

সাধক জীবন সমগ্র

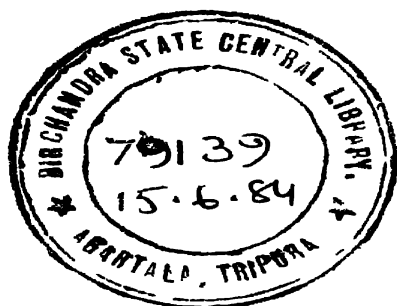


॥ অবধূত ॥

সাধক-জীবন-সমগ্র

অবধূত

UNDER THE MATCHING
GRANT SCHEME
of R. R. R. L. F.
for the Year ১৯৮৪-৮৫



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৫

—আটশ টাকা—

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন—পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রণ—চয়নিকা প্রেস

মিঃ ও বোম্‌ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ আমাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশব সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-২ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

বাংলাসাহিত্যে অবধূতের আবির্ভাব তাঁর কাহিনীগুলির বিষয়বস্তুর মতই বিস্ময়কর। এবং তাঁর বিস্ময়কর রচনাগুলির মধ্যে মরুতীর্থ হিংলাজের পরেই যে সব রচনা পাঠকের মনে শিহরণ ও রোমাঞ্চ জাগায় সে-গুলি হল তাঁর নিজের সন্ধ্যাস-জীবনের পটভূমিকায় রচিত আত্মজীবনী-১, মূলক উপাখ্যানসমূহ। অনেকেরই জানা নেই, অবধূত প্রথম জীবনে সহিংস বিপ্লবী-দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ইংরেজ সরকার সে সময় তাঁকে ধরবার জন্তে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেছিলেন। ইংরেজ পুলিশের চোখে খুলে দিতে অবধূত ঘুরে বেড়ান ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। এই ঘুরে বেড়ানোর সময়ই তিনি এলেন তাঁর গুরুর সংস্পর্শে। সেই গুরু অবধূতকে দীক্ষা দিলেন তন্ত্র-সাধনে।

তান্ত্রিক জীবনের রহস্যময় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লিখিত হয়েছে অবধূতের উদ্ধারণপুরের ঘাট, বশীকরণ ও কলিতীর্থ কালীঘাট। কখনও শ্মশানে, কখনও মঠ-মন্দিরে, কখনও বা লোকালয়ে নিজের বিভিন্ন জীবনাভিজ্ঞতার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন অবধূত তাঁর এই সব গ্রন্থে। তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলি যেমনই বিচিত্র, তেমনই বিচিত্র তাদের জীবন, জীবনের উল্লাস ও তার ব্যাখ্যা-বেদনা। এই সব কাহিনীতে নানা রসের সমাবেশ হয়েছে, কোথাও তা মধুর কোথাও আবার বীভৎস। কিন্তু রচনাশৈলীর গুণে ও উপাদান-বিজ্ঞাসের বৈচিত্র্যে কাহিনীর নিটোল বুনন কোথাও পাঠককে খামতে দেয় না, শেষ পৃষ্ঠাটি পর্যন্ত সন্মোহিত করে রাখে। এই সংকলন একাধারে অবধূতের ব্যক্তিগত তান্ত্রিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও সেই সঙ্গে তন্ত্রসাধনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় অর্ধব্রাত্য সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়।

—সম্পাদক

সূচীপত্র

উদ্ধারণপুরের ঘাট	...	১
নশীকরণ	...	১৭৩
কলিতীর্থ কালীঘাট	...	৩৫৫

উদ্ধারণপুরের ঘাট ।

কান্না হাসির হাট ।

ছত্রিশ জাতের মহাসমগম ক্ষেত্র ।

ছনিয়ার সর্বত্র দিনের শেষে নামে রাত, রাতের পিছু পিছু আসে দিন ।

উদ্ধারণপুরের ঘাটেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না ।

উদ্ধারণপুরের দিন।

স্বপ্নিমগ্না প্রকৃতির ধমনীতে নতুন জীবনের জোয়ার তুলে যে জ্যোতির্ময় উদ্ভিত হন ধরণীর বুকে তিনি উদ্ধারণপুরের ঘাটকে সভয়ে এড়িয়ে চলেন। উদ্ধারণপুরের দিন আসে ওস্তাদ জাহ্নকরের বেশ ধরে। ভেঙ্কি-বাজির সাজ-সরঞ্জাম-বাঁধা প্রকাণ্ড পুঁটলিটা পিঠে ফেলে আঁধার কালো যবনিকার অন্তরাল থেকে নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে আবিভূত হয় উদ্ধারণপুরের দিন। ধীরে ধীরে যবনিকাখানি চোথের ওপর মিলিয়ে যায়। আলোর বগ্গায় ভেসে যায় রঙ্গমঞ্চ। হেসে ওঠে উদ্ধারণপুরের ঘাট। পোড়া কাঠ, ছেঁড়া মাদুর, চট কাঁথা, বাঁশ চাটাই, হাডগোড, ভাঙ্গা কলমসী সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। হাডগিলাদের ঘুম ভাঙে। শকুনিরা ডানা ঝাপটে সাড়া দেয়। আকাশের দিকে মুখ তুলে শেয়ালেরা শেষবারের মত বলে ওঠে— হুকা হুয়া-হুয়া হুয়া-হুয়া হুয়া। অর্থাৎ কি না, হে নিশা, আবার ফিরে এস তুমি। দিনের আলোয় আমরা বড় চক্ষুপঙ্খায় পড়ে যাই কাঁচা মড়া নিয়ে টানাটানি করতে। তার ওপর ওই ওয়া জেগে উঠে পাখা ঝাপটাচ্ছে, এখনি ভাগ বসানো আসবে আমাদের ভোজে।

ততক্ষণে উদ্ধারণপুরের দিন তার জাহ্নর পুঁটলি খুলে ফেলেছে। শুরু হয়ে গেছে মায়াবী জাহ্নকরের জাহ্নর খেল। পুঁটলিটা থেকে কি যে বেরবে আর কি যে না বেরবে তা আন্দাজ করে কার সাধ্য? খেলার পর খেলা চলতেই থাকে। কথা আর কথা, কথার ইল্লজালে সব কিছু ঘুলিয়ে যায়। যা জলজল করছে চোখের সামনে এক ফুঁ দিয়ে দেয় তা উড়িয়ে। কোথাও যার চিহ্ন মাত্র নেই—তুড়ি দিয়ে তা আমদানি করে তুলে ধরে নাকের ডগায়। সবই অদ্ভুত—সবই তাজ্জব কাণ্ড। আগের খেলাটির সঙ্গে পরেরটির কোনওখানে কোনও মিল নেই।

উদ্ধারণপুরের শ্মশান। পাকা ওস্তাদ জাহ্নকরের বেশে প্রতিটি দিন যেখানে আসে কালো যবনিকার অন্তরাল থেকে। চালিয়ে যায় তার ভোজবাজি যতক্ষণ না যবনিকাখানি আবার ধীরে ধীরে নামতে থাকে রঙ্গমঞ্চের ওপর। তখন সব ফাঁকা হয়ে যায়।

আর তখন গালে হাত দিয়ে বসে থাকতাম আমি, পুনরায় যবনিকা ওঠার অপেক্ষায়।

আজ বড় বেশী করে মনে পড়ে উদ্ধারণপুর শ্মশানের সেই জমজমাট দিন-

গুলিকে। প্রতি রাতে আমার সেই রাজসিক শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে হিসেব খতিয়ে দেখতাম, কি কি জমা পড়ল সেদিন আমার জমাখরচের খাতার পাতায়। কম কিছু নয়, আক্ষেপ করতে হত না কোনও দিন। তখন সারা দিনের উপার্জন—অমূল্য মণিরত্নগুলি সাজিয়ে তুলে রাখতাম আমার মনের গহন কোণের মণি-কোঠায়। একটি পবন পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত বুক খালি করে।

তাবপর নিশ্চিন্ত আবারে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়তাম বুক-ভরা আশা নিয়ে। ঘুম ভাঙলেই এমন একটি দিনকে পাব যা বঙে রসে যেমন টাইটমুঁব, আলোয় আধাবে তেমনি বহুসময়। এমন একটি দিনকে বরণ কববার বুক-ভরা আশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া কি কম ভাগ্যের কথা।

এখন বাত পোণায় আটকুডো দিনের মুখদর্শন করে—অর্থাৎ হাড অযাত্রা। এখনকার এই দিনগুলির কাছে কোনও কিছু প্রত্যাশা করা বৃথা। জীবনের জোয়ালখানা কাঁধে নিয়ে টেনে বেড়াবাব এতটুকু অর্থ আছে নাকি এখন। বছবার পড়া পু্যানো-পুঁখি পা তা গুলটানো। না আছে তাতে চমক, না আছে উত্তেজনার বোমাঞ্চ। বৈচে থাকাব বিড়ম্বনা ভোগ। এর নাম ঠেচে পাকা নয়, শুধু টিকে থাক। মবা ফুল যেমন গাছের ডালে শুকনো বোঁটা আঁকড়ে ঝুলতে থাকে।

আজ মনে মনে ভাবি এসে দাডায়—উদ্ধারণপুৰ শ্মশানের কত কথা, কত কাহিনী। কোন্টিকে গেলে কোন্টি বালি। এমন একটি দিনও তখন আসেনি যেদিন কিছু না কিছু কুড়িয়ে পেয়ে তুলে বাখিনি মনের মণি-কোঠায়। সেই সব ভাঙ্গিয়ে এখন এই মবা দিনগুলোর গুজবান হচ্ছে। মহাশ্মশান-উদ্ধারণপুৰ-ঘাটে-কুড়িয়ে-পাওয়া মণি-মুকুণ্ডালর স্বাভা আজও এতটুকু স্নান হয়নি।

কাটোয়া ছাড়িয়ে গঙ্গার উজানে উঠতে থাকলে আসবে উদ্ধারণপুৰ। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পার্বদ শ্রীউদ্ধাৰণ দত্ত ঠাকুর। তাঁরই নামের স্মৃতি বহন করছে উদ্ধারণপুৰ। কিন্তু সে কথা কারও মনে পড়ে না। উদ্ধারণপুৰ বলতে বোঝায় উদ্ধারণপুৰের ঘাট। “যত মড়া উদ্ধারণপুৰের ঘাটে”—এটা হচ্ছে ওদেশের একটা চলতি কথা। অবাস্তিত কেউ এসে জ্বালাতে থাকলে বিরক্ত প্রকাশ করে এই কথাটা যখন তখন বলা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় যে অংশটুকু গঙ্গার পশ্চিম তীরে পড়েছে, সেখানকার আর বীরভূম জেলার প্রায় ষোল আনা মড়া আসে উদ্ধারণপুৰ ঘাটে। কাঁথা মাহুর চট জড়ানো, বাঁশে ঝোলানো মড়া দশ দিনের পথ পেরিয়ে আসে উদ্ধারণপুৰ ঘাটে পুড়তে। ওদেশের নিয়ম, স্বজাতিয়া মড়া কাঁধে করে

গ্রামের বাইরে একটা নির্দিষ্ট গাছতলায় নিয়ে গিয়ে মুখাণ্ডি করবে। মস্ত পড়া, শিতি দেওয়া, এ সমস্ত শাস্ত্রীয় আচার অহুষ্ঠান সেখানেই সেরে ফেলা হবে। তারপর মড়াটিকে নিয়ে যাওয়া হবে উদ্ধারগপুরে গঙ্গায় দিতে। গঙ্গায় দেওয়া যদি সামর্থ্য না হুলোয় তাহলে আত্মীয়স্বজনের আর আক্ষেপের অন্ত থাকে না। দশ বছর আগে যে মরেছে তার জন্তেও শোক করতে শোনা যায়—ওরে বাপু, তাকে আমি গঙ্গায় দিতেও পারিনি রে বাপু।

গঙ্গায় মড়া নিয়ে যাবার জন্তে গ্রামিণী গায়ে দু-একদল লোক আছে। মড়া বওয়া হচ্ছে তাদের পেশা। কে কোথায় মরো-মরো হয়েছে সে খোঁজ তারা রাখে। মরার সঙ্গে সঙ্গে জুটে গিয়ে সেখানে। তখন দর কষাকষি চলবে। এত বোতল কাঁচি মদ, নগদ টাকা এত। আর যাওয়া-আসায় যে ক’দিন লাগবে সেই কদিনের জন্তে চাল ভাল তুণ তেল তামাক মুড়ি গুড়! সব জিনিস বুঝে পেলে মড়াটিকে কাঁথায় মাতুরে জড়িয়ে একটা বাঁশে বুলিয়ে ইঁটতে শুরু করবে উদ্ধারগপুরের দিকে। এঁরাই হল কৈধো। সব জাতের ঘর থেকেই কৈধোর পেশার লোক জোটে। যে ছেলেটা বখে গিয়ে বাউণ্ডুল হয়ে গেল, সে আর করবে কি? পরের পয়সায় মদটা ভাঙুটা চলে এমন পেশা বলতে ঐ কৈধোর পেশার তুল্য আর কোন্ কাজটি আছে! টাকাটা সিকেটা জোটে। পেট ভরে খাওয়াটা ত ফাউ, তার উপর নেশাটা। গায়ে ফিরে একটা ফলাঃও জোটে বরাতে। যেমন তেমন করে মৃতের পারলৌকিক কর্ম করলেও কৈধোরা বাদ পড়ে না। মুখাণ্ডি হয়ে যাবার পর আর জাতি-বিচারের দরকার করে না। তখন বামূনের মড়াও এদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাসে যদি দু’তিনটে কাজও কপালে জুটে যায় তাহলে কৈধোদের সচল বচল থাকে সব দিকে।

কিন্তু সব সময় ত আর সেরকম চলে না। হামেশা আর মরছে কটা লোক? একবারের বেশী দু’বার ত আর মরবে না কেউ ভুলেও, একবার মলেই একজনের মরার পালা সাঙ্গ হয়ে গেল জন্মের মত। তখন আবার আর একজনের দিকে তাকিয়ে কৈধোদের দিন গুনতে হয়। আর এক-একটা লোক জালায় ত কম নয়। ক্ষীরগোবিন্দপুরের ঘোষাল মশাই আজ মরি কাল মরি করে তের বছর পার করে তবে এলেন। তের বছর একজনের দিকে নজর রেখে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা কি সহজ কথা না কি!

মড়া কাঁধে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে মাঠের পর মাঠ ভ্রমতে থাকে কৈধোরা। রান্না খাওয়ার সব কিছু সঙ্গে আছে। পথে কোথায় থেমে খাওয়াদাওয়া করা হবে তার জন্তে এক-একটা আম জাম বট পাকুড় গাছ ঠিক করাই আছে। ঘণ্টা পাঁচ-ছয়

সমানে চলে—সেই গাছতলায় পৌঁছে প্রথমে মড়াটাকে টাঙানো হবে সেই গাছের ডালে। নয়ত ওরা যখন ব্যস্ত থাকবে খাওয়াদাওয়ায়—তখন শেয়াল-কুকুর টানাটানি করবে যে। মড়াটা টাঙিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আশপাশের খানা ডোবা পুকুরে ডুব দিয়ে এসে সকলে রান্নাবান্নায় লেগে যাবে সেই গাছতলাতেই। তার সঙ্গে চলতে থাকবে মদ গাঁজার শ্রাদ্ধ। খাওয়াদাওয়ার পর সেই গাছতলাতে পড়ে লম্বা বেহুঁশ ঘুম। ঘুম ভাঙলে মড়া নামিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা। এইভাবে দশ দিনের পথ ভেঙ্গেও মড়া আনে উদ্ধারণপুর ঘাটে।

আবার এরই মধ্যে অনেক বকমেণ অনেক সব গডবডও হয়। বর্ষার সময় বিচার-বিবেচনা কবে মাঠের মধ্যে কোনও নালায় ফেলে দিলে মড়াটাকে। দিয়ে যে যার কুটুমবাড়ী চলে গেল দূব গাঁয়ে। কাটিয়ে এল কটা দিন। প্রাপ্যটা ষোল আনাই মিলে গেল দিগ্‌দারি না ভুগে।

আরও নানা রকমেণ কাণ্ডও ঘটে। তবে সে সমস্ত ব্যাপার হামেশা ঘটে না। উপযুক্ত শাস্ত সজ্জত আধার পেলে শুক হয় মড়া-খেলানো। মড়া-খেলানো অতি কঠিন শাস্ত সম্পাদ। যার তাব কর্মও নয়। পাকা লোক দলে থাকলে তবে এ খেলা চলে।

কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপার বড় একটা তত্তে পায় না। সব মড়াই আব কোঁধোদের হাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় না। আত্মীয়স্বজন সঙ্গে থাকেই। তার পর বড় ঘরের বড় কাণ্ড। খাটে কবে মড়া যাবে। সঙ্গে লোকজন-আত্মীয়স্বজন এক পাল। যেন বিয়ের বরযাত্রী চলেছে। এ সমস্ত ব্যাপারে কোঁধোদের যদি ডাকা হয়ও, তবে তাদের পাওনা শুধু ঐ টাকা কটাই। এক টোক মদ বা এক বেলার ফলারও নয়।

সেই বিখ্যাত উদ্ধারণপুরেব আশানে যে ঘাট দিয়ে ওদেশের বাপ-ঠাকুরদার ঠাকুরদারাও পার হয়ে চলে গেছেন ওপাবে, সেই ঘাটেই তখন আমি সাধ করে বাসা বেঁধেছিলাম। ছিলামও কয়েকটা বছর বড় নিরাঙ্কাটে। একেবারে রাজার হালে আর আমিরী চালে।

আশান গঙ্গার কিনারায়—দক্ষিণে উত্তরে লম্বা। পশ্চিমে বড় সড়ক। সড়ক থেকে নেমে আশানে ঢুকলে দেখা যাবে গঙ্গার জল পর্যন্ত সমস্ত স্থানটুকুময় ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসী, পোড়া কাঠ, বাঁশ চাটাই মাদুর দড়ি আর হাড়-গোড় ছড়িয়ে পড়ে আছে। ইয়া হামদা হামদা শিয়ালগুলো আংপোড়া মড়া নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে। দিনের আলোয় সকলের চোখের উপরেই তাদের খেয়োখেয়ির বিরাম নেই। ওদের চক্ষুলজ্জা বলতে কোনও কিছুই বালাই নেই একেবারে। রক্ত-চক্ষু

কৈদো কৈদো কুকুরগুলো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারিঙ্গী চালের মুরব্বী সব, ছোট দিকে নজর যায় না।

একেবারে গঙ্গার কিনারায় জলের ধারে শকুনগুলো পাখা মেলে মাটির ওপর মুখ খুবড়ে পড়ে আছে। যা খেয়েছে তা হজম না হওয়া পর্যন্ত ওরা পাখায় রোদ লাগাবে।

ঋশানব উত্তর দিকের শেষ মীমায়—একটি উচ চিবি। চিবির পেছনেই আকন্দ গাছের জঙ্গল। সেই চিবির ওপরেই ছিল আমাব গদি।

তোশকেব ওপর তোশক, তার ওপর আবও তোশক, তাব ওপর অশ্বনতি কাঁধা লেপ কঙ্গল চাপাতে চাপাতে আমার সেই স্মৃতিসন মাটি থেকে ছ’হাতের ওপর উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। প্রথানে গিয়ে প্রথম যেগুলো পেতেছিলাম সেগুলো ক্রমে ক্রমে মাটিতে পরিণত হচ্ছিল। তা হোক না, আমার কি তাতে? আমার ত অভাব ছিল না কোনও কিছুর। বোজাই কিছু না কিছু নতুন জিনিস চডছেই আমার গদিতে। কাজেই একেবারে তলারগুলোর জগ্রে মন খারাপ হত না।

বনকদমপুরের কুমার বাহাদুরেব বড়ী ঠাকুরমাব গঙ্গালাভ হল মাঘ মাসে। আধ হাত চওড়া হাতেব-কাজ-করা কাশ্মীরী শালখানা এসে চডল আমার গদির ওপর। দিন কতক বুলতে লাগল আমার গদির ছ’পাশে সেই অপূর্ব কারুকার্য করা পশমী শালের পাড। তার ওপর শুয়ে শরীব মন মেজাজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে। কয়েকটা দিন কাটতে না কাটতেই এসে গেলেন গৌসাইপাড়ার সপ্ততীর্থ ঠাকুর মশাই। তাঁর শিষ্য-ভক্তরা প্রভুকে একখানা নতুন মটকা চাদর চাপা দিয়ে নিয়ে এল। দিলাম চাপিয়ে সেই মোলায়েম মটকাখানা কাশ্মীরী শালের ওপব। শাল নিচে যেতে শুরু করলে। মটকাব ওপব শুয়ে মন মেজাজ বেশ মোলায়েম হয়ে আসছে—এমন সময় এলেন পালবাবুদের বড বোমা একখানি রক্তবর্ণ বেনারসী পরে। তা বলে বেনারসী পরে চিতায় ওঠা যায় না। বেনারসী ছাড়িয়ে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নতুন লালপাড শাডী পরিয়ে সিন্দুরে চন্দনে আলতায় সাজিয়ে যখন তাঁকে চিতায় তোলা হল, তখন সেই বেনারসীও এনে গেছে আমার গদির ওপর। পালবাবুর খোদ শালাবাবু আস্ত পূর্ণাভিষিক্ত কোল। বিলাতী ভিন্ন দিশী জিনিস চোন না তিনি। তবে আমার কাছে যা পেলেন তা হচ্ছে শোধন করা মহাকারণ। মহাপাত্র পূর্ণ করে মহাকারণ করে গেলেন তিনি। ভায়ে-বোয়ের বেনারসীখানা নিজ হাতে আমার গদির ওপর বিছিয়ে দিয়ে বিকট চিংকার করে উঠলেন, “বোম্ কালী ঋশানওয়ালী, মাকে নিলি তাকে পায়ে ঠাই দিস মা।” বলে ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিলেন মহাকারণ।

বেনারসীর ওপর শুয়ে রাতে ঘুম হল না। খস খস করে, গায়ে ফোটে। তার পরদিন বিরক্ত হয়ে তার ওপর চাপালাম একখানি পুরানো কাপড়ের নরম কাঁথা। কাঁথাখানায় বড় যত্নে শাড়ীর পাড় থেকে নানা রঙের সূতো তুলে ছুঁচ দিয়ে ফুল লতা পাতা আঁকা হয়েছে। কতদিন লেগেছে তৈরী করতে ওখানা কে জানে! এবার তার ওপর শুয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

এইভাবেই তখন আমার আমিরা মেজাজ গড়ে উঠেছিল। কোনও কিছুই জল্পট পবোয়া ছিল না তখন। গরজ বলতে কোনও বলাই ছিল না একেবারে। অফুরন্ত ভাণ্ডার—কে কার কাঁড় ধারে?

আমার সেই গদির তিন পাশে দিয়েছিলাম বাঁশ পুঁতে। পর্যাপ্ত বাঁশ, চাঁচা ছোলা পরিষ্কার করা। যে বাঁশে মড়া ঝুলিয়ে আনে তা নাকি পোডাতে নেই। সে বাঁশ পোডালে আব সহজে বয়ে আনার জন্যে মড়া জুটেবে না। কেঁধো বন্ধুরা কায়মনোবাক্যে এক কথাটি বিশ্বাস করত। আর সেইজন্তেই তারা মড়া নামিয়ে বাঁশখানা এনে আগে পুঁতে দিয়ে যেত আমার গদির তিন পাশের দেওয়ালে। ঘরবাড়ির উপরে চাল রেওয়া হয়েছিল মাদুর আর চাটাই দিয়ে। মাদুরের ওপর মাদুর, তার ওপর চাটাই আর চাটাই। ঘরের ভেতর তিনদিকেব বাঁশের দেওয়াল চেকে দিয়েছিলাম বড়-বোঁড়ের শাড়ী দিয়ে। মাথার ওপর হরদম বদলে বদলে ঝুলিয়ে দিতাম নতুন নতুন চাঁদোয়া। চাঁদোয়াও শাড়ী দিয়ে বানানো। কোনও কিছুই অভাব ছিল না কিনা তখন। এতে কার না মেজাজ চড়ে!

খাওয়াদাওয়ার কথা না বলাই ভাল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক কথা একশব্দও শুনতে হচ্ছে—‘বাবা, এটুকু পেসাদ করে দিন!’ গণ্ডা গণ্ডা বোতল সামনে নামিয়ে দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে মিনতি করে—‘বাবা পেসাদ করে দিন।’ এক চোক করে গিলতে গিয়েও সারাদিনে অন্ততঃ এক পিপে গিলতে হত। তার ওপর গাঁজা। কলকেতে আগুন দিয়েই জোড় হাতে এগিয়ে ধরবে—‘প্রভু, ভোগ লাগান। টান দিতেই হবে একটা। নয়ত ভক্তরা হায় হায় করতে থাকবে। বলবে—‘ভৈরবের কিপা পেলুম না।’

বাজার থেকে কিনে আনল লুচি পুরী মেঠাই মোড়া। তাও ‘পেসাদ’ করে দিতে হবে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মিলে গেল গন্ধার ইলিশ। মাছ ভাজা আর গরম ভাত তৈরী হল। কলাপাতা পেতে সামনে সাজিয়ে দিলে আগে। তাও করে দাও প্রসাদ। ডোমপাড়া থেকে ছোটো হাঁস এনে পালখ ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে ফেললে পেঁয়াজ-গরমমশলা দিয়ে। তার সঙ্গে খিচুড়ি। দাও পেসাদ করে। আশান জাগিয়ে যে বসে আছে সেই ত সাক্ষাৎ ভৈরবের চেলা। প্রথমে তার মূখে

এর বীভৎস মুখ-গহ্বরেব মধ্যে কৃতান্তের কুটিল ইঙ্গিত। কোটরে-বসা ছুই চক্ষের হিংস্র দৃষ্টিতে নিষতির নির্মম আহ্বান, শ্বাসপ্রশ্বাসে হারিয়ে যাওয়া অতীতের জন্তে কুৎসিত হাহাকার। কিছুই দিতে আসে না আজকের নিঃশ্বা বিভাবী। শুধু নিভেট আসে। সাবাবাত এব সঙ্গে এক শয্যা কাটাবার মূল্য দিতে হয় এক-দিনেব পবমাযু।

আজও তারা আসে—যারা আসত আমার কাছে উদ্ধাবণপুন্দের শ্মশানে। এসে ভিড় কবে দাড়াষ আমার চারপাশে। করুণ কণ্ঠে মিনতি করে বলে, “চল গোঁসাঁই, আবাব কিবে চল আমাদের সেট আড্ডায়। তোমার জন্তে গদি পাতব আমবা। বাঁশেব দেশেয়াল দিয়ে ঘর তুলে দোব, চাটাই আব মাহুর দিয়ে চাল বাঁধব। তুমি আমাদের শজা ছিলে। আবাব তোমাষ বাজসিংহাসনে বসিয়ে আমবা তোমার প্রসাদ পাব।”

আসে বিষ্ণুটিকুবীব জয়দেব ঘোষাল, দাডোন্দাব হিতলাল মোডল, বাঘডাঙ্গার ছুটকে বাগ্নী। নাকে বসকলি আঁকা, মাথাষ চূডো-কবে চুল বাঁধা নিতাই বোষ্টমী আসে মন্দিরা বাজিয়ে। চরণদাস বাবাজী আসে হাতে একতারা নিয়ে। আর আসেন ব্রহ্মবিজ্ঞা আগমবাগীশ খডম খট খট কবে। তাঁর পিছু পিছু আসেন টকটকে লালপাড শাড়ীপরা তাঁব নতুন শক্তি। আগমবাগীশ প্রতিবাবই নতুন শক্তি নিয়ে আসতেন শ্মশানে লতা-মাধনা কবনে। বলতেন—“জানলে গোঁসাঁই, বাসি ফুলে পুজো হয় না।” তখন ভেবে পেতাম না এত নতুন ফুল তিনি জোটান কোম বাগান থেকে, আর বাসি হয়ে গেলে ওদের জলাঞ্জলি দেনই বা কোথায়।

এখনও মাঝে মাঝে দেখা দেষ একমাথা-কোঁকড়া চুল রামহবি ভোম আব আধ-বিঘত চণ্ডা কপার বিছা কোমরে পবে রামহবিব বউ। সঙ্গে নিয়ে আসত তাদের পাঁচ বছরের উলঙ্গ মেয়ে সীতাকে। মেয়েটাকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে রামহরি বলত—“তোমার সেবায় দিলুম গোঁসাঁই। তোমার পেসাদী ফুল না হলে যে শালা একে ছোঁবে তাকে জ্যান্ত চিত্তেয় তুলে দোব।” নিজের সুপুষ্ট নিতম্বের ওপর হাতখানা ঘষে মুছে আঁচল থেকে একখিলি পান খুলে দিয়ে বামহরির বউ বলত—“নাও জামাই, মুখে দাও

সাড়ে তিন মণ ওজনব মোষের মত কালো রতন মোডল আসে। নিজের নাম বলত ‘অতন’। চিং হয়ে মড়ার মত গল্পায় ভেসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অতন মোডল দলে না থাকলে সহজে কেউ চাটাই কাঁথা খুলে মড়া বার করে নাচাতে সাহস করত না। অতনকে কেঁধোরা সমীহ করে চলত। অতন মোডল কেউটে

সাপের বিষে পোস্ত ভিজিয়ে তাই শোধন করে খেত নেশা করবার জন্তে । লোকটি ছিল চণ্ডীর দেয়াসি । তিন তুড়ি দিয়ে ডাকিনী নামাতে পারত ।

ঝাড়া পাঁচ হাত লম্বা খস্কা ঘোষ এসে দাঁড়ায় সামনে । একটা বিলিতী সাদা ঘোড়া বার করে তাব লম্বা কোটের ভেতর থেকে । তারপর লাল টকটকে উঁচু দাঁত কথানা দেখিয়ে বলে—“চালাও গোসাঁই, খাস বিলিতী মাল । তোমার জন্তেই আনলুম । ভোগ লাগাও ।” অস্বস্ত বিশবার দান্দী মহকুমার তামাম চিনি মস্তবলে উড়িয়ে দিয়েছিল খস্কা ঘোষ । আবার মস্তবলেই আসমান থেকে সব চিনি আমদানি কবে বেচেছিল চল্লিশ টাকা মণ দরে । শেষবার ওরা খস্কাকে নিয়ে আসে চাটাই জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে । টপ টপ করে বুক ঝরছিল চাটাই ফুঁড়ে । তার আগের দিন রাত্রে পাঁচন্দ্রব শীলেন্দের বাড়ীর তিনতলার ছাদ থেকে নিচে শানদাঁধানো উঠোনের ওপর লাফিয়ে পড়ে পিঁণ্ড হয়ে এল খস্কা ঘোষ । আরও কত লোকই এখন ভিড় কবে এসে দাঁড়ায় আমার চারপাশে । সবাই চায়, আবার আমি ফিরে যাই সেই উদ্ধারগপুরের শ্মশানে—নয়ত ওদের বউ অস্থবিধে হচ্ছে । অস্থবিধে হচ্ছে গাজনন্দনাব মেলাব কুমবী মেয়েদের । আমার দেওয়া মাহুলি না পাবলে ওদের গতব ঠিক থাকে না । আর অস্থবিধে হচ্ছে কৈচরের বামুনদিদির । পাল-পার্বণে তাঁর যজ্ঞমানদের নিয়ে তিনি গজ্ঞান্নানে আসতেন । আমার কাছে থেকে নিয়ে যেতেন অনেকের জন্তে ছেলে হবার মাহুলি । আবার অনেক বড়ঘরের কুমারী আর বিধবাদের জন্তে অন্ন জিনিস । তাদের সঙ্গে করে এনে গজ্ঞান্নান করাতেন বামুনদিদি, তখন আমার পায়ে পড়ত পাঁচসিক করে দক্ষিণা ।

আসে সবাই । টাট্টু চেপে দারোগা আসেন মদ ধরতে । রামহরির ঘরে বাতটা কাটিয়ে যান । বামহর্য সে রাতট' মেয়ে নিয়ে আন' কাছে এসে থাকে আর সারারাত ঢক ঢক করে মদ গেলে । পরদিন সকালে রামহরির বউ গজ্ঞান্নান করে এসে আমার সামনে কাঁচা গোবৎ থায় । গোবৎ-গজ্ঞান্ন সব শোধন হয়ে যায় ।

উদ্ধারগপুরের ঘাট ।

পতিতপাবনী মা গঙ্গা কুল কুল করে বয়ে যায় কালো মাটি ধুয়ে নিয়ে । ঘাটের উত্তরদিকে আকন্দ গাছের জঙ্গলের পি' উঁচু টিলার ওপর আমার দু'হাত পুরু গদি । সামনে চিতার পর চিতা সাজিয়ে তার ওপর তুলে দিয়ে যায়—ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী ছোকরা-ছুকরী যুবক-যুবতী । দমকা হাওয়া লেগে এক-একবার দাউ দাউ

করে জলে ওঠে চিতাগুলো। আবার ঝিমিয়ে পড়ে। শিয়ালেরা হোঁক হোঁক করে ঘুরতে থাকে। আগুনটা নিভে না এলে এগুতে সাহস পায় না ওরা। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটানে নামিয়ে আনে একটা মড়া। তারপর আর ওদের কে পায় ! হেঁড়া-ছিঁড়ি করে সাবড়ে ফেলতে ওদের বেশী সময় লাগে না। শূন্য চিতাটা জলে জলে নিভে যায়। সাদা হাড় কথানা এধারে ওধারে ছড়িয়ে পড়ে থাকে।

সাদা হাড় আর কালো কয়লা। উদ্ধারণপুর শ্মশানে কোনও ময়লা নেই। বর্ষায় গঙ্গার জল ওঠে শ্মশানে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় হাড়গোড় আর পোড়া কাঠ। তখন নেপথ্যে মহাসমারোহ লেগে যায়। পাপী-তাপী জ্ঞানী-মূর্খ মহাপুণ্যবান আর মহাধর্মিষ্ঠের দল স্বর্গারোহণ করে। সবাই হাত-ধরাধরি করে উদ্ধার হয়ে যায়।

আমি ঠায় বসে থাকি গালে হাত দিয়ে আমার সেই দু'হাত পুরু গদির ওপর চেপে। আমার উদ্ধার হয়নি উদ্ধারণপুরে গিয়েও।

আজও বসে বসে মালা গাঁথছি। এ শুধু কথার মালা নয়। চিতার আগুনে-পোড়ানো—কষ্টপাথরে কষা সোনার মালা। এ মালা হীরে মুক্তা চুনী পান্না দিয়ে সাজাব আমি। হয়ত চোখধাধানো জেল্লা থাকবে না আমার মালায়। তবু এ হচ্ছে সাঁচা জিনিস, মেকাি বুটার কারবার নয় আমার। উদ্ধারণপুর শ্মশানে যা কুড়িয়ে পেয়েছি তা শহর গাঁয়ের হাটে-বাজারে মাথা খুঁড়ে মলেও মিলবে না। শহর-গাঁয়ে রঙের খেলা। রঙের জলুমে এখানে পচা মালও চড়া দামে বিক্রয়। উদ্ধারণপুর শ্মশান একটিমাত্র রঙে রঙিন। সে হচ্ছে পোড়া কাঠ কয়লার রঙ—যে রঙের মাঝে পড়ে সব রকমের রঙই কালোয় কালো হয়ে যায়।

সেই কথাই বলে নিতাই বোষ্টমী। বলে—“বল না গোসাঁই, কি করে এই দেহটাকে একবার বলসে নেওয়া যায়। বলসে আড়ার করে নিতে পারলে আর এটার দিক চেয়ে কারও জিভ দিয়ে লাল গডাতো না। গলায় কণ্ঠি পরে নাকে রসকলি একে জীবনটা কাটলাম শুধু মাংস বেচে। আর ভাল লাগে না এই রক্ত-মাংসের কারবার করা। তুমি মজা পাও দিনরাত মাংস পোড়ার গন্ধ শুঁকে। কাঁচা রক্ত-মাংসে তোমার রুচি নেই। চিতায় উঠে আগুনে বলসে কালো কয়লা হয়ে যাচ্ছে না দেখলে তোমার মন ওঠে না। তাই ত ছুটে ছুটে আসি তোমার কাছে। দাও না গোসাঁই একটা উপায় বলে, যাতে এই হাড় মাস পুড়ে কালো আড়ার হয়ে যায়। যা দেখে আর কারও হ্যাংলামো প্রবৃত্তি হবে না।”

তা জিত দিয়ে লাল গড়াবার মত সম্পদ ছিল বৈকি নিতাই বোষ্টমীর। কাঁচা হলুদের সঙ্গে অল্প একটু চুন মেশালে যে রঙ দাঁড়ায় সেই রঙে রঙিন ছিল নিতাই। তার ওপর তার সেই ছোট্ট শরীরখানির বাঁধুনি ছিল অটুট, সব খাঁজ-খোঁজগুলি তীক্ষ্ণ স্পষ্ট। পেছন ফিবে চলে গেলে ষাট বছরের তত্ত্বদর্শী মশাই থেকে তের বছরের ফচকে ছোঁড়া নাপিতদের झুলো পৰ্ধন্ত সবাই একবার বোষ্টমীর কোমরের নিচে চোখ বুলিয়ে না নিয়ে স্থির থাকতে পারত না। ‘জয় রাধে, দুটি ভিক্ষে পাই মা’ বলে যখন গেরস্তের দরজায় গিয়ে দাঁডাত নিতাই, তখন বউ-ঝিরা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত বাড়ী ব ভেতর। পিঁড়ি পেতে বসিয়ে মুড়ি নাড়ু খাইয়ে পানের থিঁলি হাতে দিয়ে জেনে নেবাব চেষ্টা করত, কি উপায়ে বুকের সম্পদ বোষ্টমীর মত চিরকাল বজায় রাখা যায়। মাথাব চুল অত কালো হয় কি করে? কোমর ছাড়িয়ে চুল নামাবার ওষুধ কি? কি দিয়ে কাজল বানালে বোষ্টমীর মত চোখের পাতা কালো হবে? সবাই খোঁজ কবত, ওর কুঁড়াজালির ভেতর পুরুষকে হাতের মুঠোয় পোরবার জড়ি-বুটি লুকোনো আছে কিনা।

দশাশ পশ্চিমে নান্নরেব কাছাকাছি কোনও গ্রামে ছিল ওদের আখড়া। বাবাজী চরণদাস আখড়া বেঁধেছিল নিতাইকে নিয়ে না নিতাই ঘর তুলেছিল চরণদাসকে নিয়ে তা ঠিক করে বলা অসম্ভব। আখড়া বাঁধবার গরজ যায়ই আগে হয়ে থাকুক না কেন, আখড়া চালাত কিন্তু নিতাই দাসী। চরণদাস গাঁজা টেনে পড়ে পড়ে ঘুমোত। নেহাৎ কখনও কোনও কারণেঠেকে গেলে তার হাতিয়ারের খলেটা নামিয়ে নিয়ে ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ত। মাসখানেক পরে যখন ঘুরে আসত আখড়ায় তখন অন্তত পাঁচ কুড়ি টাকা তার কোমরে বাঁধা। করাত চালিয়ে বাটালি ঝুকে রেঁদা ঘষে জলবের গাছকে গেরস্ত গাড়ীর দরজা জানলা বানিয়ে ছেড়েছে! নিশ্চিন্তে ঘুমোক এখন গেরস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে। চরণদাসও গাঁজা টেনে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ত। একবার চোখ মেলে দেখবেও না তার বোষ্টমী কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, কি দিয়ে কেমন করে চালাচ্ছে আখড়া।

মাত্র আমার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও ওরা দুজনে একসঙ্গে যাওয়া-আসা করত না। ফোঁটা তিলক কুঁড়াজালি এসব কোনও কিছুই ধার ধারত না চরণদাস। কোথাও বৈষ্ণবসেবার নিমন্ত্রণ রাখতে যেত না সে। কচি বৈষ্ণবকে ভোর-কোপীন দেবার সময় কিংবা কোনও আখড়ার মোহন্ত বাবাজীর সমাধি হলে সমাজের সকলের ডাক পড়ত। চরণদাসও নেমস্তন্ন হত। কিন্তু কোথাও যেত না। ওর খজনি আর একতারা আখড়ার দেওয়ালে লটকানোই থাকত। মাথার কাছে কলকেটা উপুড় করে রেখে চরণদাস নাক ডাকাতো। সেই চরণদাস

কেন যে আসত আমার কাছে তা অবশ্য আন্দাজ করতে পারতাম। দ্বিবারাত্রি অষ্টগ্রহর চালাও গাঁজা টানার স্বযোগ আমার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও জুটত না তার। কিন্তু কিসের টানে যে নিতাই আসত উদ্ধারগণপুর শ্মশানে, তার হৃদিস কোনও দিনই পাইনি।

বিস্তীর্ণ চারণভূমি ছিল নিতাইয়ের। জমিদার বাড়ীর অন্দরমহল থেকে ধরম কলুর কুঁড়ে পর্যন্ত সর্বত্র ছিল তার অব্যবহৃত দ্বার। তার ভক্তসংখ্যা যে কত তা সে নিজেও বলতে পারত না। মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর আর রাম-হরি ডোমের ছোট শালা—পঙ্কজ—সবাই তার চোখের ইশারায় সাপের মাথার মণি আনতে ছুটে যেত। আস্ত পূর্ণাভিষিক্ত কোঁল পালবাবুর খোদ শালাবাবু আর বিষ্ণুটীকুর জয়দেব ঘোষালের ছ'বারের পুঁচকে বউ বোষ্টমীকে দুটো মনেব কথা শোনাবার জন্তে হা-পিতোশ কবে বসে থাকতেন। নিতাইয়ের ডবল লম্বা খস্তা ঘোষ ডাকত তাকে ছোডদি বলে। চরণদাসের জন্তে কোথা থেকে কাঁচা গাঁজা আমদানি করত সে কে জানে। নিজের বোন বলেই তাকে মনে কবত খস্তা। একবার বৈরাগ্যতলার মেলায় ঘুমিয়ে পাঁচটা লোকের নাক খেবড়ে দিয়েছিল সে। তারা নাকি বোষ্টমীর নাম নিয়ে রসিকতা জুড়েছিল খস্তার সামনে। সেই দুর্দান্ত খস্তাও বোষ্টমীর কাছে ছোট ভাইয়ের মত বসে মুড়ি চিবুতে চিবুতে মনের কথা বলত। এ হেন নিতাই কি লোভে শ্মশানে এসে আমার গদির পাশে মাদুর বিছিয়ে বসে এক-একবারে পাঁচ-সাতদিন কাটিয়ে যেত তা আজও আমার অজানাই রয়ে গেছে।

থুঃ থুঃ করে থুতু ফেলে নিতাই বলে—“খালি পচা পাক আর নোংরা জল। জলে রক্তশোষা জেঁক কিলবিল করছে, ছুঁতে গা ঘিন ঘিন করে। কোনও ঘাটে আমার কলসী ভরা হল না গোঁসাই—আমার কলসী শুকনোই থেকে গেল চিরকাল।”

আকাশে একথানা আস্ত চাঁদ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে বোষ্টমীর দিকে। গঙ্গায় গলানো কপো টলমল করে বয়ে যাচ্ছে। সেই দিক চেয়ে একই মাদুরেব এক পাশে পা ছড়িয়ে বসে আছে নিতাই, ওপাশে শুয়ে আবলুস-কাঠের-কুঁদো চরণদাস নাক ডাকাচ্ছে। অত গাঁজা টেনেও কি করে স্বাস্থ্যটি বজায় রাখে বাবাজী তা একটা রহস্য বটে।

সেইদিকে দেখিয়ে বলি, “ওই ত পাশেই রয়েছে তোমার কাজলা দাঁঘি। এমন দীঘির জলেও তোমার মন ওঠে না কেন গো মই?”

আঁচলের বাতাস দিয়ে চরণদাসের ওপর থেকে মশা তাড়িয়ে খিলখিল করে

হেসে ওঠে নিতাই। বলে—“আ আমার পোড়া কপাল, এ যে নিরেট পাষণ গো গোঁসাই। এতে কলসী ভোবাতে গেলে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে যে। শাবল কোদাল চালালেও এক চাকুড় কেটে ওঠানো যাবে না এর তলা থেকে। এই দীঘির পাড়ে কপাল ঠুকে শুধু বক্ত ঝরানোই সার, এক ফোটা তেঁস্তার জলও মেলেনা।”

চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। তাঁদের আলোয় ওব মুখখানি বড়ই করুণ দেখাচ্ছে। ওব অল্পময় কালো ভুরু দুটি আরও যেন বঁেকে গেছে। ছোট্ট কপালখানা একটু কঁচকেছে। অনাবৃত স্বর্ভোল কাঁধ দুটি দু'পাশে নয়ে পড়েছে। নিরাভরণ হাত দু'খানি পড়ে আছে কোলেব ওপর। নিজের ছড়ানো-পায়ের আঙুলের ডগায় নজন রেখে চুপ করে বসে আছে। ওই দেওখানির মধ্যে যেন ডুব দিয়ে তলিয়ে গেছে নিতাই।

গঙ্গার ওপার থেকে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করা হল। শ্মশানের মধ্যে ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া আরম্ভ হয়ে গেল। ওই ওধাবে একেবারে গঙ্গার জল ছুঁয়ে চিত্রা সাজিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় একটা বুড়াকে চড়িয়ে দিয়ে গেছে কারা। সেখান থেকে চড় চড় চটাস শব্দ উঠছে। সেইদিকে চেয়ে দেখি, বুড়ীটা আশ্তে আশ্তে খাড়া হয়ে উঠে বসছে জলন্ত চিতার ওপর। তার মুখেও তাঁদের আলো এসে পড়েছে। এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মুখ। চোখ দুটোর মধ্যে আর কিছু নেই। মাংস পুড়ে গিয়ে কপালের আর নাকের সাদা হাড় বেরিয়ে গেছে। ঠোট দু'খানাও নেই। দাঁতও নেই একখানি। মুখের গর্তটার মধ্যে জমাট অন্ধকার। ওপর থেকে তাঁদের আলো আর নিচে থেকে - গুনের আভা পড়ে অদ্ভুত রঙ খুলেছে বুড়ীর। বুড়ীর শূন্য চোখের দৃষ্টি তার ছড়ানো পায়ের আঙুলের ডগার ওপর।

সশব্দে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল এ পাশে। মুখ ফিরিয়ে দেখি বোষ্টমী তার রানীকৃত চুলে চুড়ো বাঁধছে দু'হাত মাথার ওপর তুলে। সারাদিন তার পরনে থাকে একখানি সাদা থান আর তার তলায় গলাবন্ধ কাঁধকাটা শেমিজ। মাত্র হাত দু'খানি ছাড়া সম্পূর্ণ শরীরটাই থাকে ঢাকা। বোধ হয় গরমের জন্তেই রাত্রে শেমিজটা খুলে ফেলেছে। দু'হাত মাথার ওপর তোলায় দরুন দুই বাহুমূলের পাশ দিয়ে বুকের অনেকটা অংশ দেখাচ্ছে। জ্যোৎস্নার রূপালী আলোয় ভয়ানক রকম জীবন্ত পাতলা চামড়া-ঢাকা দুইটি রক্ত-মাংসের ডেলা।

আবার মুখ ফিরিয়ে নিলাম। চিতার ওপর বুড়ী সটান উঠে বসেছে। আগুনের

লাল আভা পড়েছে তার বুকে। চামড়া মাংস পুড়ে গিয়ে লাল হাড় ঝেঁরিয়ে পড়েছে। বীভৎস দৃশ্য—নিজেকে থেকে দুই চোখ বুজে গেল।

চুডো বাঁধা শেষ করে নিতাই বললে, “জল নেই গোঁসাঁই, কোথাও এক ফোটা তেঁটোর জল নেই। কাঁটার জালায় মন বিষিয়ে উঠেছিল ঘরে, তেঁটোর বুকের ছাতি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। মনে করেছিলাম পথের ধূলায় আছে মুক্তি। আকাশের জল মাথায় পড়লে মনের জালা আর বুকের তেঁটা দুই-ই জুড়িয়ে যাবে। কে জানত যে সবচেয়ে বড় শত্রু যে আমার, সেও সঙ্গে সঙ্গে পথে নামবে। পথও বিষিয়ে উঠল। কেউই আমায় চায় না। আমার খোঁজে কেউ আসে না আমার কাছে। সবাই আসে আমার এই শত্রুর কাছে। বাপ-মায়েব হাড় মাংস থেকে পাওয়া এই হাড় মাংসের বোঝাটার লোভে সবাই ছোকছোক করে ঘোরে আমার পেছনে। কানের কাছে ফিসফিস করে—সোনা-দানায় গা-গতর মুড়ে দেবে, বাড়ীঘর দাসী চাকর কোনও কিছুবই অভাব রাখবে না। খেংরা মারি সোনা-দানা বাড়ী-ঘরের মুখে—হ্যাংলা কুকুরের পাল।”

হেসে ফেলি। বলি—“খামকা গালমন্দ দিচ্ছ কেন সই দুনিয়াহুদু সবাইকে? সে বেচারাদের দোষ কি। লোভের জিনিস নাকের ডগায় ঘুবঘুব কবে ঘুবলে কে কতক্ষণ মাথার ঠিক রাখতে পাবে। আমারই মাঝে মাঝে লোভ হয়। মনে হয় যা থাকে কপালে, দুর্গা বলে ঝুলে পড়ি তোমার সঙ্গে। তারপর যেখানে হাত ধরে নিয়ে যাবে সেখানেই চলে যাই দু’চোখ বুজে। যা হুকুম করবে তাই করব, সারা জীবন ঘুরতে থাকব তোমার পিছু পিছু।”

ঘাড় বেকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা করলে, “সত্যি বলছ?”

বললাম, “ই্যা গো—বিশ্বাস হয় না? আচ্ছা, একবার ডাক দিয়েই দেখ না তু করে।”

“কিসের লোভে ছাড়বে তোমার এই রাজসিংহাসন গোঁসাঁই?”

“শুধু তোমায় পাব বলে।”

হঠাৎ বোষ্টমী একেবারে ক্ষেপে গেল। ধাক্কার পর ধাক্কা দিতে লাগল চরণ-দাসের গায়ে—“ওঠ মোহন্ত, ওঠ শিগ্গির। রাজী হয়েছে গোঁসাঁই। এইমাত্র আমায় কথা দিলে, যাবে আমাদের সঙ্গে। আমরা যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যাবে। আমায় পাবার লোভে গোঁসাঁই ওই মড়ার বিছানা থেকে নামতে রাজী হয়েছে। আজ আমাদের জয় হল মোহন্ত। ওঠ, চল এবার গোঁসাঁইকে জোর করে তুলে নিয়ে যাই।”

‘ একবার আডমোডা দিখে চোখ না খুলেই চরণদাস জবাব দেয়, “কলকেতে অগুন চাপা বোষ্টমী। কোনও লাভ হবে না ছজ্জং করে। জোব কবে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখবি কোন্ খাঁচায় ? ও পাখী কখনও পোষ মানবে না। আবার শেকল কেটে পালিয়ে আসবে।”

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে আমার একথানা হাত ধবে ফেলেছে নিতাই : “নাম, নেমে এস ওখান থেকে। আর ওখানে চড়ে বসে থাকবার কোনও অধিকার নেই তোমার। এইমাত্র কথা দিশে—যা হুকুম করব আমি তাই করবে। হাত ধরে যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যাবে। নাম—চল এখনিই। কথা বাথ তোমার গোসাঁই।” প্রবল উত্তেজনার আব কিছু বেরুলই না তাব গলা দিয়ে।

আচমকি উচ্ছ্বাসেব তোড়ে আমিও বাক্যহারা।

চোখ মেলে উঠে বসল চরণদাস। ধরা গলায় বললে, “চল না গোসাঁই, ঐ মডার বিছানার মায়া ছেড়ে। যতকাল বেঁচে থাকব তোমার পিছনে ঘুরে বেড়াব কুলি ববে। এতটুকু কষ্ট অভাব হতে দোব না তোমার। দেখছ ত আমার শরীফখানা। তিনটে অল্পের শক্তি আছে এতে। গভব খাটিয়ে তোমায় খাওয়াব গোসাঁই। মিথ্যে ভডং আর নোংরা বুজুকবি এই থোলসটা ছেড়ে বাঁচব। চল গোসাং আমাদের সঙ্গে। যেখানে তুমি নিয়ে যাবে সেখানেই যাব আমরা। আজীবন তোমা সেবা করে কাটাৰ।”

আবার হাসতে হয়। বলি—লোভ দেখাচ্ছ মোহন্ত ? কিন্তু তোমার ত সঙ্গে থাকবার কথা নয়। তেমন কথা ত হয়নি নিতাইয়ের সঙ্গে। নিতাই বলছিল তুমি নাকি একটা গুননো দাঁঘি। ও বেচারী তোমার কাছ থেকে এক ফোঁটা তেষ্ঠার জলও পায় না। শোমার পাড়ে কপাল ঠুকে শুধু রক্ত ঝানো- গাব হচ্ছে ওব। আর পাচকনে ওব মাংসের লোভে সোনা-দানা ঘব-বাড়ীর ফাঁদ পাচ্ছে। কাজেই শেষ পর্যন্ত আমিই লজ্জা হয়ে গেলাম—দেখি, যদি আমায় পেয়ে মইষেব তেষ্ঠা মেটে। কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে যে আমার সব বস শুকিয়ে যাবে মোহন্ত।”

উঠে এসে থপ্ করে দু’হাতে পা জড়িয়ে ধবে চরণদাস।—“তাই কর গোসাঁই, তাই কর। যাও তুমি নিতাইকে নিয়ে। আমি থাকি তোমার ছাড়া গদির উপর। তাতে আমারও কোনও দুঃখ হবে না। তবু যে তোমায় এই লক্ষীছাড়া গদির মায়া ছাড়াতে পেবেছি এ কি কম কথা আমাদের। তোমাকে “থানে ফেলে বেথে গিয়ে আমরা কোথাও শান্তি পাই না। আমরা খেয়ে স্ব্থ পাই না, ঘুমিয়ে শান্তি পাই না। অষ্টপ্রহর তোমার কথা মনে করে জলেপুড়ে মরি। এখানেই আমরা রেখে যাও গোসাঁই। আমি খুব শান্তিতে থাকব। তবু ত জানব কোথাও

না কোথাও তুমি স্থপে আছ নিতাইকে নিয়ে। তাতেই আমার মনের আলা জুড়াবে।”

তখনও আমার হাত ধরে টানাটানি করছে নিতাই।—“উঠে এস গোম্বাই— আর তোমার একটি কথাও আমি শুনব না। এইমাত্র আমায় যে কথা দিচ্ছে, আগে রাখ দেই কথা। নাও আমাকে, নাও এখনিই। আমাকে নিয়ে যা স্থপি হয় কর। তবু উঠে এস গুথান থেকে, নয়ত এখনিই বাঁপিয়ে পড়ব একটা চিতায়।”

হুজনের হাত ধরে টেনে পাশে বসাই। বলি—“দেওয়া নেওয়া ত অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে ভাই। আজ আবার নতুন করে সে সব কথা উঠছে কেন? অনেক দিন আগেই ত আমি তোমাদের জিনিস হয়ে গেছি। এমন পাকা জায়গায় রেখে গিয়েও তোমরা শা স্ত পাও না কেন? নিজের প্রাণের ধন সচ্ছিত রাখবার এমন ভাল জায়গা আন পাবে কোথায় তোমরা? এখানে না আছে চোর-ডাকাতেও ভয়, না আছে হাবিয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর যেখানেই নিয়ে রাখবে আমায়, সেখানেই গায়ে পাক কাঁদা লাগবার ভয়। এখানে শুকনো ভস্ম, এ গায়ে লাগলেও দাগ পড়ে না। ঝেড়ে ফেললেই ঝরে যায়। তোমাদের এত দাম্য সম্পত্তি এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ভিড়ের মাঝে রাখলে শেষে খোঁষা যাবে যে। নয়ন দেখবে গায়ে কলঙ্কের দাগ লেগে গেছে। এখানে চিতার আঁচে তেতে থাকি বলে গায়ে কোনও দাগ লাগবার ভয় নেই। যতবার তোমরা ঘুরে আস তোমাদের সম্পত্তি দেখতে, দেখ ঠিকই আছে। তোমাদের মনের মতনটি হয়ে আছে। এখান থেকে বার কবে নিয়ে গিয়ে কদিন শামলে রাখতে পারবে ভাই? দেখতে দেখতে বড় যাবে বদলে, তখন তোমরাই ঘেম্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।”

চরণদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। বলে—“বোষ্টমী, আগুন দে কলকেতে। খামকা আমার নেশাটা ছুটিয়ে দিলি। এখানে মাথা খুঁড়ে কোনও লাভ হবে নয় রে। এ একেবারে ছিবড়ে হয়ে গেছে, এতটুকু রসকষ আর নেই এই পোড়া কাঠে।”

গঙ্গার প্রপার ওপার থেকে শেষ প্রহরের শেষ ডাকাডাকি অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। চাঁদখানার রঙ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, পেছন দিকে আশু আশু নেমে যাচ্ছে বড় সড়কের ওধারে। রাস্তার ওপরের বট পাকুড় গাছের লম্বা ছায়া পড়েছে আশানের ভেতর। বুড়ী তার চিতার উপর শুয়ে পড়েছে আবার। চিতাটাও প্রায় নিভে এল। ভোরবেলা ছুঁপ্রাণ মুখে দেবার জন্যে শুভ-নিশ্চয় উঠে

গেল। একটু পরে হাড়গিলে আর শকুনিয়া জেগে উঠে লম্বা গলা বাড়িয়ে ডানা মেলে সব আগলে বসবে। তখন ওধারে এগোয় কার সাধা ?

বড় সড়কের ওধারে কে স্তর তুলছে, “কাহ্নু জাগো, কাহ্নু জাগো।”

আমার একখানা হাত নিজের কোলের উপর নিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে নিতাহ। হঠাৎ আমার হাতেও ওপর দু’ ফোঁটা তপ্ত জল পড়ল।

এবার সতাই হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম—“এ কি করছ মই ? অশানে জ্যাস্ত মাহুবের জন্তে চোখের জল ফেললে নাকি তার ভয়ানক অকল্যাণ হয়।”

নিতাই রুদ্ধকণ্ঠে ঝাঁজিয়ে উঠল, “হোক—এর চেয়ে এই গদিটায় হুডো জেলে দিয়ে এর মালিককে হুক পুড়িয়ে পেখে যেতে পার না ত শাস্তি পেতাম।”

চরণদাসকেই বললাম, “মোঃস্ত, তুমিই ভাগ্যবান। চোখের জলের ঝলঝল সঙ্গে রয়েছে তোমার। আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ তুমি, কিন্তু কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকলে তোমার নোমাব জীবিয়ে যাবে। অতবড় লোকসান তখন মইবে কেমন করে ? আব কি লোভেই বা আমি অমন ভয়ঙ্কর কাজ করতে যাব ? এই ছুনিয়ার একমাত্র গাটি জিনিস—বুকেব আগুন চুষানো ঐ চোখের জল, সব চেয়ে দুর্লভ মদ। কেউ গাবও জন্তে ও জিনিসের এক ফোঁটাও বাজে খরচ করতে চায় না। আমার ওপর ভেতন এই অশানের ভয়ে ছেয়ে গেছে। এব ছোয়া লাগলে সব স্তব্ধ হয়ে যাবে। জান না, কি লোভে তুমি আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে চাও। কিন্তু তোমার এই সবুজ লহাটিকে শুকিয়ে মেরে ফেলবার জন্তে আমি কোনও মতেই তোমার সঙ্গে নিতে পারি না।

আঁচলে চোখ মুছে নিতাই উঠে দাডাল। বললে,—“তাই ১ বলছিলাম গোঁসাই, পুড়ে কালো আড়ার না হলে এই বক্ত মাংসের ওপর বেঁমার কিছুতেই লোভ হবে না। অনর্থক সাবাটা রাত মাথা খুঁড়ে মলাম।”

চরণদাস নিজেই কলকেটা নিয়ে আগুন চাপাতে গেল। ওপারে কিচিরমিচির করে উঠল কয়েকটা পাখি। নিতাহ উঠে গেল গঙ্গার দিকে। বোধ হয় মুখে মাথায় জল দেবে। সামনে আবখানা বোতল পড়োছিল। তুলে নিয়ে গলায় ঢেলে দিলাম। আর একজন জাহ্নকবাদন আসছে ইছারগপুর অশানে। তাকে অভ্যর্থনা করার জন্তে তৈরি হলাম।

তখনও নিচেটা ভাল করে ফর্সা হয়নি। বড় সড়ক থেকে হরিষ্মনি শোনা

গেল। নামল এসে একজন আশানে।

দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে একজন হাতের লাঠিগাছা আর পোটলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আছড়ে এসে পড়ল আমার পায়ের ওপর।

“ঠাকুর হেই বাবা, এবারও রক্ষা করতে পারলুম না বাবা। এবারও সোনার পিতিমে ভাসিয়ে দিতে এলুম গো—ভাসিয়ে দিতে এলুম।” বলেই চিপ চিপ করে কপাল ঠুকতে লাগল পায়ে।

নিচু হয়ে ভাল করে চেয়ে দেখে চিনতে পারলাম—বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষাল।

গঙ্গার ওপারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটি মেয়ে।

কপালে শুকতারার টিপ আঁকা, স্বচ্ছ কুহেলী ওডনায় তক্তখানি ঢাকা, বন-হরিণীর চকিত চাহনি চোখে শিশুর অভিসারিণী।

উষা। অনিরুদ্ধ আনন্দের মুটিমতী প্রাণশক্তি।

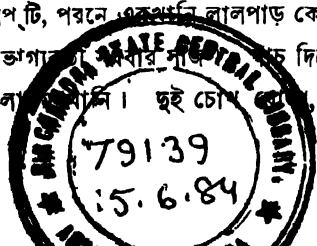
ঘুমভাঙানি গান শুনিয়ে ঝরা শিল্পীর ওপর দিয়ে লঘু চরণে পালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ভাল বেটে গেল গানের, চরণে চরণ জাড়িয়ে গেল, থমকে দাঁড়িয়ে ঘোমটার ভেতর থেকে চোখ মেলে চেয়ে রইল গঙ্গার এপারে।

ও কি! মাদুর জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে কি এনে নামালে এই জাগরণের পরম লগ্নে। কি বাঁধা আছে ওর ভেতর! কার ভেট বয়ে এনেছে ওরা অত কষ্ট করে।

গঙ্গার এপার থেকে হা হা করে হেসে উঠল দিন, উদ্ধারণপুরের ওস্তাদ জাহুকর। বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে চোঁচিয়ে বুলে, “দেখছি কি হৃদয়! থমকে দাঁড়িয়ে। এই দেখ এসে গেছে আমার জাহুর পুঁটল। এস না এপারে, দাঁড়িয়ে দেখ না আমার জাহুর খেলা। খুলে দেখাচ্ছি তোমায় এই মাদুর চাটাইয়ের ভেতর কি জিনিস লুকানো আছে।”

লজ্জায় সরমে রাঙা হয়ে ছুটে পালিয়ে যায় উষা।

শুক হয়ে চেয়ে থাকি বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষালের দিকে। ওধারে ওরা ততক্ষণে দড়াদাড়ি খুলে বাঁশ থেকে ছাড়িয়ে কাঁথা-মাদুরের ভেতর থেকে বায় করে মাটির ওপর ঝইয়েছে একটি মেয়েকে। মেয়েটির সারা কপাল মাথা সিঁথি ভগভগে সিন্দূরে লেপটা-লেপটি, পরনে একপানি লালপাড় কোরা শাড়ী, হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা, পরম নোভাগ্যের সীমার সীমার সীমার দিনের পথ ভেঙ্গে এসেছে, তাই একটু ফোলা ফোলা শিশি। দুই চোখ, অসীম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে আছে



মেয়েটি। বিষ্ণুটিকুরির নৈকশ্য কুলীন জয়দেব ঘোষালের পঞ্চমবারের সহধর্মিণী।

জয়দেব তখনও পাগের ওপর মুখ ঘষছে আর জড়িয়ে জড়িয়ে কাঁতবাচ্ছে—
“হেই বাবা, তুমিই সাক্ষাৎ ভৈরব গো, জ্যাস্ত কালভৈরব তুমি, কিপা কব বাবা—
এই অধম সম্ভানের ওপর একটি কিপান খোখে চাপ। তুমি না দয়া করলে আমার
বংশ রক্ষে কিছুতেই হবে না গো, আমার বাপ-দিতামো জন পিণ্ড না পেয়ে চপটা
কাল টাটা কবে মরবে।”

“এবাব নিয়ে কবাব হল গো ঠাকুর মশাই?”

“হেই বাড়া দিদিমণি যে গো, তা ভালই হল বাপু, কোমাকেও পেয়ে গেলুম
এখানে। এবারে গোসাঁইকে বলে কবে আমার এচটা ব্যবস্থা করে দাও গো দিদি
ঠাকুর। আমার পক্ষটা থাকে ক্ষে পাখ। পাঁচ-পাঁচজনকে এখানে নিয়ে
এলুম গো, কেউ আমার মুগের দিবে চানলে না। খুড় বেচমান বন্দ্যোব ঝাড়
সব। একটা ছেনেমেয়ে দিদি কেউ নেই আসে। তবে আর আমাকে বসে বসে
নিজেব খাতে এ গুণেও হবে কেন? গোসাঁইকে ধরে একটা কিছু উপায় করে
দাও গো দিদি, ‘হেই বাবা’ যে আমাকে খাওয়াবে, সে যেন অন্যত একটা
ছেনে আমাকে দিয়ে খাবে খায়ে আসে।”

পাঁচটে দেবে টেনে বসল জয়দেব। পাঁচদিন অবিরাম মদ গাঁজা টেনে ওর
খোখ তুলে জগা মদ মত মল হয়ে উঠেছে। মুখময় খোখ খোঁচা গৌফ
দাঁড়ি ভেঁত তৃপ্ত ময়লা শুকিয়ে গেছে। পোব হব বঁচ কবে তার ওপর মুখ
বগদেছিল জয়দেব। বড়ান শোষণ জালায় মুখ বুজে, স্থান করলে শুনে গেছে
বেচারা। বাফনের ঘরের পাঁচ পাঁচটি সাদা সাদা জ্বর পরিত্রেরতা নৈকশ্য কুলীন
জয়দেব ঘোণাল আমার সামনে বসে বসে চেপে ধরে, হিক্কা সামলাতে আর খুঁত
ফেলে লাগল।

“তা এবারে যিনি আসছেন তিনি আর ঘবেব গো ঠাকুর মশাই?” বোষ্টমীর
কণায় বিধেব ব্যাধ।

অত খেয়াল কবাব মত ব্যবস্থা নয় এখন ঠাকুর মশায়েব। এক ধেবড়া খুঁত
ফেলে হাতের পিঠে মুখ মুছে এক গান গেলে সে আনন্দ করলে—“হে তুমি চিনলে
বৈকি গো বাড়া দিদি। আমাদের নাপাডান হৈপো কণী হাবাধন চক্কোদীর ছোট
মেয়ে ফিবি গো। আজগাল বেশ ভাগব-ভোগবটি হয়ে উঠেছে যে। এ বউ
রোগে পড়লে কথাটা একদিন মাকে দিয়ে পাড়ালাম ক্কোদীর কাছে। সহজে কি
নছার হারামজাদা বাগ মানে। শালাব ঘরের চালে খুড় নেই, পাঁচ বিধে ভুই
আব ভিটেটুকু আজ তিন বছর আমার ঘরে বাধা রয়েছে। এক পরশা হুদও

আজ পৰ্বন্ত ঠেকাতে পারেনি ব্যাটা। খালি বসে বসে ইঁপাচ্ছে আর মেয়েকে ঘরে রেখে ধুশী করছে। ভিটে-ভূঁই সব দখল করে পথে বসাব বলে মোচড় দিলুম। তখন ব্যাটা শয়তানি ছেড়ে সোজা পথে এল।”

এতক্ষণ আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল নিতাই, এবার সামনে এসে দাঁড়াল। স্নান সেরে এসেছে। পিঠ ছাপিয়ে কোমরের নিচে নেমেছে ভিজে চুলের রাশি। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তার দুই চোখে আগুনের ফিনকি ছুটছে।

হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে নিতাই বললে—“এখনি আমরা উঠব গোসাঁই। এবারের মত অনুমতি কর আমাদের।”

“সে কি! এই ত সব পরন্ত এলে তোমরা, এর মধ্যে যাচ্ছ কোথায়?”

মোহন্ত চরণদাস বাবাজী মাহুরের ওপর বসে দম লাগাচ্ছিল। আকাশের দিকে মুখ তুলে ধোঁয়াটা ছেড়ে দিয়ে কলকেটা উপুড় করে মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে জবাব দিলে মোহন্ত, “ঠাকুর যেখানে নেন। আমাদের জন্তে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না গোসাঁই। তুমি তোমার রাজসিংহাসনের ওপর বসে শাস্নিতে রাজত্ব চালাও।”

মুখ ফেরাতেই আবার নজর পড়ল জয়দেবের ওপর। সামনে বসে বুক চেপে ধরে হিঙ্কা সামলাচ্ছে আর থুতু ফেলছে। একটু দূরে মাটির ওপর চোখ বুজে পড়ে আছে গর বউ। রাজ্যের মাছি এসে ভেঁকে ধরেছে তার ফোলা ফোলা মুখখানা, যারা তাকে কাঁধে করে বয়ে এনেছে তারা চারজন পাশে বসে হ্যাংলার মত চেয়ে আছে মেয়েটার দিকে।

হঠাৎ খেয়াল হল যে আমি উদ্ধারণপুরের বিখ্যাত সাঁইবাবা নিজের গদির ওপর চেপে বসে আছি। কিন্তু আমার যা করা কর্তব্য ঐ সময় তা এখনও করাই হয়নি।

আরম্ভ করলাম গালাগাল। প্রথমে মা বেটীকে অর্থাৎ যার কানে কোনও কিছুই ঢুকবে না কোনও দিন সেট অদৃশ্য আশানকালীকে। তারপর বেটা কালভৈরবকে। তারপর চোখ বুজে শোওয়া বেইমান বৌটিকে। সে পালা সমাপ্ত করে শ্রীমান জয়দেব ঠাকুরকে।

“শালার বেটা শালা, ফের তুই এ পাপ করতে গেলি কেন রে হারামজাদা? লজ্জা নেই তোর শুয়োরের বাচ্ছা? কতবার তোকে সাবধান করে দিয়েছি রে হারামজাদা যে তোর বংশরক্ষা কিছুতেই হবে না। তবে তুই কেন এ কাজ করতে গেলি রে আটকুড়ির বেটা?”

লাল চক্ষু দুটো ঘুরিয়ে কি ইশারা করলে জয়দেব তার সঙ্গীদের। তাড়াতাড়ি

তারা দুটো বোতল বার করে সামনে বসিয়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। জয়দেব আবার উল্টু হয়ে পড়ে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলে।

“ক্ষেপে যেও না বাবা, শাপময়ি দিও না তোমার অধম সন্তানকে। তুই হয়ে একটু পেমাদ করে দাও বাবা। তুমি তুই থাকলে আমার সব হবে গো বাবা, সব হবে। দিনকে রাত বানাতে পার বাবা তুমি, তোমার দয়ায় এবার আমার বংশ-রক্ষে নিশ্চয় হবে। রোথে কার বাবার সাধি।”

জয়দেবের বংশরক্ষে হবেই হবে। রোথে কার বাবার সাধি, শুধু একটু যা আটকাচ্ছে আমাব তুই হওয়া ব্যাপারটার জন্তে। আর তুই আমাকে হতেই হবে। সে ব্যবস্থা ওরা বাড়ী থেকেই করে এনেছে। যবে তাঁটি নামিয়ে জলন্ত মদ এনেছে কষেক বোঁল। একবার ওর খানিকটা গলা দিয়ে নামলে পর আমি তুই না হয়ে যাব নোখাদ। আর তখন পেমাদ পেয়ে ওরা নাচতে নাচতে গাঁয়ে ফিরে যাবে। সেখানে জয়ানো আছে আর একটি মেয়ে। যাকে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে আবার আমায় তুই কবে ফিবে আনবে জয়দেব কিছুদিন পরেই।

জয়দেব আমাব পাঁদা খেঁদে। গুকে চটানো কাজের কথা নয়। একটা বোতল তুলে নিয়ে খানিকটা ঢেলে দিলাম গলায়, থামা মাল। গলা দিয়ে যতদূর নামল, জলতে জলতে নামল।

পেমাদ পাবার জন্তে জয়দেব পা ছেড়ে দিলে। বোতলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম। তার সঙ্গীরা চীৎকার করে উঠলো—“বোম্ বোম্ হরশঙ্করী মা।” হাবপর ছুঁ গানে নিজেদের ঢুকান আর নাকটা মুচড়ে গড হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকালে।

বড় সভের ওপর থেকে চরণদ্বারের গলা তেমে এল—

“গুরু—বলে দাও মোবে

কোনখানে সে মনের মাহুস নিবাজ করে।”

উদ্ধারণপুরে ঘাট

বিকিকিনির টাট।

পাপ-পুণ্য চরিত্র মত্তস্তম্ভ জ্ঞানন্ত মড়া ধড়িবাজ আর ধর্মধ্বজী সব একসঙ্গে সস্তা হয়ে নিলামে দাঁঠে সেখানে। নিলাম ডাবে স্বয়ং মহাকাল—ক্রেতা চারজন। ভক্তিতবা, ভাগ্য, কর্মফল আব নিয়তি।

অশানে ঝিরঝিরে বাতাসে, গঙ্গার ঢেউয়ের কুলকুল ধ্বনিতে, চিতার ওপর

আগুনের আঁচে মাছের মাথা ফাটবার কই ফটাস আগুয়াজে শোনা যায়, সেই নিলামের ডাক। সপ্তগ্রামের বণিক কুলপতি উদ্ধাবণ দত্ত মশায় পাকা সদাগর ছিলেন। নিস্ত্রিষ তৌলে আজও জোব বারবার চলেছে তাঁর ঘাটে। কড়া কাস্তি এধার ওধাব হবার জো নেই। ঘিনি নিলাম ডাকেন তাঁর বপালের ওপব আছে তিন-তিনটে চোখ। কাব সাধ্য বেহাই পাবে সেই চোখ িনটিকে ফাঁকি দিয়ে।

বলসামপুবের সিঙ্গীমশায় কিন্তু বেহাই পেবেছিলেন সেবাব। খোল খস্তাল বাজিয়ে ঘটা কবে গজায় দিতে এনেছিলেন তিনি তাঁব বিধবা গুরুকন্তাকে। তিন মহলা সিঙ্গী বাড়ী বলসামপুবে, বাড়ীতে সিংহবাহিনীর নিন্দা সেবা। তাব সঙ্গে তাঁর গুরুদেবকেও সপদিবাবে নিজের বাড়ীতে বাস কবিযে সেবা চালিবেছিলেন সিঙ্গীমশায়। গুরু দেহ বক্ষা করলেন, তাবপবেও গুরুপত্নী আর বিধবা গুরুকন্তা বয়ে গেলেন তাঁর আশ্রয়ে। কোথায় ফেলবেন অসহায়া বিধবা দুটিকে সিঙ্গীমশাব ? তাঁদেব বক্ষা কবাও ন তাঁব ধর্ম বটে।

ধর্মবক্ষা হল বটে তবে শেবৎক্ষাটুকু হল না।

চিঠায় আগুন দেবাব পত্রমুহর্তেই তাঁব জ্ঞানি ভব সিঙ্গী পুলিসেব দাবোগাকে সঙ্গে নিয়ে হৈ হৈ কবে ঢুকে পড়লেন শ্মশানে। পুলিস চিঠাব ওপব থেকে ঢান মেবে নামিয়ে নিলে শব। পাঁচ মাস গর্ভবতী ছিল মেয়েটি আব তাব নরম তুল তুলে গলায় ছিল দাগ—বাঁশ দিয়ে নিষ্পেষণ করাব স্পষ্ট দাগ ছিল তাব গলায়। নতুন গবদের থান পরিষে, অজস্র শ্বেত পদ্মে ঢেকে, বদ চন্দনমাঠেব গন্ধে চারিদিক মাত্র করে, খই-কড়ি-পষমা ছড়াতে ছড়ানে, নাম সংকীর্তনের দল সঙ্গে নিয়ে, ঠিক যেভাবে গুরুকন্তাকে গজায় দিতে নিয়ে আসা উচিত, সেইভাবেই এনেছিলেন সিঙ্গীমশায়। কোনও দিকে এতটুকু ক্রটি-বিচ্যুতি না হয় সেদিকে ছিল তাঁব বদা নজব। কিন্তু তিনটে চোখ যে বয়েছে উদ্ধাবণপুত্রের নিলামদাবেব বপালের ওপব

কাজেই সব চাল গেল ভেস্বে। চাটাত জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে নিবে যাবেত তারা সদবে সিঙ্গীমশায়েব অত সাধেব গুরুকন্তাকে। সেখানে হবে চেষ্টা বাড়। তাবপর—

তাবপর ভয়ানক চড়া ডাক দিলেন সিঙ্গীমশাব। যাব বলে তাব তিনখানা চাবহাজারি মহাল হাতছাড়া হয়ে গেল। উদ্ধাবণপুত্রের নিলামদাব হল পরাভূত। কিন্তু গুরুকন্তা আর উঠল না চিঠায়। গোলমাল চুকে গেলে কারও আর মনেই পড়ল না তার কথা। পড়ে বইল গুরুকন্তা উদ্ধাবণপুত্রের ঘাটে, নরম সাদা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল শ্যাল-শকুনে। পেটটা ঠোঁট দিয়ে ফেড়ে ভেতরের পাঁচ মাসের ভ্রূণটাকেও তারা রেহাই দিলে না।

ঠিক দু'বছর পরে ছুটকে বাগদীর দল নামালে তাদের কাঁধের বোঝা উদ্ধারণ-পুত্রের ঘাটে। বিকট ভূগঙ্কে পেটের নাড়িভুঁড়ি মূচকে উঠে দম বন্ধ হবার উপক্রম। কপালের ঘাম মুছে বাঁশখানা খুলে নিয়ে পুঁতে দিতে এল ছুটকে আমার গদির দেওয়ালে।

“পেরেম হুগ গো গোঁসাইবাবা। এক টোঁক প্যাশাদ তান।”

বললাম—“গাজ ওটা কি আনলি বে ছুটকে—দা আতনে এল যে। আজকাল শুযোব পচা বট্‌চিস নাকি তোবা?”

“হেই—শুযোব কি গো। ক্ষামা দাও গো পানাস্কুং—ক্ষামা দাও ও কথা। ও যে আমাদের বলপায়পুনের মিল্লিমাশার গো। তিনদিন হবে পচেছেন হবে শুগে। কেউ চাইনে না ছুঁতে মড। শেখে বট স্যমশেপ নেইবে এসে আমার হাত দুগানা জইডে ধবে কানতে লাগলেন। সে ব কান্না গো গোসাইবাবা—বললেন—‘ছুটকে, পেটের সম্বান, এই আমার, নো বই হাজ থেকে ছেলে বলে মান্নু, ককাব হাড কখানা গজাব নিয়ে গাবি নে বাবা?’ সে কান্না দেখে আব থাকতে পার না গো। মাস বাঁদে তুলে হে মা কোশ মাটি এক ছুটে পাব হয়ে গ্রু আমবা। নামাবান ক ধো আছে কোথা—এমন বাস নেকছেন যে গগনের শকুন টেনে নামিয়ে দেবে।”

এক চান্দজন—নবাই গোকলো ভয়না তান চনতে একটা আস্ত বোতল এঁগামে দিলাম। এবা থায় পচুট থান এ হুছে পানাস্কুং মাল। এক এক ঘটি জলেব সজে খানিকটা কবে মিশিয়ে নিয়ে চকচক কবে গলায় ঢালতে লাগল।

শুনলাম সিন্ধী গিন্নিও আসছেন গকল গাশীনে। ফিনি এলে শব চিত্তেয় উঠবে।

বললাম—“তবে খেন সঁপয়ে রেখ আয নটাকে। এত উত্তর দিকেব জাম গাছের ডাণে লটকে বেখে আয দ ক্ষণে হাণ টাউনে নিখে যাবে গজ। নমত টেকা যাবে না যে এখানে।”

এদেব মাল উঠিয়ে নিয়ে গেল ওবা। আবাব মড়াপোড়াব সোদা গন্ধে চাবিদ্দিক মাংস হয়ে গেল। বুক ভবে বাস টেনে ইফ ভেডে পাঁচলাম।

গজার কিনাবায গোটা চাব পাঁচ চুলায় ভিযান চড়েছে। সব সময় বস পাক হচ্ছে ওখানে—নববসের রসায়ন টেবী হচ্ছে। ায গামছা জড়িয়ে ভিযানকনরা চুলায় খোঁচাখুঁচি কবছে বাঁশ দিয়ে। উদ্ধারণপুত্রের সৃষ্টি ঠাকুব ঐ ওপরে এসে দাঁড়িয়ে ইঁ করে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে বয়েছেন ভিযানের দিকে। এখানকার

বাঁহুকর চালিয়ে যাচ্ছে তার ভেলকি-বাজির চাল। বোতল বেঁকছে, আগুন চড়ছে
 বার বার কলকের মাথায় আর কাঠ বইছে রামহরি আর পঙ্কেশ্বর। বল হরি—
 হরি বোল, হরি হরি বল। হরিবোল দিয়ে আসছে—হরিবোল দিয়ে চলে যাচ্ছে।

হরি গঙ্গা তিল তুলসী এই নিয়েই উদ্ধারগপুরের ঘাট মশগুল। আবার
 একখানি লাল রঙের ছোট্ট গীতাও অনেকে চাপিয়ে আনে মড়ার বকের ওপর। যে
 বকের ভেতর আগুন নেই, তুমারের মত শীতল হয়ে জমে গেছে যে বকের ভেতরটা,
 সেখানেই ঝড় বহাবে গীতার গীতিকা।

অতন মোড়ল হাই তুলতে তুলতে হাতে তুড়ি দিয়ে বলে—এই ত সাক্ষাৎ
 কানীক্ষেত গো। গঙ্গার পশ্চিম কল বারানগী সমতুল। এঁর তুল্য থান কি আর
 কোথাও আছেন ?

নেইও।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ভুজ সিদ্ধির চৌকস বন্দোবস্ত রয়েছে উদ্ধারগপুরের
 ঘাটে। রক্তে আগুন ধরিয়ে দেবার জগ্গে রামহরির বউ এমন মাল জাল দিয়ে
 নামায়—যা আর কোথাও মেলে না। আর যে দেহের রক্ত জমে শক্ত হয়ে
 গেছে তাতে আগুন ধবাব ধবাব জগ্গে রামহরি কাঁধে করে বয়ে আনে মোটা মোটা
 তেঁতুল কাঠের কুঁদো। তারপর রামহরিব শালা পঙ্কেশ্বরের পালা। তার আছে
 একখানি রঙিন চৌকো ছককাটা কাপড় আর তিনখানা হাডের পাশা। টাডালের
 পায়ের হাড় থেকে বানিয়েছে সে পাশা তিনখানা। পঙ্কা যখন তাব ছকখানা
 গঙ্গার ধারে পেতে ডাঁক দেয় তখন না গিয়ে থাকতে পারে না কেউ সেখানে।
 আওয়াজ ওঠে সেখান থেকে—ব্যোম কালা নাচনেওয়ালী—চা বেটি একবাব মুখ
 জুলে—শালার হাডে ভেলকি খেলিয়ে দি।

ভেলকিই খেলিয়ে দেয় পঙ্কা ডোম। সকলের সব ট্যাঁক খালি হয়ে সব রেস্ট
 গিয়ে ঢোকে পঙ্কার ট্যাঁকে। তাতে যায় আসে না কিছুই। তখন ডাক পড়ে
 পঙ্কার দিদিকে। পাঁচ বছরের উদলা মেয়ে সীতাকে নিয়ে এসে দাঁড়ায় সে।
 পরনে শুধু কস্তাপেড়ে পাতলা একখানি শাডী। তার আঁচলখানা বা কাঁধের ওপর
 দিয়ে ঘুরিয়ে এনে শক্ত করে দাঁধা থাকে কোমরে। মাজায় জড়ানো থাকে আধ
 বিঘত চওড়া রুপের বিছা। সামনে উবু হয়ে বসে সে টাকা গুণে দেয়। যাকে
 দেয় সে চেয়ে থাকে। চেয়েই থাকে শুধু ওর দিকে। পাতলা শাডীখানা কিছুই
 ঢাকতে পারেনি। মাংস শুধু মাংস—টাকা তাজা জ্যান্ত মাংস অনেকটা বয়ে
 বেড়াচ্ছে পঙ্কেশ্বরের দিদি।

আধ কুড়ি টাকা পঞ্চম শ্রুতি দেয় রামহরি বউ । কিবিয়ে দেবার সময় দিতে হবে মাত্র দু' টাকা বেশী । তা ছ'মাস পবে ঘুবে এলেও তাই দিতে হবে । রাম-হরি বউ জানে যে এই ধম্মক্ষেত্রে হাত পেতে নিজে কেউ মেয়ে দেবে না তার টাকা ।

সে উপাস নেই উদ্ধারণপুরের পাণ্ডা দেন। জন্মের শোধ চুকিয়ে দেওয়া যায় নিজের মনে । নয়ত বাপ বাবা ঘুবে আসেই হবে এখানে । আসতেই হবে নয় • চলবে কি করে আমাদের ? শেখাল শকুন কুকুর রামহরি পক্ষা আমি আব গুই মন, যাবা মনে অষ্ট ধর্মাবান দোষান খাল বাসছে বড় বড় মড়কব গুণে । দলমার খোপ বানিয়ে বাঁধেব মাচা পেতে দি যছে রামহরি জন্মদানর কাছ থেকে কামি বন্দোবস্ত মনে । শোধ মন্যে মন্যে দিতে চা মাত্র এক আনা করে লাড় । • আমাদের একতলি প্রাণী চন্দন ক করে যদি ব'সে পান না ঘুবে আসে সকলে ?

এক দু' খাটে পুরুত মাকুর মিন্ গ'পুল' দে' ড' আনা করে বোজ । মনে অষ্ট ধর্মাবান জন্মে যারা বাসছে পান্দর ধর্মাবান কেবান ঘবে দোকান মাজিয়েছেন মিন্ খ দৃষ্টে দেন, শেখ চন্দনের সাক্ষ বো' বডি থাওয়ান । ডাক দিলে দা' শোনে মিন্ বদান্ধের গুলি ••• দন তিনটি বডি আর এক লাড় ব'স পাচন থা'—কিছু মাত্র ১০ম পৌ জ ডিম্ ব সমস্ত চলবে না অন্তত মাত্র দি ••• বান্দর যা থুশি চান্দ ••• কিছু দন পলে আ'পন কাবে এসো সিধু কবো'ব কাছ যঃ করে খা দৃষ্টা' ব ড় থাই'স মেবেন আবাব । একেবারে নবকলের পাণে

নবকলের ধারণ করবার শাসা মিস্ত্র লোক তাদের উদ্ধারণপুরে ঘাটে । মাঝা জীবন জন্মে পাড় আঁধার হয়েই আসে । চিত্তান পের মাগান্ন বলসে শ্রে মাসদা যখন তখন শেখালব' মেনে নামা ••• তারপবে ম'দেই পেটে চলে যায় নবটুকু । তখন পাবা আবান জন্মায় নবকলের ধারণ করে ।

কিছু আবাব কি জন্মায় ওবা ? সাক্ষাৎ বাসীক্ষেত্রে গল্পায় দিয়ে গেলে অব্যব জন্ম হয় কখনও ? অতন মোডল চাক্ষ প্রমাণ দিতে পাবে যে সব ন উদ্ধাব হয়ে 'সগ'গে' চলে যায় । আর যাবা তা যায় ন', তাদব জন্মে অন্ত সগ'গেব ব্যবস্থা ত কবেই বেথেছে এখানে রামহরি ।

বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষাল বউকে সগুণে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চলে গেল রামহরির তৈরী এই মর্ত্যের সগুণে। বউটাকে চিতায় তুলে একটা ছুড়ো জালিয়ে দিয়ে ওবা উঠে গেল রামহরির সঙ্গে। আজ বাতে ওবা আর ফিরবে না। অঙ চড়াবে মনেব পর্দায়। ওধারে ত জয়দেবের পথ চেয়ে বসেই আছে হেঁপো কগী হাবাধন চক্কোস্তায় যেয়ে ক্ষিবি।

থাকুক আরও কয়েকটা দিন সে পথ চেয়ে বসে। কিন্তু ছুটকে নবাই গোকলো ভুষণো আব পথ চেয়ে বসে থাকতে পাবলে না সিন্ধী গিন্নীও জন্তো। গাছে টাঙ্কানো সিন্ধীমশাইকে আমার জিন্মায় বেখে তাবা নেয়েধুয়ে নিজেদেব পথে পা বাড়ালো। নগদ দেড় কুড়ি টাকা আগেই গুণে পেয়েছিল, কাজেই আবও এক বাও সিন্ধী গিন্নীও অপেক্ষায় বসে থেকে লাভ কি। বাল সেই জনখাবার বেলা হবে তাঁর গরর গাড়ী এসে পৌছতে।

বউই নিবান হয়ে যুথ আবার কবে বড় সড়কের ওধাবে নেমে গেলেন আবাবে দেবনা। সাবাদিন এও ভিযান চড়ল উদ্ধারগপুংর ঘাটে কিন্তু 'কছুই জুটল না তাঁর ভাগ্যে। শুধু হ্যাংলাব মত চেয়ে থাকত সাব হল সাবাদিন। কেউই কিছু নিয়ে যেতে পাবে না এখান থেকে। মুঠো মুঠো শুকনো ভস্ম ছাড়া আরও কপালে কিছুই জোটে না এখানে।

গঙ্গার পূর্বতীরেব তালগাছেব মাথাগুনো লাল হয়ে উঠেছে। কানো যবানকা-খানি ধাবে ধাবে নেমে আসছে রঙ্গমঞ্চের উপর। 'চাব আগুনের আলো আবও লাল আবও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নি মাড়ে পা ফেলে অনক্ষ্য এসে থমকে দাঁড়িয়েছে উদ্ধারগপুংর বাড়ি। কুহকিনীও চোখে ভাঁক লজ্জ, নংখাসে কামগঙ্গ, আত্রে টোটে নিলজ্জ লালসা। থমকে দাঁড়িয়ে সভয়ে দেখছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। অনাবাসে কেমন গলগল করে গলায় ঢালছি আমি জলন্ত মদ। সেই জিনিস জলতে জলতে নামছে পেটের মধ্যে। ঢালব গলায় যক্ষণ হুঁশ থাকবে। অনেক-গুলো বোতল আজ ভবতি পড়ে রয়েছে এখানও। জয়দেব আমার বড় উচুদেব খদ্দের। ওব হুদ আদায় করা সার্থক হোক।

এইবার আর একলা নহ আমি। সারাটা দিন বড় একা একা মনে হয়। ঐ ত এসে দাঁড়িয়ে আছে অভিসারিণী। এধাব চুপে পড়ব ওর নরম বুকের ওপর। তিমির কেশজালে ও তামাষ ঢেকে ফেলবে। ওর দেহের অতল বহুস্তেব মাঝে তলিয়ে যাব। মিশে যাব ওব আধার অন্তরের সঙ্গে। তখন আর থাকবে না কিছুই এখানে, উদ্ধারগপুংর রঙ্গমঞ্চের ওপর তখন যে খেলা দেখানো হয় তা দেখবার ক্ষম্তে একমাত্র রাত্রি ভিন্ন কেউ জেগে থাকে না।

সেদিনও কেউ সাক্ষী ছিল না সিঙ্গীমশায়ের গুরুকৃত্যর পক্ষে। শুধু এক ভয়ঙ্করী রাত্রি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছিল। তিন মহলা বাড়ীর কোন এক অন্ধকার ঘরের মধ্যে একান্ত সঙ্কোপনে স্বহস্তে কার্খটি সমাধা করেন সিঙ্গী মশায়। ভোরে রটিয়ে দিলেন হঠাৎ কলেরায় তাঁর গুরুকৃত্য দেহত্যাগ করেছেন। জ্ঞাতিশত্রু বাদ না মাধলে অত চড়া ডাক দিতে হত না তাঁকে উদ্ধারণপূর্বক নিলামে। তিন-খানা মহালও নিলামে চড়ত না। কিন্তু তাহে... কি তিনি রেহাই পেলেন? অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে সেই মননাত্মী রাত্রি মুখ টিপে হাসলে। সেই হাসির জের চলল দু' বছর। নিবিড় আঁধার ঘনিয়ে এল তাঁর জীবনে। দু' বছর মশায়ের ভেতর শুয়ে কাটানো হল তাঁকে। সেই মশায়ের ভেতর বসে তাঁর স্ত্রী তার অঙ্গ থেকে একটি একটি করে পোকা বাছতে লাগলেন। খসে গলে পড়তে লাগল নাক কান হাত পায়ের আঙুল। দুর্গন্ধের চোটে তাঁর বাড়ীর ত্রিমাণা দিয়ে কেউ হাঁটত না। শুধু সিঙ্গী গিন্নী নিবিচারভাবে মুখ টিপে বসে বসে হঠলেন স্বামীর বিছানায়, আর পোকা বাছতে লাগলেন।

এই দিন শেষ ২৭ তার পোকা বাছা। গরর গাডী এসে পৌঁছল ভোর বেলায়। শাঁখা সিঙ্গীর পরেই নেমে এলেন সিঙ্গী গিন্নী। স্বহস্তে স্বামীর মুখায় কবে শাঁখা সিঙ্গীর ভেঙ্গে মুঁচ ফেলবেন এখানেই। আর এক প্রাণীও তাঁর সঙ্গে আসেনি। মহাপাতক যে—এমন কি একঘরে হবার ভয়ে গায়ের পৃকতে প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র পঞ্চস্ত পড়ানি।

সিঙ্গীমশায়ের সাক্ষী স্ত্রী পাগলের মত মাথা খুঁড়তে লাগলেন, “বলে দাও—ওগো বলে দাও কেউ আমায়—কি করলে এর প্রায়শ্চিত্তটা করানো যায়।”

জানা নেই কারও প্রায়শ্চিত্তের বিধান। গুরুকৃত্যর ভ সমস্তান উৎপাদন কবে তার গলায় বাঁশ দিয়ে ডলে মেরে ফেললে কি জাতের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন, তার বিধান হয়ত এখনও কোনও পণ্ডিত লিখে উঠতে পারেননি কোনও পুঁথিতে। পূর্বো দু'বছর বিছানায় শুয়ে যে প্রায়শ্চিত্ত চালাচ্ছিলেন সিঙ্গীমশায় তার ওপরেও আরও কিছু করবার আছে কিনা তাই জানবার জন্য তিনি সদা সর্বক্ষণ আকুলিবিকুলি করতেন। কিন্তু কেউ জানে না, কেউ বিধান বলে দিতে পারেনি তাঁকে।

হয়ত জানতে পারেন আমাদের সিধু ঠাকুর। তাঁকেই ডাকা হল। তিনি এসে দান করলেন প্রায়শ্চিত্তের শাস্ত্রীয় বিধান।

একটি সবৎসা গাভী দান করতে হবে। সেই গাভীর ভাত খাবার জন্তে খালা গেলাস বাটি চাই। তা ছাড়া গাভীর শয্যা বস্ত্র পাছকা ছত্র সবই প্রয়োজন। মন্ত্র

পড়ালেন সিধু কবরেজ সিদ্ধী গিন্নীর হাতে ভিল তুলসী গঙ্গাজল দিয়ে—“ইদং সালঙ্কার্য সর্বংসা ও সবজা শয্যা পাছুক। ছত্র ভোজ্য গামছা সহিতং গাভীমূল্যং ব্রাহ্মণাং দদামি।” তারপর স্বামীর জন্তে মস্তক মূণ্ডন করলেন সিদ্ধী গিন্নী, পঞ্চ গব্য পান করলেন। কিন্তু চিতায় উঠল না সিদ্ধীমশায়ের পচা দেহখানি, গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হল। গোটাকতক কলা গাছ নিয়ে এল পঞ্চা। সেগুলো একসঙ্গে বেঁধে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল সিদ্ধীমশায়কে। তারপর বুকে নিন কলুষ-নাশিনী মা গঙ্গা। গাভীর মূল্য আর বস্ত্র পাছুকা ছত্র শয্যা দক্ষিণা ইত্যাদি বাবদ মাত্র বিয়াল্লিশটি টাকা গ্রহণ করলেন সিধু কবরেজ। রামহরি অবশ্য সম্পূর্ণ চিতার খরচই পেলে। জলে ভাসিয়ে দিলেও চিতার খবর দিতে হয়।

পার হয়ে গেলেন সিদ্ধীমশায়। সিধু পুণ্ড্রের সঙ্গী ব মস্তুর জোরে। যথাসময়ে কৈচরের বামুনদিদির শরণাপন্ন হলে নির্বিল্পে পার হয়ে যেতেন অনেক আগেই। কাকে-বকে টের পেত না কিছুই। অনেক বড় ঘরের বড় কথা জমা আছে বামুন দিদির পেটে। তাঁর বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না।

সিদ্ধী গিন্নীও কম পাকা নন। সেদিন রাত্রে তাবও বুক ফেটেছিল কিন্তু মুখ ফোটেনি। নিজের বাড়ির অন্দরমহলে যে খেলা খেলেছিলেন তাঁর স্বামী, তাতে তাঁর হাত ছিল না। বটে তবে মুখ ফুটিবে তিনি বাধাও দিতে যাননি। বরং তাঁর বুকের জ্বালা কিছুটা হযত জুঁড়িয়েছিল। চোরকুঠারটার বাইরে দাঁড়িয়ে একবার তিনি সামান্য চাপা আত্নানন্দও শুনেছিলেন। তারপর নিজের হাতেই সমস্তে ফুলে চন্দনে সাজিয়েছিলেন গুরুকণ্ঠাকে, নিজের হাতেই গুরুঠাকুরকণকে একটা ঘরের মধ্যে বস্তু করে রেখেছিলেন। সেই-সেদিন কবেছিলেন স্বামীর জন্তে, স্বামীর নাম মান ষীচাবার জন্তে। আর তা করাও তাঁর কর্তব্য, নয়ত তিনি কেমন করে নিজেকে সিদ্ধীমশায়ের উপযুক্ত সহধর্মিণী বলে পরিচয় দেবেন।

তারপর তাঁর অত বড় বাড়ী-ভতি আত্মীয়স্বজন আশ্রিত-আশ্রিতার দল যখন একে একে বিদায় নিলে, সারা বাড়ীটা খাঁ খাঁ করতে লাগল, আর সন্ধ্যা হলেই সেই চোরকুঠারটার ভেতর থেকে নানারকম অদ্ভুত শব্দ বার হতে লাগল, তখনও তিনি মুখ বুজে পড়ে রইলেন সেই বাড়ীতে। সাধবী স্ত্রীর কর্তব্য করে গেলেন স্বশারির ভেতর বসে—স্বামীর দেহ থেকে পোকা বেছে। আজ তাঁর সব কর্তব্যের শেষ হল এখানে, স্বামীর সঙ্গেই তিনি জন্মের-শোধ বেরিয়ে এসেছেন সেই বাড়ী থেকে। আর ফিরবেন না সে বাড়ীতে, ফেরবার উপায়ও নেই।

শাখা সিন্দুর ঘুচিয়ে মাথা মুড়িয়ে থান পরে আমার সামনে এসে বসলেন তিনি।

তীয় দিকে চেয়ে মনে হল এবার জুড়িয়েছে তাঁর বৃকের জালা, নিতে গেছে যে চিতাটা তাঁর বৃকের মধ্যে হু হু করে জলছিল। দুঃখ শোক উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই তাঁর চোখে নুখে কোথাও। যেন মস্তবড় একটা দেনাপাওনা মিটিয়ে কেলে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এলেন। বড় ঘরের মেয়ে তিনি, বড় ঘরের বোঁ। বয়সও এমন কিছু বেশী হয়নি তাঁর, শরীরের বাধুনিও নষ্ট হয়নি তেমন। যে বয়সে মেয়েরা মেয়ে জামাই ছেলে বোঁ নিয়ে জাঁকিয়ে সংসার করেন সেই বয়স তাঁর।

কিন্তু কিছু নেই, পেছন ফিরে তাকাবার মত কোনও আকর্ষণ নেই তাঁর। তাই আর ফিরবেন না তিনি, এগিয়েই চলবেন সারাজীবন।

বললেন—“গাভী ত অনেকক্ষণ ফিরে গেছে বাবা। ওতে আর আমার দরকার নেই। পা দুটোই ত রয়েছে, এতদিনে ঘুচেছে পায়ের বেড়ি। এবার শুধু হাঁটবে। যেখানে নিয়ে যাবে এই পা দু’খানা সেখানেই যাব। আর কোনও খাঁচায় ঢুকছি না আমি।”

তাবপর যা বললেন তা শোনার ভণ্ডে আমার কান দুটো তৈরী ছিল না; একেবারে। দুঃখ জোড় করে বললেন—“এবার দয়া করে আমায় একটু প্রসাদ দিন বাবা।”

“প্রসাদ। কি প্রসাদ?”

“ঐ যে রয়েছে বোতল-ভর্তি আপনার সামনে। দিন বাবা দিন, একটু জুড়োক বৃকেব ভেতলটা। আজ কতদিন গলা দিয়ে এক ফোঁটা জলও নামেনি। দয়া করুন এহ হতভাগী মেথেকে।”

দিলাম।

হাতে তুলে দিলাম একটা বোতল। তারপর করে চেয়ে রহে তাঁর মুখের দিকে। বলরামপুত্রের দিঙ্গী বাঙার বড় বোঁ, ষাঁঘ রূপের খ্যাতি ও তলাটে একদিন লোকেব মুখে মুখে ছড়াত, খোল বেহারার পালার মধ্যে বসে যিনি চলাফেরা করতেন একদিন, তিনি উদ্ধারণপুরের ঘাটে বসে সকলেব চোখের সামনে অনায়াসে বোতলটা গলায় ঢেলে দিলেন। শ্মশানস্থল সবাই কাঠ হয়ে চেয়ে রইল নতুন খান-পরা মাথা-কামানো সত্ত্ব বিববাব দিকে। আর যারা মরে কাঠ হয়ে পড়ে ছিল তারাও যেন একটু নড়েচড়ে উঠল চিতার ওপর।

শিপ্রা নদীর তীরে মহাকালের বিরাট ঘণ্টাটা জ্বলে। চিতাভস্মে স্নান হচ্ছে এখন মহাকালের। প্রত্যহ একটি শব্দ পুড়বেই উজ্জয়িনীর শ্মশানে। সেই ভস্ম এনে প্রত্যহ মাখানো হয় মহাকালকে। ঘি গজাজল চন্দন—কিছু লাগে না তাঁর

স্থানে, লাগে মাহুখ-শোভা ছাই। কেউ জানে না সেই স্থানের মন্ত্র।

হয়ত তারা জানে, যারা এখন নিশ্চিন্তে বাড়ছে নারীর গর্ভকোষের মধ্যে ঘোর অন্ধকারে। সেই অন্ধকার ছেড়ে আলোর স্তভাগমন করলেই সব যার ফুলিষে। ভুলে যায় মহাকালের মহামন্ত্র। যোনিস্থার দিয়ে এই জগতে পদার্পণ করেই তাই কবিয়ে কৈদে ওঠে মাহুখ।

ব্রহ্মবিজ্ঞা আগমবাগীশ স্তব পাঠ করতে করতে বড় সড়ক থেকে নেমে আসছেন

ওঁ যোনিকপে মহামায়ে সর্বসম্পৎপ্রদে শুভে।

কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশাক্ত সমাধিতে।

কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।

মহাধোবে মহাবালী কুলাচাংগ্রিযে সদা।

কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।

যোনিকপে মহাবিগ্ধে সর্বদা মোক্ষদায়িনী।

কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।

হে যোনে হ্র বিঘ্নং মে সর্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে।

আধাবভূতে সর্বেষাং পূজকানাং প্রিয়ং বদে।

স্বর্গপাণ্ডলবাসিন্গে যোনয়ে চ নমো নমঃ।

আগমবাগীশেব গলায় খোলে ভাল স্তোত্রটা। গমগম করতে লাগল উদ্ধাবণ পূবের বঙ্গমঞ্চ। বামহবি পঙ্কা বয়ে নিয়ে এল তাঁর মোটঘাট। উত্তর দিকে বড় পাকুড় গাছেব তলায় মস্ত বড় বাঘছাল বিড়িয়ে বসলেন তিনি। বাঁয়ে বসলেন তাঁর শক্তি, সামনে সিন্দূর মাথানো ত্রিশূল পুঁতে।

রামহরিব বউকে ডেকে খোঁজ নিলাম বত মাল মজুদ আছে ঘরে, তাঁটি নামবে কবে। হাতের কাছে তখনও যে দুটো বোতল বসানো ছিল তাই নিয়ে নেমে গেলাম গদি থেকে। সিঙ্গী গিন্নী একভাবে হাঁটতে মাথা গুঁজে বসেই রইলেন সেইখানে।

উদ্ধারণপুরের আকাশ।

ছায়াপথে ঘুরে ফেরেন মায়াবিনী দুই যমজ ভগিনী।

বাসনা আর বঞ্চনা—দুই চিরজাগ্রতা দেবী উদ্ধারণপুর শ্মশানের। গন্ধার

কাকচক্ষু জলে ধরা পড়ে তাঁদের প্রতিবিম্ব, যা দেখে ওরা নিজেরাই সভয়ে শিউরে ওঠেন। অবিরাম চিতার ধোঁয়া লেগে লেগে কালোর কালো হয়ে গেছে ওঁদের মুখ। সেই পোড়া মুখ নিয়ে কেমন করে আর লোকের মন ভোলাবেন তাঁরা!

কালামুখীদের মুখে হাসির আলো ফোটার আয়োজন হয়েছে। উদ্ধারণ-পুরের ঘাটের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাঁদের পূজার মন্ত্র—

“তুধ্যস্তাং তুধ্যস্তাং তুধ্যস্তাং—”

নিশীথ রাতের গোপন অহুষ্ঠান—রহস্তপূজায় বসেছেন আগমবাগীশ শ্মশানের ঈশান কোণে। রক্তবস্ত্র পরে, জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে কপালে মস্ত বড় সিঁহুরের ফোটা লাগিয়ে তাঁর শক্তি আসন গ্রহণ করেছেন তার বামে। সামনে শ্রীপাত্র গুরুপাত্র যোগিনীপাত্র ভোগপাত্র আর বলিপাত্র স্থাপন করা হয়েছে।

একে কৃষ্ণাষ্টমী তায় মঙ্গলবার। মোক্ষম যোগাযোগ মিলে গেছে আগম-বাগীশের। উপাসনা করছেন—তত্ত্বত্বাঙ্কি হবে মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে।

ওঁ প্রাণাপানব্যানোদনসমান। মে তুধ্যস্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্ম্য
ভূয়াসং স্বাহা।

আমার প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান শোধন হোক, রজোগুণশূন্য পাপশূন্য জ্যোতিঃস্বরূপ হই যেন আমি।

জ্যোতিঃস্বরূপ হবার প্রধান উপচার আস্ত ৩৬ ভাঁটি টিনে এনে দিয়েছে রামহরি ডোম। সাধক মানুষ সেও, বউকে একখানি রক্তবর্ণ কাপড় পরিয়ে নিয়ে এসেছে সঙ্গে। মেয়েটাকে রেখে এসেছে পঙ্কজের কাছে। সাজ রাতে পঙ্কাও ঢুকতে পাবে না শ্মশানে। পঙ্কা হচ্ছে অনধিকারী শভিহীন পশু। অবশ্য আমিও তাই। আমারও শক্তি নেই মৃতরাং অধিকার নেই রহস্তপূজায় বসবার। কিন্তু আগমবাগীশ আশা রাখেন যে একদিন আমার পশুত্ব ঘুচবে। নীরতাব জাগবে আমার প্রাণে, সেদিন আমিও একটি শক্তি জুটিয়ে নিয়ে লেগে যাব শোধন-ক্রিয়ায়। তাই আমাকে একরকম জোর করে এনে বসিয়েছেন আগমবাগীশ ওঁদের সামনের আসনে।

বসে আছি আর বেশ বুঝতে পারছি অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাদের। আজ সন্ধ্যায় উদ্ধারণপুরে পৌছে চিতায় উঠে শুয়েছিল যারা, তারা চিতা থেকে

উঠে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের চার পাশে। দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছে আগম-বাগীশের শোধন করার মন্ত্রপাঠ আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। স্পষ্ট শুনেছে পাচ্ছি শৌ শৌ শব্দ উঠছে চিতাগুলো থেকে। ছুনিয়ায় আলো বাতাস আনন্দ ভালবাসা বিধাক্ত করে তুলেছিল ওদের পঞ্চপ্রাণ। শেষ পর্যন্ত সেই অশোধিত নোংরা প্রাণের মায়া কাটিয়ে ওরা পালিয়ে এসেছে উদ্ধারগপুর শ্মশানে। পালিয়ে এসেছে এই আশা বুকে ভরে নিয়ে যে চিতার আগুনে সব শোধন হয়ে যাবে।

কিন্তু তা হবে না, হতে পারে না শোধন চিতার আগুনে। কি করে চব্বিশ তম্বের শোধন করা যায় তার গুহ তত্ত্ব জানেন আগমবাগীশ। জানেন তিনি অনেক বিস্ময় মন্ত্র, যে মন্ত্রের আগুনে পুড়িয়ে নিলে অশোধিত তত্ত্বগুলি পাকা হয়ে যায়। আর তখন সেই পাকা তত্ত্বগুলিকে নিয়ে চিতায় চড়লে চিতা থেকে বিধাক্ত কালো ধোঁয়া উঠে আকাশের মুখ বালোয় কালো হবার ভয় থাকে না।

ওঁ পৃথিব্যন্ত্বেজোবাব্বাকাশানি মে তুধ্যস্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা
ভূয়াসং স্বাহা।

ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম শোধন হয়ে গেল।

এধারে প্রথম গ্রহর শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। উদ্ধারগপুরের আকাশের কালো চোখ আরও কালো হয়ে উঠল, আমার সামনে বসা আগমবাগীশের শক্তির নিবিড় কালো চোখ দুটির মত। লালে লাল হয়ে আছেন আগমবাগীশের শাক্ত। তার মধ্যে বড় বেমানান দেখাচ্ছে হাডের মত সাদা গুঁর হাতের শাঁখা দুটিকে। শাঁখাপরা হাত দু'খানির আঙ্গুলে জডাজড়ি লেগে গেছে। আবার মাঝে মাঝে কাঁপছে হাত দু'খানি। কেঁপে উঠছে তার সারা দেহখানিও। যেন ভিতর থেকে কে ঝাঁকানি দিচ্ছে ওঁকে। ঝাঁকানির চোটেই বোধ হয় ওর কালো চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছে একটা অজানা আতঙ্ক আর উৎকর্ষ। আগমবাগীশের এবারের শাক্তি নোংরা কাঁচা, বলির পত্তর দৃষ্টি ওর কাজল-কালো অবোধ চোখে।

ওঁ প্রকৃত্যহকারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রোণি মে তুধ্যস্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা
ভূয়াসং স্বাহা।

প্রকৃতি অহকার মন বুদ্ধি আর শ্রোত্র শুদ্ধ হোক।

হওয়াই একান্ত প্রয়োজন, নয়ত কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে যাবি। আগম-

বাগীশের শক্তির চক্ষু দুটিই করছে সর্বনাশ, আমার অহংকার মন বুদ্ধিকে কিছুতেই
 ঘুমোতে দিচ্ছে না। ওর ওই অতল চোখের চাহনি যেন অনবরত খোঁচা দিয়ে
 আগিয়ে তুলছে আমার প্রকৃতিকে। সামনে বসানো ঘুতপ্রদীপের উজ্জ্বল শিখাটি
 অল্প অল্প নাচছে। তার ফলে যেন ঢেউ খেলছে ওর শরীরের শীতল শ্রামলতায়।
 বেশ একটি সক্রিয় আবেদন আছে ওর মেটে মেটে বর্ণের। যেন মৌন মিনতি
 জানাচ্ছে—এস, নামো, ডুব দাও। ডুব দিয়ে দেখ জুড়োয় কিনা গায়ের জালা।

সুতরাং ঐ আপদগুলোকে আর একবার ভাল করে শোধন করবার জন্যে
 হাত বাড়ালাম। একটা মস্ত বড় মাথার খুলিতে ভতি করে আগমবাগীশের
 মস্তগুণে শোধন-করা এক পাত্র কারণ হাতে তুলে দিলে রামহরি। এইটিই বোধ
 করি পঞ্চত্রিংশ পাত্র আজ সকাল থেকে গণনা করলে। রামহরির বউ উঠে এসে
 কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে—“এবার ক্ষ্যামা দাও জামাই।” কি রকম যেন
 কাকুতি ফুটে উঠল ওর গলায়।

হাঁ—ক্ষ্যামাই দোব এবার। এই পাত্রটিকে শেষ করে—এই রাতের মত
 ক্ষ্যামা দোব। এই শোধন করা পাত্রটি শেষ করলেই শোধন হয়ে যাবে আমার
 চরিত্র তত্ত্ব। তখন ঘুমিয়ে পড়ব। ঢলে পড়ব বিশ্ব্তির কোলে। বিশ্ব্তি
 উদ্ধারণপুরের কুহকিনী নিশাচরী।

কিন্তু আজ ত সে আসেনি। এসে দাঁড়ায়নি সে আমার পিছনে। আজ
 আমার পিছনে হাঁটুতে মাথা গুঁজে ঠায় চরিত্র ঘণ্টার ওপর বসে আছেন যিনি
 তিনি কিছুতেই নড়বেন না সেখান থেকে। আজ সন্ধ্যাবেলায় যখন আমি আমার
 গদি ছেড়ে এসে বসলাম চক্রে, সিঁদ্রী গিন্নীও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে বসলেন আমার
 পিছনে। ভাগ্য ভাল তাঁর যে চক্রে অনধিকারিণী উপস্থিত প্রাণ করলেন না
 আগমবাগীশ।

সামনে আগমবাগীশের শক্তি আর পিছনে নলরামপুরের সিঁদ্রী বাড়ীর সন্ত-
 বিধবা বো। এ অবস্থায় পড়লে পঞ্চত্রিংশ পাত্রের পক্ষেও চরিত্র তত্ত্বের নাড়ীর
 স্পন্দন কিছুতেই বেচালো চলে না। পাত্রটা প্রায় শেষ করে বাকিটুকু সিঁদ্রী গিন্নীকে
 প্রসাদ দিলাম। ঠেলা দিয়ে তুলে পাত্রটা ধারিয়ে দিলাম তাঁর হাতে। বিস্তর পচা
 বিষ জমা হয়ে আছে ওর মনের মধ্যে। ভাল করে ধুয়ে সাফ হয়ে যাক উদ্ধারণ-
 পুরের পাকা তাঁটির শোধন-করা তরল আঙনে।

ও স্বচ্ছজিহ্বাভ্রাণবচাসি যে শুধ্যস্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাশ্মা
 ভূয়াসং স্বাহা।

গণ্ডারের মত পুরু কি আগমবাগীশের গায়ের স্বক ! ঔর চক্ষু ছুটিতে কিসের
 আশুন দপ দপ করে জলছে । স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর লকলকে জিহ্বাটি । সেই
 জিহ্বা দিয়ে উনি ঔর পাশে বসা শক্তির সর্বাঙ্গ লেহন কবছেন যেন । উদ্ধারণপুর
 ঘাটের মাংস পোড়ার গন্ধ আগমবাগীশের থ্যাঁবড়া নাকে প্রবেশ করে না । ঔর
 শক্তির মেটে মেটে বঙের সজীব মাংসের ভ্রাণ পান উনি নাকে । মুখ ব্যাদান করে
 তিনি বিস্কন্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন । আমাব শুন্ত-নিশুন্ত কান খাড়া করে
 শুনছে ঔর সজীব মন্ত্র-উচ্চারণ ।

ও পানিপাদপায়ুপশুশব্দা মে শুধ্যস্তাং জ্যোতিবহং বিবজা বিপাপ্মা

ভূয়াসং স্বাহা ।

ও স্পর্শরসরূপগন্ধাকাশানি মে শুধ্যস্তাং জ্যোতিবহং বিবজা বিপাপ্মা

ভূয়াসং স্বাহা ।

ও বায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মানো মে শুধ্যস্তাং জ্যোতিবহং বিবজা বিপাপ্মা

ভূয়াসং স্বাহা ।

গন্ধাব ওপাবে আকাশ থেকে একটি তাবা থসে পড়ল । তীব বেগে নামতে
 নামতে হঠাৎ গেল মাঝপথে মিলিষে । এপাবে ঐ ওধাবেব শেষ চিতাটা থেকে
 ছিটকে পড়ল একখানা জলন্ত কাঠ । অনেকগুলি ক্ষুলিঙ্গ লাফিয়ে উঠল আকাশের
 দিকে । কিছু দূরে উঠে ওবাও মিলিষে গেল । আকাশ থেকে যে নেমে এল সে
 পেল না মাটির স্পর্শ, আব আকাশ ছুঁতে উঠল যারা তাবা পেল না আকাশেব
 নাগাল । মহাশূন্ত সবই গ্রাস করল ।

আমাকেও ।

অসীম অনন্ত আকাশ ।

অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র মহাবেগে অবিবাম ঘূবে মরছে আপন আপন বক্ষপথে ।
 কেন ? কেন তা কেউ জানে না । কেউ বলতে পারবে না কিসের টানে ওরা
 ঘুরছে, কার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে ওদেব ঐ নিরন্তর আবর্তনে ।

কীরোদ সাগর । নিস্তরঙ্গ অবিস্কুল অচেতন । শেষনাগ সহস্র ফণা বিস্তার
 করে ভাসছে । অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত অনন্তদেব, অতি সন্তর্পণে পদসেবা করছেন
 মহালক্ষ্মী ।

সহস্র মুখে সহস্র ফণা দিয়ে বিবাক্ত খাল ত্যাগ করছে নাগেশ নারায়ণের মুখের
 ওপর । তারই বিবজ্রিয়ায় বিশ্বস্তর আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে আছেন । কালকূটেক

প্রমত্ত প্রভাবে সর্বাঙ্গ নীল হয়ে গেছে তাঁর। সেই নীলাভায় মহাব্যোম নীলে নীল হয়ে আছে। তার মাঝে উঠেছে প্রলয়ঙ্কর ঝড়। সেই ঝড়েও বাহুকির সহস্র ফণা-নিঃসৃত হলাহলেব নিশ্বাস। কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র সেই বিশ্বের মাঝে পড়ে বিশ্বের নেশায় মত্ত হয়ে দুর্নিবার গতিতে অনন্তকাল আবর্তিত হচ্ছে।

বহুদূর থেকে ভেসে আসছে আকুল আকৃতি।

“ওগো আমায় ছেড়ে দাও। আমাব যে ছেলেমেয়ে আছে গো ঘবে। সর্বনাশ কোর না গো আমাব, সর্বস্ব কেড়ে নিও না। সব খুইয়ে এখান থেকে ফিরে গিয়ে কোন্ মুখ নিয়ে আমি মা হয়ে দাঁড়াব তাদের সামনে?”

উদাস্ত স্ববে শোনা গেল মন্ত্র উচ্চারণ—

ওঁ যোনিবিদ্ধাং মহাবিদ্ধাং কামাখ্যাং কামদাখ্যিনীং ।

তৎসুসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং কামবীজাজ্জিকাং পদাং ॥

গাল ফুলিয়ে তুবড় বাঁশিতে স্বব তুলেছে সবনিষস্তা সাপুড়িয়া। স্তরের তালে তালে বাস্তবিক সহস্র ফণা ছলছে। ঘুমোক সবাই, কিন্তু ঘুমোয় না যেন ফীজ। ও ঘুমোলে ওব খাসনালাই কঁদু হয়ে যাবে যে। তখন আর বইবে না বিষাক্ত ঝড়, নাযাযণেব নেশা টুটে যাবে। স্তব্ধ হয়ে যাবে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবেগ। নিমেষে জেগে উঠবে সকলে, অগতির গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে জেগে উঠবেন স্বয়ং চক্রপাণি।

বিশ্ব ক্রমাগত উঠছে মর্মস্তুদ আর্তনাদ ধবণীব বুক থেকে। গাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে মহাকাব্যের মহাপ্রশস্তি।

“ওগো তোমাব পায়ে পড়ি, আমায় মেরে ফেল না। এই জ্বলে শস্যায় এখানে আনছ, এ যদি বুঝতে পারতাম তাহলে মবে গেলেও আমি আত্ম না গো তোমাব সঙ্গে, কিছুতেই এখানে মবতে আসতাম না।”

সেই ক্ষণ বর্ষস্বব চাপিয়ে উঠল যুগ্ম মহাদেবী বাসনা আব বঞ্চনার বলি-মন্ত্রধ্বনি।

ওঁ ক্লীং কাগেশ্বরী মহামায়ে ক্লীং কালিকায়ৈ নমঃ ।

কুলাকুলাদিবিজ্ঞানে কালীনামতযোর্মতে ॥

হঠাৎ সাপুড়িয়ার বাঁশির স্বরেব তাল কেটে গেল। নিমেষে বাহুকির সহস্র ফণা গুটিয়ে গেল। নারায়ণ পাশ ফিবলেন। চমকে উঠলেন পদসেবারতা মহালক্ষ্মী। আপন কক্ষপথ থেকে গ্রহনক্ষত্রগুলো ছিটকে পড়ল। উদ্ধা বেগে

নামতে লাগল ধরার বৃকে ।

তখনও কোথায় কে ছুমদাম করে মাথা খুঁড়ছে আর অবিরাম আর্তনাদ করছে ।

“আমায় ছেড়ে দাও, ওগো আমার যেতে দাও আমার ছেলেমেয়ের কাছে ।
তারা যে পথ চেয়ে আছে আমার । পূজার প্রসাদ নিয়ে আমি ঘরে ফিরব । সেই
প্রসাদ থেয়ে তাদের বাপ ভাল হয়ে যাবে । প্রাণের মায়ায় সে আমাকে তোমার
হাতে দিয়েছে । এ সর্বনাশ করতে আমার নিয়ে আসছ তুমি, তা জানতে পারলে
মরে গেলেও সে আমাকে পাঠাত না তোমার সঙ্গে ।”

অচঞ্চল কর্তে তখনও ধনিত হচ্ছে মস্ত ।

কামদা কামিনীজ্ঞেয়া তত্ত্বমধ্যে মহামতা ॥

হাহাকার করে উঠল অসহায়া ধরিজী, নক্ষত্রগুলোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ
হবার ভয়ে আঁতকে উঠল । বৃকে যত জোর আছে সব উজাড় করে উন্মাদ সাপুড়িয়া
ফুঁ দিলে তার তুবড়ি বাঁশিতে । সেই ধাক্কায়ে জেগে উঠল শেয়নাগ । প্রলয়ঙ্কর
বিবনিষাস ত্যাগ করলে । বিধে বিধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মহাবোম । গ্রহনক্ষত্র-
গুলো নেশায় মত্ত হয়ে ফিরে পেল আপন গতিবেগ ! মোহাচ্ছন্ন হয়ে আবার
ঘুরতে লাগল আপন কক্ষপথে ।

নীরঞ্জন অঙ্ককার । অঙ্ককারের বৃক থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরছে তাজা বক্ত ।
রক্ত নয়, রক্তাক্তের ফুটে উঠেছে অঙ্ককারের বৃকে মহামস্ত ।

ও সৌঃ বালে বালে ত্রিপুরাসুন্দরি যোনিরূপে মন সর্বসিদ্ধিং দেহি
যোনিমুক্তিং কুরু কুরু স্বাহা ।

উদ্ধারণপুরের আকাশ ।

কালো হয়ে উঠেছে আকাশের কালো চোখ । গুমরে গুমরে কাঁদছেন তাঁরা,
মোচড় দিচ্ছে আকাশের মর্মস্থলে সেই সন্ধ্যা বিলাপ । কাঁদছেন উদ্ধারণপুরের
দুই চিরজাগ্রতা দেবী—বাসনা আর বঞ্চনা । তিথি বার নক্ষত্র সবই মেলবার মত
মিলেছিল দৈবাৎ । তবু অসম্পূর্ণ হল না তাঁদের পূজা । বলিদানে বাধা পড়ল ।
আগমবাগীশের শোধনক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে গেল । এরই নাম বোধ হয় দৈববিড়ম্বনা ।

কিন্তু না, অত সহজে ব্যর্থ হয় না কিছুই উদ্ধারণপুর আশানে । সারা দুনিয়া
উজাড় হয়ে ব্যর্থতা এসে জমা হয় যেখানে আগুনে পুড়ে চরিতার্থ হবার আশার,
সেখানে বসে কিছু করলে তা ব্যর্থ হয় কি করে ! তা’হলে যে দৈব হবে জয়ী, আর
যার তুবড়ি বাঁশির স্বরের তালে দৈব নাচে মাথা ঢুলিয়ে, সেই সর্বনিরস্ত্র সাপুড়িয়ার

বাঁশি বাজানো হবে নিশ্চয়।

শেষ পৰ্বন্ত স্তানমাহাত্ম্য বজায় রইল। মুখ রক্ষা হল উদ্ধারণপুর ঘাটের।

ধীরে ধীরে মাথা তুললে এক কালনাগিনী। নিজের বিষের জ্বালায় নিজেই জ্বলে পুড়ে মরছে সে। তাই সে চায় শান্তি, চায় বিশ্বাস, বিষে ডুবে থেকে বিষের জ্বালা ভুলতে চায়।

ধরধর করে কেঁপে উঠল উদ্ধারণপুরের আকাশ। স্বেচ্ছায় গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলি।

“আমায় নাও ঠাকুর। আমায় নিলে যদি তোমার চলে তা’হলে নাও আমায়। পূর্ণ হোক তোমার পূজা, আমারও জন্ম সার্থক হোক। ও হতভাগীকে আর অভিসম্পাত দিও না ঠাকুর, ও ফিবে যাক ওর ছেলেমেয়েব কাছে। তোমার পূজার প্রসাদে ওর স্বামী নীরোগ হয়ে উঠুক।”

ক্ষীরোদমাগরের নিস্তরঙ্গতা কিছুতেই বিক্ষুব্ধ হয় না। কোন কিছুতেই পদ-সেবায ছেদ পড়ে না মহালক্ষ্মীর। বিষে বিশেষ নীল হয়ে গেল বিশ্বচরাচর। মহাবিশ্ব কিস্তি ঘূমে অচেতন।

রামহরির বউয়ের বড় প্রাণ কঁাদে তাব ভবিষ্যৎ জামাইয়ের জন্তে। ওরা স্বামী-স্ত্রী দু’জনে বয়ে নিয়ে এল আমাদের আমার গদির ওপর। শুনতে পেলাম রামহরির বউ বলছে—“মুয়ে আগুন মাগীর, আজ সকালে শাখা সিঁহর খোয়ালি, আর রাতটা পোয়াতে তব সহীল না তোর, এব মধ্যে হুডো জ্বলে দিলি নিজের মুখে।”

আমায় গদির ওপর তুলে দিয়ে ওবা ঘবে ফিরে গেল। অ প্রবৃত্তি নেই রামহরির—আগমবাগীশের অহুষ্ঠানে থাকবার। বললে—“চল আমরা ঘরকে চলে যাই বউ। ঠাকুরেব খাটামো আর সহি হয় না।”

রামহরির বউ কাকে বললে—“এখানে গোসাঁইয়ের কাছে বসে থাক গো ঠাকুর। রাত পোয়ালে গোসাঁই তোমার ব্যবস্থা করবে’খন।”

আগমবাগীশের অহুষ্ঠানে আর একটি প্রাণীও উপস্থিত রইল না, তার নবলক শক্তি ছাড়া। চিতা ছেড়ে উঠে গিয়ে যারা দাঁড়িয়েছিল অহুষ্ঠান দেখতে, তারা ফিরে গেল তাদের জলন্ত চিতার ওপর। থাক যেমন আছে তেমনই থাক ওদের অশোধিত চক্ষিণ তত্ত্ব। আর কোনও আক্ষেপ নেই ওদের মনে। মহাশাস্তিতে চিতায় শুয়ে পুড়তে লাগল সকলে।

কোন একটা গাছের ভগায় বসে কেঁদে উঠল একটা শহুন। তার সঙ্গে গলা

মিলিয়ে স্বর তুললে অস্ত্র সবাই। সেই নাকী স্বরের মড়াকান্না চলতেই লাগল।

তারপর খুব দূরে ভাঁয়রোয় চান দিলে কে।

জাগো—মোহন প্যারে।

কে জাগবে তখন? একমাত্র রাত্রি ভিন্ন আর কারও উদ্ধারগপুরের শ্মশানে জেগে থাকা নিষেধ।

উদ্ধারগপুর ঘাটের নিশীথ রাতের গোপন অস্থান—বাসনা আর বঞ্চনার রহস্যপূজা নিবিড় চলে থাকুক। অনর্থক 'মোহন প্যারে'কে জাগাবার জন্তে গলায় কসরত করা, মিছামিছি মরণের দরজায় জীবনের মাথা খুঁড়ে মরা। তার চেয়ে ঘুমোও। মুছে ফেল জীবনের লক্ষণ উদ্ধারগপুরের ভস্ম চাপা দিয়ে।

পায়ের কাছে মাটিতে অন্ধকারে বসে ছিল যে মূর্তিটি তাকে বললাম—“ঘুমিয়ে পড়। পার ত একটু ঘুমিয়ে নাও এই বেলা।”

বেচারা আশা কবে নি যে আমি জেগে আছি। চাপা গলায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—“ওগো আমার কি হ'ব গো।”

বললাম—“কিছুই হবে না। কাল সকালে লোক সঙ্গে দিয়ে তোমায় বাড়ী পাঠিয়ে দোব।”

আবার কানে গেল মন্ত্র উদ্ধারগ।

ও ধর্মাধর্ম-হবিদীপ্তে আত্মায়ো মনসা স্রুচা।

স্বয়ম্ভবর্তনা নিতামক্ষ-বৃত্তিজুহোমাহং স্বাহা ॥

আগমবাগীশ পূর্ণাহতি প্রদান করলেন।

আলো—আলো—আলো।

আলোয় আলোয় ছেয়ে গেছে উদ্ধারগপুরের শ্মশান। আলোর হাসি চলকে চলেছে গঙ্গার স্রোতে। শেরাল শকুন কুকুর—সকলের মুখে ভোঁয়াচ লেগেছে সেই হাসির। চিতাগুলো তখনও ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। মাল সব সাবাড়। বাসি পচা পড়ে থাকে না উদ্ধারগপুর ঘাটে। প্রতিদিন টাটকা নিয়ে কারবার। যা ছিল—তা আর নেই। থাকে না, থাকতে পারে না। অন্ধকার নেই, তার বদলে এসেছে আলো। স্বতরাং একদম ভুলে মেরে দাও অন্ধকারের আশ্বাস। নিজেকে তৈরী করে নাও নতুনের স্বাদ পাবার জন্তে। নতুন হচ্ছে জীবন, বাসি পচা যা কিছু তা হচ্ছে বৃত্তা। তা নিয়ে মাথা ঘামানো, মন খারাপ করা, হায় হায় করাও বৃত্তা। উদ্ধারগপুর শ্মশানে মৃত্যুর প্রবেশ নিষেধ। নতুন জীবনের জয়গান উঠছে

উদ্ধারণপুর আশানে । ভায়রোয় শেষ টান দিচ্ছে কে খুব কাছ থেকে ।

“উঠ উঠ নন্দকিশোর ।”

খস্তা ঘোষ ।

ঝাড়া পাঁচ হাত লম্বা খস্তা ঘোষের গলা । পান টকটকে চারখানা দাঁত বার করা খস্তা ঘোষ কালোয়াতি গান গায় । খস্তা এসে গেল । যাক বাঁচলাম এবার । খস্তাই করবে একটা বাবস্তা । ওই পৌছে দেবে'খন বউটাকে ওর স্বামীর কাছে । গোলমাল চুকে যাবে ।

উঠে বসলাম গদির ওপর । হঠাৎ কি খেয়াল হল, দু'হাত জোড় করে আলোর দেবতাকে একটি প্রণাম জানালাম : “দুঃস্বপ্নেব অবসান ঘটো তুমি, তোমার আলো অসহায়তার অস্ত্র ঘটায়—তাই হে জীবন দেবতা, তোমার কাছে রুতজ্ঞতা নিবেদন করেছি ।”

তাবপব চোখ খুললাম । মৃতিমান খস্তা ঘোষ চোখেব সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে । আরও গোটাকতক দাঁত বেবিষে পড়েছে তাব ।

“তা'লে তুমিও আজকাল ঘুমোচ্ছ গোঁসাঁই ?” দবাজ গলায় হা হা হা হা হাসতে লাগল খস্তা । একেবাবে যোল আনা জীবন্ত খস্তা ঘোষ—হাসার মত হাসতে পারে অনর্থক উদ্বেগহীন হাসি ।

হাসি খামিয়ে তার লম্বা কোটের লম্বা পকেট থেকে টেনে বার করলে একটি চেন্সো বোতল । বোতলটির মুখ খোলা হয় নি তখনও, কতবে টল টল, ছে সাদা জল ।

“নাও গোঁসাঁই—চালাও । আসল জাহাজী মাল, এ তোমার ভোম বউয়ের মা গঙ্গার পানি নয় বাবা—এ হচ্ছে গিয়ে—”

মাল মগজে দীর্ঘ বক্তৃতা চালিয়ে যাবে খস্তা, যদিও নিজে ও কখনও মাল গেলে না । নেশাব মধ্যে ওর আছে মাত্র দুটি নেশা । এক—টাকা বোজগার করা, আর দুই—টাকা ওড়ানো । ওই দুটি কর্ম স্চারুক্রমে সম্পন্ন করার জন্তে ওর মগজে হাজার রকম ফন্দিফিকির খেলা করে । যে কাজে ঝুঁকি কম সে রকম কাজে খস্তা সহজে হাত দিতে চায় না, মোটা লাভের লোভেও না । বলে—“দূর দূর, ওভাবে দু'দশ কুড়ি কামাতে ত বেলতল । জ্বাড়া ভট্‌চায়ও পারে, চুনো পুঁটি মেয়ে শুধু শুধু হাতে গন্ধ করে কে ? চেপে বসে থাক না বাবা, বাবা মাছ ঘাই দেবেই ।” হয়ত বাবা মাছের জন্তে দু'দশ মাস গড়িয়ে চলে গেল । কুছ পরোয়া নেই খস্তার, নেহাৎ অচল হলে চূপচাপ শুয়ে থাকে গিয়ে ওর দিদির আখড়ার চরণ

দাস বাবাজীর পাশটিতে । সে সময় খস্তার মাথায় তেল পড়ে, অত লাল দেখায় না দাঁতগুলো, চোখের কোল অত কালো থাকে না । আর মুখের চেহারাও বেশ বদলে যায় । “কুছ পরোয়া নেই” তখন বেঁচে থাকে না ওর চোখে । নিতাই বোষ্টমীর সবুজ শিমগাছের দিকে ঠায় চেয়ে থাকার ফলেই বোধ হয় ওব চোখেও সবুজের আভা দেখা যায় ।

তারপর একদিন আবাব সংবাদ আসে । কাটোয়া শিউড়ি কান্দি বেলডাঙ্গা এমন কি কলকাতা পর্যন্ত ছুটতে হয় খস্তাকে । বড মাছ ঘাই দিয়েছে, খেলিয়ে জুলতে হবে ।

আবার একদিন খস্তা ফিরে আসে । ফিরে কোথাও আসে না সে । তার চলার পথে হযত পডল উদ্ধারগপুরের ঘাট । তাই খামকা ঢুকে পড়ে শ্মশানে । গায়ে একটা লম্বা কোট, পবনে একখানা দশ-বাবো টাকা দামের কোরা তাঁতের ধুতি আর এক জোড়া চীনে-বাড়ীর জুতো । জুতো জামা কাপড় সবই নতুন । অর্থাৎ নতুন কেনা হয়েছিল যেদিন, সেদিন অন্ধে চড়িয়েছে খস্তা । পোশাক-পরিচ্ছদ ও একবারই পরে আর একবারই ছাড়ে, পরা-ছাড়াব মাঝের সময়টুকু হযত বা ছ’-মাস ন’মাস বা কয়েক বছরও হতে পারে । খস্তাব তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না ।

কিছুতেই কিছু আসে যায় না খস্তার । পক্ষা এসে জানালে যে দুটো খাসি পাওয়া গেছে । দাম বড বেশী চাচ্ছে । এক কুড়ির কমে কিছুতেই ছাড়তে চায় না ।

খিঁচিয়ে উঠল খস্তা—“তবে কি পাঁচ টাকায দেবে নাকি রে শালা ? জানিস, শিউড়িতে চাল উঠেছে এগাবোষ । লিয়ে লে খাসি দুটো, সের পনেরো মাল হাওয়া চাই । বানিয়ে ফেল্ ঝটপট, সিধু ঠাকুরকে চাপিয়ে দিতে বল্গে যা ।”

বুঝলাম—এখন জাঁকিয়ে ছ’চার দিন থাকবে এখানে খস্তা । তার মানে চলল এখন মহোৎসব উদ্ধারগপুর ঘাটে । উদ্ধারগপুর ঘাটে এখন বিকিকিনি বন্ধ । দর-মার খোপে বাঁশের মাচায় যারা মনে অঙ্ ধরাবার বেসাতি চালায়, সেই হতভাগীরা ছুটি পাবে কয়েকদিনের জন্তে । চেনা খন্দের ঊকি দিলেও শুনিয়ে দেবে তাকে—‘ফের বাবু এখন, ঘরের ছেলে ঘবে যাও । আমাদের ভাই এসেছে যে, ভাই না গেলে মুখে অঙ্ মাখতে সরম লাগে যে ।’

সকলের বড ভাই খস্তা ঘোষ এসেছে । এসেছে তার অভাগী বোনেদের জন্তে এক গাঁটরি কাপড় নিয়ে । এসেই হুকুম দিয়েছে—“খুলে কেলে দে ওই নচ্ছার সাজ-পোশাকগুলো, গন্ধা নেয়ে এসে নতুন কাপড় পর্ সবাই । নতুন উজ্জন পেতে ফেল্ বড বড কয়েকটা । সকলের রান্নাবান্না একসঙ্গে হবে । রাঁধবে সিধু ঠাকুর ।

আমরা সবাই প্রসাদ পাব।”

কয়েক বোতল রসায়নও নিশ্চয়ই এনেছে খন্তা ঘোষ। খেলে রক্তের দোকানটাই হয়। সেগুলো সে ভাগ করে দেয়—যাদের শরীর বড্ড ভেঙে পড়েছে তাদের মধ্যে।

আমার মুখেব দিকে চেয়ে খন্তা বললে—“অত কি ভাবছ গোঁসাই? তুমিও যদি ভেবে মর তা’হলে আমরা যাই কোথায়?”

বললাম—“না ভাবছি না কিছুই, আগে একটু ধোঁয়া-মুখ করা।”

পকেটে হাত পুরে এক মুঠো সস্তা সিগারেট বাব করলে খন্তা। একটা ধরিয়ে চোখ বুজে টানতে লাগলাম।

বক্তবর্ণ লালপাড় শাড়ীপরা কে সামনে দাঁড়াল। মুখেব দিকে চেয়ে থ হয়ে রইলাম। কপালে এত বড় সিঁতুরেব ফোঁটা, মুখে এক মুখ পান, দুধেব মত রঙ, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মূর্তি। কে তিনি?

হঠাৎ মাথার ঘোমটা সবে গেল। কিছু নেই, সাদা ধপধপ কবছে মাথাটাও। ভয়ানক চমকে উঠে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম।

“এবার একটু পায়ের ধুলো দিন বাবা, আমরা বিদেয় হই!”

এ সেই গলাব স্বব। আবাব ফেরাতে হল মুখ। নিবিড় কালো চোখের পল্লবগুলি আব তাব ওপব অতি যত্নে ঝাঁক। ভুরু দুটি—ভাগ্যে কামানো হয় নি! বুকেব মধ্যে একটা নিঃশ্বাস ঠেলে উঠল। তাড়াতাড়ি সেটাকে সামলে বলে ফেললাম—“কোথায়! কোথায় যাচ্ছ তুমি?”

সামান্য একটু হাসি খেলে গেল তাঁর ঠোঁটে। চিবুকের নি সামান্য একটু টোল পড়ল। দৃষ্টি নত করে উল্লস দিলেন—“আগে আমার ঐ বোনটিকে গুর স্বামীর হাতে পৌঁছে দোব, তাবপর চলে যাব কাশীতে।”

নিজের ওপর আর এতটুকু কর্তৃত্ব নেই আমার। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—“আগমবাগীশ। আগমবাগীশ কোথায়?”

নত চোখেই তিনি উল্লস দিলেন জড়তাহীন কণ্ঠে—“ঠাকুর আলাদা গাড়ীতে আগেই রওয়ানা হয়ে গেছেন, তিনি স্টেশনে থাকবেন যতক্ষণ না আমি ওকে গুর বাড়ীতে রেখে ফিরে আসি।”

আমার পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের ঘোমটার ওপর হাত রাখলেন। তারপর আর একজনও পায়ের ধুলো নিলে।

খন্তাকে হুকুম করলাম—“বোতলটা খোল এবার খন্তা। গলাটা ভেজাই।”

উদ্ধারণপুরের বাতাস ।

বাতাস শিঙা ফৌকে ।

বহুদিনের পুর্বানো শূন্যগর্ভ নরমুণ্ড আর মোটা মোটা ফৌপরা হাডের শিঙায় ফুঁ দেয় বাতাস । নিশ্চুতি রাতে শোন। যায় সেই শিঙাধ্বনি । শুনে শিহরণ জাগে চিতাভস্মের বৃকে । জেগে উঠে তার, পাখনা মেলে উড়ে যায় বাতাসের সঙ্গে । শকুনরা পাখা ঝাপ্টে বিদায়-অভিনন্দন জানায়, আকাশের দিকে মূখ তুলে শিয়ালরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরে—“জয়যাত্রায় যাও গো ।” গান শুনে ওদের জাতি গোত্র যে যেখানে থাকুক সেখান থেকে উল্লাসে উলুঝনি দিতে থাকে ।

উদ্ধারণপুরের বাতাসের সঙ্গে শ্মশান-ভস্মের মধুর মিতালি । দুই মিতার জয়যাত্রা শুরু হয় । এপারে শিউড়ি সাঁইখে কাটোয়া কান্দী, ওপারে বেলডাঙা বহরমপুর লালগোলা কৃষ্ণনগব—সবত্র ছড়িয়ে পড়ে উদ্ধারণপুরের চিতাভস্ম । নামে মাম্বধের মাথায়, নামে ক্ষেত-খামারের বৃকে, নামে সকলের তৃষ্ণার জলের আধার দৌঘি সরোবরে । মিশে যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে । সবার কাছে চিতাভস্মের সাদর আমন্ত্রণ পৌঁছে দেয় উদ্ধারণপুরের বাতাস । কেউ টের পায় না কবে কখন উদ্ধারণপুরের অমোঘ আহ্বান এসে পৌঁছে গেল হৃৎপিণ্ডের মধ্যে । সেই নির্মম পরোয়ানা অগ্রাহ্য করার শক্তি নেই কারও । ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সবাই গুটি গুটি এগিয়ে আসতে থাকে উদ্ধারণপুরের দিকে ।

উদ্ধারণপুরের বিসৃদ্ধ হৃৎক গায়ে মেখে শোখান সমীরণ দিক্‌দিগন্তে উড়ে চলে যায় । রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ নাকি মিশে থাকে হাড় মাংস রক্ত মজ্জা মেদের সঙ্গে । যতক্ষণ না পেণ্ডলোকে চিতায় তুলে জ্বাল দিতে আরম্ভ করা হয় ততক্ষণ গন্ধের হৃদিস মেলে না । উৎকৃষ্ট অগ্নিশুদ্ধ মানবীয় স্বেদাসে স্বেদাসিত হয়ে উদ্ধারণপুরের মন্ত মারুত ভস্মলিপি হাতে নিমন্ত্রণ করতে রওয়ানা হয় । সেই লিপির মাথায় ভস্মাকরেই লেখা থাকে—

ধর্মার্থমমায়ুক্তং লোভমোহসমাবৃতম ।

দহেয়ং সর্বগাত্ৰাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু ।

দিব্যালোকের যাত্রীরা একে একে এসে নামছে । ছেলে মেয়ে বড়ো বুড়ী যুবক যুবতী, সব জাতের সব বয়সের যাত্রী এসে পৌঁছচ্ছে । পারবাটে বেজায় ভিড়, গান-গল্প হৈ-হজ্ঞা ফটিনটির ফোয়ারা ছুটছে । স্মৃতির ঝড় বইছে তাদের

মধ্যে, যারা যাজ্ঞীদের ঘাটে পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। প্রকৃত যাজ্ঞীরা কাঁথা-মাদুর-জড়ানো পড়ে রয়েছে এখানে ওখানে। কাঁথা মাদুরের ভেতর থেকেট দিবাচক্ষে দেখছে এদের হ্যাংলাপনা। হৃদ বেহায়াব মত কেমন করে চাটছে এর; জীবনের রস, তা দেখে ওদের হিমশীতল শরীর শিউবে উঠছে। রসটুকু নিঃশেষে শুকিয়ে যাবে যেদিন, সেদিন এরাও হবে দিব্যালোকেব যাজ্ঞী, সেদিন এরাও বাঁশে ঝুলতে ঝুলতে যাজ্ঞী সেজে আসবে এখানে।

উদ্ধারণপুরের পূর্বসীমানা থেকে দিব্যালোকেব দিব্যপথেব শুক। পশ্চিমের বড় সড়কেব ওপর বসে গালে হাত দিয়ে জীবন কাঁদে। দিব্যপথে পা দেবার অধিকার নেই জীবনের। তাই খস্তা খোপা সিধু কববেজের দাওয়াইখানার সামনে জীবন-মচ্ছব দিচ্ছে। জীবনের মুখে হাসি ফোটাতে এই তাব বাসনা। হাবমোনিয়ম তবলার সঙ্গে নাবীনগ্রে ভেসে আসছে ওখান থেকে—

“শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান কবেছি হৃদি।”

ঢাকা নগর গণা মিলিয়ে মুটকি স্ববাসী মডাকান্না জুড়েছে আমার গদির সামনে বসে। তাব রোজগনে মেঘে লক্ষ্মাকে ফুলে নিয়ে গেছে খস্তা। খস্তা উদ্ধারণপুরে এলেই স্ববাসী আমাব কাছে মডাকান্না কাঁদতে বসে। আমি লুকুম করলেই নাকি খস্তা তাব মেথেকে ফিবিষে দিয়ে যাবে। তা কাঁদবে বৈকি স্ববাসী। মডার চুলের পাঁচ গুণা শুছি দিয়ে ছুকুড়ি বড়-বেবড়ের কাঁটা আব ক্লিপ গুঁজে মস্ত খোঁপা বেঁধে মুখে খড়ি আলতা মেখে সাবা দিনশাত পথে বসে থাকলেও কেউ ফিরে তাকায় না স্ববাসীব দিকে। জীবনের রস ফিবিষে এসেছে তাব। এই বয়সের সম্বল ছিল মেয়ে। খস্তা ওর বাড়া-ভাতে ছাই দিয়েছে। খস্তা শাপমন্দ দিয়ে মাথা খুঁড়ে স্ববাসী নিজের মনকে সাঙনা দিচ্ছে

একটা ভাঙা মাটির ভাঁড় পড়েছিল সামনে। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে তাতে ছটাকখানেক মদ ঢেলে আবাব মাটিতে নামিয়ে দিলাম। মরবার ভয়ে স্ববাসী আমার গদি ছোঁয় না, কাজেই আমাব হাত থেকে ও নেবে না কিছুই।

বললাম—“নে, ওটুকু গলায় ঢেলে দে বেটা। আর কেঁদে কি করবি বল। মেয়ে ত তোকে টাকা পাঠাচ্ছে মাসে মাসে খস্তার হাত দিয়ে। খামকা কাঁদিস নি আর, টের পেলে খস্তা মেরে ধামসে দেবে গা-গতর।”

ভাঁড়টা আলগোছে তুলে নেয় স্ববাসী। ব হাতে নাক টিপে ধরে পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে বিরাট হাঁ করে তরল পদার্থটুকু গলার মধ্যে ঢেলে দেয়। দিয়ে বিদঘুটে মুখ করে চোখ বুজে থুতু ফেলতে থাকে।

ওধারে গঙ্গার কিনারায় একটা চিতার পাশে হাতাহাতি হবার উপক্রম । বাছাই বাছাই সন্ধ্যাধনের ভুবড়ি ছুটছে ওখানে । তডপানোর চোটে উজ্জ্বলপূরের ষাট সরগরম । কিছুক্ষণ পরে রামহরি আর পঙ্কজের একজনকে ধরে নিয়ে এল । পিছন পিছন এল হিতলাল মোডল, ছুবড়ি বায়েন, কঙ্কালি ঠাকুর, আরও অনেকে । যাকে ধরে নিয়ে এল তার বেশ বয়স হয়েছে । নাহুলহুল চেহারা, গলায় একগোছা ময়লা পৈতে, নাভির নিচে খাটো নোংরা ধান পরা, ছুঁ-চোখ-বোজা লোকটির দুই কশ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে । টানতে টানতে নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে লোকটিকে । ওবা ছেড়ে দিতেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটির ওপর । পড়ে মাটিতে মুখ রগড়ে গৌ গৌ কবতে লাগল ।

রগড় দেখবাব আশায় যে যেখানে ছিল ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়ালে । হিতলাল মোডল মাটিতে পড়ে গড় হয়ে উঠে নাকে কানে হাত দিয়ে নিবেদন করলে তার আরজি ।

“একটা বিচার কবে দেন বাবা । এই ব্যাটা বিট্কেল বাম্‌না আমাদের হাড় জালিয়ে থেলে । দু’হুবাব এহ অলপ্পেয়ে ঠাকুর আমাদের ফাঁকি দিয়েছে । এবারও সেই মতলব করেছে ব্যাটা । এবার আর ওকে আমরা ছাড়ছি না, টাকা না পেলে ওকেও ওর ছেলের সঙ্গে চিতৈয় তুলে দোব ।”

কঙ্কালি ঠাকুর হিতলালের হাত জড়িয়ে ধরলে ।

“খামকা আর খিট্কেল কোর না মোডল । কাজ শেষ করে চল যবে ফিরে যাই । বাড়ী গিয়ে দশ মণ ধান দোব আমি তোমায় ।”

এক হেঁচকায় হাত টেনে নিয়ে হিতলাল গর্জে উঠল—“খাম ঠাকুর, ম্যালা ফ্যাচ, ফ্যাচ, করতে এস না বলছি । ঢের জানা আছে তোমার মুরাদ । দশ মণ ধান কখনও চোখে দেখেছ এক সঙ্গে ?”

ইতিমধ্যে ষটে গেল মহা অশাস্ত্রাঘ ব্যাপার । যে ব্যক্তিটি উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে মুখ রগড়াচ্ছিল সে গড়াতে গড়াতে গিয়ে হিতলালের পা জড়িয়ে ধরেছে । আর যাবে কোথা—তিড়িং করে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল মোডল । ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনলে একথানা তিন হাত লম্বা পোড়া কাঠ । সেখানা মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে লাফাতে লাগল ।

“খুন করে ফেল ! আজ বাম্‌নাদের । মা-গঙ্গা লাকী করে আমার পা ধরলে শালা বাম্‌না, আমার চোন্দ পুরুষকে নরকে ভোবালে । আজ আর ওদের আমি জ্যাস্ত ফিরতে দিচ্ছি না ষাট থেকে—”

পিছন থেকে রামহরি ছিনিয়ে নিলে কাঠখানা, পঙ্ক জড়িয়ে ধরলে ওর

কোমর। যা মুখে এল তাই বলে চোঁচাতে লাগল হিতলাল। দেখাদেখি ছুকড়ি বায়েনও গরম হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে থপ করে কঙ্কালি ঠাকুরের কাপড় ধরে ফেললে।

“টাকা না পেলে আজ এক শালাকেও ফিরতে দিচ্ছি না এখান থেকে।”

একটা বছর আষ্টেকের ছেলে এক পাশে দাঁড়িয়ে ডুকরে কঁদে উঠল। এক মাথা রুক্ষ চুল, কোমরে একফালি ত্রাকডা জড়ানে, রোগা ভিগভিগে ছেলেটির কচি মুখখানিতে, ছ’চোখের অসহায় দৃষ্টিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, নিদারুণ আতঙ্ক আর অবশাদ। তার অবস্থা দেখে মনে হ’ল বহুক্ষণ বোধ হয় এক কৌটা জলও গলা দিয়ে নামে নি। ছ’পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কাদামাটি মাখা, পা দুটো বেশ ফুলেও উঠেছে। বুঝতে বাকি রইল না যে ভাগ্যদেবতা একটু মজার খেলা খেলছেন ছেলেটির সঙ্গে।

একটা খালি বোতলের গলা ধরে ঝাঁ করে ছুঁড়ে মারলাম আকাশের দিকে। বোতলটা ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল গঙ্গার জলে। আর একটা হাতে তুলে ঝাঁপ করে সবাই বসে পড়ল। আর দু’শব্দটি নেই কারও মুখে।

হুকার দিয়ে উঠলাম—“কিরে, কি ভেবেছিস সব?”

কারও মুখে রা নেই।

দাঁত কিড়িমিড়ি করে দাঁড়িয়ে উঠলাম গদির ওপর। কোথা থেকে শুষ্ক নিশ্বস্ত ছুটে এল বিকট ঘেউ ঘেউ করে। যারা রগড় দেখতে জুটেছিল তারা উদ্‌ব্বাসে দৌড় দিলে। সামনে বসে রইল হিতলাল, ছুকড়ি, কঙ্কালি। বড়ো লোকটাও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ছেলেটা এসে জাপটে ধরলে হিতলালকে। হিতলাল ছ’গানে তাব মাথাটা নিজের বুকে ঢেপে ধরলে। হাবি পঙ্কজের চিংকার করে উঠল—“জয় বাবা কালটেরব, জয় বাবা পাগলা ভোল।”

কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। তারপর আবার হুকার ছাড়লাম একটা।

“জয় মা শ্রীশানচণ্ডী, আজ তুই রক্ত খাবি মা রক্তখাকী!”

হিতলালের বুকের ভেতর ছেলেটা ডুকরে কঁদে উঠল।

সেই এক সুরে বলে গেলাম—“পঙ্কা, ছুটে যা। ডেকে আন খতাকে, ছুকড়ি টাকা আনতে বলিস সঙ্গে!”

পঙ্কা ছুটল।

“ছুকড়ে, তোর বড্ড বাড় হয়েছে, আমার শা- বাম্বনের গায়ে হাত দিলি।”

ছুকড়ি নিজের হাঁটুতে মুখ গুঁজে কান্না জুড়ে দিলে।

“মোড়লের পো—ঐ ছেলেটা কার?”

হিতলাল কোনও রকমে উচ্চারণ করলে—“দোহাই বাবা, এই ছেলেটার ওপর নজর দিও না বাবা। আমাদের এই ঠাকুরের বংশে বাতি দিতে আর কেউ নেই গো। গত দু’সনে আমরা ছ’বার যাওয়া আসা করলাম ঠাকুরের জন্তে। ঠাকুরের ঘর ভরা ছেলে-বউ নাতি-নাতনী সব উজোড হয়ে গেল। আজ নিয়ে এসেছি ঠাকুরের বড় ব্যাটাকে। এই একরক্মি ছেলেটাকে রেখে সে-ও চোখ বুজলে। দু’সন ম্যালোরিতে ভুগছিল, শেষে রক্ত—”

আবার হুকার দিয়ে উঠলাম—“চোপবাও ব্যাটা চামার। তা টাকা না বুঝে পেয়ে তোরা বইতে গেলি কেন ঠাকুরের মড়া? গাঁয়ের বাইরে শ্মশান ছিল না?”

এবার হিতলালও ক্রোধে উঠল।

“কি করি বলুন গোসাঁই বাবা! হাড় মাস জালিয়ে খেলে ঐ নচ্ছার বামনা। আমরা যত ওকে বোঝাই যে, ঠাকুর, তোমার ঘরে এক বেলার খাবার নেই, তোমার কেন শখ হয় সকলকে গঙ্গায় দেবাব, ততই ঠাকুর হাতে পায়ে ধরতে আসে। এই করে দু’দুবার ফাঁকি দিয়েছে। এবার এই নাতির মাথাঘ হাত দিয়ে দিবা করলে যে ঘাটে পৌঁছেই টাকা মিটিয়ে দেবে। কে ওর বডলোক যজ্ঞমান আছে সে নাকি টাকা নিয়ে ঘাটে আসবে।”

আবার হুকার দিয়ে উঠলাম—“চোপবাও ব্যাটা গো-হাড়গেল। এট নে মহাপ্রসাদ। গিলগে যা ওধারে বসে। এত ছোট নজর তোরা, তোরা না শ্মশান-কালীর সম্ভান। মায়েব দযায় কিসের অভাব তোদের স্তনি? গাঁয়েব বামুন, গঙ্গায় দিয়ে গেলি, একটা সং কন্ম করলি। এর ফল দেবে তোদের মা শ্মশানকালী। সে বেটীর কি চোখ নেই নাকি মনে করেছিস? তোদের গাঁয়ের বামুন, তোদের আপনার লোক, ফেলবি কোথায় তাই স্তনি?”

হিতলাল দু’হাত জোড করে নিলে বোতলটা। কঙ্কালিকে বললে—“খুড়ো। এইবার এই বাচ্চা ঠাকুরের মুখে কিছু দাও বাপু। এও কি জল না খেয়ে মরবে নাকি? বাপের মুখে আগুন দেবার পর ত আজ আর এক টোক জলও খেতে পাবে না।”

খস্তা এসে দাঁড়ালো সামনে।

“হুকুম কর গোসাঁই, কোন্ শালাকে লম্বা করতে হবে।”

“হুকুর্ডি টাকা ফেলে দে খস্তা। বামুন ঘাটে এসে চিত্তের উঠছে না। মোড়লের পো, টাকা নিয়ে এখানকার কাজকন্ম করে গাঁয়ে ফিরে তোমাদের ঠাকুরকে একটু দেখো। খস্তা, ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়া। ওকে নতুন কাপড় চাদর পরিয়ে দিস যাবার সময়।”

রামহরি আর পঙ্ক। আর একবার চিৎকার করে উঠল।
 “জয় মা অগ্নিকালো, জয় বাবা কান্টেভরব।”

মানবজন্মের যজ্ঞবদীতে—স্বার্থত্বের সমিধ্ দিয়ে অয়ং বিশ্বদেব অগ্ন্যাদান করেন ।

ইতঃপূৰ্বে প্ৰাণবুদ্ধিদেৱীৰ্মা ধাৰণতৌ জাগ্ৰৎ স্বপ্ন সুষুপ্তাবস্থাষু মনসা বাচা বৰ্মণা
হস্তাভ্যাং পদ্মামুদরেণ শিল্প যং কুণ্ডং যদ্বক্ৰং যৎস্মৃত তৎসৰ্বং ব্ৰহ্মাৰ্পণং ভবতু স্বাহা,
মাং যদৌষধং সকলং সম্যক শ্ৰীমৎ শ্ৰীশানক্যাকাষ্টে সমৰ্পিণ্যমুং তৎসং ॥

কয়েক গুণ্ডা খোন খতানের আশ্রয় ছাপিয়ে হস্ত-কার উঠছে—বল হরি হরি বোল। কোন বড়মানুষ অমন মানে চুপা চড়ো আসছেন। ঐ চাপটুকু ছাড়া সব চালাকি বিদর্জন দিয়ে আসছেন। চালাকি পেঁড়ানো যায় না চুপায়।

বড় সড়ক থেকে নেমে আসছে শোকযাত্রা। বহু লোক অতি সাবধানে নামিয়ে আনছে একখানি চকচকে পালিশকরা খাট। খাটে বহুমুখ্য মশারি খাটানো। মশারির চাবধাবে ঝুঁছে ফুলের মালা। বড় বড় ধূতি নিয়ে নামছে কয়েকজন। ধূনা গুগুণ চন্দনকাঠের গন্ধে উদ্ধারণপুবেব মৃগন্ধ লঙ্কার মুখ লুণালো। শিখালগুলো উক খাসে ছুটে পালালো, শকুনগুলো বহু উর্ধ্বে উঠে পাখা মেলে চক্কর দিতে লাগল আকাশের গায়ে। আর গদির পিছনে লুাবয়ে পড়ল শুভ নিশুভ। শ্মশানের মন্ডলখানে সন্তর্পণে নামানো হল খাটখানা। সঙ্গে সঙ্গে চরমে শিয়ে পৌছল গিজ্জতা গিজ্জাং। খোল খতাল খেই খেই করে নাচতে লাগল

খাট ঘিরে। বল হরি হরি বোল—মুহুমুহুঃ চিংকারের চোটে কানের পর্দা কাটবার উপক্রম। যার নাম ধুমশোক, প্রিয়জনবিরোগসজ্জত সন্তাপের মহাসমারোহ কাণ্ড।

তৈরী হয়ে নিলাম। ঢকঢক করে সামনের বোতলটা খালি করে ফেললাম। মাথার মাঝখানে একটা মস্ত বিঁড়ে পাকালাম জটা জটা চুলগুলো দিয়ে। পাকিয়ে শিরদাঁড়া টান করে হাঁট মুড়ে গদির মাঝখানে বসে রইলাম।

কেউ না কেউ আসবেই এখানে। নয়ত ওদের এত জাঁকজমক সব বার্থ হয়ে যাবে যে। উদ্ধারণপূর্বের ঘাটে জাঁকজমকের সাক্ষী শেয়াল শকুন রামহরি পঙ্ক। আর আমি। শেয়াল শকুন জাঁকজমকের রসাস্বাদনে অক্ষম। বরং মড়াটা না পুড়িয়ে ঝলসে ফেলে রেখে গেলে ওরা বাহবা দিত! রামহরি পঙ্ক ভাবছে খাট বিছানা বেচে কত টাকা মারবে। একমাত্র আমিই ওদের ভরসা। যুগযুগান্ত মন্ডার বিছানায় বসে গাইতে থাকব ওদের কীতিকাহিনী। স্মৃতির আগ্নেয়গিরি আমাকে তাতে রাখতেই হবে।

হঠাৎ ঝপ করে থেমে গেল খোল খন্তালের আওয়াজ। খেই খেই কবে যারা নাচছিল তারা দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। কতক মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে, বাকি সকলে পড়ি-ত-মরি করে উঠে গেল বড় মড়কের ওপর। কয়েক বোঝা মালমশলা, কয়েকটা বড় বড় হাঁড়ি, ডেক কড়াই আর মশারি ঢাকা খাটখানা পড়ে রইল আশানের মাঝখানে। জন পাঁচ-ছয় লোক খাটের দিকে এগর রেখে পিছু হেঁটে আসতে লাগল আমার গদির দিকে। একা রামহরি ডোম অনেকটা তফাত দিয়ে খাটখানার চারপাশে ঘুরতে লাগল আর মাঝে মাঝে এক এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে কি সব বিড় বিড় করে বলতে বলতে মশাবিব গারে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে আছড়ে পড়ল পঙ্ক।

“গোসাঁই বাবা, বাঁচাও গো, রক্ষা কর আমাদের।”

পিছু হেঁটে আসছিল যারা তারা ঘুরে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সকলে চেয়ে “ইল আমার দিকে। সজোরে ধমক দিলাম পঙ্ককে।

“উঠে দাঁড়া হারামজাদা। স্ত্রাকামি রাখ। কি হয়েছে কি? অমন করে আতকে মরছিস কেন? হল কি তোর ছেরান্দ?”

ধীর সংযত কণ্ঠে জবাব এল—“ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি হয়েছে, খাটের ওপর শব পাশ ফিরেছে। আমরা সবাই দেখেছি।”

বক্তার দিকে চাইলাম। অতি স্ত্রী চেহারা। রঙ রূপ চোখের চাহনি বর্ষস্বর পরিচয় দিচ্ছে যে ইনিই হজুর। খালি পা, গায়ে একখানি গরদের চাদর জড়ানো,

লরীয়ে অনাবশ্যক মেদ নেই। দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়—এই মানুষটি হুকুম করতে জন্মগ্রহণ করেছে, হুকুম তামিল করতে নয়।

কয়েক মুহূর্ত তিনি এবং আমি পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। তাঁর পিছন থেকে কে একজন ভীতি-বিহ্বল খোশামুদে গলায় বলে উঠল—“একটিবার উঠুন বাবা রূপা করে। আমাদের হজুরের—”

বক্তার দিকে মুখ ফেরালেন হজুর। কথা আটকে গেল তাব গলায়।

আমার দিকে ফিরে সামান্য একটু হাসিবাব চেষ্ঠা পেলেন হজুর। তারপর সহজ গলায় বললেন—“অবশ্য আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমাদেরই অন্তায় হবে—”

আর বাড়তে দিলাম না তাঁব বক্তব্য। ওড়াক করে লাফিয়ে পড়লাম গদি থেকে। বললাম—“দাঁড়িয়ে থাকুন এখানেই। এক পা নড়বেন না।” বলতে বলতে ছুটে গেলাম খাটের পাশে।

আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল রামহরি। বন্ধ হন তাঁব মস্ত পড়া। হাত তুলে ইশারা করলাম তাকে গদিব কাঁচে যেন। বিনা গজবে বলো মুঠো ফেলে সে সরে গেল।

তখন মশারিবি ভেতর নজব করে দেখলাম।

সাতাই ত! দিবা ওপাশ কিরে শুয়ে আছে মড়া। গলা থেকে পা পর্যন্ত ফুল আর ফুলের মালায় ঢাকা। শুধু মাথাব পিছনটা দেখা যাচ্ছে। মেয়ে কি পুরুষ তা বোঝা গেল না।

খাটের ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মশারিবি বাইবে থেকে দেখে কিছুই বোঝা গেল না। মশারিবি তুলে ভেতবে মাখা গলিযে দেখলাম। একটি বুদ্ধা খাটো করে চুল কাটা, কপালময় খেওচন্দন লেপ্টানো, বহুমূল্য গবদের চাদর পা দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন। ছোটখাটো শুকনো মাছনটি, বোধ হয় এমন কিছু বোগভোগও করেন নি।

তাঁর সামনে থেকে ফুলগুলো সরিয়ে ফেললাম। একটি ছোট পাশবালিশ। কিন্তু এ কি। পাশবালিশটি অনেকটা নেমে গেছে। বালিশের নিচে হয়েছে বেশ একটি ছোটখাটো গর্ত। তাড়াতাড়ি খাটের তলায় হাত দিয়ে দেখলাম। ঠিক সেখানেই ব্যাটমটা গেছে সরে।

তৎক্ষণাৎ মালুম হল ব্যাপারটা। ফুল মালা দিয়ে পাশবালিশটা তাড়াতাড়ি ঢেকে দিয়ে ছ’হাতে শুধু মৃতদেহটা তুলে নিলাম। তারপর মশারিবি ভেতব থেকে বেরিয়ে ঘুরে এসে দাঁড়ালাম খাটের এপাশে।

আমার গদির কাছ থেকে কেউ এক পা নড়ে নি। সেখান থেকে চক্ষু

বিস্ফারিত করে চেয়ে আছে আমার দিকে। দেখে মনে হয় যেন পাথরের প্রতিমূর্তি, শ্বাস প্রশ্বাসও বইছে না কারও।

হাঁকাব দিলাম—“রামহরে পক্ষা এগিয়ে আয় এধারে। এখনই খুলে ফেল খাট বিছানা সব। খুলে সরিয়ে ফেল এখান থেকে। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন আপনারা। এক পা এগোবেন না।”

রামহরি পক্ষা দৌড়ে এল। মড়া নিয়ে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম ঠাঁদের সামনে। একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখে হাটু গেড়ে বসে শুইয়ে দিলাম মড়াটা মাটির ওপর। শুইয়ে দিয়ে মড়ার গায়ে হাত রেখে বললাম।

“আমুন একজন, ছুঁয়ে বসে থাকুন এঁকে।”

কেউ এগোয় না। হুজুর একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। দেখে স্বয়ং এগিয়ে এসে মাটির ওপর বসে পড়লেন মড়ার পায়ের কাছে। ডান হাতখানি রাখলেন মড়ার পায়ের ওপর।

জিজ্ঞাসা করলাম—“কে ইনি?”

“আমার মা।”

“জানেন না, শ্মশানে শবদেহ নামিয়ে ছুঁয়ে থাকতে হয়?”

উত্তর না দিয়ে নত চোখে মায়ের পায়ের দিকে চেয়ে বইলেন।

সহসা হুজুরের সঙ্গীরা চাক্ষা হয়ে উঠলেন। হুজুর মাটির ওপর বসে পড়েছেন এ দৃশ্য তাঁরা সহ্য করেন কেমন করে। সকলে একসঙ্গে এগিয়ে এসে বসে পড়লেন হুজুরের পাশে। একজন বলে উঠলেন—“আহা হা, তুমি এখানে বসে পড়লে কেন বাবাজী? আমরা থাকতে তুমি কেন—”

তার দিকে চেয়ে তার মুখ বন্ধ কবলেন হুজুর। সংঘত কণ্ঠে হুকুম দিলেন—“এবার ডাকুন সকলকে, এখন ত আব কোনও ভয় নেই।”

ওধারে চেয়ে দেখলাম, রামহরি আর পক্ষেশ্বর মশারি খুলে বিছানা নামিয়ে খাট খুলতে শুরু করেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে গিয়ে বসলাম গদির ওপর চেপে।

ছুটতে ছুটতে এল খস্টা ঘোষ।

“কি হল? হয়েছে কি গোঙ্গাই?”

“তোর কেন মাথা-বাথা তা জানবার? নে গলাটা ভেজা এবার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে এধারে।”

হুজুর হুকুম দিলেন একজনকে—“খুড়ো, এনে দাঁও ওকে দুটো বোতল। বসে থেকে না হাঁ বরে।”

বকের মত লম্বা গলা আর লম্বা ঠ্যাং একটা বাকচোয়ো লোক লাক্ষাতে

লাফাতে ছুটল যেখানে মোটোবাট পড়ে আছে। সেখান থেকে তার খ্যানখেনে গলা শোনা গেল।

“কোথায় গেল সব আবাসীর ব্যাটারা? রাখলে কোথায় মালের বাস্তুটা ছাই!”

ততক্ষণে আবার হুডমুড কবে সকলে নামতে শুরু করেছে বড় মডক থেকে। বল হরি হবি বোল দিয়ে ফাটিয়ে ফেললে উদ্ধাবণপুবেব আকাশ।

আসল স্কটল্যান্ডেব পানীয় ছু বোতল এসে নামল গন্ধিব সামনে।

“খোল এটা খন্তা। মা বেটা অনেকক্ষণ গেলে নি কিছু। জয় মা ভীমা ভবানী।”

দূর থেকে পঙ্কা রামহ ব চিংকাব কবে উঠল—“জয় বাবা আশান-ভৈবব—জয় বাবা সাঁই গোসাঁই।”

অনেকক্ষণ ধরে অনেককর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল জয়ধ্বনি। বোতলে মুখ লাগিয়ে অর্ধেকটা শেষ করে ফেললাম।

২৭.১.১০

স্কটল্যান্ডেব খেল ভাণ্ড-বাজির বজ্রবৈজ্রযন্তা উডছে উদ্ধাবণপুরের ঘাটে ভৌকব ব্যাপার ভূতুড়ে গুণ্ড সব। জনস্তু চতাব গুপ মড়া উঠে বসে খাচের গুপ মড়া পাশ ফিরে শোয়, উদ্ধাবণপুবেব খাচের খানাচে বানাচে নরকদ্বার খেল বেহ বনে নাচে কী যে বড় নিম গাছটা দাড়িয়ে বসেছে আশানে ঢোকবাব পনের খুণ্ডে, কবাব বন মড়া ই গাছচাব ভাল ধবে দোল খেয়েছে। একবার একটা মড়া ত উঠেই বসে বহল গাছে পাঁচ দিন পাঁচ রাত। লালগোলা থেকে লাল ফকির এসে বুণে পড়া দিয়ে সে মড়া নামায়। এ সময় স্যাপার ঘটত তখনবাব দিনে, যখন শুই ‘এল’ লাইন খোলে নি। লোকে ‘এল’ গা চপে ফল কবে গয়া গিয়ে পিণ্ডাদে পাবত না। স্বা মোডল দেখে সে সব কাণ্ড। এখনও জলজ্যাস্ত বেঁচে বসেছে মোডল। বিশাস না হয়, ডিক্সাসা কব গয়ে তাকে।

অতন মোডল বলবে, ভাড দেওয়া স্বাভ তুড়ে দেওয়া মধ্য এতটুকু তফাত নেই বাপ। এইমাত্র যে গোবেচাচার নাবেব ভগায় ভুড় দিয়ে একবাবে উড়িয়ে দিলে তাকে, পবমুহুর্তেই সে মবে গিয়ে আবাব জ্যাস্ত হয়ে গোমায় ভুড়ে দিতে পারে। একেবাবে চাক্ষুব সব দেখা কিনা অতন মোডলের, কাজেই মোডল যা বলে সে সব কথা একেবাবে ফেলনা নয়।

খন্তাও বললে সেই কথা।

বললে—“ওই রাঙা মূলো গোবর গণেশটাকে চিনে রাখ গোমাই। ওই মিটিমিটে শয়তান একবার তুড়ি দিতে চেয়েছিল চরণদাস বাবাজীর নাকের ভগায়। তখন আমি তুড়েছিলাম ব্যাটা ছুঁচোকে। আবগারি দারোগা ছ’টি হাজার গুণে নিয়ে তবে ওর ঘাড় থেকে হাত তুলে নিয়েছিল। হারামজাদা রক্ত-শোষা জোঁক, মাস্কাতা-আমলের তৈরী গাঁ-জোড়া ইটের পাঁজাব ভেতর মুখ লুকিয়ে থাকে, দিন রাত ফরাসে গা গড়ায় আব ছুঁচোর মতলব ভাঁজে। ওই মাকাল ফলেব জন্তো লোকে ঝি-বউ নিয়ে শাস্তিতে বাস করতে পারে না গাঁয়ে। ইচ্ছে করছে, দি ব্যাটাকে ওব মায়ের সঙ্গে চিতৈয় তুলে। মা-ব্যাটা দু’জনে গোমায় যাক একসঙ্গে। লোকের হাড় জুড়োক।”

খস্তার কপালের ওপর কয়েকটা নীল শির দাঁড়িয়ে উঠেছে, নাকের গর্ত দুটো আরও মোটা দেখাচ্ছে, দাঁতগুলো আবও অনেকটা বেরিয়ে পড়েছে। যেন একটা ক্ষ্যাপা ঘোড়া, ঐ দাঁত দিয়ে দেবে এক কামড় আমার ঘাড়ে।

বললাম—“মালটা কিন্তু বড় খাসা এনেছে বে। খোল দেখি আর একটা বোতল, টেনে নি বাকৌটুক।”

থপ্ করে বোতলটা তুলে নিয়ে মাঝে আছাড় খস্তা ঘোষ। বোতলটা চুরমাং হয়ে গেল, মালটুকু শুধে নিলে উদ্ধারণপুরের স্ত্রীলোক তম্ব। আমরা দিকে এক নজর রক্তচক্ষু ফেলে চুমদাম করে চলে গেল খস্তা। বিশুদ্ধ বিনিত্য মালের স্বর্গীয় স্বাসে উদ্ধারণপুরের বাতাস মাতাল হয়ে উঠল।

ভারি দমে গেল মনটা। লোকটা না হয় মাকাল ফল, বাঙা মূলো, ছুঁচো শয়তান, তা’বলে তার দেওয়া বোতলটা কি এমন দোস করলে যে আছাড় মাংতে হবে মাটির ওপর। লোকটার ভেতর যাই থাকুক, বোতলের ভেতরে ত খাটি মাল ছিল। নাঃ, খস্তাটা চিরকালই গোয়ারগোবিন্দ বয়ে গেল।

নীলাঞ্চলের ঘোমটা-ঢাকা নীলাঞ্জনা সন্ধ্যা সেদিন এসে পৌঁছল না উদ্ধারণপুরের ঘাটে। বাসকসজ্জায় সজ্জিতা রাত্রি গঙ্গার ওপারে দাঁড়িয়ে রাগে হতাশায় ফোঁপাতে লাগল। এত জোড়া চোখের সামনে দিয়ে এতগুলো অত্যাঙ্ক আলোর চোখ-খাঁধানো জলুসের মাঝখানে কি করে অভিসারে আসে বেটারা চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে! এল না স্থিতি, জেগে রইল উদ্ধারণপুরের আশান, জেগে রইল গঙ্গা, আর একান্ত নির্দয় ক্ষমাহীন সত্যের মত তন্ত্রাহীন চোখে বসে রইলাম আমি—আমার সেই তিন হাত পুরু গদির ওপর চেপে। মুন্সুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুরের জননী চন্দনকাঠের চিতার ওপর চড়ে মহাসম্মানের সঙ্গে পুডতে লাগলেন। যে

বহুমূল্য গরদের চাদরখানি চাপা দিয়ে এসেছিলেন তিনি, সেখানি তখন বিছানো হয়েছে আমার গদির ওপর। চাপা ফুলের গন্ধ বার হচ্ছে তা থেকে, আর ওধারে চন্দন কাঠ পোড়ার গন্ধে উদ্ধারণপুত্রের বাতাস ঘুলিয়ে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত সবই নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল। বড় বড় গামলায় এসেছিল রসগোল্লা, ঝোড়ায় ঝোড়ায় এসেছিল লুচি আর বাক্স ভর্তি এসেছিল বিলিটী মদ। সব গেল ফুরিয়ে, চিতা নিভে এল, আরও গোটা দুই বোতল দিযেছিলেন ঠুঁবা আমানে, তাতে আর কিছু বইল না। একশ কলসী জল দিয়ে ধোয়া হল চিতা। দুধের মত সাদা কবে ধুও হবে কিনা, নাবণ কুমার বাতাহুরের মা আবার যদি জন্মান কোথাও হবে যেন রাজধানীর রূপ নিয়েই জন্মান।

পানিমুখী শুকনো বিদায় নিয়ে উদ্ধারণপুত্রের আকাশ থেকে। কাদতে কাদতে বিদায় নিয়ে। আবার পর্দার আড়ালে শোজ যে থেলে দেখানো হয় উদ্ধারণপুত্র ঘায়ে, মোভাগ্যবতী শুকনো ড্যানড্যান কবে চেয়ে থাকে তার দিকে। এটো তাব একমাত্র সাক্ষী। এক বড় নিবাস হলো হয়েছে বড় লোবের মায়ের জন্তে, সেদিন অসংখ্য শোনও কিছুই দেখতে পেল না শুকনো। তাব বদলে আলো গান হৈ হলায় বেচাবাব মেজাজ বিগড়ে গেছে।

সমকে উল্লাস।

বোথায় পালিয়ে গেল এক গাঙা দিলিত বোলনের মহামহিম মর্ষাদ। কান পেতে শুনে লাগলাম—

“পাডায় পাডায় ঘুরিয়া বেডাচ

পাডাব লোকে মন্দ কয়।

ও সে পবেব মন্দ পুষ্প-চন্দন

অলঙ্কার পরেছি গায়।”

নেমে আসছে বড় সড়ক থেকে। একতারা আর খজনা বাজছে। আবার শোনা গেল নাবাকর্ষ—

“গৌব-প্রেমে হটয়াছি পাগল

ঔষধে আর মানে না।

চল সজনী যাইগো নদীয়ায়।”

তারপর নারীপুরুষ বৈত-কর্ষ—

“ও সে গৌবাক্স ভুজ্জ হয়ে দংশিয়াছে আমার গায়।”

কাছে এসে পড়েছে। খালি বোতল কটা লুকিয়ে ফেলে কুমার বাহাদুরের মা'র গায়ের গরদখানা গদি থেকে তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বেশ ভাবিযুক্ত হয়ে বসসাম।

এসে পড়ল হু'জনে আমার সামনে। মাথা দু'লিখে নাচতে লাগল চরণদাস —

“ও সে গৌবান্ধ ভূজঙ্গ হখে দংশিয়াছে আমার গায়।”

হু' চোখ বোজা নিশাই হেনেহাল ঘুবেতে লাগল তাব চারিদিকে —

“ও সে পবের মন্দ পুষ্প চন্দন অলঙ্কার পরেছি গায়।”

উদ্ধারণপুংবের আলো।

আলো আঁকে আলপনা।

গঙ্গার কিনাবাঘ বাঁ কড়া পাকুড গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আলো-আধারি রঙের পৌচ টানে উদ্ধারণপুংবের খামখেয়ালী পটুয়া। সাদা হাড আর কালো কয়লার ওপর উদ্ভট সব বল্পনার কাবসাজি খেলিয়ে অ পন প্রিয়ার চোখে ধুলো দিতে চায়।

আলোব প্রিয়া ছায়া।

ছায়া আসে নাচতে নাচতে। নিৰ্বাঞ্জাট নিৰ্বিকাব নিৰিবোধী ধ্বংসের বকে চটুল চরণে নাচে রূপণী আলোক-প্রেমদী। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ওঠে এক-একটি স্বর্ণকমল। ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে যায় অবিনশ্বর ধ্বংসের শাস্তত স্বরূপ। রাশি রাশি প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমলের মাঝে আলো ছায়ায় লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে।

আলোক মিথুন নৃত্য দেখতে অনক্ষ্য এসে দাঁড়াষ অসংখ্য ছায়াদেহ। নৃত্যের ছন্দে দোলা ওঠে সেই সব বক্তমাংসবজ্র ছায়া দিয়ে গড়া কাষার বৃকে। তারাও নাচে, নাচে এক অশরীর অঞ্জলি নাচ। সেট নাচের ছল্লোড়ে রাশি রাশি স্বর্ণ কমলের মাঝে হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হয় একটি কত্তা।

আশা।

ছায়ার গর্ভে আলোকের ঔবসে তার জন্ম। ভূমিষ্ঠ হয়েই কবিষে কৈদে ওঠে সেই মেয়েটি। কচি কচি হাত দু'খানি বাড়িয়ে জননীকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

সভয়ে ঘুরে সরে যায় ছায়া। আপন গর্ভজাতা কত্তার নাগালের বাইরে পালায়। আলোর আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

কত্তার কুৎসিত কান্নায় শিউবে ওঠে আলো। স্থগাষ বিদ্বেষে কালোয় কালো

হয়ে যায় তার মুখ। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একটা অস্বাভাবিক ছাতি।

আলোর চোখের আঁচে শুকিয়ে যায় স্বর্ণকমলগুলি, তার সঙ্গে শুকিয়ে যায় তার কন্যাটিও। আলোক-কন্যা আশা ভস্মভূতা হয় আপন পিতার চোখের আগুনে। তার সঙ্গে অশ্লীলতাও ভস্ম হয়ে মিশে যায় উদ্ধাবণপুত্রের ভস্মের সঙ্গে।

হয় কি মোল আশা ভস্মমাংস ?

কিছুতে হয় না, হতে পারে না। উদ্ধাবণপুত্রের ভস্মের গর্ভে আশা আর অশ্লীলতা ষিকিষিকি পুড়ছে। ছাই চাপা আগুন—একটু হাওয়া পেলেই দাউদাউ কবে উলে ওঠে।

জলে ওঠে মানুষের দুই চক্ষে।

গঙ্গার কিনায়ায় ঝাঁকড়া পাকুড গাছটার শাখা জলছে দুটি চক্ষু। চক্ষু দুটিতে আশা আর অশ্লীলতা সগা ধরে নাচছে। শ্বেতবরগী সাপিনী দুটি। শ্বেতবরগী সাপিনীর চোখে চোখে বিস। চোখ দিয়ে ছোবলায় ওয়া। যাকে ছোবলায় ওয়া আর হুঁশ জ্ঞান থাকে না।

“নি ওই বোম্বো দু’চোখ বুজে নেচে নেচে ঘুরে আসে মন্দির বাজাচ্ছে।

“এ সে গৌরীঙ্গ ভূদেব হয়ে দংশন যাচ্ছে—”

কদম্ব দংশন নিশ্চয়ই। তবে বড় বড় নিশা মন্ত্রমুগ্ধা ফণিনীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠল। তার গুহ্মব গেল স্তব্ধ, হানের মন্দির গেল থেমে। একদিকে সে চেয়ে ওঠল আশা আর অশ্লীলতার দিকে। একেবারে অচৈতন্য বেহুশ।

বাবাজী তখনও চোখ বুজে মাথা দু’পাশে গাইছে—

“চল সজ্ঞানী যাহগো নন্দায়া।”

নোখাখ সজ্ঞানী! কে যায় নদীয়ায় তার সঙ্গে। সজ্ঞানীর সাড়া মেলে না। সাড়া না পেয়ে চোখ মেলে চাফলে বাবাজী।

পংমুহুর্তেই তার একতায়ায় শঙ্ক স্থানের ঝঙ্কার উঠল। নিশাটকের চতুর্দিকে নেচে নেচে ঘুরতে লাগল চবণদাস।

“মধুবনেতে কালো বাঘ এসেছে

বাধে যাসনে যাসনে।

কদম্বতলে সে যে থানা করেছে

বাধে যাসনে যাসনে।”

বাঘের বর্ণ কিন্তু কালো নয়। নিতাইয়ের মতই বর্ণ বাঘের। প্রায় কাঁচা হলুদের রঙ। স্তম্ভ কাছা গলায় দিয়েছে। পাতলা ফিনফিনে কাপড় আর চাদরে গায়ের রঙ চাপা পড়ে নি। অবিস্তৃত ভিজে কৌকড়ানো চুল কপাল ছাপিয়ে মুখের ওপর নেমেছে। ক্লান্তিতে বিরক্তিতে চেহারাটা হয়ে উঠেছে কঞ্চণ। মায়ের শোকে হৃদয়কে যেমন দেখানো উচিত ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে। ছোটলোকেরা শোকে বুক চাপড়ে কাঁদতে পারে, কিন্তু হৃদয় তা পারেন না। কাজেই তিনি হয়ে উঠেছেন আরও গম্ভীর, শোকের মহিমায় আরও মহিমাম্বিত হয়ে উঠেছেন হৃদয়।

ধীর পদে এগিয়ে এলেন তিনি। ওদের পাশ দিয়েই চলে এলেন। এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে।

চরণদাস তখনো গাইছে—

“পথে যেতে আছে ভয়,
একা যাওয়া ভাল নয়
রমণী-হরিণীধরা ফাঁদ পেতেছে,
রাধে যাসনে যাসনে।”

আর “যাসনে যাসনে।”

কে শোনে কার মানা!

ব্রহ্ম পদে এগিয়ে এল নিতাই। এসে দাঁড়ালো তাঁর পাশে। চোখ দুটি ছল-ছল করছে বোষ্টমীর, নাকের ডগাটি লাল হয়ে উঠেছে। রুদ্ধকণ্ঠে ডাক দিলে—
“কুমারবাবু!”

মুখ ঘুরিয়ে চাইলেন কুমার। অতি শূদ্রস্বরে বললেন—“হাঁ বোষ্টমী, মাকে আড় রেখে গেলাম এখানে।”

বোষ্টমীর গলা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

“কিন্তু রানী-মা যে বলেছিলেন, মা যে আমায় কথা দিয়েছিলেন—”

নত চোখে উত্তর দিলেন কুমার—“আমি জানি সে কথা। তোমায় নিয়ে বৃন্দাবনে যাবেন বলেছিলেন মা। যাও তোমরা বৃন্দাবনে, আমি খরচ দোব।”

নিতাইয়ের মাথা হুয়ে পড়েছে তখন।

শেষ পদটি গাইছে চরণদাস।

“ও বাঘের চোখে চোখে হলে দেখা
নিশ্চয়ই মরণ লেখা গো—”

আমার দিকে চেয়ে বললেন কুমার—“এবার আমাদের আদেশ দিন, আমরা

যাই, যদি কখনও প্রয়োজন হয়, অধমকে স্বরণ করবেন রূপা করে।”

মুখ তুলে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে নিতাই, “বউরানী! বউরানী! এখন—”

হাসলেন কুমার। উজ্জ্বলপূর্ণের ঘাটে যে বকম হাসি মানায়, সেই জাতের হাসি হাসলেন তিনি।

অবিশ্বাস দকম নিম্মুচ কণ্ঠে বেশ খেমে খেমে বললেন—“আব ত ফিববে না সে পোষ্টমী। আমার মন মানসকে পা দিয়ে ছুঁতেও যে তার ঘেরা কবে।”

বড় সড়কের গুলব একসঙ্গে বহু বগ্গ গজর্ন হবে উঠল

“বল হানি হানি বোল।”

অখাৎ সান্ধ্যপাঙ্কোরা গ্রাণেব হুজুর্নে ডাক দিচ্ছে।

জোড হাং আমায় প্রাণম হবে কুমার পা লাড়ালেন ছায়ায় মত নিতাই চলল এব পিছু পিছু।

চন্দ্রদাসের মস্তক তখন গেছে এক গার হাতে অামার সায়নে এসে দাঁড়িয়ে বললে—“দেবদাস দাং গোসাঁই বাকস ভেবতা ইয় হয়ে গেছে। ধোঁয়া দিয়ে না তাকালে চলছে না আর।”

তার মুখে দিকে তারিগে দেবদাস

শাবাজান ১৯ বর্ষ মস্তক নখের চামড় রড্ড বেশী শুকিয়ে গেছে যেন। কোনও কালেই চন্দ্রদাসের মৌল দাঁড় কিছু নেই, মনে হয় ঐ সমস্ত আপন কোনও দিন গজায়নি নি মন মুখের ওপর। বকম ও দেহের তুণ্যায় মুখখানি বেশ একটু মেঘেলি ধাঁচের বলে মনে হয়। গহনিশ গাঁজ টানাব বলে আখি দুটিও ঢুলুঢুলু হয়ে থাকে। মনে হয়, এ যেন সেই চোখ মেই মুখ নয়। হাতের কাঁধের বুক পিঠের সদাজাগ্রত পেশীগুলোও ফেন কেমন চিলে চিলে দেখাচ্ছে

হাতের এক গার আন কাঁধের নুলিদা একান্ত অবহেলায় মাটিতে ফেলে তাব পাশে বসে পড়ল চন্দ্রদাস। দেহটাক দিয়ে দেব খাড়া পাথরও আব শক্তি নেই যেন তার বসে পড়ে মাথা ঠেঁক কবে দু’হাং কপালটা সজোরে টিপে ধবে রইল।

গদীব তলায় খঁজতে খঁজতে এক চাপড়া গাঁজা বাব করলাম। চন্দ্রদাস চেয়েও দেখে না, মাথাও তোলে না। বাজেই নিজেই টিপতে লাগলাম গাঁজাটা।

উদ্ধারণপুরের আলো।

আলো জালায় আগুন।

যে আগুন চিতার বৃকে দাউ দাউ করে জ্বলে আর হাড় মাংসও খায়, এ আগুন সে আগুন নয়। চিতার আগুনের রঙ লাল, আলোর আগুনের রঙ সাদা। চিতার আগুনের দিকে চেয়ে থাকলে চোখ জালা করে না, আলোর আগুনে চোখ ঝলসে যায়। চিতার আগুনের বৃকভরা করুণা, একবার তার বৃকে আত্মসমর্পণ করলে নিঃশেষে শেষ কবে ছাড়ে। আলোর আগুনের বৃকে দগ্না নেই, মায়া নেই। সে আগুন শুধু জমায়, টলটলে তরল পদার্থকে জমিয়ে কঠিন করে ছাড়ে। এমন কঠিন করে ছাড়ে যে তখন সেই পদার্থের ওপর ভেতর নিয়েট নীরঞ্জ অঙ্ককারে একেবারে বোবা হয়ে যায়।

আর একবার বড় সড়কের ওপর ছুঁকার শোনা গেল।

“বল হরি হরি বোল।”

দূরে সরে যেতে লাগলো ওখানকার শোংগোলটা। হাতের তেলোয় টিপতে লাগলাম রসকবচুণ গাঁজাটুকু। নয়ম করতে হবে, দু’ ফোঁটা জল চাই। কিন্তু জল কোথায়—আমার দু’ হাত পুরু গদির ওপর। দোব নাকি কয়েক ফোঁটা বোতলের জল।

না, এ জিনিসের সঙ্গে ও জিনিস অচল। এ বড় দাণ্ডিক জাতের জ্বা, দু’ ফোঁটা কাঁচা গো-দুগ্ধ দিয়ে টিপতে পাবলে তবে এর পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা হয়। গো-দুগ্ধ অভাবে মনুষ্য-দুগ্ধ। তাই কবেছিলেন একবার আগমবাগীশ। তাঁর শক্তির কাছ থেকে দুধ চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে বানিয়েছিলেন এই কালভৈরবের ভোগ। অতন মোডল নাকি স্বচক্ষে দেখেছিল আর প্রসাদও পেয়েছিল সেই কলকের। আরপর থেকে অতন যখন আসে রামহরির বউ দেয় তাকে কয়েক ফোঁটা দুধ।

অন্ত চেষ্টাও করে দেখেছে অতন মোডল। কিন্তু কোনও ফল হয় নি। কাজেই রামহরির বউ দুধ দেয়। অতন মোডল ঝাংটা চণ্ডীর দেয়াসি, তিন তুড়ি দিয়ে ডাকিনী নামাতে পারে। সে চাইলে কৌন্ সাহসে না বলবে রামহরির বউ।

চরণদাস বাবাজী কিন্তু জল দিয়েই গাঁজা ডলে। কারণ নিতাই বোষ্টমী পাষাণে বৃক বেঁধেছে।

“আমি পাষাণে বাঁধিয়া বৃক

নীরবে সহি যে দুঃখ গো

আমার বন্ধু যদি পারিত গো জানতে।”

ফিরে আসছে নিতাই। বন্ধুকে বিদেয় দিয়ে ফিরছে। বড় সড়ক থেকে
নেমে আসছে নিমতলা দিয়ে।

“সখী গো

কেমনে ভুলিব প্রাণকান্তে।”

আহা, প্রাণকান্তেব জন্মে বেচাবীর বুক মুচড়ে গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছে।

“অভাগী রাধাবে ভুলে

বন্ধুবা বইল গোকুলে গো

বিবি আশায় জনম দিল কানতে।”

চরণদাসের পিছনে এসে দাঁড়ালো নিতাই। বোধ হয় নেহাৎ অভ্যাসদোষেই
হাত বাড়িয়ে একতারাটা তুলে নিলে চরণদাস। চোখ বুজে মাথা ইট বয়েই
বসে রইল সে। শুধু একটা আঙুল ঠিক তালে তালে চলতে লাগল
একতারার ওপর। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে দু’হাতে মন্দিরায় বোল তুলে নিতাই
গাইলে—

“আমি অবলা কুলের বাল্য

কত বা সাহিব জালা গো—”

একতারা হাতে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো বাবাজী। মন্দিরার সঙ্গে একতারা
তখন সমানে কঙ্কার দিচ্ছে।

আবার নিতাই গাইলে—

“আমি অবলা কুলের বাল্য

কত বা সাহিব জালা গো—”

বাবাজী আর থাকতে পারলে না। তখনও তার দু’চোখ নে’না, মাথা ছলিয়ে
শরীর ছলিয়ে সে গেয়ে উঠল—

“এক জালা বাঁশের বাঁশী

আর এক জালা বসন্তে।”

তারপর দু’জনেরই গলা মিলে গেল—

“সখী গো—

কেমনে ভুলিব প্রাণকান্তে।”

তখনও পর্বন্ত শব্দে গাঁজাটা রয়েছে আমার হাতের তেলোয়। সেটার দিকে
নজর পড়তে নিজে’র ওপর বিরক্তিতে ভরে গেল মনটা। না, এ জিনিস থেকে রস
বার করা আমার কর্ম নয়। চরণদাস বাবাজী পারে, পাষণ থেকেও রস ঝরাতে

পারে ও। জল দুধ কিছুই ওর লাগে না। লাগে যা তার নাম মধু। চরণদাসের মধু জমা আছে নিজের বকের মধ্যে। তাই দিয়ে ও পাষণ-বাঁধা বকেরও মধু ফরণ করতে জানে।

দূর ছাই, গাঁজাটুকু টেনে ফেলে দিলাম একটা চিতার দিকে।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

ঘাটের উত্তর সীমায় আকন্দ গাছেব জঙ্গলের সামনে উঁচু টিবিব উপর মজস্ লেপ কঙ্কল তোশক কাঁথাব তৈবী বাজপাট। বাজপাটে বসে বাজঠাট বজায় বেথে চলতে হয়। বাজতন্ত্রে হৃদয়-দৌর্বল্যেব স্থান নেই। মায়া-মমতা প্রেম-প্ৰীতি মান-অভিমান মিলন-বিবহ এট সমস্ত ভুচ্ছাতিভুচ্ছ কাণ্ডকাবথানা বাজধর্মের ধাবে কাছে ঘেঁষতে পারে না। এগুলোকে বাদ দিয়ে যা থাকে তাব নাম বাজঠাট।

উদ্ধারণপুরেব আকাশ বাতাস আলো বোল আনা বাজঠাট বজায় বাথে। আকাশে ওঠে কান্নাব বোল—“ওগো আমাব কি হ’ল গো, আমাব ছেড়ে কোথায় তুমি গেলে গো।” বাতাসে শোনা যায় গান—“কেমনে ভুলিব প্রাণকান্ডে।” আব উদ্ধারণপুরেব আলো—আলো ক্ষুব্ধ আক্রোশে জ্বলতে থাকে—কোথা গেল ছায়া? ছায়া নেই। ছায়া অন্তর্ধান কবেছে। আলোকপ্রিয়া আপন বস্ত্রভের অন্ধের আঁচে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাজশক্তিব আলো ছায়া সহ কবতে পারে না।

খস্তা ঘোষ সইতে পাবে না কান্না। কোথা থেকে ভেড়ে এসে এব বমক লাগালে।

“আঃ, কান আলাপালা হয়ে গেল বাপু তোমাদেব মডাকান্নাব জালায়। এখানে এসে একটু জুড়োব তাবও উপায় বাথলে না তোমরা। গেলেই পারতে তোমাদেব প্রাণকান্তর সঙ্গে। পালকিব পাশে দাঁড়িয়ে আঁচলে চোখ মুচছিলে ত। ফিরে এলে কেন আবার? একবার যাব বললে সে তোমাদেব দু’জনকেই পালকিতে তুলে নিয়ে যেত। খামকা এখানে নেচে নেচে মডাকান্না জুড়েছ কেন?”

কটাং করে একতারার তার গেল কেটে। একটা মন্দিরা খসে পড়ল বোষ্টমাব হাত থেকে। চোঁচাতে লাগল খস্তা ঘোষ।

“তোমাদের জাতের ত কিছু আটকায় না। বরভাঙানো তোমাদের ব্যবসা। যাও না যাও, গিয়ে ওঠ ঐ বাবুর মাছাতা-আমলের ভুতুড়ে বাড়িতে। চৌক

পুরুষ যাতে ভূতের নাচ নাচতে পারে সেই জন্তে অত বড় বাড়ি বানিয়ে গিয়েছিল
 ‘গুর ঠাকুরদাদার বাবার বাবা। এখন সব দিকে স্থবিধে, সেই বউ ছুঁড়িও সহ্য
 করতে না পেরে বাবুর মুখে লাগি মেরে পালিয়েছে। এক আপদ ছিল মা, তিনিও
 গেলেন। এখন বাবুর পোষা বারো। এমনও হতে পারে, বাবু মোহন্তকে তাঁর
 বৃন্দাবনের ঠাকুরবাড়ির সেবায়েত কবে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন। এখানে
 নিরালায় নিঝুঁক্লটে বোষ্টমীব কাছে ছোটো বাধা-কেষ্টব প্রেমকথা শুনবেন বাবু।
 আর—”

চিলের মত চিংকার কবে উঠল নিতাই।

“খন্তা—”

উদ্ধাবণপুবেব আলো ঠিকবে শব্দ হচ্ছে নিতাইয়েব হুঁচোখ দিযে। যে আলোর
 আগুনে ঢলটলে এবল পদার্থ জমে কটিন হয়ে যায়।

হঠাৎ একেবারে খাঁড়াব চোপ পড়ল খন্তাব গলায়। অদ্ভুতভাবে সে সামান্যক্ষণ
 চেয়ে রইল। নিতাইয়ের মুখেব দিকে। তাবপর আমার দিগে ফিবে আমাকেই একটা
 ধমক লাগিয়ে দিল।

“মজা কবে নাচ গান দেখে ক সময় কাট’চ্ছ। ওধাবে দারোগা এসে বসে
 আছে যে তোমার জন্তে। তোমাকে ধবে নিয়ে যাবা’ হুকুম দিয়ে’ছিল সেপাইদের।
 তাদেব বৃষ্টিয়ে স্থজিযে সাগা কবে বসিযে বেথে এসে’ছি। নাও, এখন চল আমার
 সঙ্গে। একটা ছোটো নয়, তিনটে মানুষ খুন হয়ে’ছে, সে সঙ্কে তোমায় জিজ্ঞেস-
 পড়া করবে দাবোগা সাছেব।”

আত্মকে উঠানাম—“খুন। কে হল? কোথায়?” বলতে ত লাফিয়ে
 পড়লাম গদি থেকে।

“চল চল, দেখি গিয়ে, কে আবার খুন হল কোথায়?”

ওপাশ থেকে হেঁড়ে গলায় কে বললে—“আপনাকে আব কষ্ট কবে যেতে হবে
 না বাবা, আমিই এসে গেছি।”

খাকী কাপড়ে মোড়া সাড়ে-তিন-মণী একটা সচল মাংসপিণ্ড সামনে এসে
 দাঁড়ালো বত্রিশ পাটি দাঁত বার কবে। দুই খাবা কচলাতে কচলাতে হেঁ হেঁ করে
 হাসতে লাগল বিদ্যুটে হাসি। নিবীহ হরিণের বকেব ওপব চেপে বসে হ যনারা
 বোধ হয় এই জাতের হাসি হাসে।

“আমিও আপনার একটি অধম সন্তান বাবা। এ অধমের নাম হচ্ছে সাধুরাম
 সমাদ্দার। লোকে বলে সমাদ্দার হুঁদে দারোগা। হুঁদে না হলে কি পুলিশের

কাজে উন্নতি করতে পারে রে বাবা। কিছুতেই পারে না। অস্ত্র দারোগা যেখানে লাঠি ধরি জল খাবে, সমাদ্দার সেখানে এক চালে বাজিমাৎ করে দেয়। এই যে একটি চিলে দু'টি পাখী বধ করে বসলাম, এ কি খেলত অস্ত্র কারও মাথায়? এই বেটা খস্তারও ত দুঁদে বলে নামডাক আছে। ও ব্যাটাও ত ধরতে পারলে না আমার মতনব। দিব্যি ফাঁদে পা দিলে। আর আমিও চলে এলাম ওর পিছু পিছু। আড়ালে দাঁড়িয়ে স্ববর্ণে শুনলাম, খস্তা কি বললে আপনাকে। স্বচক্ষে দেখলাম, খুনের কথা শুনেই কি ভাবে আপনি আতঙ্কে উঠে ছুটেছিলেন পুলিশের কাছে। বাস, হয়ে গেল। সমাদ্দারের এক আঁচড়েই সব সাফ হয়ে গেল। কি রে বেটা ঘোষের পো, হাঁ করে চেয়ে আছিস যে মুখের দিকে। মাথায় ঢুকল কিছু?”

ভাবাচাকা খেয়ে খস্তা শুধু মাথা নাড়লে।

দারোগা সাহেব আবার হাসতে লাগলেন তাঁর সেই হায়না-মার্কী হাসি। হাসির চোটে পেটের মাংসপিণ্ড ওঠানামা করতে লাগল। হাসি সামলে বললেন—“নাধে কি লোকে বলে যে চার কুড়ি বঘস না হ'লে তোদের মগজ্ঞে কিছুই ঢোকে না। এই মগজ্ঞ নিয়ে লোক চরিয়ে খাস কি করে—এঁা। এটুকু খাব বুঝলি না যে খুন সম্বন্ধে তোর বা গোঁসাঁই বাবার যদি কিছু জানা থাকত তাহলে তুই বেটা এসেই গোঁসাঁইকে সটকাবার মস্তুর দিতিস। আর বাবাও কে খুন হল তা জানবার গরজ্ঞে পুলিশের কাছে ছুটতেন না।”

ফাঁক পেয়ে আমিই জিজ্ঞাসা করে বসলাম, “কিস্তি কে খুন হল? কোথায় হল খুনটা?”

দারোগা সাহেব তাঁর ধামার মত মাথাটা এপাশে ওপাশে দোলাতে দোলাতে বললেন—“সে আমার জানতে পারবই। লোক তিনটে এই আশান থেকে ফিরে যাচ্ছিল। তাদের খানা থেকে তুলে খানায় পাঠিয়ে দিখেছি। ভাতারবাবু আমাদের খুব কাজের মানুষ। যে করে হোক ওদের তাজা করে তুলবেনই। আজ হোক, কাল হোক, জ্ঞান ফিরে আসবেই ওদের। এমন কিছু বেশী চোট নয়। বেমকলা লাঠি ঝেড়েছে ওদের ঠ্যাঙে। আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে তিনজনকেই ঠ্যাং ভেঙেছে একভাবে। যারা ভেঙেছে তারা টাকা-কড়ি কাপড়-চোপড় কিছুই নেয় নি।”

খস্তা বললে—“আশান থেকে যারা ফিরে যাচ্ছিল তাদের কাছে খাববেই বা কি হাতি-ঘোড়া। তারা যে আশান থেকে ফিরছিল এ আপনারা জানলেন কি করে?”

সমাদ্দার সাহেব বললেন, “রাস্তায় যে গ্রামে তারা রাত কাটিয়েছে সেই গ্রামের লোকে বললে। আরে বাপু, সম্ভান না করেই কি এখানে এসে পড়েছি আমি? অত কাঁচা ছেলে নই। বাবার কাছেই একেবারে এসে গেলাম। বাবাকে দর্শন করাও হল। পুলিশের চাকরি করি হাজার ইচ্ছে থাকলেও ত সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ কবতে পাট না। বাবার রূপা হলে হয়ত লোক তিনটের পরিচয়ও পেয়ে যাব। মানে লোক তিনটেকে হয়ত বাবা চিনে ফেলতেও পারেন।”

বললাম—“দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারব। কবে মার খেয়েছে তারা, কোথায় মার খেয়েছে?”

“কবে যে মার খেয়েছে তা ত বলতে পারব না বাবা।” শক্তিপুরের মাঠের পশ্চিম দিকে বাঁধা বটতলার ওধারে একটা খানার ভেতর ওদের পাওয়া গেছে পরন্তু দুপুর বেলা। একজনের গলায় পৈতে রয়েছে, আর এই এত বড় একটা সোনার কবচ ছিল তার গলায়। দেখুন ত বাবা এই কবচটা। এত বড় একটা কবচ গলায় ঝুলিয়ে যে মড়া পোড়াতে এসেছিল তার ওপর সকলের নজর পড়বেই।”

বলতে বলতে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কালো স্ততোয় বাঁধা একটা সোনার কবচ বার করলেন তিনি। দূর থেকে ওটা দেখেই আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম—“জয়দেব, জয়দেব ঘোষাল। বিষ্ণুটিকুরির জয়দেবকে আমি ঐ কবচ তৈরী কবে দিয়েছিলাম। ওটা গলায় ঝুলিয়েই ও সেদিন ওর পাঁচবারের বউকে পোড়াতে এনেছিল। কবে যেন? কবে যেন এল জয়দেব?”

মনে করবার জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম।

হুঁদে দারোগা সমাদ্দার নিজের উরুর ওপর একটি বিরশি সিন্ধা ওজনের খাল্লড মেয়ে বললেন—“ব্যাস ব্যাস, কাম ফতে হো গিয়া। আর আপনাকে কষ্ট দোব না বাবা। ওতেই আমাব কাজ হয়ে গেল। বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষাল। ব্যাস, এর বেশী আর জেনে লাভ নেই পুলিশের। ডায়েরিতে লিখে রেখে দোব। জ্ঞান হলে জয়দেবরা যদি কাবও নাম কবে ও তাকে ধরে চানা-ই্যাচড়া করা যাবে তখন। মাতাল তিনটাকে কারা ঠ্যাঙালে তার জন্ত পুলিশের মাথাব্যথা নেই। যাক গে যাক, ও সৎসত্ত নোংরা ব্যাপার।”

সাধুরাম সমাদ্দার ঠ্যাং-ভাঙার প্রসঙ্গটা একেবারে চুকিয়ে দিয়ে হুঁড়ির ওপর থেকে আধ বিঘত চওড়া চামড়ার পেটিটা খুলে ফেললেন। খুলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বললেন—“এখন একটু বসি বাবার চরণের তলায় । শালার এমন কপাল নিয়ে এসেছি যে মরবার ফুৎসৎটুকুও জোটে না কপালে । আর যখন এসে পড়েছি তখন জুঁউয়েই যাই প্রাণটা ।”

বিনয়ের অবতার মোহন্ত চবণদাস তাড়াতাড়ি তার বগলে ঝোলানো সৰু মাদুবখানা খুলে পেতে দিলে । ২২ কণ্টে তাব ওপর দেহভার বক্ষা করলেন দারোগা সাহেব ।

খস্তা তাব সব ক'খানা দাত বার কবে বললে—“তা'হলে এখন একটু ইয়ের বাবস্থা কবি হুজু ?”

হুজু বললেন—“আনবৎ করবি । বাবাব প্রসাদ না পেয়ে কি উঠব নাকি মনে কর'ছস এখান থেকে ? খাঁটি জিনিস আনবি রে ব্যাটা, এমন জিনিস আনবি যা জলে । বাবাব মুখের মহাপ্রসাদ পাব আজ । শালার রাজারাজড়ার কপালে যা কখনও জোটে না সেই জিনিস খেয়ে আজ আমার জন্ম সার্থক হবে ।”

খস্তা ছুটল ।

এবারে ওধাবে চেয়ে দেখলাম । নিতাই গেল কোথা ? বোধ হয় গঙ্গায় গেল মুখ হাত ধুতে ।

যাক গে—নিশ্চিত হয়ে উঠে বসলাম গদির ওপর ।

উদ্ধারণপুরের ঘাট ।

ঘাটের প্রান্তে অবশ্রান্ত কপাল কুটছে গঙ্গা । কপাল কুটছে আব বাদছে । অভিমান উথলে উঠেছে ধর্পৎ ধনৎ কবে । গঙ্গা সঙ্গের সাথী করে নিয়ে যেতে চায় উদ্ধারণপুরের ঘাটকে । নিয়ে যাবে সাগরে, সাগরের অতল তলে গিয়ে অশ্রয় নেবে হু'জনে ।

সাগরের অতল তলে মড হয়ে শয়ালে শকুনে ছেঁড়াছাঁড়ি কবে না, জ্যাস্ত মাস্তবর তাজা বুজু-মাংসেব পোতে মাস্তবে মাস্তবে কামড়া কামড়া করে না সেখানে । হাহাকাব হ্যাংগাপনা রেযাবোধি পৌছতে পাবে না সাগরের জলের তলে । মৃত্তির নির্মল আনন্দে শুভ্রণা ঘুবে বেড়ায় সেখানে । তাই ত তারা দিতে পারে মৃত্তার জন্ম । আসন মৃত্তাথ কলক পড়ে না কখনও । উদ্ধারণপুরের কালো মাটির বলক ঘোচাবার জন্তে গঙ্গা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে চায় সাগরে ।

গঙ্গার কিনারায় একেবারে জলের ধারে গালে হাত দিয়ে বসে নিতাই একমনে

শুনছে গঙ্গার কান্না। বেচারী আজ সাথীহারা। চরণদ্বন্দ্ব গেল খসে খসে। ঘোবের
মুখের খোল বাজাতে। কেউ যাত্রার দল খুলবে খসে। কুমারী মেয়েদের দিয়ে।
তাতে যদি ওদেব পোড়া পেটেব দাবি মেটে তাহলে আর মুখে “অঙ” মেখে
মামুষের মনে “অঙ” ধবাবার ফাঁদ পাততে হবে না ওদেব।

নিতাহের বাহরেটাত রঙীন। দুখে-খানতাব রঙে ফোপানো ওর বাইবেটা।
ভেতরটা শুদ্ধকাব, উদ্ধারণপুলেব রাতেব মত অন্ধকাব। দেউ অন্ধকার রাতেও
শুষ্টি দেখা যাচ্ছে ওর বাহরেটার রঙ। গদির ওপর বসেই বেশ দেখতে পাচ্ছি,
এগেবারে জনের খাব ঘেঁষে বসে আছে নিতাই। সন্ধ্যা থেকে ঠায় এভাবে বসে
আছে ওখানে।

আর এক প্রাণীও জেগে নেই আশ্রানে। শুষ্ক-নিশুষ্ক ঘুচ্ছে, শেরাল-শকুনরা
কে কোথায় লুকিয়ে শুয়ে পড়েছে, চিতাও একটা জ্বলছে না কোথাও। এরকম
নিরুপ নিস্তর হয না এখনও উদ্ধারণপুলেব ঘাট। বাত্রে জ্যাস্ত মামুষ থাকে না
কেউ বটে, কিন্তু যারা জ্যাস্ত নয় এবা ত থাকে তাদের অশরীরী শরীর নিয়ে
আমাব চাব পাশে। আজ যেন তাবাও নেহ নেউ। বড একা একা মনে হতে
লাগল নিজেকে। ওই গঙ্গাব কিনাবায় বসা রক্ত-মাংসের মামুষটির মত একা একা
মনে হতে লাগল।

ডাক দিলাম—“সই, ও সই।”

মাথা তুলে মুখ ঘুঁষে চাইল আমার দিকে। তারপর উঠে এল। গদির
নামনে দাড়িবে বললে—“আমায় ডাকছ?”

বললাম—“তোমায় ডাকব না ও আম ডাকব কাকে? কে মর আছে
এখানে?”

অনেকগুলো আধপোড়া কাঠ দিয়ে এটা ঘুঁনি কবে বেখে গেছে রামহরি।
ওটাকে খোঁচানে আলো পাওয়া যায়। ওই হচ্ছে আমাব আলোর ব্যবস্থা। গদির
ওপর বসে যাতে খোঁচাতে পাবি তার জগে হাতের কাছে এখানো লম্বা সরু বাঁশও
রেখে যায় রামহরি। বাঁশ দিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করলাম ধুনটাকে।

একটু চুপ করে থেকে নিতাই বলল—“কি জগে ডেকেছ বললে না ত?”

তাই ত। কি জগে ডাকলাম ওকে? কেন ওকে ডেকে তুলে আনলাম
ওখান থেকে? কেন? কি বলবার আছে আমায়? বলব কি ওকে এখন?
কিছু-না বলতে পারলে ও ভাববে কি?

ধুনিটা এবার বেশ জলে উঠল। আগুনের লাল আভা পড়ল নিতাইয়ের মুখের
ওপর। সেদিকে একবারটি চেয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। নিয়ে আবার একমনে

খোঁচাখুঁচি করতে লাগলাম খুনিটায়।

খিলখিল করে হেসে উঠল নিতাই। বললে—“কি করে খুঁচিয়ে আগুন জ্বালাতে হয় তাই দেখবার জন্তে থাকলে বুঝি আমাকে?”

তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চেষ্টা করলাম ওর প্রশ্নটায় : “না না, তা কেন, তা কেন। মানে একলাটি ওভাবে বসে আছ ওখানে, মানে ওধারে সাপখোপের ভয়ও ত আছে।”

একান্ত ভালমাসুখি গলায় নিতাই বললে—“ও তাই বল, সাপখোপের ভয় আছে বুঝি জলের ধারে। কিন্তু তোমার ঐ গদির ভেতরেও ত অনেকগুলো সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে গোসাঁই।”

বীশটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল আমার। সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, “সাপ! সাপ থাকবে আমার গদির ভেতর লুকিয়ে?”

“কেন? থাকতে নেই নাকি? আছে গোসাঁই আছে, সাপ আছে সর্বত্র, কোনটা ছোবল দিতে আসে, কোনটার ছোবলাবার ক্ষমতা নেই, কোনটা নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে শেকড়-বাকড় মস্ততন্ত্রের জোরে। বিষ আছে, ছোবলাতে জানে অথচ কিছুতে ছোবলাতে পারে না, তেমন খেলা দেখানোই ত পাকা সাপুড়ের ওস্তাদি গোসাঁই।”

নির্বাচন হয়ে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। নিতাইয়ের মুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। যা বলবার তা বলে শেষ করবেই ও।

অল্প একটু হেসে কপালের ওপর থেকে চুলগুলো এক হাতে সরিয়ে দিয়ে ও বললে—“গোসাঁই, খুঁচিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বড় মজা পাও তুমি। আগুন জলে আর তার তাপে তুমি গরম হও। কিন্তু এমন একজাতের আগুন আছে যা বরফের মত শীতল। সে আগুন একবার যদি জলে ওঠে তা’হলে ঐ মড়ার গদি, যার ওপর বসে তুমি রাজঠাট বজার রাখছ, সেই গদি এমন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে উঠে পালাতে পথ পাবে না। তেমন আগুনের নাম শুনেছ কখনও?”

অনেকটা সময় কেটে গেল। একভাবে চেয়ে রইল নিতাই আমার মুখের দিকে, বোধ হয় উত্তরের আশাতেই চেয়ে রইল।

অনেক চেষ্টায় অনেক কষ্টে শুধু বলতে পারলাম—“কিন্তু কি করোঁছ আমি তোমার সহি?”

ধীরে হুস্থে ওজন করে এক-একটি কথা বলতে লাগল নিতাই—“কই না, কিছুই ত কর নি। কিছু করবার গরজ আছে নাকি তোমার? কেন কিছু করতে যাবে আমার জন্তে? হুথু বসে আছ তুমি রাজসিংহাসনে, পথে পথে ঘুরে

বেড়াছি আমি সাত দরজায় বাঁটা লাগি থেয়ে। আমার মত রাস্তার কুকুরের
জন্তে তুমি কিছু করতে যাবে কেন? তোমার স্থখশান্তির ব্যাঘাত হবে যে
তাহলে।”

আঁকড়ে ধরবার মত একটা কিছু পেয়ে বর্তে গেলাম। বেশ অন্ততপ্ত হয়েও
উঠলাম। বললাম—“তা তোমরা রাগ-অভিমান করতে পার বৈকি আমার ওপর।
সত্যি তোমাদের জন্তে কিছু করতে পারি নি আমি। বাবাজী ফিরে এলে আজ
রাত্রেই পরামর্শ করে দেখব িনজনে। সত্যিই তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে এই
দেশে। কালী বৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র এই রকম কোনও ধামে-টামে যদি একটি আখড়া
হয় তোমাদের, যেখানে শান্তিতে বসে সাধন-ভজন করে তোমরা জীবনটা কাটাতে
পারো, তার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে এবার আমাদের। ও আমি খুব পারব
সই। একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। এত বডলোক ভক্ত আছে আমার,
সবায়ের কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবই
কোনও তীর্থস্থানে। আর যাতে কারও দরজায় গিয়ে তোমায় না দাঁড়াতে হয়
তার জন্তে—”

প্রায় আত্ননাদ করে উঠল নিতাই—“কি? কি বললে? টাকাকড়ি ভিক্ষে
চাইছি আমি তোমার কাছে? আমাদের টাকাকড়ি সোনাদানা দেবার লোকের
বড অভাব পড়েছে, না?”

“না না না বোষ্টম। সে কথা বলছি না আমি। চরণদাস আমায় প্রায়
বলে কিনা, কোনও নীথস্থানে গিয়ে যদি জীবনটা শান্তিতে কাটানো—”

দাঁতে দাঁত চেপে নিতাই বললে—“তীর্থস্থানে গিয়ে শান্তিতে জীবন কাটাক
না চরণদাস বাবাজী, কে তাকে অটকে বেখেছে। মবা গাছ ও, সব শান্তিতে
আমার কি? ওব বেঁচে থেকে লাভ কি? শকুনের মত আগলে এস আছে
কেন আমার? কি সম্বন্ধ ওব সঙ্গে আমার?”

একটু রমিয়ে বলবার চেষ্টা করি—“আহা, তাও ত বটে। কি এমন সম্বন্ধ
চরণদাস বাবাজার সঙ্গে তোমার? আচ্ছা সই, তোমাদের শাস্ত্রে এই অবস্থার
নামটা যেন কি। খণ্ডিত না প্রোষিতভর্তৃকা?”

অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর শোণাল নিতাইয়ের গলা : “গোসাঁই—ভুল করছ।
না-বোঝার ভান করে আমায় ঠকাতে পারবে না তুমি। ঐ মড়ার গদির ওপর
বসে গর্বে অহঙ্কারে তুমি মাছুষকে মাছুষ বলে মনে কর না। কিন্তু এই অহঙ্কার
যেদিন তোমার ভাঙবে, সেদিন—আচ্ছা দেখা যাক—”

কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো নিতাই। আগুনের আভা পড়ল

ওর গিঠের ওপর। সামান্য একটু সামনের দিকে झুয়ে পড়েছে যেন। কিন্তু ওকি ?
কাঁদছে যে।

কেন কাঁদছে নিতাই ? এমন কি বললাম যার জন্তে ও অমন করে নিঃশব্দে
ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল ?

আমার গলার মধ্যেও যেন একটা কি ঠেলে উঠতে লাগল। এটা কিছু
বলতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। কিছুতেই একটিও কথা বার হল না গলা
দিয়ে।

হঠাৎ একখানা পর্দা উঠে গেল চোখের সামনে থেকে।

ঐ যে নারী, একাকিনী—অন্ধকাবে আশানে দাঁড়িয়ে কান্না সামলাবার চেষ্টা
করছে, মনে হল—এ কান্না নতুন কান্না নয়। অনেকদিনের জমানো অনেক কান্না
আজ আশানের তাপে গলে বরছে। মনে হল, এই দুনিয়ায় এমন কেউ নেই ওর,
যাকে ও ঐ বেদনার সামান্য অংশও দিতে পারে। তা যদি পারত তা’হলে এতটা
করুণ এতটা নিষ্ঠুর বলে মনে হত না ওর ঐ নিঃশব্দ রোদনকে।

উদ্ধারগপুরের ঘাট।

সে রাত্রে অনেক অশ্রু চলেছিল নিতাই উদ্ধারগপুর ঘাটের ভাষে। সাক্ষী
ছিলাম একমাত্র আমি। একটি চিতাও জ্বলছিল না সে রাত্রে উদ্ধারগপুর আশানে।
মড়ার বিছানার স্তূপের ওপর মড়াব মত কাঠ হয়ে বসে রইলাম। নির্বিকার
নিরাসক্ত নিরপেক্ষ সাক্ষীর আদর্শ হয়ে। একটি আঙুল তুলতে পারি নি। এটি
বাক্য গলা দিয়ে বার হয় নি আমার। যেন একটা বিষের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে
রইলাম।

উদ্ধারগপুরের অশ্রু।

অশ্রাব্য অশ্রু অশ্রুটি বুকফাটা হাহাকারের বিয়োগান্ত বিভীষিকা নয়,
অনিবার্য অন্তর্দাহের পায়ে বিফল বিলাপের বিহ্বল মাথা-কোটাকুটি নয়, করুণাহীন
কাটফাটা রোদে ঝুলো তালগাছের হা-হতাশ চুয়ানো গাঁজলাওঠা তপ্ত তাড়ি নয়।
উদ্ধারগপুরের অশ্রুতে বারে মাধবী মধু। আকর্ষণ পান করেও গায়ে মাধব
জালা ধরে না। দেহ-মনের তন্ত্রীগুলো প্রশন্ন প্রশান্তিতে জুড়িয়ে শীতল হয়ে
যায়।

উদ্ধারগপুরের অশ্রু।

একল ওকুল হুকুল-নাশিনী উচ্ছ্বসিত উর্মিমালা নয়—অন্তঃসলিলা অত্মরঞ্জিত
অনিকঙ্ক অন্তর্বেদনা।

মেলিহান লালসার রুচিহীন রোমন্থন নয়—মূর্তিমতী মমতার মুমূর্ষু মিনতি।
বিস্তৃত বিক্ষেপের বিগলিত বিজ্ঞাপন নয়—বিক্রান্ত বিদগ্ধনার ব্যথিত বাউবানল।
কিছুই সিক্ত হয় না উদ্ধাবগপূর্বের অশরীরী অশ্রুতে, নয়ম হয় না উদ্ধাবগপূর্বের
সাদা হাড় আর কালো কয়লা। সে অশ্রুতে ধলুভূতব তন্ময় থাকলেও থাকতে
পারে, কিন্তু উদ্ধাবনার উদ্ভাপ নেই। উদ্ধাবগপূর্বে অশ্রু কিছুই ভাসিয়ে নিতে
পারে না, শুধু খানিক নাকানি চোবানি খাটবে হাযরান করে ছাড়ে।

উদ্ধাবগপূর্বের অশ্রু।

অশ্রু নয়, অশ্রুখ্য অত্মশোচনা। শূশানের ধোঁষাটে আবাসে নিশ্চিন্ত
নৌহারকাপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে থাকলে যে ভাবাতাত ভাগ্য বৃকের মাঝে
গুমরে ওঠে, সেট ভাবায় আশার কথা শোনাও চায় উদ্ধাবগপূর্বের অশ্রুখ্য
অত্মশোচনা।

বলে—“জানলে গোসাঁই—পিপড়ের পাখা গজালে সে মরবেই। না পুডলে যে
তার স্বাস্থ্য নেই জীবনে। তাতে আগুনব দোষ কি? আগুন ত তাকে উড়ে
এসে বাঁপিষে পড়বার জন্তে সাধতে যায় নি।”

নড়ে-চড়ে বসি। ধড়ে প্রাণ এল ওর কথা কানে যেতে। তাড়াতাড়ি দুটো
খোঁচা দিয়ে ধুনিটাকে আবণ্ড চাক্সা করে তুলি।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে বোষ্টমী। আমার মড়াপোড়া কাঠের ধুনি থেকে লাল আভা
পড়েছে তার ভিজে মুখ-চোখের ওপর। নিশীথিনী-নিন্দিত চক্ষু দুটির অন্তলম্পসী
চাউনিতে জ্বলছে দু’টি নিবাত নিরুপ দীপশিখা—প্রত্যাশা আর প্রদাহ। কিন্তু
এটুকু উষ্ণতা নেই সেই চাউনিতে, পাখা-গজানো কোনও হতভাগা বাঁপ দেবে
না সেই আগুনে। ও দীপ কাছে টানতে জানে না, শুধু দূরে সরিয়ে রাখে।

কিন্তু সাধ্য নেই চোখের ওপর চোখ রাখার, মোচড় দিয়ে ওঠে বৃকের মধ্যে।
কোষায় যেন একটা বোবা বেদনা টনটন করে ওঠে।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলি—“মাঝে মাঝে অমন করে ভয় দেখাও কেন সই? যে
মরে আছে তাকে মেয়ে কি স্বথ পাও তুমি?”

আরও দু’পা এগিয়ে এল নিতাই। একটু সামনে লুঁকে ফিসফিস করে বললে
—“কি দিয়ে বিধাতা তোমায় গড়েছিল গোসাঁই? কি ধাতুতে তৈরী তুমি?
স্বথের কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না তোমার? তোমায় ভয় দেখাব আমি!

ভয় কি বস্তু—তা তুমি জান ? লজ্জা ঘেরা ভয় এই সব আপদ বালাই আছে নাকি তোমার শরীরে ?”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৰ্ণভাবে বোঝাই ওকে—“সহজ কথা কিছুতেই সোজাভাবে নিতে পার না তুমি সই ? মডার গদির ওপর যে শুয়ে আছে সেই মডার সঙ্গে খামকা ঝগড়া করে নিজে দুখে পাও । কাঞ্চন নজরে ধবে না তোমার, কাঁচ নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে নিজের হাত পা কেটে জলে পুড়ে মবছ । কি অসম্মত লগ্নেই যে তোমাব সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল ।”

খপ্ করে আমার কথাটাই পাল্টে দেয় বোষ্টমী—“মনে পড়ে গোসাঁই ? এখনও তোমার মনে আছে সেই দিনটিকে ? তোমায় আমায় দেখা হবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি এখনও মন থেকে মুছে যায় নি তোমার ?”

খপ্ করে প্রশ্ন করা সহজ কিন্তু টপ্ করে তাব জবাব যোগায না আমার নুখে । আগুনের দিকে চেয়ে উত্তর খুঁজতে থাকি । আমাব মড়া-পোড়া কাঠের ধূনিব লাল আগুনের মাঝে কি লুকিয়ে আছে নিতাইয়ের প্রশ্নেব উত্তর ? না এতদিনে নিঃশেষে ছাই হয়ে গেছে উদ্ধারণপুরেব আঁচে ।

যায নি ।

অত সহজে কিছুই মুছে যায় না মনের মুকুর থেকে । যে বস্তু নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায চিতার আগুনে, সেই বস্তুই বৃক্বেব আগুনে পুড়ে অংশও বাল, আরও উজ্জ্বল, আবও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তাছাড়া কেমন কবে ভোলা যায সেই অতি বিখ্যাত পুণ্যধামটির কথা, যেখানে মানুষ এখনও দলে দলে ছুটছে শান্তি পাবার আশায়, সংসাব-জালায় জলেপুড়ে থাক হয়ে পাপ তাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবাব জন্তে মানুষ যেখানে গিয়ে মাছড়ে পডছে আজও । বর্ম যেখানে ওজন-দরে বিক্রি হয়, টাকা আনা পাই দিখে পাইকাবি দবে মাল কিনে আডত খোলা যায যেখানে, যে আডত থেকে অনায়াসে হবিনামের হট্টগোলের আড়ালে তাজা রক্ত-মাংসের ভেজাল দেওয়া মধুর রসের জোর কাবাবব চলে ।

কি করে ভোলা যায আডতদারদের মূল আডকাটি খাঁহু বোষ্টমীব পোনে এক হাত লম্বা সেই শ্রীমুখখানি, আর সেই মুখের ঠিক মাঝখানে এক আনাব ফালি দেওয়া কুমড়োর মত সেই গোপীচন্দন-চর্চিত নাসিকাটি । সেই মুখে সেই আশ্চর্য নাকটির ছ’পাশে অতটুকু ছুটি চক্ষু—সত্যিই দেখবার মত বস্তু । সবালে বিকেলে আডতের ঢালাও হলে যখন হবিনামের নামতা পড়া চলে, কয়েক শত পনেরো থেকে পঁচাত্তর বছর বয়সের সাদা খানপরা হতভাগিনী সারবন্দী বসে সপ্তাহান্তে

পেট-মাথা চাল ছুন পাবার আশায় হুঁর করে নামতা মুখস্থ করে, তখন তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্দারনী খাঁহু সেই এক হাত লম্বা মুখখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নজর রাখে কোনও পড়ুয়া ফাঁকি দিচ্ছে কিনা। একঘেয়ে প্রাণহীন চিৎকার বন্ধ করে মাথা হেঁট করে বসে আছে কিনা কেউ। ফাঁকি দিক বা না দিক তাতে কিছু আসে যায় না। খাঁহু বোষ্টমীর কুতকুতে চোখের কুনজর যার ওপর গিয়ে পড়বে তার আর রক্ষে নেই। সারাটা সকাল বিকেল প্রাণপণে চেষ্টালেও গদি-ঘরের খেরো-বাঁধানো লাল খাতায় তার নামের পাশে চ্যারা পড়বে। অর্থাৎ সে-সম্প্রদায় চাল ছুনের ববান্দ থেকে অর্ধেকটা ছাটা হয়ে গেল।

নামে ক'চি আর জীবের দয়া—কলির জীবের জন্তু এই সহজ পন্থাটি বাস্তবে দিয়ে যিনি জগৎকে উদ্ধার কবতে চেয়েছিলেন, তিনি কল্পনা করতেন দেবের পুত্র তাঁর সেই প্রেম নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে কি চমৎকার ফাঁদ পাতা যাবে। আর সেই ফাঁদে পা দেবার জন্তে বাঙলার নিভৃত পল্লী থেকে দলে দলে হতভাগিনীরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে পোড়া পেটের দায়ে। টাকা জুটলে জীবের দয়া দেবার জন্তে জীব খরিদ করা যাক, “তাদের দিগে” নামে ক'চির ফলাও লাবারও ফাঁদা যায়। এ বড় অদ্ভুত যন্ত্রটা চালু থাকবাব মন্দ যন্ত্রটাই জুটিয়ে চলেছে। আখের রস জাল দেওয়া হচ্ছে আখের ছিবড়ে দিয়ে। মাছেব তেলে মাছ ভাজা যাকে বলে।

নিতাই দামী তখনও নিতাই তখন, আর পাঁচটা গাঁয়ের মেয়ের মত গরুও একটা ঘণেঘা নাম ছিল নিশ্চয়ই। সেই নামটুকুমাত্র সম্বল কবে খাঁহু বোষ্টমীর নজবে পড়ে গেল সে। খাঁহু তার বাৎসরিক মকবে গিয়েছিল গ্রামে। প্রতিবারের মত এবারও ত্রুণটি অসহায় “বধবা যুবতী”কে বর্মপথে টেনে আনার সং-বাসনা নিয়ে দেশে গিয়েছিল সে। গুটি পঁচশেক না টাকার লোহ গমলাতে না পেবে নিতাইয়ের কাকা তাঁর পিতৃমাতৃকন ভাইবিকটিকে খাঁহু বোষ্টমীর হাতে গোর-গঙ্গা করবার জন্তে সমর্পণ করে দাখমুক্ত হবেন। প্রাপ্তর যথাকালে যথানিদিষ্ট স্থানে পৌঁছে নামগানের আখডায় নাম লেখালে নিতাই। গদি-ঘরের লাল খেরোবাঁধানো মস্ত খাতায় শব নতুন নাম উঠে গেল নিতাই দামী। সবই হুশ্জলে সমাধা হয়ে গেল, যেমনটি ঘটা উচিত ঠিক তেমনভাবে বিনা ওজর-আপত্তিতে ঘটে গেল সব কিছু। গদিঘরে বসে তিলক চন্দন তুলসী মালায় বিভূষিত ভক্তবর আখড়ার মালিক দেখলেন মুঠোর মধ্যে যায় এমন একটি কোমর। আরও যা দেখলেন তাতে তিনি নেপথ্যে খাঁহু বোষ্টমীকে তারিফ না করে পারলেন না। কিন্তু কে জানত যে—যে-ফুল মধুতে টুটুট করছে, তার কাঁটায় অত বিষ!

ধর্মপ্রাণ আখড়া পরিচালকের বিরাট অট্টালিকায় ভাগবত পাঠ শোনার জন্ত

খাঁহু নিয়ে গেল তার ছোট্ট শিকারটিকে। কিন্তু শিকার ছোট্ট হলে কি হবে, জাল কাটতে জানে সে। ফলে ঘটে গেল এক অভাবনীয় অচিস্তনীয় ব্যাপার। সেই অসময়ে সকলের অন্ধেয় শহর-বিখ্যাত গুণী ব্যক্তিটির শাস্তিকুঞ্জের সামনে বিরাট ভিড় জমে গেল। দাবোয়ানদের কাবু করে মার মার সঙ্গে মাছুষ ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। পাওয়া গেল নিতাইকে, অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া গেল। নথ আর দ্বাত এই দুটি অহিংস অস্ত্রের সাহায্যে সে বাঁচিয়েছে নিজেকে। তাব ওপর আর যা করেছে তার জন্তে তামাম মাছুষ তাকে মাথাষ তুলে নাচতে লাগল। পাচ-পঞ্চাশ বছরব নাহুসমুহুস সেই ভক্তপ্রবরটিকে ভয়েষ মত কানা করে দিয়েছে নিতাই, দু'হাতে তার দু'চোখ খাবলে তুলে নিয়েছে।

কেলেকারি যতদূর হবাব হয়ে গেল। ক্রমে লোকেব উচ্ছ্বাসে তাঁটাব চান দেখা দিল। তখন পিছিয়ে গেল সকলে। কে নেয মেঘেটাব ভার? সহজে কেউ এগোয় না ও মেঘেব দিকে হাত বাডাতে। যাযা এগোয তাদেব নজর দেখে নিতাই দম্ভনথর বাব করে। তাবপর খোলা রাজপথ। এ হেন চরম দুদিনে, যখন একগাছা খড়কুটো ধরতে পারলেও নিতাই বর্তে যায় তখন এল সেই মাহেন্দ্র-কর্ণটি। আমার নিতাইয়ের চার চোখের মিল হয়ে গেল।

মনে মনে কি মতলব ভেঁজে মেনিন নিতাই সেই পুণাধামেব ঋশানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তা সে-ই জানে। হঠাৎ আমার নজর পড়ল তার ওপর। নজর না পড়ে পারে না। ঢাকবার মত সম্পদ রয়েছে অথচ তার উপযুক্ত আবরণটুকুও নেই, ক্লক চুল, বন্ধ পাগলের মত চোখ-মুখের অবস্থা—একটি বহিঃশিখা ঋশানমুন্ধ সকলেব লোলুপ চাউনিকে বিন্দুমাত্র গ্রাছ না কবে ঘুরে বেডাচ্ছে। আমি দেখলাম—কি দেখেছিলাম ওর মধ্যে আজও বেশ মনে আছে। আমাব মনে হয়েছিল যে চিবুবার মত এক মুঠো কিছু, আর এক পেট ঠাণ্ডা জল ওকে তখুনি দেওয়া প্রয়োজন। তুলে গেলাম নিজের হীন অবস্থার কথা, নেংটি-চিমটে-কলকে-সম্বল হাডহাভাতে ঋশানচারীরব চালাকি নিমেষের মধ্যে ছুটে গেল আমার দেহমন ছেড়ে। আমার সেই বীভৎস মূর্তি নিয়ে সোজা উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ওর সামনে। বলেছিলাম—মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ছোট একটা অমুরোধ—“এস আমার সঙ্গে।”

চোখ তুলে নির্জলা নির্গুণ দৃষ্টিতে কয়েকটি মুহূর্ত চেয়ে ছিল নিতাই আমার দিকে। তারপর কয়েকবার আমার আপাদমস্তকে সে বুলিয়েছিল তার সেই অস্বাভাবিক বৃত্ত দৃষ্টি। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল—“চল—কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে।”

আমার মত আর যে কটি ফালতু মানবসন্তান আশানে পড়ে মজা লুটছিল, তাদের ঠোটকাটা টিপ্তনীর বড গায়ে না মেখে নিতাইয়ের পিছু পিছু মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিন সেই আশান থেকে ।

কিস্ত তারপর ?

রাজপথ আশান নয়, রাজপথের ইজ্ঞা আছে । তার বকের ওপর দিয়ে নেংটি-চিমটে-সদল আশানচাবী পিছনে একটা জলন্ত ঘোঁরন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পাবে না । অযথা ফেট লেগে গেল । এল একটা মর্যাস্তিক ঘুণা নিজের ওপর । ওব পাপে নিজেকে মনে হল হানতম হান চবম অপদার্থ জীব, তুচ্ছাণ্ডিতুচ্ছ রাস্তাব ঘোষো কুকুর বলে মনে হল নিজেকে । আশানে বসে যা বাগিয়েছিলাম তাই দিয়ে তাড়াতাড়ি ওকে বিনে দিলাম দই মিষ্টি খাবার । হাত পেতে নিলে নিতাই, গঙ্গান ধারে বসে ধীরে স্বপ্নে গিললে সব খাবার । গিলে আজলা আজলা জল খেয়ে এল গঙ্গায় গিয়ে । ফিবে এসে ছেঁড়া আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে সেই প্রথমবার ওর রহস্যময় ভঙ্গিমায জিজ্ঞাসা করলে—“কি গো ঠাকুর, মদল • তোমার মদল হয়ে গেল । এবার আমার ক্ষিদে পেলে খাওয়াবে কি ?”

জবাব—হা—তৎক্ষণাৎ দিতে পেরেছিলাম তার জবাবটি । বলেছিলাম—
“তুমি সঙ্গে থাকলে কোনও কিছুই অভাব হবে না কি ?”

তারপর আর কোনও কথা নয়, ছেঁড়া আঁচল পেতে আমার পাশে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়েছিল নিতাই । ওর মেন কথা দুটি এখনও বাজছে আমার কানে—
“তাঁহলে আমি এবাব ঘুমিয়ে নিই একটু । তুমি বসে পাহারা দাও আমাকে । দেখো, যেন শেয়াল শকুনে খাবলে না খায় ।” বলে নিতাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল ।

আর চোবের মত কিছুক্ষণ পবেই পালিয়ে গিয়েছিলাম আমি ।

দীর্ঘ পাঁচটা বছর পিছলে পার হয়ে গেল । এষাট ওষাট মে-ঘাট—সাত ঘাটের পানি গিলে শেষে উদ্ধারণপুরের ঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম । সগৌরবে আসীন হলাম এই রাজঘাটের রাজপাটে । ধরাকে সরা জান করতে শিখলাম । নিজেকে নিজে রাজাধিরাজ জানে পূজা করতে শুরু রলাম । ছোট্ট নিতাই কোথায় তলিয়ে গেল । চাপা পড়ে গেল যুগযুগান্ত ধরে সঞ্চিত উদ্ধারণপুরের আশানভন্দের তলায় ।

তারপর আচম্ভিতে একদিন মন্দিরা আর একতারা বেজে উঠল আমার রাজপাটের সামনে। কষ্টিপাথরে কৌদানো চরণদ্ব্যসকে নিয়ে চুড়ো-বাঁধা নিতাই বোষ্টমী এসে দাঁড়ালো উদ্ধারণপুরের ঘাটে। কি গান যেন গাইছিল ওরা সেদিন ? হাঁ—মনে পড়েছে—

“কুল মজালি ঘর ছাড়া
পর করিলি আপন জনে।
বঁধু তোম পিরিতির এই কি রীতি,
কাঁদি নিশি নিরঞ্জে ॥”

ঝিমিয়ে-পড়া আশুনটার দিকে চেয়ে—নিজেই ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। চমকে উঠলাম। আবার কথা বলছে চুড়ো-বাঁধা নিতাই বোষ্টমী। আরও কাছে সরে এসে প্রায় আমার গদি ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সে।

ও কি। কোঁতুক না পরিহাস ? না অস্ত্র কিছু নাচছে বোষ্টমীর দুই হালা চোখে ! কোথায় যেন একবার দেখেছিলাম ঐ চাউনি !

হাঁ—মনে পড়েছে, দেখেছিলাম একটা বৈজির চোখে। রাধু মল্লিক আমার ছোটবেলার বন্ধু। তাব পোষা বৈজিটি সদাসবদা তার কাঁধের ওপর চড়ে থাকত। ঠাট্টা করে আমবা সেই বৈজির নাম বেখেছিলাম মল্লিকা। একবাং মল্লিকা একটা হাত-দেডেক লম্বা গোথ্রোকো ঘিবেছিল। ফণা-ধবা সাপটার সামনে দাঁড়িয়ে গায়ের হোঁয়া ফুলিবে ঠিক ঐ দৃষ্টিতে চেয়েছিল তাব শত্রুর দিকে। দূর থেকে সেই সাপে-নেউলের খেলা দেখেছিলাম আমরা।

বকের মধ্যে ধুক কণে উঠল। বছদিন পরে আবার নিতাইয়ের সামনে নিজেই একান্ত অসহায়, হীনতম হীন, চরম অপদার্থ জীব বলে মনে হল। দেউ হাত পুরু মডার বিছানার মৃত মর্যাদা বুঝি গোলায় যায় এবাং।

শেষবারের মত শেষ চেষ্টা করলাম নিজেকে বাঁচাবার। শেষবারের মত একবার চতুর্দিকে নজর ফেলে দেখলাম, না, একটাও চিতা জ্বলে না, একটা প্রাণীও পুড়ে না কোনও চিতার ওপর। কেউ নেই যে আমার রক্ষা করে।

অবশেষে আত্মসমর্পণ। যা খুশি ওরা করুক এবার। আর পারি না।

বললাম—“সই, বস না একটু আমার পাশে। তোমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নিই। উঃ, কতকাল যে ঘুমোই নি। একা একা বড্ড ভয় করে এখানে, চোখের পাতা এক করতে পারি না কিছুতে। উঃ—”

বলে ছ' চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম গদির ওপর ।

সফল হল আমার আত্মসমর্পণ । অসঙ্কোচে বসে পড়ল নিতাই আমার পাশে ।
তুলে নিলে আমার মাথাটা নিজের কোলে । খুব ধীরে ধীরে বোলাতে লাগল
তার হাতখানি আমার চোখে কপালে । ঝলম্বানো মাংস পোড়ার গন্ধ নয়, এ গন্ধে
কেমন যেন নেশা ধরে যায় । গন্ধটা আসছে নিতাইয়ের নরম হাতের আলতো
স্পর্শ থেকে । সন্তর্পণে চোখ বুজে পড়ে রইলাম ওর সেট নরম কোলে মাথা
রেখে ।

অনেকক্ষণ পরে গুনগুনিয়ে উঠল ওর গলা । সামান্য ঝুঁকে পড়েছে নিতাই,
ওর ঈষৎ তপ্ত মুহু শ্বাস পড়ছে আমার মুখের ওপর । চাপা গলায় গাইতে
লাগল—

এ কি । এ যে সেই সুর ' সেট গান ।

“জালা হল মোহন বাঁশ

আর জালা তোর রূপেব রাশি

আমাব নয়ন মন উদাস

বিনা কালা দরশনে ।

কুল মজালি ঘর ছাডালি

পর করিলি আপন জনে

বধু তোর পিরিতিব এট কি দাঁড়ি

কাদি নিশি নিরজনে ॥”

নিরজনে কাদে কে '

কেন কাদে ? কাদবাব মত কোথাও একটু স্থানও কি মেলে নি ?

কেন কাদতে আসে উদ্ধারণপুরের ঘাটে ?

কাদে আমার রাজশয্যা ।

লেপ তোশক কাঁথা আর কাঁথ' তোশক লেপের স্তূপের ভেতর থেকে গুমরে
উঠছে কান্নার কণরোল । ওরা কাদে কারণ ওদের ফেলে রেখে তারা চলে গেছে ।
একদা যারা এই সব লেপ তোশক বাঁধাব সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে স্বপ্নেব জাল বুনত
তারা আর নেই । আছে শুধু তাদের স্বপ্ন—শয্যার প্র ত অণু-পরমাণুতে মেশানো ।

তাই এরা কাদে । কাদে আর আমাকে শোনায় এদের দুঃখের কাহিনী ।

শোনায় এদের মর্মহেঁড়া স্থূথের কাহিনীগুলিও । শোনায় কে কবে ওদের ওপর শুয়ে
 কার গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে কি কথা শুনিয়েছিল, কবে কোন্ বঁধুয়া তার
 বিরহিণীর মান ভাঙ্গাতে কি ছলনায় ছনোছিল,—একজনের নিবিড় আলিঙ্গনের
 মাঝে শুয়ে অপবের শ্রুতি বৃকে নিয়ে বিষেব জালায় জলেপুড়ে বাটত কার রাত ।
 লেশ শোশক কাঁথাবাও কাঁদতে জানে, নিরঞ্জে কাঁদে তারা । শুধু আঁমি শুনি
 তা দেব কারা আব শুনি নির্লজ্জ লোলুপতার উলঙ্গ ইতিহাস । বক্ত মাংস মজ্জা
 মেদেব জন্তে বক্ত মাংস মজ্জা মেদের বাঙালপনা । সে ইতিহাস বাগ-আন্তর্য্য
 ছিল চাতুরী উরেগ উৎকণ্ঠা আর হা হাশ দিয়ে গড়া, আগাগোড়াটাই বিডম্বনাময় ।
 কবিতা সেই বিডম্বনা দিয়ে গান বচনা ববেন—

“আমাব এ-কূল ও-কূল দু কূল গেল
 অকূলে ভাসি এখনে ।”

অকূলেই ভেসে গেছে তারা । এই উদ্ধারপন্থের ঘাট দিয়েই করেছে সবাই
 শেষ যাত্রা । সে যাত্রাব এ-কূল ও কূল দু কূলই নেই । কিছুই সঙ্গে নিতে পারে
 নি । সব পড়ে আছে এ কূলে । এমন কি প্রতি রাতের প্রতিটি প্রেম-অভিমান
 বিরহ-মিশন মোহাগ ভালবাসা আব ছা-কলা,—এই সমস্ত তিক্ত মধুর পালাথেলার
 জলজ্যাস্ত দাসী—সেপ কাঁথা শোশা গুলিকেও সঙ্গে নিতে পারে নি । রেখে গেছে
 আমার জন্তে এই শয্যা, যে শয্যাব সঙ্গীত কলিবিলা করছে কোটি কোটি জীবগু,
 ক্ষুবর্ত্ত আব বিবাক্ত বামের জীবগুগোষ্ঠী । আর সেই জীবগুগোষ্ঠীর সঙ্গে শুয়ে
 আঁমি গান শুনা'ছ

“একি হল, হায় রে মরি—
 ধৈর্য্য ধরতে পারি—
 আঁমি পলকে প্রলয় হেরি—
 এমনে বাঁচি কেমনে ।”

কেমনে বাঁচা যায় ?

ক্ষুবর্ত্ত জীবগুর বিবাক্ত দংশনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি ?

উপায় ব্যবধান ।

উপাবান সেই ব্যবধান রচনা করেছে । নিতাইয়ের নিখুঁত নিটোল বাম উকুর
 ওপর ডান কানটা চেপে শুয়ে আছি । বা কানের ঠিক এক বিষত উচু থেকে

নিতাই গান ঢেলে দিচ্ছে। অতএব জীবগুর ক্রন্দন আর কানে যাচ্ছে না। কিন্তু শাস্তি নেই তাতেও। সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর গাঢ়ছে বোষ্টমী। সামান্য একটু চাপ পড়ছে আমায় মাথায়, অতি কোমল নিতাইয়ের বুকের চাপ। কিন্তু শীতলতা নেই সেই মুহূর্তে। নিতাইয়ের নিটোল উরু আর গোধ হয় তার বুক ও জলছে। সর্বাঙ্গ জলছে তার। সে গাইছে—

“উপায় কি লনিতে—

অঙ্গ ভলে রক্ষা পিঁড়িতে।”

যে অঙ্গ জলছে রক্ত পিঁড়িতে সেই অঙ্গ হল আমার উপাধান। হুতরাং শাস্তি কোথায় ?

দুধে-আলস্যে গোলা রঙের নিটোল নিখুঁত শিল্পকলা, কাঁচা মাংসের অপরূপ ভাঙ্কণ। মাহুসের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার ডগ্গে দুধের মত সাদা সামান্য আবরণ দিয়ে ঢাকা পান্না। পান্নাও নাধ কাঁচা শেম্ভিড আর সাদা থান, ও আবরণে কিছুই আবরণ হয় না। প্রতিটি রেখা আবরণ তৈরি আরও প্রথর ওঠে। আরও দুপার হয়ে ওঠে ওর আবরণ, মাহুস বড় বেশী সচেতন হয়ে ওঠে নিজের সম্বন্ধে ওর দিকে চেয়ে। এই কাঁচা মাংসের পাকা শিল্পকলা যেন গ্রাস করতে চায় মাগুয়ের মন বুদ্ধি আর চিত্তবিশ্রান্ত জ্ঞানকে।

লক্ষ কোটি স্মৃতি জীব গুণ মায়াবাদি করেছে আমার উপাধানে। প্রতি মুহূর্তে গ্রাস করতে এগে অপরণে, প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি প্রাণের বিনাশ। কোটি কোটি প্রাণের স্মরণ। এই অসাব্য সাধন হচ্ছে যে অমোঘ মন্ত্রণে সেই মন্ত্রটি শুনিছি আমি ভান গান দিয়ে, যে কানটা চাপা আছে নিতাইয়ের নিটোল নিখুঁত উরুর ওপর। শুনাচ্ছি—

ও ত্রক্ষাস্ত্রসমুত্তমশেষরসমস্তবৎ।

আপারং মহাপাতং পীযুষমসবহ।

অখণ্ডৈকরসানন্দ কলেবর সুধাত্মন।

অচ্ছন্দশূন্যগামত্র নিধেহকুলকপাণ।

অকুলস্বাস্থ্যাকারে সিদ্ধজ্ঞানকলেবরে।

অমৃতত্ত্বং নিধেহস্মিন্ বস্ত্রনি ক্লিন্নকপিণি।

শ্রীপাত্র । প্রাণস্পন্দিত মহাপাত্র । এই পাত্রের মন্ত্রপুত বারি-সিঞ্জে নিম্নাণ উপচারে প্রাণ সঞ্চার হয় । এই পাত্র অতি নিখুঁত আর অতি সুদর্শন হওয়া চাই । এই ‘আপুরিতং মহাপাত্রং’ যথাবিহিতরূপে স্থাপন করতে পারলে সাধকের সিদ্ধিলাভ হয় সাধনায় । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বটুকু জেনে মাহুষ এ-কূল ও-কূল হৃ-কূলের জন্তে আর হা-হতাশ করে না ।

কিন্তু আমার পোড়া কপালে শ্রীপাত্র জুটলেও তা স্থির থাকতে চায় না । চলমান চঞ্চল শ্রীপাত্রে পূজা সুসম্পূর্ণ হয় না আমার ।

বী কানে ঢালতে থাকে বিষ নিতাই বোষ্টমী—

“বন্ধু আমার চিকণ কালা

সঙ্গেতে বাজায় বাঁশি বদমতলা

নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশি—”

অসম্ভব রকম নড়ে উঠল আমার শ্রীপাত্র । লাফিয়ে উঠে বঙ্গলাম গদির ওপর । আমার একটা হাত সজোরে চেপে ধরেছে নিতাই । অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে আমার চোখের দিকে । তার দুই চোখে ফুটে উঠেছে সন্ত্রাস । নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, একেবারে কাঠ হয়ে গেছে সে ।

একটু পরে আরও কাছে, প্রায় আমার কানের সঙ্গে যুথ ঠেকিয়ে খুব চুপি চুপি বললে—“শুনছ গোসাঁই ? শুনতে পাচ্ছ ?”

আমিও কাঠ হয়ে গেছি । কি শুনব ? কি শুনে অত ভয় পেয়েছে ও ?

“শুনছ না কিছু ? ঐ যে একটা কচি বাচ্চা কাঁদছে—ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে— । এইবাব শুনচ ?”

কান ঠিক করে তাক কবলাম । হাঁ, এবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি । গঞ্জার ভেতর থেকে আসছে ছোট ছেলের কান্নার শব্দ । ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া ।

ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া ।

ঠিক একটা কচি ছেলে কাঁদছে । আওয়াজটা আসছে গঞ্জার ভেতর থেকে ।

এ কি ব্যাপার । কেউ ফেলে দিয়ে গেল নাকি কচি ছেলে ? বোথা থেকে এলো ঐ কচি শিশু মণ্ডাস্থানে ?

“শুনছ গোসাঁই ? এবারে শুনতে পাচ্ছ ঐ ডাক ? আমায় ডাকছে, আমায় যেতে হবে । তোমাকেও যেতে হবে গোসাঁই । কিছুতেই আমি ছেড়ে যাব না তোমায় এখানে । নিশ্চয়ই তারা টের পেয়েছে । তোমাকে হুচ্চ টানাটানি করবে ।

চল গোঁসাঁই, গুঁঠ শিগুগির । এখুনি এসে পড়বে তায় ।”

দু’খানি হাত দিয়ে চেপে ধরেছে নিতাই আমার ডান হাতখানা । বেশ বুললাম ঠক্কর করে কাঁপছে সে ।

উৎকর্ষায় উত্তেজনায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর ।

“গুঁঠ গোঁসাঁই, নেমে পড় এখন থেকে । এখনও উপায় আছে । চল এখনিই নেমে পড়ি গঙ্গার জলে, চল—”

হঠাৎ চূপ করে স্থির হয়ে রইল কয়েকটি মুহূর্ত । তারপর মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে রইল বড় সড়কের দিকে । তার দৃষ্টিকে অন্তসরণ ক’রে আমিও চেয়ে রটলাম ।

“ঐ যে, ঐ দেখ, ঐ তারা আসছে, আলো দেখা যাচ্ছে ।”

টপ করে নেমে দাঁড়াল গঙ্গির সামনে বোষ্টমা । তখনও দু’হাতে আঁকড়ে ধরে আছে আমার একখানা হাত । এবার আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম বড় সড়কের ওপর উজ্জল হয়ে উঠেছে, যেন এগিয়ে আসছে অনেকগুলো আলো । তারপর কানে গেল অনেক লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর । সত্যিই কারা এগিয়ে আসছে এখানে ।

কিন্তু এত রাত্রে কার এত বড় সাহস হল আশানের মধ্যে নামবার ? কে ওরা ? কি উদ্দেশ্যে আসছে এখানে ?

“আমাদের ধরতে আসছে গোঁসাঁই, নিশ্চয়ই ওরা ধরতে আসছে আমাদের । এস নেমে । এখনও উপায় আছে, চল পালাই ।”

“কে ধরতে আসছে ? কেন আসছে ধরতে ?”

কয়েকটি মুহূর্ত চূপ কবে রইল নিতাই । তারপর কান্নায় আর মিনতিতে ভেঙে পড়ল তার কণ্ঠস্বর ।

“সব তোমায় বলব গোঁসাঁই । সব তুমি জানতে পারবে । এখন নে এস । চল পালাই ।”

দু’হাতে সজোরে টান দিলে আমার দু’হাত ধরে ।

আরও শক্ত হয়ে বসলাম । হাত ঘুরিয়ে ছাড়িয়ে নিলাম নিজের হাত দু’খানা । বললাম—“পালাও তুমি সহি । আমার দরকার নেই পালাবার । কোনও অস্ত্রায় করি নি আমি । কেউ ধরতে আসছে না আমাকে ।”

মাথা হেঁট করে কয়েক মুহূর্ত চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল । তারপর নিচু হয়ে ওদের ঝোলা ছুটো, একতারাটা আর সরু মাদুর দু’খানা তুলে নিয়ে দ্রুতপদে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে । গঙ্গার দিক থেকে ওখনও কচি ছেলের কান্না শোনা যাচ্ছে—গুঁয়া গুঁয়া গুঁয়া ।

ঠিক সেই মুহূর্তে বড় সড়কের ওপরে শোনা গেল খন্ডার গলা ।

“শেষবারের মত সাবধান করছি দারোগাবাবু। খবরদার নেমো না রাতে ঝাশানের ভেতর। ডাকিনী যোগিনী নিয়ে খেলা করেন বাবা এখন। কখনও এক প্রাণী নামে না ঝাশানে সন্ধ্যার পর। মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরবে কেন খামকা !”

প্রচণ্ড এক দাব্‌ডি শোনা গেল ।

“চোপরও ব্যাটা ছুঁচো। ফের একটি কথা কইবি ত তোকে হুঙ্ক চালান দোব। সেই ছুঁডি বোষ্টমীকে নিয়ে এখন কেলি করছেন তোঁর ভৈরব বাবা। ব্যাটা ভণ্ড সাধু, ডাকাতের সর্দার। সেই হারামজাদা বোষ্টম বাবাজীকে দিয়ে মাহুধ খুন করায় আর ঐ ছুঁডিকে দিয়ে মাহুধকে ফাঁদে ফেলে। অনেকদিন ধরে আমি লক্ষ্য করছি যুঘুদের চালচলন। আজ গুপ্তিহুঙ্ক সব ধরা পড়বে।”

আরও কাছে এসে পড়ল। এবার নামছে বড় সড়ক থেকে। নিমগাছতলা আলোয় আলো হয়ে উঠল। একজন দু’জন নয়, এক পাল মাহুধ নেমে আসছে।

কিন্তু তাদের জন্ত বসে অপেক্ষা করার সময় একদম নেই বাবা ঝাশান-ভৈরবের। অগত্যা নেমে আসতে হল সেই গাঁদি থেকে। বহির্ভাস খুলে রেখেই আসতে হল।

ঝাশানের দক্ষিণ দিকে সত্ত-নেভানো একটি চিতার ওপর রাশীকৃত কালো কয়লা বেদীর মত উঁচু হয়ে বয়েছে। আজকের মত ঐ আসনেই বসতে হবে।...

ওধারে আমার গদির সামনে থেকে হাঁপার শোনা গেল।

“কই, গেল কোথায় সে হারামজাদা ? ভেগেছে হারামজাদীকে নিয়ে ! এই পাঁড়ে, তুম দেখো উধারমে, দো আদমী দেখো পিছুমে, আউর তিন আদমী আও হামারা সাথ। আর এই শালা বামনা কোথায় তারা ? দেখা শিগ্গির কোথায় লুকলো তারা ?”

সিধু কবরেজের গলা শুনতে পেলাম। সে কাঁই কাঁই করে উঠল—“আজ্ঞে হুজুর, ছিল ত তারা এখানেই। বোষ্টমী ছুঁডি ত আগাগোড়াই ছিল এখানে। বাবাজী বেটা এই কিছুক্ষণ আগে খোল বাজিয়ে এল ওখান থেকে।”

এক সঙ্গে বহু নারীকণ্ঠ ঝাঁজিয়ে উঠল—“মুডো জেলে দোব মুখপোড়া ঘাটের মড়ার মুখে। খেংরে বিধ ঝেড়ে দোব বামনার। দাঁড়া না মুখপোড়া, আগে যাক তোঁর দারোগা বাবা, তারপর আমরা তোঁর কি খোয়ার করি ত্যাখ্।”

সমাদার দারোগা হুংকার দিলে আর একটা, “চোপরও হারামজাদীরা, জুড়িয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব এখনিই।”

সমবেত কণ্ঠে হারামজাদীরাও ক্রথ উঠল—“আয় না আয়, এগিয়ে ত্যাগ না
রক্তখেকোর ব্যাটা—”

সকলের কণ্ঠের ছাপিয়ে শোনা গেল খস্তা ঘোষের গলা—“দারোগা বাবা,
আগে প্রাণ বাঁচাও নিজের। তোমার সব নিতে এবার গোলায় গেছে। বাবা
অদৃষ্ট হয়েছেন, সেখান থেকে তোমার ঘাড় ছিঁড়ে রক্ত খাবেন এবার।”

অশ্রাব্য ভাষায় আবার গালাগালি দিয়ে উঠল সাধুরাম সমাদ্দার। দিয়ে
গজরাতে লাগল—“তখনই ধরতাম শালা শালীদের। ভাবলাম দেখাই যাক না
ব্যাটার ভিটকিলিমি—রাতে ছু ডিটাবে পয়স্তু ধরব, যখন কেলি করবে তার বাপের
সঙ্গে। তাই দু’পাত্রে চেনে দাঁত-ছরকুটে পড়ে রহলাম। কে জানত শালা আমার
চেয়ে ধড়বাজ। ঠিক সচকেছে—আমাব নাগের ডগা থেকে।”

এবার ক্রথ উঠল ময়না। ময়না সবচেয়ে কম বয়সের বুমুরী মেয়ে। দারোগা
ওর ঘরেই পড়ে ছিল এতক্ষণ। চিলের মত গলা ময়নার, সে চোঁচাতে লাগল প্রাণ-
পণে—“তোমার মুখে ছাই পড়ুক অল্পেয়ে মিনসে, শেয়াল শকুনে ছিঁড়ে থাক তোমার
জিব। যে মুখে তুমি বাবার নামে ও-সব কথা বলছিস সে মুখ দিয়ে যেন ও-রক্ত
ওঠে। হে মা আশানকালী, যেন তেরাজি না পেরোয় মা—”

যা মুখে এল তাই স্বর করে অ’ ওড়াতে লাগল ময়না। এধাবে মস মস জুতোর
শব্দ শোনা গেল গঙ্গাব দিক থেকে। একটু পরে দু’মুঠি লাঠি ঘাড়ে করে আলো
নিয়ে বেদীটার সামনে এসে উপ স্থত হল। পবমুহুর্তেই হাউনাদ করে উঠল ওরা।
লাঠি আলো ছিটকে চলে গেল এক দিকে। বিকট চৎকার করতে করতে ওরা
উপর দিকে দৌড় দিলে।

সমস্ত আশান নিস্তর হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় কি সব আলোচনা হল
ওখানে। শেষে দু’তিনটে আলো নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল কয়েকজন।

সামনে সমাদ্দার দারোগা। জান হাত বাগিয়ে ধরে আছে পিস্তলটা। ডাইনে
বায়ে ঘন ঘন চাইতে চাইতে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে জনা-দশ বাবো মাল্লুস।
বেদীর সামনে এসে পৌঁছল সকলে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। দারোগা সাহেব বুবুবু করে
তোৎলাতে লাগলেন। তোৎলাতে তোৎলাতে পিস্তল হাতে টলতে লাগলেন।
ছুম ছুম করে দুটো আওয়াজ হল। দু’বার আগুনের শিখা দেখা দিল পিস্তল
থেকে। তারপর দারোগা সাহেব দমাম করে মুখ খুবড়ে পড়লেন গাছ-পড়া
হয়ে।

ওথার থেকে কুম্ভী মেয়েরা আকাশ ফাটিয়ে হাহাকার করে উঠল।

শ্রাশানের একেবারে দক্ষিণ সীমায় একটা নেভানো চিতার রাশীকৃত পোড়া কাঠকয়লার ওপর উলঙ্গ এক মূর্তি বসে আছে। একথানা মডার হাড়, বোধ হয় কারও কছুই থেকে কজ্জি পৰ্বন্ত, তার মাঝামাঝি কামড়ে ধরে আছে, মুখের ছ'ধারে বেরিয়ে আছে হাড়খানা। আর দুটো আধ-খাওয়া মডার মাথা ধরে আছে ছ' হাত দিঘে বৃকের কাছে। লোকটি শিবনেত্র, যেন এতটুকু বাহুজ্ঞান নেই তার।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখেই দারোগা সাহেব আর সামলাতে পারেন নি নিজেকে।

ধীরে ধীরে সামনে পেছনে ছলতে লাগল সেই মূর্তিটি। রামহরি পঙ্কা আর খস্তা ঘোষ বৃক ফাটিয়ে চিংকাব করে উঠল—“জয় বাবা শ্রাশানভৈরব, জয় বাবা মহাকাল।”

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম চিতার ওপর। তখনও মুখে সেই মাতৃষের হাত কামড়ে ধবে আছি, ছ'হাতে আছে দুই মডার মাথা। সেই অবস্থায় নেমে এলাম চিতার ওপর থেকে। নেমে এসে মডার মাথা দুটো নামিয়ে রাখলাম দারোগার পিঠের ওপর। তারপর মুখ থেকে হাড়খানা নামালাম। পবম আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। খুব চুপি চুপি যেন নিজেকেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম—“কে? কে তোরা?”

উত্তর নেই কারও মুখে। সবাই এক পা ছ' পা পিছিয়ে গেল। আমি এগোলাম এক পা ছ' পা করে। আর একটু গলা চড়িয়ে বললাম—“কি চাস তোরা এখানে? কেন এ সময় মরতে এলি এখানে তোরা?”

দুর্দান্ত খস্তা ঘোষের গলা দিয়ে মেনী বেড়ালেব স্বর বার হল।

“বাবা গো, দয়া কর বাবা, আমি তোমার অধম সন্তান খস্তা গো বাবা। আমাক চিনতে পারছ না তুমি?”

গ্রোহণ করলাম না ওর কথা। আরও ছ' পা এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। ধীরে স্বস্থে চিবিঘে চিবিঘে বললাম—

“হায় হায় রে, কেন মরতে এলি তোরা এখন শ্রাশানে। এখন যে আমি বলিদান দেব মা চামুণ্ডার। যা যা যা, এখনও পালা এখান থেকে। ঐ দেখ, রক্ত খাবার জন্তে তাই তাই নাচছে ডাকিনী-যোগিনীরা। ঐ দেখ, মা এসে দাঁড়িয়েছে। যা যা যা, এখনও পালা এখান থেকে। নয়ত সবাইকে নিবেদন করে দেব আমি। কডমড়িয়ে চিবিঘে থাকে সব—”

নিমেষের মধ্যে কঁাকা হয়ে গেল আশান। সমাদারের সাড়ে-তিন-মণী বপুটা টেনে হেঁচড়ে তুলে নিয়ে গেল ওরা। ছুঁ দে দারোগা সাধুরাম সমাদার অটৈতন্ত বেহঁশ অবস্থায় প্রস্থান করলেন। পিঙ্কলটা কিন্তু তখনও তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন হাতের মুঠোয়।

উদ্ধারগপুরের ঘাট।

মহাআশানের মহাশয়ার ওপর আবার গিয়ে বসে পড়লাম। তেঁয় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে তখনও বার হচ্ছে সেই হাড়থানার গন্ধ। ছুঁতাতের চেটোয় চটচট করছে মাফুয়েব পচা মাংস।

একটা বোতল তুলে নিলাম গদির পাশ থেকে। তারপর সেই বোতলের জলন্ত জল দিয়ে হাত দুটো ধুয়ে একটা কুলকুচো করলাম। বাকিটুকু ঢেলে দিলাম গলায়। গলা দিয়ে নামতে লাগল জলতে জলতে সেই তরল পানীয়।

কিন্তু তবু যেন তেঁটা মিটল না। সেই শয্যা, সেই সব কিছু ঠিক রয়েছে। কিন্তু কোথা গেল ঐ মাঝ উপাধান? এই ত ছিল, এখনও আমার ডান কানটা আর ডান গালটা যেন চাপা রয়েছে সেই উপাধানে। এখনও যেন ঈষৎ তপ্ত মুহু শ্বাস পড়ছে আমাব বাঁ গালের ওপর। আর অতি নরম একটা চাপ বোধ করছি মাথায়।

চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম গদির ওপর। লক্ষ কোটি জীবাত্মর ক্রন্দন নয়, মর্মে মর্মে অল্পভব কবলাম জীবনের স্পন্দন।

কানে বাজতে লাগল সেই স্বর—

“সই লো তার কাজল আঁখি

ডাকে আমায় ইশারাতে থাকি থাকি।”

উদ্ধারগপুরের হাসি।

সে হাসির চাউনি বড় তেরছা। সেই তেরছা চাউনির মদির সংকেতে মানুষ নাহোক নাস্তানাবুদ হয়। জাঁহাজ জুযাভীর হিসেবের জারিজুরি জড়িয়ে জট পাকিয়ে যায়। ফলে তখন সে যা তা দর হৈকে ফস্ক করে ফতুর হয়ে বসে। বাবা বাঠপাড় বুক উজাড় করে কাশা ঢেলে দিয়ে সেই মূল্যে উদ্ধারগপুরের তেরছা হাসি কিনে নিয়ে ধরে ফেয়ে।

দারোগা সাধুরামের একটি সাধু উদ্দেশ্য ছিল বুকের মধ্যে। ঠিকে-ভুল করবার

মাছুষ নন তিনি। উপায়ও ঠাণ্ডেই ছিলেন সঠিক। উদয় বোঝাই উৎসাহ উগরে দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন উদ্ধারণপুরের হাসি। অর্ধেক রাতে শ্মশান থেকে নিতাইয়ের তাজা দেহটা ছৌঁ মেয়ে নিয়ে সটকাতে পারলে তাঁর অনেক দিনের মনের সাধ মিটত। কিন্তু সে সাধে ছাই পড়ল। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন উদ্ধারণপুরের তেরছা হাসির ঠসক দেখে।

উদ্ধারণপুরের হাসি।

সে হাসির ঠসক বড় ঠাণ্ডা। সংশয় আর সন্ত্রাসের মিশ্রণে যে স্বর্ষা তৈরী হয় সেই বেরঙ স্বর্ষায় হুশোভিত উদ্ধারণপুরের হাসির আখিপল্লব। সে আখিপল্লব সিক্ত হয় না কখনও। সেই নির্জলা নিনিমেষ নয়ন দুটির সঙ্গে নয়ন মিললে মাছুষ নিজেকে নিতাস্ত নিঃসহায় নিঃসঙ্গ নিঃস্ব জ্ঞান করে।

কিন্তু এমন চোখও আছে যে চোখের পর্দা নেই। অতন মোডলের রক্তবর্ণ চোখ দুটো হেলে-গন্ধর মত এত বড় বড়। সে চোখেব চোরা চাউনিতে চিতার ক্ষুধা। ও চোখ অনেক দেখেছেন—অনেক চেখেছেন। মোডলের নিজের কথায় ‘পেত্যাক্’ কবেছেন। ঠসক দেখিয়ে ঠকানো অসম্ভব অতন মোডলের দৃষ্টিকে। মোডলের চোখের ওপর চোখ পড়লে উদ্ধারণপুরের হাসিব চোখও চুপসে যায়।

আমঅতন আর তার উপযুক্ত ভাইপো আমজীবন। ওরা দুজনেই একটা দল। ভাগ দেবার ভাবনার আর কাউকে দলে রাখে না—পাঁচ ক্রোশ হুঁই ঠেঙিয়ে শ্রেফ হুঁজনে বয়ে এনেছে ওদের মাল। মোডলের পাকা হাতের পাকা কাজ। বাঁশের সঙ্গে মড়া আর মাদুর এমনভাবে জড়িয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে এনেছে যে কার সাধ্য সন্দেহ করবে, ওর ভেতর আস্ত একটা মাছুষের হাড়-মাংস লুকিয়ে রয়েছে। একেবারে জলের ধারে বোঝা নামিয়ে বাঁশখানা খুলে নিয়ে খুড়ো ভাইপো এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। আকর্ষণব্যাধিত হাঁ করে মোডল একচোট বাহবা দিয়ে নিলে আমায়।

একটা কাজের মত কাজ দেখিয়েছি আমি, মোডলের মনের মত কাজ একটা করে ফেলেছি এতদিনে। একেবারে চক্ষু চড়কগাছে উঠে গেছে সকলের। যৎপরোনাস্তি খুঁশ হয়েছে মোডল। এই জাতের এক-আধটা খেল মাঝে-মধ্যে না দেখালে জব্ব থাকবে কেন মাছুষ? আর এ সমস্ত না হ’লে যে শ্মশানচণ্ডীর মাছাছোয় মরচে ধরে যাবে দিন দিন।

অর্থাৎ।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম ওদের শ্রীমুখ ছ'খানি। নাঃ, এতটুকু ধোঁকার ধোঁয়া নেই ওদের চোখেমুখে কোথাও। অর্থাৎ আমার এত চোখালো চালটাও বানচাল হয়ে গেল ওদের খুড়ো-ভাইপোর চোখে। ওদের চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব।

বেশ একটু চোট লাগল আমার যোগ-বিভূতিগুলোর গায়ে। অগ্নিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবদায়িতা, এঁরা আটজন আমার আট দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে গা-জ্বালানে হাসি হাসতে লাগলেন আমার দিকে চেয়ে। কিন্তু উপায় কি? মোডল যে অনেক “পেত্যাক্ষ” করেছেন, মাতৃসেব হুধে তামাকের তোয়াজ কবে তিনি নেশা করেন। তাঁর চোখে নেশা ধরানো সহজ কথা নয়।

সুতবাং গদিব তলা হাতড়ে বাব করলাম আমার তামাকের পুঁটলি। নিঃসম্বল হয়ে সবটুকু তুলে দিলাম মোডলের হাতে। আরও খুশি হলেন মোডল মশায়। থেবড়ে বসে পড়লেন সেখানে। তাইপোকে ছকুম কলেন বাঁশখানার সদগতি কবে আগুন আনবার জন্তে। জল নেই, দুধ নেই, শুকনো তামাক খানিকটা তাঁব বিরাট খাবার নিষ্পেষণে ভুজ হয়ে গেল। সেই ফাঁকে গোটা কতক সহুপদেশও দিলেন আমায়।

“জানলে গো গোসাঁই বাবা, এবাব তোমায় শিখিয়ে দোব মড়া-খেলানোর মন্ত্রটা। সে বিড়োটি একবার শিখে লাও যদি তা'হলে যমেও ডরাবে তোমায়। তবে এড কঠিন ব্যাপার বাপু। যাব নাব কশ্য নয় সেসব কাজে হাত দেওয়া।”

একান্ত বাধিত হয়ে দাঁত বাব করে হাসতে চেঁচা করলাম। যদিও ভাল করে জানি যে কিছুতে ও বিড়ো দেবে না মোডল কাউকে। আর দিলেও কোনও লাভ হবে না আমার। কারণ মড়া খেলাতে গেলে উপযুক্ত আধার চাই। একবার মাত্র মোডল বলেছিল আমায়, উপযুক্ত আধারের লক্ষণ কি কি। ডোম চাঁড়ালের মেয়ে হওয়া চাই। বয়স বিশ-বাইশের বেশী হলে চলবে না। ছেলেমেয়ের মা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শরীর বেশ ‘টনকো’ থাকা আবশ্যক। বেশী রোগে ভুগে মরেছে, হাড়গোড় বেরিয়ে গেছে এ রকম হ'লে চলবে না অর্থাৎ খুব তাজা হওয়া চাই মড়াটা।

উপযুক্ত আধারের লক্ষণাদি শুনে হাল ছেড়ে দিলাম। ও-রকম সর্ব-গুণাশ্রিতা পাত্রী জুটছে কোথায়?

এবং যতক্ষণ না জুটছে ততক্ষণ মোডল কিছুতে দেবে না সেই ওহ মন্ত্রটি—যে মন্ত্রবলে সেই সর্বস্বলক্ষণা যুতা যুবতী নড়েচড়ে উঠে বসবে। উঠে বসে ছ'হাত

বাড়িয়ে দেবে। অর্থাৎ সোজা কথায় দু'হাত দিয়ে আপটে ধরবে তাকে, যে মস্তবলে সেই মড়াকে জ্যান্ত করবে।

এরই নাম মড়া-খেলানো। মড়া-খেলানো যার তার 'কন্ম' নয়। আর উপযুক্ত আধার না হলে মড়া মড়াই থেকে যাবে। কিছুতে খেলবে না কোনও খেলা।

অতন মোড়ল পারে। পারে যুতা যুবতীর বুকে প্রাণস্পন্দন আনতে। পারে যে একথা সবাই জানে, সবাই বিশ্বাস করে। কিন্তু কেউ কখনও চাক্ষুষ করে নি। করবে কি করে? সে যে বড় গুহ্য ব্যাপার, লোকচক্ষুর অগোচরে ঘটবার মত— গুহ্যতিগুহ্য কাণ্ড-কারখানা সেসব। উপযুক্ত বিশ্বাসী পাত্র না পাওয়ার দরুনই মোড়ল কাউকে দিতে পারছে না তার গুহ্য বিত্তে।

তার নিজের ভাইপো আমজীবন, ভাইপোব মত ভাইপো। শুধু কাঠামো-খানিই নয়, খুড়োর মত গায়ের রঙ গলার স্বর সবই তার আছে। ছায়ার মত সে ফেরে খুড়োর পেছনে। তবু সে কিছু পায় নি। মোড়ল বলে—“সবুর হণ্ড গো, আগে বাড়ুক খানিক। দিন ত আর পালিয়ে যেচ্ছে না। আগে ভয়-ভর যুচুক, নয়ত আত্মকে কাঠ হয়ে যাবে যে।”

তামাককে হাতের তেলোর চাপে নরম ভুলভুলে বানিয়ে যত্ন করে তুলে দিলে মোড়ল কলকেতে। এবার আগুন চাই।

“কই র্যা—আগুন কই—আন লা হয় চকমকিটা।”

জবাব নেই।

চড়তে শুরু করল মোড়লের মেজাজ।

আবার এক হাঁকার—“ম'লি নাকি র্যা ভ্যাকরা—রা কাডিস নে ক্যানে?”

রা কাডা হল ওখার থেকে। রা নয়, একেবারে রাসভিনন্দিত কণ্ঠে রোমহর্ষণ রোদন-ধ্বনি উঠল গঙ্গার দিক থেকে।

“হেই—আমকাকা গো দেখ'সে—আমাদের মাল কুখায় পাচার হয়েছেন।”

কান নয়, ঘাভ খাড়া করে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল মোড়ল। তারপর তামাক হুক কলকেটা পেট-কাপড়ে গুঁজে হস্তদন্ত হয়ে ছুটল গঙ্গার দিকে।

উদ্ধারগপ্তের হাসি।

হাসির চোখে পর্দা নেই। সে হাসি হাসবার নিয়ম মানে না। স্থান কাল পাত্রের বাছবিচার নেই তার। সে হাসি ভবিষ্যের ভিটকিলিমিকে স্বেচি কাটে,

পুরুষকার পৌরুষকে । ই! করে গিলতে তাদ্রা করে । ছোবল মায়ে অহংকারের
আবদারের মুখে । তার চুষনে চির-রহস্যের চিরন্তন চাতুরী চির-নিজায় ঢলে পড়ে ।

ইক ডাক হংকারে সরগরম হয়ে উঠল উদ্ধারণপুরের ঘাট । এল রামহরি, এল
পঞ্চধর, হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সিধু ঠাকুর । ময়না, সুবাসী, কালো, ভোমরা
আর বাতাসী খাঁড়, ওরা কেউ নামল না শ্মশানে । বড সডকের ওপর দাঁড়িয়ে গলা
বাড়িয়ে দেখতে লাগল শ্মশানের ভেতর কি হচ্ছে । নেমে এল রামহরির বউ মেয়ে
কাঁখে করে । ডোম গুপ্তির বাকী রইল না কেউ আসতে । বড বড লাঠি বাঁশ
দিয়ে ধপাধপ পিটোতে লাগল সকলে আশপাশের ঝোপঝাড় । আর সকলের
সবকম হট্টগোল চাপিয়ে ওরা দুই খুড়ো-ভাইপো আমঅতন আর আমজীবন
দাঁপিয়ে বেড়াতে লাগল উদ্ধারণপুরের ঘাট ।

দেশছাড়া হয়ে ছুটেতে লাগল শেয়ালগুলো । শকুনগুলো চক্কর মারতে লাগল
আকাশের গায়ে । বড সডকের ওপর দাঁড়িয়ে শুভ-নিশুভ তাদের আত্মীয়স্বজনের
সঙ্গে গলা মিলিয়ে পাবত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল ।

এল না শুধু খস্কা ঘোষ ।

আসবে কি করে ?

সংজ্ঞাহীন সাধুরামের অনড অচল অঙ্গখানি নিয়ে সে বেচারি হিমশিম খাচ্ছে
রাত থেকে । সমাদ্দারের শাগরেদবা ছুটছে ধানায় । আসবেন সমাদ্দারের স্ত্রী
পুত্র আত্মীয়স্বজন । হোমগ্রাচোমরা বড সাহেবরাও এসে পড়তে পারেন সদর
থেকে । তারপর কার কপালে কি ঘটবে না ঘটবে সে ভাবনায় সকলরই মুখ চূন
হয়ে গেছে । ইতিমধ্যে আবার ঘটল এট কাণ্ড । মাহুর-চাটাইমো আঠেপুঠে
বাঁধা আস্ত একটা মাতুষের খড়-মুণ্ড হাত-পা সমস্ত লোপাট হয়ে গেল দিনপুপুর
বেলায় শ্মশানের ভেতর থেকে ।

কেলেঙ্কারি আর কাকে বলে ।

এধারে এক ফোঁটা গলা দিয়ে গলে নি কাল রাত থেকে । শেষ রাত থেকেই
তোড়জোড় করে সব সড়িয়ে ফেলেছে রামহরির বউ । বড বড হুজুরা আসছেন ।
এ সময় সাবধান হওয়া ভাল । সরকারী ভাটিখানা নয়, কাজেই আইন মেনে
চলতে হয় ।

হায় আইন । আইন-আক্রোশের অষ্টপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় উদ্ধারণ-
পুরের ঘাটে এসে ভেরা গেড়েছি । সেখানেও শান্তি নেই, আইনের আশ্রয়
সেখানেও সকলকে জিত বার করে ভেঙে আসছে ।

তেড়ে আসছে আইন আদালত ।

আমাদের সিধু ঠাকুর আইনজ্ঞ মাহুষ । সর্বপ্রথম তিনিই সচেতন করলেন সকলকে । তাঁর কাকড়া জাতীয় মুখখানি কাঁচুমাচু করে সামনে এসে দাঁড়ালেন ছ' হাত কচলাতে কচলাতে । মাটির দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলেন তাঁর আরজি ।

“হুজুরা আসছেন বাবা । এ সময় এই থিটুকেলটা আবার—

থেকে গেলেন । একেবারে লজ্জাবতী লতাটি । এ কেলেকারির জন্তে যেন উনিই যোল আনা দায়ী । নেকামি দেখে গা জলে উঠল । তেড়ে উঠলাম—
“হুজুরা আসছেন ত করতে হবে কি আমাকে ? পাণ্ডা অর্থা সাজিয়ে বসতে হবে নাকি ?”

মরমে মরে গেলেন একেবারে কবরেজ মশায় । বহু কষ্টে শুধু বলতে পারলেন—“আজ্ঞে, একটা লাস লোপাট হয়ে গেল কিনা, তাই বলছিলুম । মোডল মশায়রা এ সময় যদি একটু চেপে যেতেন । লাসটার কথা হুজুরদের কানে না উঠলে—”

এতক্ষণে আমার মগজেও ঢুকল মামলাটা । চাক্ষা হয়ে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে । সত্যিই ত । লাস লোপাট হওয়ার সঙ্গে যে উদ্ধারণপুরের সুনাম দুর্নাম জড়িয়ে আছে । উদ্ধারণপুরের ঘাটে লাস আনলে যদি তা লোপাট হবার সম্ভাবনা থাকে তবে যে ভবিষ্যৎ অন্ধকাব । এ ত সোজা কথায় কাববারই নষ্ট, যাকে বলে—
এতগুলো মাহুষকে পথে বসতে হবে ।

চিংকার করে ভাক দিলাম—“রামহরে, পঙ্কা, এধারে আয় । বড় মোডল—
আগে শুনে যাও আমার কথা । আর এট, এই ব্যাটারা ঠ্যাঙ্কাডের গুটি, খামা শিগুগির তোদেব বাশ-বাজী । দূর হয়ে যা এখান থেকে । নয়ত চিবিয়ে খেয়ে কেলব সব কটা মাথা ।

থামল সকলে । রামহরে পঙ্কা এগিয়ে এল । বড় মোডল তখনও ছ'হাতে নিজের বুক চাপডাচ্ছে, আর যা মুখে আসছে তাই আওড়ে গাল পাডছে অদৃশ্য শত্রুকে, যে শত্রু তার এতবড় অপমানটা করলে ।

বড় মোডলকেই জিজ্ঞাসা করলাম—“ফাটক খাটতে চাও এই বয়সে ?”

বন্ধ হল বুক চাপডানো আর গলাবাজী । ঈঁ কিস্ত বন্ধ হল না । ঈঁ করে চেয়ে রইল আমার দিকে মোডল ।

সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলাম আইনের মারপাঁচটুকু । আইন খাঁদের হাতে সেই হুজুরা এলেন বলে । এখন বুঝে দেখ সকলে, মাহুরে জড়ানো লাস উধাও হয়েছে

তনলে সেই হুজুরা কি ছেড়ে কথা কইবেন ? হুতরাং যদি ভাল-চাও—

ভাল সবাই চায়। তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া গেল। রামহরে পক্ষ আর রামহরির বউ বেটা ছাড়া এক প্রাণী আর রইল না আশানে। যেখানে দু' মিনিট আগে রই-রই চলছিল সেখানটা হঠাৎ নীরব নিস্তব্ধ নিশীথ রাতের আশানে পরিণত হল। আমতন আব ভাইপো আমজীবন মাথা নীচু করে শাস্তিশিষ্ট ভ্রলোকের মত গল্পায় গিয়ে নামল। গল্প থেকে উঠে কোনও দিকে না চেয়ে সোজা প্রস্থান। মড়া খেলানো যাব কাছে ছেলেখেলা, সেও জ্যান্ত খেলাতে ভয় পায়।

উদ্ধাবপুরের হাসি।

হাসির চটুল চাউনিতে চতুরালি চমকানি। ক্ষরধার ক্ষরের ওপর বোদ পড়লে যেমন চোখ-ধাঁধানো চমকানি লাগে সেইরকম চমকানি লাগে উদ্ধাবপুরের চটুল চাউনিব দিকে চাইলে। ক্ষরধার ক্ষরের ধানালো দিকটাব ওপর দিয়ে থালি পায়ে ঠাঁটাও ছয়ত সম্ভব একই উদ্ধাবপুরের চটুল হাসির চতুরালির ধাবে কাছে ঘেঁষতে গেলে কেটে দু'খণ্ড হবার ভয়। সে চাউনির চোবাবালিতে পড়লে পাকা পাটুনীরও পবিত্রাণ নেই।

আর খস্তু ঘোষের দাঁ নালো হাসির পেছনে যে দুজ্জ্বল দুঃভিসন্ধি লুকিয়ে থাকে তার লীলাখেলা বোঝা উদ্ধাবপুরের উগ্রচণ্ডীবও অসাধ্য।

মুখে গালা লাগানো মা-নাল মার্ক তুটো বাজারে-বোন্স বগলে করে খস্তু দেখাতে এল তাব দু'গুণা দাঁতের দেমাক দু'থেকেই দরাজ গলাষে বললে—“খস্তু ঘোষ লুকোছাপার ধাব ধাবে না, এ বাবা খাস আবকারি আঁচে ভিয়ান ববা ভ্রলোকের হাতে দেবার মাল। আইনে আটকাষ কোন শালা? নাও গোসাঁই—গণ্ডুষ কবে ফেল এটুকু। গলাটা ভিজিয়ে নাও চট করে। বাবার বাবারা এলেন ব'লে, তাঁদের মুখ দর্শন করলে গলা দিয়ে আর নামতে চাইবে না কিছু।”

প্রসন্ন হলাম।

খস্তু ঘোষের নম্র থাকে সব দিকে। এইজন্তে ওকে এত ভাল লাগে। বললাম—“কোথায় ছিলে যে এতক্ষণ? এখানে আশানও যে শুকিয়ে উঠল, শয়তানদের জালায় শেয়াল শকুনগুলোও পালিয়েছে আশান ছেড়ে। কাল থেকে চিতাগুলো আছে নিবে। কারবার গুটোতে হবে এবার দেখছি।”

রামহরির বউ ব্যবসা বোঝে। সে বললে—“হক কথা বললে জামাই। চিতে সব ঝিমিয়ে পড়েছেন। ওনারের না চেতালে আমাদের দিন চলা বন্ধ। কাল মঙ্গলবার, আমি খরচা দোব। কাল রেতে তুমি মা ঋশানকালীর পূজা দাও চিতের ওপর।”

রামহরি দাবড়ি দিলে বউকে—“তুই মুখ থামা ত সীতের মা। থামকা বকে মরিস ক্যানে। আগে দেখ, থানা পুলিশের হুজুং কতদূর গড়ায়।”

“গড়িয়ে গিয়ে পড়বে ঐ মা গঙ্গার জলে।” খস্তা ঘোষ থ্যাক থ্যাক করে হেসে উঠল, “বলে—কত হাতি গেল তল—এখন মশা বলে কত জল!” ঘাবড়াচ্ছ কেন বাবা ভোম। তোমাদের কারবার মারে কে? আগে এসে পৌঁছক কে আসছে! এসে পৌঁছলে দেখবে মা গঙ্গার দয়ায় সব গঙ্গাজল হয়ে যাবে।”

ইতিমধ্যে একটা বোতলের গলা ভেঙে নিজের গলাটা ভিজিয়ে নিয়েছি। বোতলের শেষটুকু ওদের শালা-ভগিনীপতিকে প্রসাদ দিলাম। আর একটা বোতল তুলতে দেখে খস্তা এক থামচা দলাপাকানো নোট বার করলে পকেট থেকে। নোটের দলাটা পঙ্কার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—“গুণে দেখ, পঙ্কা, কত আছে? যে কটা বোতল হয় ওতে, নিয়ে আয় কেলো শুঁড়ীর দোকান থেকে। মাল কিছু মজুদ রাখা ভাল। বাবারা এলে দেখতে পাবেন, বেআইনী নেই বাবা উদ্ধারণপুরের ঘাটে।”

ভগিনীপতির হাত থেকে বোতলটা নিয়ে দু’ টোক গলায় ঢেলে পঙ্কা ছুটল। কানে-গোঁজা আধ-পোড়া সিগারেটটা নামিয়ে মুখে গুঁজে খস্তা দেশলাই জ্বাললে। রামহরির-বউ করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নিবনো চিতাগুলোর দিকে। থা-থা করছে চিতাগুলো। কাঠ নেই, আগুন নেই, নেই আগুনের ওপর হাড় মাংস। ঘুমিয়ে পড়েছে উদ্ধারণপুরের ঘাট। যজ্ঞ-বাড়ির লোকজন থাওয়ানো গেছে চুকে। ভিয়ানকররা বিদেয় নিয়েছে। পড়ে আছে শুধু ভিয়ানের চুলাগুলো। আত্মীয়-কুটুম্বরাও সব চলে গেছে। উৎসবের উৎসাহ উত্তেজনা আর নেই। বাড়ির মানুষ কে কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে। যেদিকে তাকাও—একটা বুক চাপা রিক্ততা। ঠিক সেই অবস্থা উদ্ধারণপুরের ঘাটের! অবস্থা দেখে আমার মনটাও কেমন দ’মে গেল। দমা মনে দম নেবার জন্তে দ্বিতীয় বোতলটাও গলায় ঢেলে দিলাম।

দম ফুরিয়ে গেছে, ঝিমুচ্ছে উদ্ধারণপুরের ঘাট।

আমরা চারজন—আমি, খস্তা, রামহরি আর সীতের মা—আমরা গালে হাত

দিয়ে বলে ভাবছি। উপায় ঠাণ্ডাচ্ছি কি করে বলার রাখা যায় উদ্ধারণপুরের ঠাট। কিন্তু সীতের কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই। সে তার মায়ের কাঁকালে বসে গালে ঢুকিয়ে দিয়েছে নিজের ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত। মেয়েটা জ্বলেছে চোখবার জ্বলে। হয় চুষছে মায়ের বুকে, নয় চুষছে নিজের হাত। একটা না একটা কিছু চুষবেই।

খস্তা ঘোষও চুষছে। সদা পরিদৃশ্যমান আটখানি দাঁতের ফাঁকে ডান হাতের তিনটে আঙ্গুলের মাথা ঢুকিয়ে চুষছে খস্তা ঘোষ। ঐ আঙ্গুল তিনটির সাহায্যে সে ধরে আছে কয়ে-যাওয়া সিগারেটের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশটুকু। সব কিছুর খোল আনা দাম উন্মূল করা তার স্বভাব।

সেই জ্বলেই বলে—‘স্বভাব না যায় ম’লে—ইল্লত না যায় ধুলে।’

উদ্ধারণপুরের ঘাটের স্বভাবও পালটাবে না কিছুতে, সাদা হাড় আর কালো কয়লার ইল্লতও ঘুচবে না, দুধ দিয়ে ধুলেও ঘুচবে না।

বহুদূরে শোনা গেল—“বল হরি—হরি বোল।”

চমকে উঠল রামহরির বউ। আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল রামহরি। ওদের মেয়ে মুখ থেকে হাত বার করে বড় সড়কের দিকে চেয়ে রইল। কোথা থেকে শুভ-নিশ্চয় বেরিয়ে এসে প্রাণপণে ছুটে গেল বড় সড়কের দিকে। শকুনগুলো এতক্ষণ ডানা মেলে পড়ে ছিল গঙ্গার ধারে, তারা ডানা গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে দু’টো শেয়াল আকল-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওধারে চলে গেল। শুধু নিশ্চিন্ত খস্তা ঘোষ, পকেটে হাত পুরে আর একটা দোমডানো সিগারেট বার করে নিবিকার-ভাবে অগ্নিসংযোগ করলে।

আবার শোনা গেল—“বল হরি—হরি বোল।” কাছাকাছি এসে গেছে উদ্ধারণপুরের চিতার ভোগ। কোল থেকে মেয়েকে নামিয়ে রামহরি-এ পরিবার হাঁটু গেড়ে একটি প্রণাম সেরে ফেললে। কাকে ঠিক বোঝা গেল না, বোধ করি ওদের ইষ্ট দেবী শ্রীশানকালীকেই—যার দয়ায় উদ্ধারণপুরের চিতার আগুন নেবে না কখনও।

কিন্তু চিতার ভোগ পৌছবার আগেই একটা বিদঘুটে আওয়াজ শোনা গেল বড় সড়কের ওপর। চমকে উঠলাম সকলে। মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম—মস্ত একথানা চকচকে মোটরগাড়ি এসে থেমেছে নিম্ন গাছটার ওধারে। আর একবার চমকে উঠলাম—প্রথমে যিনি গাড়ি থেকে নামলেন তাঁকে দেখে। মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর নামলেন কাছা গলায় দিয়ে। তাঁর পেছনে পেছনে একে একে নেমে এলেন আরও দু’জন হোমরাচোমরা ভজলোক।

ওঁরা ভিনজন নামছেন বড় সড়ক থেকে । নিম্ন গাছতলার পৌঁছবার আগেই
 আবার শোনা গেল—বল হরি—হরি বোল । ওঁরা এক পাশে সরে দাঁড়ালেন ।
 বাঁশে-বাঁধা মাল কাঁধে নিয়ে ছ’জন লোক তরতর করে নেমে এল ওঁদের
 পাশ দিয়ে । পেছনে আরও কয়েকজন মালপত্র লাঠি লগ্নন নিয়ে ছুটে
 আসছে ।

রামহরি উঠে গেল তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্তে । রামহরির বউ গেল ।
 খন্দের “লক্ষ্মী” । উদ্ধারণপুরের ঘাটের খন্দের শুধু “লক্ষ্মী” নয়—একেবারে
 “মহালক্ষ্মী” । এ খন্দের নেয় না কিছুই, শুধু দিয়ে যায় । মাল দেয়, টাকা দেয়,
 খাট-বিছানা কাঁথা কসল দেয় । দেয় মদ-গাঁজা চাল-ডাল কাপড়-চোপড় সব
 কিছু । দিয়ে নিজেদের নিঃস্ব করে ঘরে ফেরে । এরকম খন্দেরকে খাতির করে
 না কে ?

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর তাঁর সঙ্গী ছ’জনকে নিয়ে এসে পৌঁছলেন
 আমার গদির সামনে ।

সঙ্গে সঙ্গে খস্তা ঘোব একেবারে গড় হয়ে পড়ল তাঁর একজন সঙ্গীর পায়ের
 ওপর । প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াতে তিনি চিনতে পারলেন খস্তাকে । হাসিমুখে
 বললেন—“আরে ঘোষ ঘে ! ভাল ত সব ?”

কৃতার্থ হয়ে গেল খস্তা । ঘে ক’খানা দাঁত তার লুকিয়ে থাকে মুখের
 মধ্যে সেগুলোও বার করে ঘাড় কাত করে জবাব দিল—“আজ্ঞে হজুর, আপনার
 আশীর্বাদে একরকম—”

হজুর তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চাইলেন ভাল থাকাথাকির প্রসঙ্গটা । বললেন
 —“ভালই হল যে তোমার এখানে পাওয়া গেল ঘোষ । আমাদের ন’পাড়া
 খানার দারোগা নাকি এখানে অস্থস্থ হয়ে পড়েছে । কই তাকে ত দেখতে পাচ্ছি
 না !”

দাঁত বার করেই খস্তা জবাব দিলে—“এখানেই তাঁকে পাবেন হজুর । ওই
 ওপরে ঝুমরী পাড়ায় তাঁকে ভাল করে রেখে দিয়েছি তাঁর মেয়েমাহুষের ঘরে ।
 এখনও ভাল করে হ’শ-জ্ঞান হয় নি কিনা তাঁর ।”

হজুর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“হ’শ-জ্ঞান নেই তার ! তার মানে ?
 হ’শ-জ্ঞান তাঁর নেই কেন ? এখানে তিনি এলেনই বা কি জন্তে ?”

তখন খস্তা একে একে জানালে—কি জন্তে দারোগা এসেছেন এখানে । এসে
 তিনি কিভাবে তদন্ত আরম্ভ করেন, তারপর অর্ধেক রাতে আসামীদের গ্রেপ্তার
 করতে এসে কি করে ফ্যানাদে পড়ে গেছেন তিনি ।

মড়া পুড়িয়ে ভিনজন লোক কিয়ছিল ঋশান থেকে। মাঠের মাঝে কাঁরা তাদের লাঠি মেরে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেয়। খানার মধ্যে ঠ্যাং ভাঙ্গা অবস্থায় পড়েছিল তারা। সেখান থেকে উঠিয়ে তাদের খানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জ্ঞান হলে তারা নাম করে নিতাই দাসী বোষ্টমীর আর চরণদাস বাবাজীর। সেই বাবাজী বোষ্টমীর খোঁজেই দারোগা সাহেব আসেন উদ্ধারণপুৰ ঘাটে। ঘাটে এসে বাবাজী আর বোষ্টমীকে হাতেও পান। কিন্তু কি তাঁর খেয়াল হ'ল, খেলিয়ে মাছ ভাঙ্গার তুলতে চাইলেন। দিনের বেলায় তাদের ছেড়ে দিয়ে নিজে একটু রঙ করতে গেলেন ময়নাব ঘবে। অর্ধেক রাতে নেমে এলেন ঋশানে। রাতে ঋশানে নামা নিষেধ। কিন্তু তিনি কারও মানা মানলেন না। কলে কি যে দেখলেন তিনি ঋশানে তা তিনিই জানেন। কিন্তু সেই থেকে অজ্ঞান হয়ে আছেন আর মুখ দিয়ে গাঁজলা ভাঙছে।

চলছে থপ্পাব গল্প বলা—একমনে শুনছেন হুজুররা।

ঠঠাং টেঁচিয়ে উঠল কে হুজুরদের পেছন থেকে।

“ঠাকুর হেই বাবা—আমি তোমার অধম সন্তান জয়দেব গো বাবা। এবার আগে থেকেই এসে গেছি বাবা। এবার জ্যান্ত বউটাকে নিয়ে এসেছি তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিতে। দেখি এবার তুমি একে রক্ষে না করে থাকবে কি করে? দেখি এবার স্যামাব বংশবক্ষা আটকায় কোন্ শালার ব্যাটা?”

লাফিয়ে নেমে গেলাম গর্দী থেকে। হুজুরদেব ঠেলে সরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম জয়দেবের সামনে। চিন্তার করে উঠলাম হুঁহাতে ওর হুঁকাধ ধরে—

“জয়দেব, তোমার কবচ কোথায়? তোমায যে কবচটা দিয়েছি আমি—সেটা কই? এই ৩ সেদিনও তুমি তোমার বউকে পোডাতে এসেছিলে যে কবচটা গলায় দিয়ে।”

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বইল জয়দেব আমার মুখের দিকে।

এক ঝাঁকুনি দিলাম ওর হুঁকাধ ধরে—“বল জয়দেব, বল শিগ্গির—কোথায় গেল সেই কবচটা?”

ডুকবে কেঁদে উঠল জয়দেব—“বলছি বাবা, বলছি। অপরাধ নিশ না বাবা তোমার অধম সন্তানের। এখান থেকে ফেরবার সময় সেটা হাইরে ফেলেছি বাবা। আগাগোড়াই সেটা ছিল আমার গলায়। নপাড়ায় ঢুকে কি হুঁবুজি হল। খানায় গিয়ে ঢুকলাম। খানার ছোটবাবু শুদ্ধ লোক, তাঁর সঙ্গে বসে একটুকু রঙ করে বড্ড বেসামাল হয়ে পড়লুম। খানার লোককেই টেনে নিয়ে কখন বাড়িতে ফেলে দিয়ে এসেছে জানতে পারি নি। পরদিন যখন নেশা কাটল তখন

থেকে আর কষচটা খুঁজে পাচ্ছি না। হেই বাবা—অপরাধ নিও না তোমার অধম সন্তানের বাবা—”

জয়দেব আমার পা জড়িয়ে ধরতে এল।

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর এগিয়ে এসে ধরে ফেললেন জয়দেবের একথানা হাত।

“ঘোষাল মশায়—চিনতে পারছেন আমার ?”

কাঠ হয়ে গেল জয়দেব—“আজ্ঞে হুঁজুর, আজ্ঞে আমি, আজ্ঞে—”

ধীর শাস্তকণ্ঠে কুমার বললেন—“পেরেছেন তা’হলে আমার চিনতে। যাক, বলুন ত আপনার সেই ন’পাড়া থানার ছোটবাবু বন্ধুটি এখন কোথায় ?”

“আজ্ঞে, তা কি করে জানব হুঁজুর, তা আমি জানব কেমন কবে ? পরদিন সকালে থানায় গিয়ে তাঁকে ত পাই নি। তিনি নাকি কোথায় থানাতল্লাশ করতে বেইরেছেন।”

“ভাল করে ভেবে দেখুন ত ঘোষাল মশায়, সে রাত্রে কি কি কথা হয়েছিল আপনার বন্ধুটির সঙ্গে। ভাল করে ভেবে জবাব দিন—মনে রাখবেন যে আপনার জবাবের ওপর তার ভাল-মন্দ নির্ভর করছে। সেই ছোটবাবুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।”

আকাশ থেকে পড়ল জয়দেব—“খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কেমন কথা ?”

তখনও কুমার বাহাদুর ধরে আছেন জয়দেবের হাতখানা। হাতে একটা কাঁকানি দিয়ে তিনি বললেন—“মনে করুন ঘোষাল মশায়, ভাল করে মনে করুন। সে রাত্রে এমন কোনও কথা তিনি আপনাকে বলেছিলেন কিনা, যাতে অস্বস্তি আন্দাজ করা যায়, কোথায় তিনি যেতে পারেন। তাঁকে যদি না পাওয়া যায় তা’হলে আপনার বিপদ বাডবে। এই যে দেখছেন এঁদের হু’জনকে, এঁরা যদিও ভাল মানুষ সেজে এসেছেন কিন্তু এঁরা সহজ লোক নন। ইনি হচ্ছেন পুলিশের বড সাহেব আর ইনি আমাদের মহকুমা হাকিম। এঁরা বেরিয়েছেন সেই ছোট দারোগার খোঁজ করতে। ভেবে কথার জবাব দিন এবার।”

জয়দেব ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ-চোখ। একটু পরে সে আবার সামলে নিলে নিজেকে। এবং একটু উত্তেজিতও হয়ে উঠল, একটানে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—“বলবই ত। বলবই ত সত্যি কথা। হলোই বা বন্ধুলোক, কিন্তু সে গুয়ের ব্যাটার মুখ দেখতে আছে নাকি। হারামজাদা নচ্ছার জাত-বিচ্ছু! নয়ত অত নীচ নজর হয় ? আমাদের

রাঙা দিদিমণির ওপর ওর নজর! কতবার আমার দেখেছে, টাকাকড়ি পর্যন্ত দিতে চেয়েছে রাঙা দিদিমণিকে ফাঁদে ফেলে ওর হাতে দেবার জন্যে। সে-বাত্তেও ঐ এক কথা একশবার বলেছে! শেষে আমি ভয় দেখিয়ে বললাম—যাও না, যাও। সাগর থাকে যাও উদ্ধারণপুরের ঘাটে। সেখানে সাঁইবাণ এসে আছেন। রাঙা দিদিমণি তাঁর শ্রীচরণ আঁকড়ে আছে, কেউ তাঁর অনিষ্ট করলে বাবা আর রক্ষে রাখবেন নাকি তাঁর? সেই কথা শুনে বাটা বললে কি না যে সে দেখবে কি ক’রে বাবা বাঁচায় দিদি-ঠাক্কণকে। তারপর আব আমার হঁশ ছিল না। পরদিন সকালে যখন হঁশ হল বাড়িতে, তখন বচটা আর পেলাম না। ছোট-বাবুও সেই থেকে একেবারে উধাও হয়েছেন। তাঁকে ধরতেহ পারছি না যে কবচটার কথা একবার শুধোব।”

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর তাঁর আঙ্গুল থেকে খুলে ফেললেন এ’টি পাথর বদান আংটি। বললেন—“এখন আপনার বউ দেখান ঠাকুর মশাই, তিনি ত আমার গুরুজন। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমি তাঁকে এবার নমস্কার করি।”

আংটিটা জয়দেবের হাতে গুঁজে দিয়ে নেপথ্যস্থিত জয়দেব-পত্নীকে লক্ষ্য করে বললেন—“আপনাকে নমস্কার বরছি গো বোম’ন। পূজোর সময় যাবেন আমাদের বাড়ি ঠাকুরমশায়কে নিয়ে।”

গুঁদের মধ্যে চোখে চোখে কি কথা হয়ে গেল। গুঁরা ফিরে চললেন। যাবার আগে কুমার আমার বললেন—“দয়া করে একটু স্মরণ করবেন আমার, যখন দরকার হবে। আপনার কোনও কাজে লাগতে পারলে ধন্য জ্ঞান করব নিশ্চেকে।”

পুলিস সাহেব আর হাকিম সাহেব কিছুই বললেন না। শুধু ও’র হাতে নমস্কার করে গেলেন। খসড়া গেল তাঁদের পিছু পিছু—বোধ হয় সাধুয়াম সমস্তার একটা সমাধান করবার জন্যে।

তখন মনে পড়ল জয়দেবের এবারের ধর্মপত্নীর কথা। কিন্তু কই সে? কোথায় গেল ন’পাড়ার হৈপো রুগী হা’ধন চক্কোত্তির ভাগর-ভোগর মেয়ে স্মিরি?

জয়দেবই জানালে। জানালে যে হারাধন চক্কোত্তি মরেছে। মেয়েকে জয়দেবের মত স্থপাতের হাতে তুলে দিয়ে সেই রাতেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে মরেছে। মেয়েই এসেছে বাপের মুখে আগুন দিতে। বারণ ছেলে ত নেই হারাধনের। ওই গুধারে চিতা সাজানো হচ্ছে। জয়দেবের বউ-মাথানেই আছে। বাপের মুখে আগুন দিয়ে আগবে। এসে আমার চরণধুলো নেবে।

একথাও জানালে জয়দেব যে স্বত্তরকে পোড়বার যাবতীয় খরচটাও সেই

করছে। জানিয়ে ছুটে চলে গেল ওধারে। একটু পরে ফিরে এল ছুঁটো বোভল হাতে করে। এসে আর একবার নিবেদন করলে তার আরজি। এবার যখন সে জ্যাস্ত বউটাকে এনে ফেলেছে আমার শ্রীচরণতলে, তখন এবার আমার রক্ষে করতে হবে তার বউকে, যাতে তার বংশটা রক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করে দিতেই হবে এবার।

উদ্ধারণপুরের বাট।

ঘাটের পূবে বয়ে চলেছে গঙ্গা।

গঙ্গা বয়ে চলেছে উদ্ধারণপুরের কালো মাটি আর কালো কয়লা ধুয়ে নিয়ে।

কিন্তু নিতাই ত কালো নয়।

কোথাও কি কালোর কালিমা লুকিয়ে আছে সেই দুধে-আলতায় গোলা লালিমার মধ্যে ?

কালো নয় মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুরও। বড় বেশি রকম মানায় ঠুকে নিতাইয়ের পাশে। আর বাবাজী চরণদাসকে মানায়। কিন্তু সেটা হল বিপরীত মানান মানানো। নিতাইয়ের বউটা আরও উৎকটভাবে খুলে যায় চরণদাসের পাশে। চট্ট ক'রে নজরে ধরে যায় নিতাইয়ের দুধে আলতায় গোলা রঙ, শুধু চরণদাস পাশটিতে থাকে ব'লে ওর। কুমার বাহাদুরের পাশে নিতাই ও নিতাইয়ের পাশে কুমার বাহাদুর—না—তেমন একটা হাঁ করে চেয়ে থাকবার মত দৃশ্য হবে না সেটা। বরং বলা যায়—এ ওর রূপের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। তখন একে ওকে আলাদা ক'রে চেনাই যাবে না।

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর।

হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে মত্ত উপকার ক'রে গেলেন আমার। একটা জলজ্যাস্ত দারোগাকে দাঁতকপাটি লাগিয়েও রেহাই পেয়ে গেলাম ঠুঁর দয়ায়।

আবার যাবার সময় বলে গেলেন—“আপনার কোনও কাজে লাগতে পারলে ধন্য জ্ঞান করব নিজেকে।”

কেন ?

হঠাৎ এতটা সদয় হয়ে উঠলেন উনি কেন আমার ওপর ? কে ঠুকে সংবাদ দিয়ে পাঠালে এখানে ?

কোথায় গেল বাবাজী চরণদাস নিতাইকে নিয়ে ?

মনে হল যেন—যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম কুমার বাহাদুরের চোখে সেই আলো যে আলো ঠিকরে পড়ে নিতাইয়ের কাজল-কালো আঁখি দু'টি থেকে।

কলুষনাশিনী মা গঙ্গা। উদ্ধারণপুর ঘাটের কলুষটুকুর ওপরই তাঁর লোভ।
 ১। মাহুরে মুড়ে দড়িতে পেঁচিয়ে অতন মোড়ল যা এনে নামালে তাও হরণ করলেন মা
 গঙ্গা। বৈশ্বানরকে বঞ্চিত করে চুপিচুপি সরিয়ে ফেললেন সেই মাহুর-মোড়া
 হস্ত। তার ভেতরেও কি লুকিয়ে ছিল কোনও কলুষ? অতন মোড়ল মড়া
 খেলাতে জানে, কি খেলা খেলেছিল সেই মড়াটাকে নিয়ে তাই বা কে জানে?

আর সেই কচি ছেলের কান্না, যা শুনে নিতাই আর স্থির থাকতে পারলে না।
 গঙ্গা-গর্ভ থেকেই উঠেছিল সেই শিশু কান্তরানি। কচি ছেলেপুলের জন্তে অস্থির
 হয়ে ওঠে নিতাই। বাবাজী চরণদাসেরও ঐ এক রোগ। কতদিন ওরা বলেছে,
 একটা মা-মরা ছেলেমেয়ের জন্তে আমার কাছে কাকূতি-মিনতি বেরেছে। কোলের
 ছেলে ফেলে রেখে কত মা অশ্রুনে আসে চিত্তাভাব উঠে পোড়বার জন্তে। সেইরকম
 একটা মা-হারা ছেলে চাই নিতাইয়ের। আমি নাকি একটু খেয়াল করলেই সে
 রকম একটা ছেলেমেয়ে তাকে যোগাড় করে দিতে পারি।

কিন্তু পারি নি, কিছুই দিতে পারি নি আমি নিতাইকে।

কি দেব? দেবার মত কি আছে আমার? যে মডার গদির ওপর শুয়ে
 থাকে তার কাছে নিতাই কিসেব প্রত্যাশা করে?

কিছু না পাওয়ার অভিমানেই চলে গেল নিতাই।

বাবা গঙ্গা বয়ে চলেছে উদ্ধারণপুরের বানো মাটি ধুয়ে নিয়ে। নিতাই কালো
 নয়, তবু তাকে নিয়ে গেল।

কে বলে দেবে, নিতাইয়ের ছুঁতে আনতায় গোলা নালচে আভার মধ্যে কোথাও
 কালোর কলুষ লুকিয়ে আছে কিনা, কে বলে দেবে আমার?

উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন।

স্বপ্ন হল জাত জালিক। অকুণপাখার সাগববুকে যেখানে জলপরীরা জল-
 তরঙ্গ বাজিয়ে গান গায়, সেখানে জাল নিয়ে ছোট্ট স্বপ্ন-জেলের পাগলা পান্‌সি।
 অগাধ জলের তলে যেমন মনগড়া জাল মাছেরা খেলা করে বেড়ায় তাদের ধরবার
 জন্তে জাল ফেলে সে চুপ করে বসে থাকে তার পান্‌সির ওপর। খেয়ালও করে
 না কোথায় চলেছে তার পান্‌সিখানি উজ্জানভাটির টানে! হঠাৎ ফুঁসিয়ে ওঠে
 জল, চকের নিমেষে একটা জলহস্ত ওঠে ঘূঃতে ঘূঃতে, স্বপ্ন-জেলের পান্‌সিখানাকে
 বাধায় করে নিয়ে উঠে যায় মেঘের মধ্যে। তখন জলপরীরা পান্‌সিখানাকে

ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায় যেসবমুদ্রে আর সেই আসমানে আসমানী মাছ ধরবার জন্ত উদ্ধারণপুরের জাত জেলে জাল ফেলে বসে থাকে ।

উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন ।

স্বপ্ন পাতে জাল । উদ্ধারণপুর ঘাটের পারাপার জুড়ে স্বপ্ন-জেলের বেডাজাল পাতা । সে জালের আঁটুনি বজ্রের মত শক্ত কিন্তু তার গেরোগুলো সব ফুলের মত ফসকা । সে জালে আটকায় না কিছুই, বাবা বোয়াল আর চুনো-পুঁটি সবই যায় পালিয়ে । ফাঁদে পড়ে শুধু স্বপ্ন-জেলে নিজে । নিজের জালে জড়িয়ে বেছারা ছট্‌ফট করে মরে ।

উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন ।

স্বপ্ন টাকু ঘোরায় আর তাল জাল বোনবার হুতোয় পাক পড়ে । পুরুষ মাহুঘের মাথার খুলির মাঝে ছেঁদা করে তাতে মেয়েমানুষের বৃকের একখানি সন্ধ হাড় পরিয়ে বানানো হয় সেই টাকু । যে হুতা পাকানো হয় সে টাকুতে তা বেরিয়ে আসে মাহুঘের মগজের ভেতর থেকে । কিন্তু বেরিয়ে আসে বিশ্রী জট পাকিয়ে । তাই তার খেই খুঁজে পাওয়াই মুশ্কিল । খেই খুঁজে বার করতে স্বপ্ন হিমসিম খেয়ে ওঠে । তখন সেই টাকু দিয়েই নিজের কপালে আঘাত করতে থাকে আর তার ফলে স্বপ্ন-জেলের কপাল ভেঙে চুরমার হয়ে যায় ।

কিন্তু কিছুতেই কপাল ভাঙে না উদ্ধারণপুরের ঘাটের । মহা-জাগ্রত মহা-ঋশানের মহা-মহাশ্মর আবার সগৌরবে জাঁকিয়ে ওঠে । মাল আসে, ভিযান চড়ে, যা পাক হয় তাও কিছু প'ড়ে থাকে না । সব ঠিকঠাক কাটতি হ'য়ে যায় । রামহরির বউকে আর ঋশান-কালীর পূজো দিতে হয় না, তার অচলা ভক্তিতে গ'লে গিয়ে মা মুখ তুলে চান । চান রামহরির সংসারের দিকে নয়, “কিপাদিষ্টি” নিক্ষেপ করেন উদ্ধারণপুর ঘাটের এলাকা ছাড়িয়ে সারা দেশটার ওপর । ব্যাস—তা'হলেই হল—দেশকে দেশ উজাড় হয়ে সব মাল এসে ওঠে উদ্ধারণপুরের ঘাটে ।

এমন কি পাচার-হওয়া আমঅতন আমজীবনের মালও মা গঙ্গা “কিপা” করে ফিরিয়ে দেন । ডোমপাড়ার সিধে ডোম ভিঙে নিয়ে উজানে মাছ মারতে যাচ্ছিল । মাছ মাগা আসল কথা নয়, সিধে ডোম ভাঙার কোল ঘেঁষে লগি ঠেলে ভিঁড়ি বায় আর ঝোপঝাড়ের দিকে নজর রাখে । কপালে থাকলে ছ'একটা গোসাপ মাঝে মধ্যে মিলেও যায় । গোসাপ মারতে হয় লুকিয়ে-চুরিয়ে, ছালখানার দাম আছে । তবে জানতে পারলে খানায় টেনে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার দেয় । সিধে ডোমের লগিতে লাগল এই মাল । বাজার-খালের ওপরে কেয়া কোণের তলায় আটকে

ছিল। মিথে ভোম চিনতে পেরে ঝোপ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

আমাদেরও চিনতে কষ্ট হল না। মোড়লের পাকা হাতের পাকা কাজ, মাহুরে জড়ানো আটপূঠ বান্ধা ঠিক সেই মালই বটে। দড়ির বান্ধন এতটুকু টসকায় নি কোথাও—ফুলে ফেঁপেও ওঠে নি। এমন কি গন্ধ বাসও বার হচ্ছে না একটুও। আর সব থেকে তাজ্জব কাণ্ড হচ্ছে, খেংরাকাটির মত মিথে ভোম, মিথে হয়ে অন্যায়সে সেটাকে কাঁধে করে নামিয়ে নিয়ে এল ডিঙি থেকে। টসটস করে জল পড়ছে তখনও, কিন্তু ভিজ্ঞে একটুও ভারী হয় নি মডাটা। বোধ হয় দশ-বারো বছরের ছেলেমেয়ে হবে, এন্টার ভূগে একেবারে হাড়িডমার হয়ে মবেছে। তাই অত ছোট করে বাগিয়ে বাঁধতে পেবেছিল মোডল, শাই জলে ভিজ্ঞেও ভারী হয় নি একটুও।

ডাকা হল সকলকে। রামহরি, পদ্মা, বামহরির বউ, ভোমপাড়ার সবাই, ময়না, সুবাসীরা সকলে, আর সিধু কবরেজ—সবাই ছুটে এল। এল না শুধু খস্তা, খস্তা গেছে সাধুবামকে স্বস্থানে পৌঁছে দিতে। বলে গেছে, ফিরে এসে সে আমঅতন-দের মানের একটা কিনাও করবে। সে মালই ফিরে এল অথচ খস্তা নেই। এ সময় থাকলে সব থেকে বেশি খুশি হত সে। হুতরাং তার অনুপস্থিতিটা সকলেই বেশ বোধ কবলে।

সিধু ঠাকুর নিবেদন করলেন যে মা গঙ্গা যখন নিয়েও নিলেন না তখন একে সৎকার কবতে হবে। হয় জলে নয় আগুনে। জল থেকে যখন উঠে এল ও, তখন এবার চাপাও আগুনে।

চাপাও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু খরচটা? কে দেবে চোদ্দ সিকে? চোদ্দ সিকে হল চুক্তি। চোদ্দ সিকেয় বাঠ পাটকাঠি কলসী ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জাম যোগান দিতে হবে রামহরিকে। একেবারে কাঠ বয়ে এনে চিতে পৰ্বন্ত সাজিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এখন দেয় কে চোদ্দ সিকে?

অবশেষে সাত সিকে যোগাড় হয়ে গেল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ময়না ওদের নিজেদের ভেতর থেকে সাত সিকে তুলে এনে দিলে। আর সাত সিকে দিলে সীতের মা। সত্যি সত্যিই সাতখানা সিকি এনে দিলে রামহরির হাতে। রামহরি আবার যেটা তার হাতেই গুনে দিলে, যেমন দেয় অন্ন খন্দেরের কাছে আদায় ক'রে। তখন কাঠ বইতে গেল ওরা শালা-ভগ্নীপতি।

এখন প্রশ্ন হল আগুন দেবে কে?

আমঅতন আমজীবন থাকলে তারাই আগুন দিত। কৈধোদের হক আছে আগুন দেবার। মড়ার মুখে আগুন দিয়েই তাদের হাতে সঁপে দেওয়া হয়—

ভাই পোড়ার এখানে এনে। কিন্তু ভোমে পোড়ালে অস্ত্র কথা দাঁড়াবে যে।
আর মড়াটা যে কোন্ জাতের তাই বা কে জানে ?

আচ্ছা—খোলাই হোক না মড়াটা। সিধে ভোমই খুলুক, ওই যখন ব'য়ে
এনেছে কাঁধে করে।

সিধে বললে জোড় হাত ক'রে।

“তা'হলে একটু পেসাদ ছান কত্তা। চোখদুটো একটু আঙা করে নিই
আগে। কে জানে কার বুক খালি ক'রে এনেছে একে। কেঁধো শালাদের
পাঁজরার ভেতর ধুকপুক করে না বুক। ও শালারা যা পারে আমরা তা
পারি নে।”

মেয়েরা দিলে একটা বোতল এনে। রামহরির বটও দিতে পারত। কিন্তু
একদিন তার ভাটি ঠাণ্ডা। সাবধান করে গেছে খস্কা—সে কিরে না এলে যেন
ভাটি না চড়ে। হুজুরদের নজর একটু না ঘুরলে ও-সব সাহস করা উচিত নয়।
সুতরাং আইনে চুয়ানো বোতল এনে দিলে মেয়েরা।

পেসাদ ক'রে দিলাম। সিধে ভোম একটা ভাঙা ভাঁড়ে নিলে মাত্র দেড়
ছটাক। এসব বাজারে-বস্ত্র তার নাকি চলেই না।

সেটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে সিধে বসল গিঁট খুলতে। নারসেল দড়ির গিঁট,
জলে ভিজ্ঞে আরও চেপে বসেছে। শেষে কাটতে হল কাটাগিঁট এনে। দড়িগুলো
খুলে ফেলে মাহুরটা ছাড়িয়ে ফেললে সিধে। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে—একদৃষ্টে চেয়ে
আছে। মাহুরের ভেতর কাঁথা-জড়ানো মড়া। কাঁথাখানাও ভিজ্ঞে সপসপ
করছে। কাঁথাখানা ছাড়িয়ে ফেলা হল। তারপর নোংরা কাপড়ে বাঁধা একটা
মাঝারি শব। সেটাকে দু'হাতে ধরে টেনে তুলেই ধপাস করে ফেলে দিলে সিধে।
সঙ্গে সঙ্গে আত্মকে উঠল। শুধু আত্মকেই উঠল না, এক লাফে তিন হাত পিছিয়ে
গেল।

কি হল না বুঝেই হুড়মুড করে মেয়েরা পিছিয়ে গেল দশ হাত। কি হল না
বুঝতে পেরে আমিও লাকিয়ে নামলাম গাঁদ থেকে। দু'পা সামনেই সেটা পড়ে
রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে কাপড়খানা ধরে হেঁচকা টান দিলাম। ফ্যাস
ক'রে ছিঁড়ে গেল কাপড়খানা। ছিঁড়ে আমার হাতেই চলে এল।

কিন্তু ও কি ? কি ওটা ?

পা দিয়ে ঠেলা দিলাম। সেটা গড়িয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম
সেটার দিকে। অশানস্বস্তি-কারও মুখে গা নেই।

হাড হুয়েক লম্বা একটা কলা গাছের টুকরো পড়ে আছে সবার চোখের
লামনে। মড়া নেই।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

তাল-বেতালের পাট।

সে পাটের পাটোয়ারী চালে হৃদ হুঁশিয়ারের হিকমত যায় ভেসে। জাগরণের
জায়গা নেই সেখানে, স্বপ্ন তার জাল বোনবার স্তোর খেই খুঁজে না পেয়ে খাবি
খায়। সেখানকার সূচীভেদ অঙ্ককারে রোমহর্ষক হৈয়ালির পাল্লায় প'ড়ে
অযুপ্তিরও নাভিখাস ওঠে। বিশ্বাস অবিবাসেরও স্থান নেই সেখানে। অতন
মোডল তা জানে, জানে ব'লেই সে মাহুষের দুধে তামাক ভেজায়। সে তামাক
টানলে সকলেরই বিশ্বাস হবে যে মড়াটা বেমালুম উবে গেছে পোটলার ভেতর
থেকে। গেছে শুধু মোডলের মড়া-খেলানো মস্তবলে। আর ঐ কলাগাছের
টুকরোটাও ঠিক সেই একই কারণে এসে সঁদিয়েছে ঐ আত্মপৃষ্ঠে বাঁধা পোটলার
মধ্যে।

পঙ্কজর তামাক টানে না। টানে মড়া পোড়াবার কাঠ। কাঠ টেনে তার
কাঁধ দুটো মোবের কাঁধের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে শুধু ঝেকে দাঁড়ালো।
উহু, অত সহজে পঙ্কজকে বোঝানো সম্ভব নয়। যদিও সে মড়া খেলায় না কিন্তু
মড়ার পায়ের হাড় দিয়ে তৈরী পাশা চালে। কাঁধ থেকে কাঠের বোঝাটা ফেলে
এসে ঘাড় ঝেঁকিয়ে সে দাঁড়ালো। দাঁড়ালো ত দাঁড়িয়েই রইল। এধারে মাহুর
কাঁথা দিঁদদা সব আবার গঙ্গায় দিয়ে আসা হল। কলাগাছের টুকরাটারও
গঙ্গাপ্রাপ্তি হল। ওনাকে ভানিয়ে দিয়ে সিঁধে আর রামহরি ডুব দিয়ে এসে আগুন
ছুলে। আগুন ছুঁয়ে একটা ক'রে লোহার চাবি ছ'জনে কোমরে নুলিয়ে রাখলে।
রামহরির বউ জানে—নোয়া আর আগুন ছোয়া থাকলে ওনারা কেউ 'দিষ্টি' দিতে
পারেন না সহজে।

কিন্তু সহজে পঙ্কজর ঘাড় মোজা করে না। তামাক কলকে চকমকি আর
গামছা কাপড় নিয়ে সে তৈরী হয়ে এস। এসে বললে—

“একবার বিদেয় দাও গোসাঁই, গাঁ-দেশ পানে ঘুরে আসি গিয়ে।”

মেয়ে কোলে ক'রে ওয় দিদিও এসে দাঁড়িয়েছি, পেছনে। আঁচলে চোখ
মুছে বললে—“বল, বলে যা গোসাঁইয়ের সামনে যে এবার দেখে শুনে বউ লিয়ে ঘরে
ফিরবি। লয়ভ আমার মরা মুখ দেখ'বিক কিন্তু এই ব'লে রাখছ।”

পক্ষা গুর ভায়ীর মূখখানা ধরে নেড়ে দিয়ে হনহন ক'রে চলে গেল। একবার পেছন ফিরেও চাইলে না। সোজা উঠল গিয়ে বড় সড়কের ওপর।

ওর দিদি এবটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—“হে মা আশানকালী, ওক্ষে কোর মা। গোয়ার মনিষ্মি, কোথাও যেন কিছু বাধিয়ে না বসে।”

কোথাও কিছু না বাধলে কিন্তু কৈচরের বামুনদিদি এমুখো হন না কখনও। হাত দেডেক ঘেরে আড়াই হাত লম্বা একটি মুখ বাঁধা সুপুঠ খলেকে বড় সড়ক থেকে মাথা উঁচবে নেমে আসতে দেখে তৎক্ষণাৎ চাক্সা হয়ে উঠলাম। ওটি ধীর বা কাঁখে চড়ে আসছে তিনি যে আমাদের বামুনদিদি ছাড়া অন্য কেউ নন এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। ওই খলেটি বামুনদিদির স্বহস্তে তৈরী, খলেটি চটের কিন্তু তার ওপর নানা রঙের ছিট দিয়ে অস্ত্রত তিন গুণা তালি লাগাবার দরুন ওটি প্রায় ছিটের খণ্ডে খণ্ডে পরিণত হয়েছে। গল্পান্নানে আসতে যেসব দ্রব্য-সামগ্রী সঙ্গে আনতে হয় সেগুলি সাজিয়ে শুছিয়ে আনবার জন্তে ঐ খলেটি বামুনদিদি সৃষ্টি করেছেন। কাক পক্ষা মাহুঘ গরু কেউ ওটির ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। চবাচর অন্তরীক্ষবাসী সবায়ের ছোঁয়া-ত্যাগ এড়িয়ে পাঁচ দিনের পথ বামুনদিদির কাঁখে চ'ড়ে গল্পান্নানে আসে খলেটি। কাজেই পুণ্য কিছু কম সঞ্চয় হয় নি ওর। পুণ্যে বোঝাই খলেটির মর্যাদাও অসামান্য। কাঁখ থেকে নামবার সময় আশান-ভাস্মের ওপর গল্পা ছিটিয়ে তবে নামানো হবে। তখন ওর পেটেব ভেতর থেকে পর পর যা সব বার হবে তাও আমার মুখস্থ হয়ে আছে। প্রথমে বেরোবে গলায় দড়ি বাঁধা একটি পেলের ঘটি—তারপর বামুনদিদি টেনে তুলবেন দড়ি-বাঁধা একটি ছোট পেলের গোল। বোতলটিকে নামিয়ে রেখে আবার খলের ভেতর হাত পুরে যে জিনিসটি বামুনদিদি টেনে বাব কববেন সেটি একটি ছোট বড় নানা সাইজের পোটলা পুঁটলির মালা। একখানি আস্ত কাপড়ের দশ জায়গায় দশটা পুঁটলি বাঁধা হয়েছে। ওর কোন্টিতে কি আছে তাও আমি বলে দিতে পারি। সব থেকে বড়টিতে আছে মুড়ি, তার ছোটটিতে চিঁড়ে, তাই পরেরটায় ছাতু। এমনি ভাবে কোনটা থেকে বেরোবে শুড়ের ডেলা, কোনটা থেকে ঝাল লাডু। কোনটায় আছে আমচুর, কোনটায় বা খানিক তেঁতুল। সবই শুছিয়ে নিয়ে গল্পান্নানে আসেন বামুনদিদি। মায় একখানি কুলনি আর এক মালা নারকেল পর্যন্ত বার হয় তাঁর খলি থেকে। উদ্ধারণপুর ঘাটে বসে আরাম ক'রে নারকেলকোরা-সহযোগে মুড়ি-চর্বণ—এতবড় ষাটশাহী বিলাস একমাত্র বামুনদিদির কৃপাতেই সম্ভব হ'ত। কাজেই ওর আবির্ভাবে একটু চাক্সা হয়ে উঠতেই হয়।

চাড়া হয়ে ওঠার মত আরও কিছু মাল সঙ্গে আছে বামুনদিদির। কোনও বেটা-বেটার সাতের থাকেন না, পাঁচের থাকেন না তিনি। থাকেন না বলেই সারা দেশটার যাবতীয় হাঁড়ির খবর তাঁর বৃকের মধ্যে একটি ছোট্ট হাঁড়িতে টগ-বগিয়ে ফোটে। ফুটলেও কোনও ভাবনা নেই, তেমন বাপের বেটা ন'ন তিনি। তাঁর বৃক ফাটেবে তবু মুখ ফুটেবে না।

ফোটবার দরকারও করে না তাঁর শ্রীমুখখানি। চক্ষু দু'টি আছে কিসের দরুন তাঁর কপালের নিচে ? ওই চক্ষু দু'টির সাহায্যে তিনি যত কথা যত সহজে বলতে পারেন কোনও বোলক-বাচালেও তা বদনের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে না। আমার সামনে পৌছেই তিনি তাঁর চোখের তারা দু'টিকে চট করে এমনভাবে ঘুপপাক খাইয়ে দিলেন যে তৎক্ষণাৎ আমাব নজর গিয়ে পড়ল সাদা খান-পর। ঘোমটা-টানা আর এটি জীবের ওপব, যিনি ছায়ায় মত বামুনদিদির ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ততক্ষণে বামুনদিদির বাঁশের মত গলাও গিয়ে পৌঁছিল শ্মশানের হাড়গুলোর কর্ণবিববে।

“এগো ও ভালমানুষ মেয়ে, এই নাও তোমাব সাঁটাবাকে, গড কর বাপু।” ভালমানুষের মেয়ে বামুনদিদির পাশ দিয়ে এগিয়ে এল। দু'পা এগোতেই একেবারে তিড়বডিযে উঠলেন বামুনদিদি—“আহা, হা, হা—আবার চললে কোথায় গো আমাব মাথা খেতে ? উঠবে নাকি গিয়ে একবারে ঐ মড়ার গদির ওপর ? জাত-জন্ম আর খুঁটও না বাবু। নাও—এখান থেকেই গড কর, বাবার পাটের সামনে গড ক'লেই হবে।”

ঠিক কি যে কবতে হবে তা বুঝতে না পেরেই বেঁধে হয় তিনি অল্প একটু ঘোমটা সবিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন। গ্রান চাইলেন আ'র মুখের দিকে আর সেই মুহূর্তে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর চক্ষু দু'টির ওপর। শুধু চোখ দু'টিই দেখতে পেলাম আ'র এবং তাই যথেষ্ট। যদি চোখের মত চোখ হয় তা'হলে চোখ দু'টিই যথেষ্ট। অন্য কিছু দেখবার প্রয়োজনই করে না।

বিন্দু চোখ নিয়ে আবিষ্কৃত্য করার সময় নয় সেটা। বামুনদিদি খন্দের এনেছেন। স্ত্রীতবাং যেমনই চোখ হোক, চোখের মালিক চিন্তা খন্দের। এ খন্দের দাম দেবে, মাল কিনবে। দোকানদার যদি খন্দেরের চোখ নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ে তা'হলে তার কারবার চলে না।

তাড়াতাড়ি তাঁকে রেহাই দেবার জন্তে বলে উঠলান—“হয়েছে, হয়েছে, যাও ওখানে বসো গিয়ে। বসে ঠাণ্ডা হওগে যাও।”

ঠাণ্ডা হবার জো কোথায় বামুনদিদি সঙ্গে থাকতে !

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল—“হ্যাঁ, এবার একটু গঙ্গা নিয়ে এস গে তোমার ঘটিতে । এনে বেশ করে ছিটিয়ে দাও ওই ওধারটায় । আমার মাথা খেতে কিছু নামিও না যেন গঙ্গা না ছিটিয়ে । নরক, নরক, ছিষ্টছাড়া পোড়ারমুখো জায়গায় এমন একটু ঠাই নেই যে পা রাখি । হাড়গোড় কাঁথা-কানিতে সব ‘খ্যাতোড়’ হয়ে রয়েছে, জ্বাত-জ্বন্ত আর রইল না বাপু, কত পাপই যে করে এসেছিলুম মরতে—”

বলতে বলতে বামুনদিদি ডানদিকে খানিক এগিয়ে গিয়ে ডান হাতে কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে সেই থলে কাঁখে নিয়েই ডান ঠ্যাং দিয়ে খানিকটা জায়গা চাঁচতে লাগলেন । তিনিও ততক্ষণে গঙ্গার দিকে পা বাডালেন, বোধ হয় গঙ্গা নিয়ে আসতেই গেলেন ।

চোখের আড়াল হ’তেই ডিঙি মেরে গলা উচিয়ে বামুনদিদি একবার দেখে নিলেন ঠিক নামছে কিনা গঙ্গায় । তারপর ছুটে এসে দাঁড়ালেন আমার বাছে, দাঁড়িয়ে চোখ দুটিকে অবিশ্রান্ত ঘোরাতে ঘোরাতে ফ্যাস-ফ্যাস বয়ে জানালেন খন্দেরের পরিচয় ।

“পাঁচুন্দির শীলদের ঘরের ভাগনী । ছুঁড়ীর হাতে ঢাকা আছে বাপু । একটু খেলিয়ে তুলতে পারলে ভাল হাতে দেবে-থোবে । বড় ঘরের বড় ব্যাপার,—দেখ—যেন আগে থাকতে ঝুলি ঝেড়ে ভালমাস্তব সেজে বোস না । যা দিনবাল পড়েছে ।”

ব’লে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার তিন লাফে গিয়ে ঠ্যাং চালাতে লাগলেন ।

অশান-ভস্ম উডতে লাগল বামুনদিদির ঠ্যাং চালাবার চোটে । উড়ে এসে চুকতে লাগল আমার চোখে-মুখে । তা থেকে বাঁচবার জন্তে চাদরখানা মুখের ওপর টেনে দিলাম ।

মুখ ঢাকা পড়লেও বিস্ময় মন ঢাকা পড়ল না । মনের মুখে ছাই লাগে না । মনের চোখে পর্দা নেই । সেই বেপর্দা মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম দুটি চক্ষু । চক্ষু দুটিতে অস্বাভাবিক লম্বা পল্লব । আর সেই পল্লব-ঘেরা চোখের মাঝে যেন ডুব দিয়ে রয়েছে কত কথা—কত কাহিনী । নিমেষের জন্তে সে চোখের সঙ্গে আমার চোখ মিলেছিল । নিমেষের মধ্যে সেই চোখ দু’টি স্পষ্ট বললে যেন—

কি বললে ?

আমাকে কি বলতে চায় সেই চক্ষু দু’টি ? কি শোনাতে এসেছে আমায় ?

যা শোনাতে চায়, তা ত আমার জানা । হাম দেবে তার বদলে এমন কিছু পাবে আমার কাছে, যা দিয়ে মূল্য শোধ করবে নিজের নিয়তির । কণিকের

দুর্বলতার স্বযোগে যে নিয়তি মন্ত বড় পাণ্ডানদার সঙ্গে লায়নে এসে দাঁড়িয়েছে তার দেনা শোধ করবার জন্তেই ত ওয়া আসে আমার কাছে। এ ত অতি লাদাসিধে কারবার। কিন্তু কই? আজ পর্যন্ত বামুনদিদি যত খন্দের এনেছেন, তাদের কারোও চোখে কখনও দেখি নি ও-জাতের দৃষ্টি। নির্লজ্জ লালসায় লালায়িত কসাইয়ের চোখের নিবিড় নিষ্ঠুরতা যেন ছোবলাতে এসেছে সে-সব চোখ থেকে। সে-সব চোখ যেন চিৎকার করে বলতে চেয়েছে—দাম দিয়ে মাল কিনতে এসেছি—সুতরাং খাতির কিসের? কিন্তু এ চোখ দু'টি যেন অস্ত্র সুরে কথা বললে। বললে—দিতেই এসেছি, দিতে পেলো বাঁচি। নিতে আসি নি কিছুই। কাজেই ভয় নেই আমার কাছে।

তঁার কাছে ভয় না থাকলেও বামুনদিদির রসনাকে ভয় করে না এমন কেউ আছে নাকি জগতে! বামুনদিদির আবির্ভাবে শ্মশানের হাড়গোড় শেয়াল-শকুন-গুলোও তটস্থ হয়ে ওঠে। শুষ্ট ও নিশুষ্ট কে জানি গিয়ে পড়ল বামুনদিদির পা দিয়ে বাঁটানো পবিত্র এলাকায়। রৈ রৈ বরে উঠলেন তিনি।

“দূর, দূর—দূর হয়ে যা চুলো-মুখোরা। মরতে আবার এখানে আসা হচ্ছে কেন? নাথি মেরে মুখ ভেঙে দেবো একেবারে।”

তাড়াতাড়ি মুখের ওপর থেকে চাদর নামিয়ে চেয়ে দেখলাম, ঊর্ধ্ববাসে ছুটছে একটা কুকুর। ওখানে যারা তিনটে চিতার পাশে কাজে বাস্ত ছিল তারা খোঁচা-খুঁচি খামিয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে বামুনদিদির দিকে। ইতিমধ্যে গঙ্গা এসে পৌঁছে গেলেন। সেই সুরেই বামুনদিদি হুকুমজারি করলেন—“নাও গো নাও। এবার বেশ করে গঙ্গাটুকু ছিটিয়ে দাও এই ঠাইটুকুতে। জাত-জন্ম আর রইল না মা—পাঁচ আবাগীর জন্তে। এই জন্তেই বলে—ভাল করতে যেতে নেই মানুষের। পাঁচ আবাগীর পাল্লায় পড়েই এই হাড়ী ডোমের হাল হয় আমার থাকতেও পারি নে মানুষের চোখের জল দেখে, তাই এই নরকে মরতে এসেছে হয়।”

বলতে বলতে তাঁর নজর প’ড়ে গেল আমার দিকে। পড়লেন আমায় নিয়ে।

“আর ঐ মুখপোড়া মড়া চড়ে বসে আছে মড়ার কাঁথার পাজা সাজিয়ে। মরতে আর ঠাই মেলে না ওর। যত বলি, কেন রে বাপু, ভূ-ভারতে কি আর মরবার জায়গা জুটবে না নাকি? এই ত প’ড়ে রয়েছে বাটোয়ার কালীবাড়ী। সেখানে ব’সে থাকলে কি ভাত জুটত না? চলুক ত দেখি আমার সঙ্গে সেখানে। দেশহুস্ত সব মড়াকে এনে যদি জমা না করতে পারি ওর পায়ের তলায় ত আমি দেশো ঘোষালের বেটীই নই।”

ব’লে দেশো ঘোষালের বেটী নামালেন তাঁর মোট গঙ্গা-ছিটানো জায়গায়।

নামিয়ে তৎক্ষণাৎ খুলতে বসলেন থলের মুখের বাঁধন। তাঁর নিজের মুখের বাঁধনও খোলাই রয়েছে, কাজেই তা থেকে অনর্গল ছিটকে বেরোতে লাগল বচনবৃদ্ধ।

“খ্যাংরা মারি নিজের কপালে মা, খ্যাংরা মারি সেই বিধাতা পুরুষের কপালে, যে আমার গড়েছিল। রাজার তুল্য বাপ-ভাই সব খেয়ে এই বয়সে এখন লোকের খ্যামজ্ঞ খেটে মরছি। নয়ত আজ আমার অভাব কিসের? পোড়ারমুখো যমের মুখেও খ্যাংরা মারি, এত লোককে মনে পড়ে আর আমার ভুলে বসে আছেন চোখ থেকে যমে।”

বলতে বলতে থলের মুখ খুলে বার ক’রে ফেললেন তাঁর ঘটি আর তেলের শিশি। সে দু’টো দু’হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে পড়ল যে কিছু পবিত্র কাঠ প্রয়োজন। বামুনদিদির চাষের নেশা আছে। জল গরম করতে গেলে কাঠ চাই। অথচ শ্মশানময় যত কাঠ পড়ে আছে তা তিনি ছোঁবেনও না। এ সমস্ত মড়াপোড়া কাঠ বাঁশে তাঁর জল গরম হতে পারে না। কাজেই চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে হাঁক ছাড়লেন—“ও বাবা হরিপাল, ওরে ও হরিবংশ, বলি গেলি কোন চুলোয় রে?”

এক বোঝা কাঠ কাঁধে নিয়ে রামহরি আসছিল। কাঁধে কাঠ নিয়েই জবাব দিলে, “হেই—বামুনদিদি লয় গো। এসো গো দিদি ঠাকুরণ। দাঁড়াও—আসছি কাঠ-বোঝা লামিয়ে।”

ফোকলা মুখে এক গাল হেসে বামুনদিদি বললেন—“এস ভাই, এস। কাঠ নামিয়েই এস। আমি ততক্ষণ একটা ডুব দিয়ে আসি। তা ভাই দু’খানা সরু কাঠের ফালি আর পাকাটিও এনে দিস তোর ঘর থেকে। ক’রে মরেছি মুখপোড়া নেশাটা। ডুব দিয়ে এসে একটু গরম জল মুখে না দিলে আবার মাথা ধরবে।”

সামনে দু’পা এগিয়েই আবার ফিরে দাঁড়ালেন দিদি। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল যে সঙ্গিনী তখনও একভাবে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে তাঁর পিত্তি জলে উঠল।

“বলি, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি গো তুমি? ঢের হয়েছে, আর নজ্জা দেখাতে হবে না এথেনে। এখন কাপড়-চোপড় খুয়ে তেল দাও মাথায়। আর নজর রেখো চারদিকে, শেয়াল-কুকুর না এগোয় এদিকে। ডুবটা দিয়ে আসি আমি, তা’পর তুমি যেও।”

কয়েক পা গিয়ে আবার একবার পেছন ফিরে সাবধান করলেন—

“মুখের কাপড় তুলে একটু চোখ চেয়ে খেকো বাপু। আমি এই গেলুম আর এলুম বোলে—এর মধ্যেই যেন মাথা খেয়ে না যায় আমার কেউ।”

যড়ার কানি পোড়াকয়লা হাড়গোড় এসব বাঁচিয়ে লাফাতে লাফাতে দিদি নেমে গেলেন গঙ্গায় এবং তৎক্ষণাৎ “তিনি” ফিরে দাঁড়ালেন আমার দিকে। দাঁড়িয়ে তাঁর আঁচলের খুঁট মুখে তুলে দাঁত দিয়ে গিঁট খুলতে লাগলেন। সামান্য সময় লাগল গিঁট খুলতে, কি একটা ছোট্ট সাদা-মত বস্তু বার হল। সেটা নিয়ে ত্রস্তপদে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। তখন দেখলাম তাঁর মুখখানি। কাঁচা, একদম কাঁচা এ মুখ। এ মেয়ে মেয়েই আছে এখনও, নারী হয়ে উঠতে পারে নি।

নারীর বর্ষ নয়, মেয়ের বর্ষই কানে গেল আমার। এতটুকু জড়তা নেই, সঙ্কোচ নেই, নেই ছিটে-ফোটা খাদের মিশ্রণ। দুঃখ-লজ্জা হা ছত্রিশ মেশালে যে খাদের সৃষ্টি হয় তার এতটুকু ছোঁয়াচ নেই সে সুরে। তার বদলে যেন বানে গেল আমার স্থূল-পালানো ধুঁষ্ট্র মেয়ের গলার সুর।

“এই কাগজখানা প’ড়ে দেখুন ভাড়াভাড়ি। রাঙা দিদি আমাকে আসতে বলেছেন আপনার কাছে।”

অস্বস্তি হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—“রাঙা দিদি! কে তোমার রাঙা দিদি?”

চট ক’রে একবার পেছন দিকে চেয়ে নিয়ে বললে, “বোষ্টমী দিদি। তিনি আমাকে বলেছেন আপনার কাছে আসলেই—” হঠাৎ চুপ করল। মুখখানিও নিচু হয়ে পড়ল। এক ঝলক রক্তও যেন ছুটে এল চোখে-মুখে।

বললাম—“আচ্ছা ভাই, পড়ব তোমার চিঠি। এখন যাও তুমি। খুব সাবধান—বড় ভয়ানক লোক উর্ন, যার সঙ্গে এসেছ এখানে।”

মুখ তুলে বললে—“যখন যাব আপনার পায়ের ধুলো নোব কিন্তু। একটিবার নেমে দাঁড়াবেন।” বলে আর দাঁড়ালো না, কাক শকুন ভাড়াতে ছুটল বামুনদিদির পৌটলার ওপর থেকে।

চেষ্টা ক’রে কাগজখানির ভাঁজ খুলতে হল। গদির ওপর মেলে হাত দিয়ে চেপে যতটা সম্ভব মোজা করনুম কাগজখানি। পেন্সিলের লেখা, অপটু হাতের মেয়েলি টান। একটু একটু ক’রে পড়তে হল। একবার ছ’বার তিনবার পড়লাম আগাগোড়া। তারপর মুখ তুলে দেখলাম। বামুনদিদি তখনও ফেরেন নি, মেয়েটি এখানে পেছন ফিরে চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে আছে।

জপায় গঙ্গায় ভাক দিলাম—“হবর্ণ!”

খুঁজে পাঁড়ালো। চেয়ে রইল আমার দিকে।

বললাম—“কিন্তু কে এই লোকটি—ঠিক চিনতে পারছি না ত।”

মুখ নিচু ক’রে সেও চাপা গলায় জবাব দিলে—“ঐ যে আপনার কাছে আসে, দাঁত উঁচু—”

প্রায় চিংকার ক’রে উঠলাম—“কার কথা বলছ তুমি? খস্কা! আমাদের খস্কা ঘোষ?”

সঙ্গে সঙ্গে ঝটু ক’রে মেয়েটি পেছনে ফিরল। ফ্যাল ফ্যাল ক’রে চেয়ে রইলাম ওর পেছন দিকে। দূরে বামুনদিদির গলা শুনতে পেলাম। মা গঙ্গার বাপের শ্রাদ্ধ করতে করতে উঠে আসছেন।

“গড় করি এমন মা গঙ্গার খুঁজে। খুঁজে খুঁজে গড় করি মা তোমায়। কত পাপ করলে তবে লোকে গঙ্গা নাইতে আসে এখানে। যত বার ডুব দি, ততবার একটা ছাইভস্ম ভেসে উঠবেই মুখের কাছে। খ্যাংরা মারি এমন গঙ্গা নাওয়ার মাথায়।”

তাড়াতাড়ি কাগজখানা লুকিয়ে ফেলে একটা বোতল টেনে তুললাম গদির পাশ থেকে। গলায় একটু না ঢাললে মাথাটা ঠিক সাক্ষ হচ্ছে না।

খস্কা ঘোষ।

ময়নাপাড়ার বড় ভাই, দাঁত-উঁচু লক্ষীছাড়া ভবঘুরে খস্কা ঘোষ! খস্কা ঘোষ উডনচণ্ডে বেপরোয়া বাউড়নে বাউল। যার মাথায় তেল পড়ে না কখনও, তেল না পড়লেও যে মাথার মধ্যে হাজারো রকম ফল্দি-ফিকির সদাসর্বদা বিলবিল করছে। ঝুঁকি যাতে নেই তেমন কাজে হাতে দিতে যার বৌক চাপে না কিছুতে। সেই খস্কার মাথার মধ্যে এ হেন একটি স্বর্ণ-পোকা ঘুরঘুর করছে—এ কি কস্মিন-কালেও বল্পনা করতে পেরেছি!

কিন্তু এত কল্পনা নয়, এ হয়ত সত্যিও নয়। এ শুধু স্বপ্ন। উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন। উদ্ধারণপুরের জাত-জালিকের আসমানী জালে ধরা পড়েছে খস্কা ঘোষের স্বর্ণ-মাছ। মাহুঘের মাথার খুলিতে ছেঁদা ক’রে তাতে মেয়েমাহুঘের বকের একটি নরম হার পরিয়ে যে টাকু তৈরি হয়, সেই টাকুতে স্ত্রীতো পাকায় উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন-জ্বলে। বিশ্রী জট পাকানো সে স্ত্রীতোয়, মগজ থেকে সে স্ত্রীতো বার হয়। খস্কা ঘোষের কক্ষ মাথার মধ্যে যে মগজ আছে তা থেকে বার হয়েছে যে স্ত্রীতো, সেই স্ত্রীতোয় বোনো জালে বাধা পড়েছে এই সোনালী মাছটি।

কিন্তু থাকবে না, থাকতে পারে না, স্বপ্ন-জ্বলের জালে বাধা বোয়াল থেকে

চুনো পুঁটি কিছুই আটকে থাকে না।

তাই খস্কা ঘোষ ছুটে বেড়ায়। ছুটে যায় আবার ছুটে আসে। ধামতে পারে না কোথাও। খস্কা ঘোষের জীবনসঙ্গীতে সমের মাথায় তেহাই পড়ে না কখনও।

কিছু করব কি আমি? কি কাজের ভার দিয়েছে আমায় নিতাই? এই বিশি জট আমি খুলব কেমন করে।

কাগজখানা থেকে যেটুকু জানতে পেরেছি তার বেশী আরও একটু কিছু জানবার জন্তে মুখ তুলে হাঁ করলাম। টপ্ করে হাঁ বন্ধ করতে হ'ল। বামুনদিদি সন্সার পাঠছেন। কানে গেল তাঁর মন্ত্র পাঠ।

“তুডো জ্বলে দি মান্শের নজরে। একেবারে চড়ুই পাখীর নজর গা। বলে—লোকের বেলায় সওয়া হাত গলা, নিজের বাপের ছরাৎদে একটা পচা কলা। এই তোর হাতে উঠল লা হারামজাদী! যার দৌলতে আজ ডগডগে মিঁহুর কপালে দিয়ে সতী সেজে সোয়ামীর পাশে শুচ্ছিস, তাকে পূজা দিতে গিয়ে এই তোর হাতে উঠল লা বোনাই-ভাতারী! তুডো জ্বলে দিতে হয় এমন হাড়-হাবাতে নজরের মুখে। তা আমার আর দি, যা পাঠিয়েছে আমার হাতে তাই ত আমি দিয়ে যাব। আমার আর কি, আমি ত ব'য়ে আনবার বাদী। গদির ওপর ব'সে ভালমানুষি ফলিয়ে একেবারে উজ্জোড করে দিয়ে বসলে এই রকম ত হবেই। গলা দিয়ে একবার উল্লে মান্শের আর মনে থাকে নাকি কিছু? বলে—নেবার বেলা ছিনে জ্বোক, দেবার বেলা পুহশোক!”

বলতে বলতে বামুনদিদি উঠে এলেন। কাছাকাছি এসে আমার গদির ওপর ছুঁড়ে মারলেন একটা পুঁটলি। এতটুকু একখানি গামছায় বাঁধা কয়েক মশা চাল আর বোধ হয় ছুঁটো আলু-কচুও আছে ওর মধ্যে। গদির এক হাড় গামনে জ্বাকড়া-জড়ানো একটা বোতল টিপ করে নামিয়ে দিয়ে গজরাতেই লাগলেন তিনি।

“এই নাও ভাই, তোমার পূজো নাও। যা তোমার পোড়া কপালে আছে তাই ত পাবে। আমি মাথা খুঁড়ে ম'লে হবে কি, তোমার কপালের ছুঁখ খণ্ডাবে কে? ওমা, মানুষ নিয়ে আসি আমি, তা আমার সঙ্গে ছুঁটো শলাপরামর্শ করার ফুরসৎ হয় না তোমার। উনুন-মুখীদের চোখে জল দেখেই তুমি ম'জে যাও, আর হাত তুলে খপ করে যাকে যা খুশি দিয়ে হাত ধুয়ে ব'সে থাক। এখন এই ধর— দু'বছর হাঁটাইটি করে ঐ খাদ্য করেছি। পাঁচ সিকে বেঁধে দিয়েছে ঐ টেনাখানার খুঁটে। আর এই তোমার বোতল। সেই বোনাই এখন ভাতার

হয়েছে, কোল জোড়া ছেলে, এখন তুমিই বা কে—আমিই বা কে ?”

ভয়ে ভয়ে একান্ত কুণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করলাম—“এ আবার কে দিদি, মনে পড়ছে না ত !”

দিদি একেবারে ছুঁহাত ঘুরিয়ে হৃত্য জুড়ে দিলে—“মনে তোমার পড়বে কেন ভাই ? মনটি কি তোমার আছে এখানে ? সে পদার্থটুকু ত চুরি ক’রে নিয়ে পালিয়েছে সেই চলানী। সাত দোর যে যাজিয়ে বেড়ায় তার দাঙ পায়ে মনটি ‘সমগ্ধ’ ক’রে ত তুমি যত্নর হয়ে বসে আছ। যাও না যাও, একবার দেখে এস গিয়ে মালিপাড়ার জমিদার বাড়ীতে। তোমার মন-কেড়ে-নেওয়া সেই সাধের বোষ্টমের রূপে এখন মালিপাড়া বলসে যাচ্ছে যে। মা ম’ল ! মায়ের ‘ছরাঙ্গ’টা চোকবারও তর সইল না। অমনি সঁধুলো গিয়ে সেখানে। আর সেই মুসকো মিন্বে বোষ্টমটা, সেটা প’ড়ে প’ড়ে লাথি খাচ্ছে বাবুদের দরজার বাইরে। তুমিও যাও না কেন, গিয়ে মাথা খুঁড়ে মর গে বাবুদের দাওয়ানের ছিচরণে। শুধু সোনার পিতিমে ছাড়া আর কার কথা কবে মনে পড়েছে তোমার ? এই যে আমি মরি তোমার জন্তে, আমার কথাটাই বা কবার মনে পড়ে তোমার ভাই ? সেবার কত বকিয়ে পড়িয়ে সেই হারাগীকে আনলাম। বড় বোন মরতে বোনায়ের ঘরে গেল ভাত-জল দিতে। ভাত-জল দিতে দিতে একেবারে তিন মাসের ছেলে পেটে নিয়ে ফিরল। বোনাই নাথি মেয়ে খেদিয়ে দিলে। তখন এই দেশো ঘোষালের বেটা ছাড়া আর গতি নেই। তা আমি আনলাম এক কথা বোলে, উনি দিলেন উল্টো মন্তর। দিলেন এক মাছলী ছুঁড়ীর হাতে বেঁধে বিনি পয়শায়। সোহাগ দেখিয়ে আশীর্বাদ করা হল আবার—সোয়ামী পুরুষ নিয়ে সুখী হও গে যা। সুখীই হয়েছে, সুখের পাঁচ-পা দেখেছে এগেবারে। সেই বোনাই এসে সিঁহুর পরিষে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। সেট ব্যাটাই এখন কোল-জোড়া হয়ে বেঁচে রয়েছে। আমে-হুখে মিশে গেছে, আঁটিটা আঁহাঝুঁড়ে প’ড়ে বকাচ্ছে।”

হঠাৎ এখানে নজর গিয়ে পড়ল বামুনদিদির। ছিলা-ছেঁড়া ধক্তবের মত ছিটকে উঠলেন—“হস, হস, দূর দূর, বঁটা মার মুখপোড়াদের মুখে।” ছুটে গিয়ে পড়লেন তাঁর পোটলার কাছে। ছুঁটো কাক চক্রাবারে উড়তে লাগল তাঁর মাথার ওপর।

চুপি চুপি নেমে গেলাম গদির পেছন দিয়ে।

আবঙ্গ ঝোপের আড়াল দিয়ে ঘুরে গজায় গিয়ে নামলাম। কৈ ? কোথায় গেল সে ?

একগলা জলে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে ছুঁহাত জোড় ক’রে স্বর্গ প্রণাম করছে ।

চোখবোজা মুখখানির দিকে চেয়ে খন্টার মুখখানাও চোখের ওপর ভেসে উঠল। সেই দাঁত বার করা ক্রীহীন মুখে, সেই বেপরোয়া বেহায়া চোখ দু'টোর মধ্যে যে কি রহস্য লুকিয়ে থাকে এতদিন পরে তার হৃদিস পেলাম। উদ্ধারগপুরের স্বপ্ন, খন্টার চোখে উদ্ধারগপুরের স্বপ্ন। এতকাল পরে সেই স্বপ্ন সশরীরে এসে দাঁড়িয়েছে উদ্ধারগপুর ঘাটের একগলা জলে। নিতাই পাঠিয়েছে একে আমার কাছে। এখনও তা'হলে নিতাই বিশ্বাস করে যে আমার মধ্যে মানুষ একটা বেঁচে আছে, যে মানুষ মানুষের স্বখে-দুঃখে-বেদনায়-দুর্বলতায় জেগে উঠতে পারে। বড় বেশী বিশ্বাস ক'রে ফেলেছে আমাকে নিতাই, এত ঠেকেও তার বিশ্বাস করা হোগটা গেল না।

আরও খানিক জলে গিয়ে সামনে থেকে ডাক দিলাম—“স্ববর্ণ?”

চোখ চেয়ে হকচকিয়ে গেল।

বললাম—“মন দিয়ে শোন। ওষুধ তোমায় খাইয়ে দোব আমি। বিশ্বাস ক'রে চোখ বুজে হাঁ করবে। কিছুই হবে না তোমার। এক মাস অন্তত আমার সময় দাও। খস্কা যাবে তোমার কাছে। গিয়ে তোমায় নিয়ে আসবে। তোমাদের বিয়েতে আমি মন্ত্র পড়াব। তারপর তোমাদের বাড়ী হ'লে এক ক্যুণায় একখানা ঘর তুলে দিও আমায়। সেই ঘরে গিয়ে আন্তানা গাড়ব। শেষ দিন ক'টা কাটাব তোমাদের কাছে।”

চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল মেয়েটার। ঠোঁট দু'খানি কাঁপতে লাগল থর থর করে। বার বার ছোড় হাত কপালে ঠেকাতে লাগল।

বললাম—“উঠে যাও এবার।” ব'লে এক ডুবে অনেকটা পার হয়ে গেলাম। বলা যায় না—বামুনদিদির স্তেনদৃষ্টি পড়ছে কিনা আমার ওপর কোনও ঝোপের আড়াল থেকে।

উদ্ধারগপুরের ঘাট।

ঘাটের কালো মাটি ধুয়ে নিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। কালো মাটি আর কালো কয়লা, এই দিয়ে উদ্ধারগপুরের স্মরণ তৈরী। কত যুগ ধরে কালো এসে জমা হচ্ছে এখানে। সে কালোয় কিছু ফলে না। যা ফেলা যায়—তাই যায় জলে। বীজ জলে গেলে অঙ্কুরিত হবে কি?

নিতাই পাঠিয়েছে এ বীজ। স্থির বিশ্বাসে পাঠিয়েছে যে আমি পারব। পারব এ বীজ অঙ্কুরিত করতে। তাই আজ গঙ্গায় নামলাম। কত কাল! কত যুগ-যুগান্ত পরে আজ শীতল হবার অন্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি গঙ্গায়।

। কলুনাশিনী মা গঙ্গা । সকলের সব জালা জুড়িয়ে শীতল ক'রে দেন । আমার জালাও নিশ্চয়ই জুড়িয়ে যাবে । না জুড়ালে যা ছোঁব এ হাত দিয়ে তাই যে জলে পুড়ে থাক হয়ে যাবে । এই জলন্ত স্পর্শ নিয়ে কি ক'রে হাত দোব আমি কোনও কিছুতে ? তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছি গঙ্গায় ।

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল যে গঙ্গাজলে তর্পণ করলে দেবলোক পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন হয় । আচ্ছা—জ্যাক্স মাহুঘের হয় না ? ইহলোকের কাউকে তুট ক'রতে হ'লে তিন ঔজ্জনা গঙ্গাজল দিলে হয় না ?

হোক না হোক, দিতে দোষ কি ? দিয়েই দেখি !

এক গলা জলে দাঁড়িয়ে তিন ঔজ্জনা জল দিলাম । মনে মনে বললাম—“তুমি তৃপ্ত হও । সকল জালা জুড়িয়ে যাক তোমার । যেখানে থাক শান্তি পাও । যে তার দিয়েছ তুমি আমায়—তার মবাদা আমি রাখবই প্রাণপণে । তুমি তৃপ্ত হও ।”

উদ্ধারণপুরের কল্পনা ।

শ্রীমতী কল্পনা দেবী উদ্ধারণপুরের শ্মশানের চিতা-লক্ষ্মী । আদর্শ গৃহলক্ষ্মীদের মন শ্মশানলক্ষ্মীও মশগুল হয়ে থাকেন নিজের শ্মশান-সংসার নিয়ে । অভাব স্নানটন বলতে কোনও কিছু নেই তাঁর গোছানো সংসারে । ভাঙা ইাড়ি কলসী আর ছেঁড়া চট কাঁথা মাহুরে তাঁর সোনার সংসার বোঝাই । নেই যা তাঁর—তা হচ্ছে একটু শান্তি, এক ছিটে স্বস্তির হাওয়া পেলে তিনি নিশ্বাস নিয়ে বাঁচেন । কিন্তু উপায় নেই, কালশত্রু বাসা বেঁধেছে তাঁর হৃৎপিণ্ডে, রাজযক্ষ্মায় ধরেছে যেচরাকে । শকা আর সন্দেহ—এই দুই মারাত্মক জীবাণুতে ঝাঁজরা ববে দিচ্ছে তাঁর ফুসফুসটা, কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁর কলিজাখানা । মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে তাঁর, কালো রক্ত । হিংসার বিবাক্ত পুঁজ মেশানো বলেই অত কালো রক্ত উঠছে তাঁর মুখ দিয়ে ।

উদ্ধারণপুরের কল্পনা ।

কল্পনা শ্মশান-বধু—উদ্ধারণপুর থেকে উদ্ধার হবার পথ খোঁজে । পথ খোঁজে আর কাদে । কাদে আর মাথা ঝোঁড়ে । বুখা প্রতীক্ষায় বসে বসে দিন গণে । উদ্ধারণপুর ঘাট থেকে উদ্ধার হবার পথ খুঁজে পায় না ।

কিন্তু উদ্ধারণপুর ঘাটের দিন হল ওস্তাদ জাহ্নকর । তার ওস্তাদি চালের সারপ্যাচে কল্পনা-বউ কান্না ভুলে যায় । মনে থাকে না তার বুকের জালা-যন্ত্রণা । চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়ে সাজে-গোজে, পোকায় খাওয়া বুকে জোর ক'রে খাস নিয়ে

আবার ঘর-গৃহস্থালীতে মন দেয়, সাদা হাড় আর পোড়া কয়লার সংসারে নিজেকে রাজরাজেশ্বরী জ্ঞান ক'রে নিজের মনের পর্দায় রঙের পর রঙ চড়ায়।

উদ্ধারণপুত্রের কল্পনা।

কল্পনা জানে পথ চেয়ে থাকতে। পথ চেয়ে থাকে আর ধুক্কে মরে। ধুক্কে ধুক্কে আরও ধোঁকায় পড়ে যায় হতভাগী। পোড়া কাঠ আর পোড়া হাড়ের পোড়া প্রবঞ্চনায় আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। শেষে একদিন খুব ভোরে সব জ্বালা পোড়ার অবসান হয়ে যায়। সন্দেহ আর সংশয়ের দংশন-জ্বালা আর থাকে না, থাকে না নিজেকে ধোঁকা দেবার কুৎসিত হ্যাংলাপনার প্রয়োজন। তার বদলে এ রোগের যা অনিবার্ণ উৎসর্গ, তাই এসে দেখা দেয়। বিকট হাঁ করে একেবারে গিলে খেতে আসে কল্পনামুন্দরীকে। রাগ এবং ঘৃণা এই দুটি নতুন উপসর্গ জুটে—কল্পনার ভাঙা শরীর ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে দেয়।

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় উদ্ধারণপুত্র ঘাটের নির্বিকার নির্মমতা। পোড়া কাঠ আর কালো কয়লা, সাদা হাড় আর ঘোলা গন্ধার জল, সবাই একদিন খুব ভোবে সচকিত হ'য় ওঠে। দেলা লাগে স্বপন-জ্বেলের বৃকে আর কল্পনা-বহুর মাথার মধ্যে। কান পেতে স্থির হয়ে শুনে থাকে সকলে—

“দেখেছি রূপ-মাগরে মনের মাহুঘ কাঁচা সোনা।

তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গিয়ে আর পেলাম না।”

‘গুব-গুব-গুব’ ক্রমেই এগিয়ে আসে।

কিস্তি খজনা কই? ‘রিন্-টিনি টিন্’ উত্তর দিচ্ছে না ত ‘গুব-গুব-গুব’ এর লক্ষে। এ কি রকম সঙ্গীত? যেন লবণহীন বিষাদ ব্যাঘ্রন, একটু মুখে দিলেই গা বমি বমি করে। উঁক উঠে উগরে দিতে চায়।

তবু কান পেতে থাকি, তখনও সামান্য এতটুকু ক্ষীণ আশা, নিজেকে নিজে প্রবোধদানের নিলজ্জ বেহায়াপনা। কানে আসে—

“সে মাহুঘ চেয়ে চেয়ে, ঘুঝিতেছি পাগল হয়ে,

মরমে জলছে আগুন আর নিভে না।

ওগো তারে আমার আমার মনে করি,

সে যে আমার হয়ে আর হোল না।”

দূর, দূর, দূর হয়ে যা আপদ। লজ্জা করে না আবার এখানে তোর ঐ কালো মুখ দেখাতে? মরমে আগুন জ্বলে “গুব-গুব-গুব” বাজিয়ে শ্রাকাপনার গান গেয়ে বেড়ানো হচ্ছে। অমন মরমের আগুনের মুখে ছাই তুলে দিতে হয়। কেন

—আগুন নেই নাকি উদ্ধারণপুরের ঘাটের কোনও চুলোয় ? যা না, চ'ড়ে বস্ না, গিয়ে তোর “গুব্-গুব-গুব্” স্বর একটা জলন্ত চিতার ওপর। একেবারে খতম হয়ে যাক তোর ঐ পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ানো ! অক্ষমের ঠুঁটো হাত বাড়িলে আকাশের চাঁদ ধরতে যাওয়ার ধাত্যমো ছাই হয়ে যাক—উদ্ধারণপুরের অনির্বাপ আগুনে।

“দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মাহুঘ কঁাচা সোনা।

তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গিয়ে আর পেলাম না।”

এসে পড়েছে। নিমগাছটা পেরিয়ে এলেই দেখা যাবে তাকে। শুধু তাকে, সেই কণ্ঠি পাথরে কৌদানো মোষের মত নিরেট পিণ্ডটাকে। দরকার নেই দেখবার, এতটুকু প্রয়োজন নেই আমার, তোর ঐ কুৎসিত লেংচানো নাচ-দর্শনের। ইচ্ছে করে, এক হেঁচকায় ঐ ‘গুব্-গুব-গুব্’টা বেড়ে নিয়ে গুর ওই চূড়ো-বাঁধা মাথার ওপরেই আছড়ে ভাঙতে।

এসে পড়ল। চোখ বুজে লেংচাতে লাগল হেলে ছুলে ঠিক আমার চোখের সামনে। আর সহ্য হল না, আমিও চোখ বুজে ফেললাম।

কিন্তু কান দুটো ত আর বোজা যায় না। বাজেই বিষ ঢালতে লাগল আমার এক জোড়া খোলা কানে।

“পথিক কয় ভেব না রে ডুবে যাও রূপ-সাগরে

ডুবিলে পাবে তারে আর ভেব না ,

ওগো এবার ধরতে পেলো মনের মাহুঘ, ছেড়ে যেতে আর দিও না।”

কি বললে !

বলছে কি ও ?

“ওগো এবার ধরতে পেলো মনের মাহুঘ, ছেড়ে যেতে আর দিও না।”

আর কথতে পারলাম না নিজেকে। চোখ বুজে বসে থাকার সাধ্য হল না আর। অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বার হ’ল একটা প্রকাণ্ড চিৎকার।

“চরণদাস বাবাজী !”

‘গুব্-কটাং’ ক’রে একটা উদ্ভট রকমের আওয়াজ হল। ছিঁড়ে গেল “গুব্-গুব-গুব্”-এর তারটা। তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হল চরণদাসের চরণ। বোকার মত চলে রইল সে আমার মুখের দিকে।

আগুনের হলুকার মত এক কলক শব্দ বার হ'ল আমার মুখ থেকে ।

“কোথায় সে ? কোথায় রেখে এলে তাকে ?”

খুব হালকাভাবে, যেন বেশ একটা মজার খবর শোনাচ্ছে, সেইভাবে অতি প্রশান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে বাবাজী ।

“চলে গেছে গোসাঁই ।”

কঠিনতর কণ্ঠে প্রায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম—“কোথায় ?”

“জানি নে ত গোসাঁই, বাবুর কাছে খোঁজ করবার চেষ্টা করলাম । দারোয়ানেরা গেট পার হতে দিলে না ।”

দম বন্ধ হয়ে আসবার যোগাড় আমার তখন । তবু অন্তিম চেষ্টায় মুখ দিয়ে বার করলাম—“কে সে ? কোন্ বাবু ?”

হেসে ফেসলে চরণদাস । পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললে বাবাজী—“ঐ যে সেই বাঘ ! সেই যে সেদিন শুনলে না—গেয়েছিলাম—

“ও বাঘের চোখে হলে দেখা

নিশ্চয়ই মরণ লেখা গো—”

প্রস্তুত ধমক দিলাম একটা—“চুপ থামাও তোমার গ্ৰ্যাকাপনার গান, আমি শুনতে চাই, কি ক'রে আবার দেখা হল তোমাদের সেই লোকটার সঙ্গে ? কোথায় দেখা হল ? কবে দেখা হল ? সব বলতে হবে তোমায় এখনই ।”

উল্টো প্রশ্ন ক'রে বসল বাবাজী অতি করুণ কণ্ঠে—“ব'লে আমার কি লাভ হবে গোসাঁই ? শুনেই বা তোমার এমন কি লাভ হবে এখন ?”

ওর ওই মালা-তিলকের মোলায়েম নির্নিপুণতা সহ্যের সীমা পার হয়ে গেল । হঠাৎ কুকুরের মত ছিটকে পড়লাম গদির ওপর থেকে । দু'হাতে চেপে ধরলাম ওর গলা ।

প্রস্তুত ঝাঁকানি দিতে দিতে দাঁত কড়মড় ক'রে বললাম—“বল, বল শিগু'রি, বলতেই হবে তোকে সব কথা—বল—বল—”

চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসবার যোগাড় হল বাবাজীর । মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত, বাগ্গ-যন্ত্রটা আছড়ে পড়ল তার হাত থেকে, দু'হাত দিয়ে ধরলে আমার দুই কজ্জি । সঙ্গে সঙ্গে মড়মড় ক'রে উঠল আমার কজ্জির হাড়, থ'সে এল আমার হাত দু'খানা ওর গলা থেকে । হয়ত একটা আতঁনাদও ক'রে উঠলাম আমি ।

ইপাতে ইপাতে খুব মিনতি ক'রে বললে চরণদাস—“নাও গোসাঁই, বস গিয়ে তোমার ঐ মজার গদির ওপর চেপে । বলছি—বলছি আমি তোমায় সব কথা । আমার গলা টিপে ধরলে কি লাভ হবে বল এখন ! এ গলা দিয়ে বহুবার আমি

তোমায় সাবধান করেছিলাম, তখন কেন তোল নি আমার কথা কানে ?”

ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কব্জিখানা উল্লসে উল্লসে বেমনা-বিকৃত গলায় বললাম—“কি বলেছিলি ? বলেছিলি কি আমার তখন ?”

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে চরণদাস—“বলি নি তোমায় ? পায়ে ধরে সাধি নি তোমায় আমাদের সঙ্গে যেতে ? ঐ মড়ার গদির মায়া কিছুতে কাটাতে পারলে না গোঁসাঁই, কিছুতে টললে না তখন । আজ তোমার মাথায় খুন চাপল । কি লাভ হবে এখন আমার খুন করলে বা নিজে খুন হ’লে ?”

মাথা নিচু ক’রে ফিরে গিয়ে বললাম আমার গদির ওপর । মড়ার বিছানার মরা মর্দাদার মাথা হেঁট হয়ে গেল । মুখ তুলে চাইবার উপায় নেই আর । পায়ে ক’রে বাত্ব যন্ত্রটা একধারে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এল চরণদাস । গদি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রায় ফিসফিস ক’রে বলতে লাগল—

“সে গেছে, তার জন্তে আমার দায়ী করছ কেন গোঁসাঁই ? আমার সঙ্গে কি এমন সম্বন্ধ ছিল তার যে তাকে বাধা দোব ? কি এমন সম্পদ আছে আমার, যা দিয়ে তাকে বেঁধে রাখব ? সেই রাজে, যখন জানতে পারলাম দারোগা ছিনিয়ে নিতে আসছে ওকে, তখন আমিই গঙ্গার ভেতর দাঁড়িয়ে কচি ছেলের কান্না কেঁদে-ছিলাম । আমাদের মধ্যে ষড় ছিল, ঐ কান্না শুনেল বুঝতে হবে যে বিপদ একটা কিছু ঘটতে চলেছে । তখন পালাতে হবে । পালালাম তাকে নিয়ে । পথে বললে আমার মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমারবাবুর কথা । তিনিই নাকি একমাত্র বাঁচাতে পারেন তোমায় । নিতাই ধারণা করেছিল যে আমাদের না পেয়ে দারোগা তোমায় ওপর অত্যাচার চালাবে । তখন আমারও মাথাটা ঘুলিয়ে উঠল । তোমাকে বাঁচাবার জন্তে ছুটলাম তাকে নিয়ে মুকুন্দপুর মালিপাড়ায় । ভোর নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম । নিতাই সোজা গিয়ে ঢুকল অন্দরমহলে । সেই যে ঢুকল আর বার হল না । মাথা খুঁড়লাম নায়েব গোমস্তা দারোগাখানের পায়ে, একটিবার তার সঙ্গে দেখা করার জন্তে । অন্তত একটিবার বাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্তে পায়ে ধরলাম সবলের । ঘা কতক দিয়ে তারা আমার রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেল । তখন বসে রইলাম বাবুর বাড়ীর সামনে । দিনের পর দিন কেটে গেল । কত গানই যে গাইলাম, কত ডাকই যে দিলাম, বিজ্ঞ অন্দরমহল বড় সাংঘাতিক স্থান গোঁসাঁই । অনেকগুলো দরজা ওপারে তখন নিতাই, আমার ডাক পৌঁছবে কি ক’রে সেখানে ?”

বলতে বলতে মাথাটা হুয়ে পড়ল চরণদাসের, ওর দু’চলো খুত্‌নি নামতে নামতে প্রায় তেকে গেল ওর বুকের সঙ্গে । বাবাজীর সান্না শরীফটাই কেমন যেন

শিথিল হয়ে গেল। কাঁধ দুটো অনেকটা ঝুলে পড়ল ছুঁধারে। রণমার্কী চরণদাস বাবাজী, যার মূর্তির সামান্য চাপে আমার কান্না ছুঁখানা মড়মড়িয়ে ভেঙে যাবার যোগাড় হয়েছিল, সে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ননীর পুতুলের মত নমনীয় হয়ে উঠল।

হঠাৎ আমার মনে হল—স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম চরণদাস কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওর ভেতরের রক্ত একটা ভয়ঙ্কর কিছু যেন ফেটে বার হবার অন্তে চরম চেষ্টা করছে। চিতার ধোঁয়া লাগা আমার পোড়া চোখেও যেন ধরা পড়ে গেল—নিরুদ্ধ বেদনার সাকার রূপটা। ঘৃণা নয়, ঘেব নয়, প্রতিশোধ-স্পৃহা নয়, এমন কি নিষ্ফল অভিযোগ বা মাথা-কোটাকুটিও নয়, এ শুধু একটা বোবা যন্ত্রণা-ভোগ। একটা বাসনাহীন নির্জলা হিতকামনা। যাকে ও ভালবাসে তার অন্তে একটা আশঙ্কা আর উৎকর্ষ। ও জিনিস এতে খেলো জাতের নয় যে ওর অন্ত কোনও রকম বহিঃপ্রকাশ সম্ভব। যার ভেতর জন্মায় ও-বস্তু, তাকেই শুধু নিঃশেষে পুড়িয়ে মারে, অন্ত কেউ টেরই পায় না।

আমিও টের পেলাম না, স্পষ্ট ক’রে পারলাম না অমুভব করতে, কিসের জ্বালায় জলে মরছে ও। তবু আমার ভেতরটাও কেমন যেন মূড়ে উঠল। আরো ভালো ক’রে চিরে চিরে ওকে বিচার করবার ফুরসতও পেলাম না। যেন আমায় ঠেলে নামিয়ে দিলে গদির ওপর থেকে। নেমে ছুঁহাতে জাপটে ধরলাম ওকে বুকের সঙ্গে। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—“চরণদাস, আমায় ক্ষমা কর ভাই।” আর কিছু বারই হল না আমার গলা দিয়ে। ছুঁহাতে ওকে বুকের সঙ্গে কবে আঁকড়ে ধরে ওরই কাঁধের ওপর মুখ রেখে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল।

উদ্ধারণপুর ঘাটের অনেকগুলো কাঠ নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

অনেকগুলো হাড়, অনেকটা মাংস মিশে অনেকটা ছাই জমে গেল আশানে। সেই ছাই উড়ে গেল অনেকটা উদ্ধারণপুরের বাতাসের সঙ্গে। উড়ে চলে গেল কোথায়, কতদূরে, তাই বা কে বলতে পারে!

হয়ত সেই ছাই খানিকটা লুবিয়ে ঢুকে পড়ল বাতাসের সঙ্গে মুকুন্দপুর মালি-পাড়ার কুমার বাহাদুরের স্বরক্ষিত অন্দরমহলের মধ্যে।

হয়ত সেই ছাই খানিকটা ঢুকল গিয়ে এই মুহূর্তে কুমার বাহাদুরের নাকে-মুখে-চোখে।

হয়ত আতে ছন্দপতন হল তাঁর প্রেম-গুণনের।

হয়ত সেই ছাই ঢুকল গিয়ে নিতাইয়ের কানের মধ্যে, তাতে সব চেয়ে মধুর
আর সব থেকে প্রিয় ডাকটি আর তার শোনা হল না।

হয়ত উদ্ধারণপুরের ছাই খানিকটা লাগল গিয়ে নিতাইয়ের গালে। আর
তাতে মুখ রগড়াতে গিয়ে কুমার বাহাদুর মড়া পোড়ার গন্ধ পেয়ে সজোরে ছ'হাতে
নিতাইকে দূরে ঠেলে দিলেন।

কতক্ষণ পার হয়ে গেল তার খেয়ালও রইল না।

আমার খোলা বুকটা ভিজে গেল দৈবদ্রুত জলে। বাবাজী চরণদাসের বৃকের
জ্বালা তখন জলের রূপ ধরে উপচে পড়তে লাগল আমার হিম-শীতল বৃকের ওপর।
তাতেও কি নরম হল উদ্ধারণপুরের পোড়া মাটির তৈরী পোড় খাওয়া কালো
বুকটা আমার। না, বরং আরও রুক্ষ, আরও ঠাণ্ডা, আবও নির্মম হয়ে উঠল
আমার বৃকেব ভেতরটা। অস্ত্র বোনও চিন্তা ভাবনা নেই তখন সেখানে,
এমন কি নিতাইকেও বেমালুম ভুলে গেলাম। শুধু একটা তীব্র অপমান-বোধ,
একটা নির্জলা প্রতিশোধ-স্পৃহা দুমদুম করে ঘা দিতে লাগল আমার বুকটার মধ্যে।

অবশেষে ওর কাঁধের ওপর থেকে মুখ তুললাম। তারপর ছেড়ে দিলাম ওকে।
চরণদাস চোখ-মুখ মুছে সলজ্জ করে বললেন—“তামাক আছে গোঁসাই ? থাকে ত
একটু দাও। আজ কতদিন কলকে ধরি নি হাতে।”

ফিরে গিয়ে উলটে পালটে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম গদির তলায়। না,
কোথাও ছিটে-ফোটা তামাক নেই। ও পাট উঠে গেছে একদম, ওরা চলে
যাবার পর থেকে। যেটুকু তামাক পড়ে তা লোককে বিসিয়ে বেটে দি। ধারণাও ত
ছিল না আমার যে বাবাজী আবার ফিরবে একদিন। ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে
পড়লাম, রাগও হল ভয়ানক নিজের ওপর। রাগের ঝোঁকে নিচু হয়ে বুক প'ড়ে
তছনছ করে ফেললাম গদিটা।

চরণদাসও বেশ লজ্জিত হল তামাক চেয়ে। বললে—“থাক, থাক, আর কষ্ট
করতে হবে না তোমায় গোঁসাই। ও জিনিস বোধ হয় আর কপালে জুটবে না
আমার। না জোটাই উচিত, বেশ ত আছি, নেশা বলতে আর কিছুই রইল না
আমার জীবনে।”

টপ করে ঘুরে দাঁড়লাম। বললাম—বেশ মিনতি করে বললাম—“গোমায়
যাক তোমার শুকনো জটা পুড়িয়ে টানা। খাবে বাবাজী ? টানবে এক বোতল ?
দেখবে টেনে—কেমন জ্বলতে জ্বলতে নামে বৃকের ভেতর দিয়ে ? কি হবে ঐ
কলকে টেনে ? কি আরাম পাও ও-থেকে ? কতটুকু জ্বালা করে ও জিনিস

টানলে ? এস, গল গল ক'রে গালায় ঢেলে দাও এক বোতল। দেখ, কি চমৎকার জ্বালা লুকিয়ে আছে এই বোতলের ভেতর ! এ বিষ একবার গলা দিয়ে গললে অস্ত্র যে কোনও বিষের জ্বালা জুড়িয়ে শীতল হয়ে যাবে। এস—এই নাও ধর—” গদির পাশ থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

তীব্রবেগে ছুটে এল একজন। এসে আছড়ে পড়ল আমার পায়ের ওপর। দু'টো পা জড়িয়ে ধরে গৌ গৌ করতে লাগল।

কি বলছে তাও ঠিক বুঝলাম না। লোকটা কে তাও ঠাণ্ডা করতে পারলাম না সেই মুহুর্তে। চরণদাস নিচু হয়ে এক হেঁচকায় লোকটাকে তুলে খাড়া ক'রে দিলে। দিয়ে তার হাতে সজোরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলে—“কি, হয়েছে কি ? অমন ক'রে মরছিস কেন ? কি হয়েছে বল না ভাল ক'রে ?”

পঙ্কজ ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—“পালাও গোসাঁই, শিগ্গির পালাও এখান থেকে। ওরা এসতেছে, এসে পড়েছে ঐ বাজার-তলা পর্যন্ত। তেঁতাল খুন করবে ওরা, খুন করবে বলে দা-সডকি লিয়ে ছুটে আসছে ওরা সকলে।”

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—“কারা তারা। কারা ছুটে আসছে আমায় খুন করতে রে ?”

দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে চরণদাস বললে—“সে যারাই হোক গে যাক, দরকার নেই সে বখা শুনে। পঙ্কা, একখানা পাকা লাঠি দিতে পারিস আমায়, কিংবা এবটা দু'হাত লম্বা রামদা ? থাকে ত বার বর্শ শিগ্গির, হাঁ বরে চেয়ে থাকিস পরে।”

প্রায় কৈদে ফেলে পঙ্কা ডোম—“ঐ যে গা বাবাজী,—ঐ ত রয়েছে আমার বৃহস্পতির হাতের ঠ্যাঙাখানা গোসাঁয়ের চালে গৌজা। কিন্তু একলা তুমি ঠুকতে পারবে কি গো সেই এক গুপ্তি বাগদী লেঠেলদের ? ওরা একেবারে নেশে এসতেছে। হায় হায় রে, আজ আবার আমাদের মানুষ একজনও লেই গো এপারে। সব ওপারে গেছে শুয়ার বিধতে।” কপাল চাপডাতে লাগল পঙ্কা।

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল পঙ্কার কাঁপুনি দেখে। হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। বললাম—“মব্ব বেটা, কাঁপছিস কেন অত ? মদ ভাঙ খেয়েছিল নাকি ঠেলে ? কাদের ঘাড়ে ভুত চেপেছে যে এই দিনছুরে খুন করতে আসছে আমায় ? নেশা ক'রে বেটার মাথা-ফাতা ঘুলিয়ে গেছে—”

“চুপ, মুখ বন্ধ কর গোসাঁই।” একটা প্রচণ্ড ধমক দিলে আমায় চরণদাস।

ওর দিকে মুখ করিয়ে দেখি, ইতিমধ্যেই কোমর বাঁধা হয়ে গেছে তার। হাতের বুকের মাংসের গুলিগুলো ঠেলে উঠেছে। ওর সদা-প্রসন্ন চোখ দু'টোর ফুটে উঠেছে ও কিসের আলো? এবার সত্যিই একটু ঘাবড়ে গোলাম ওর চোখের দিকে চেয়ে।

ঝাঁ ক'রে এক হেঁচকায় আমার হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিলে বাবাজী। নিয়ে গলগল ক'রে চালতে লাগল গলায়। অর্ধেকের বেশীটা এক নিঃশ্বাসে সাবাড় করে ফেললে। বাকীটুকু পক্ষীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে—“নে, লাগা চুমুক। ওস্তাদের নাম নিয়ে দাঁড়া গিয়ে আমার পাঁচ হাত পেছনে একথানা ঠাণ্ডা হাতে ক'রে। ডোমের বাচ্চা ন'স তুই? বাঁশ তোদের দেবতা নয়? বাঁশ হাতে থাকতে ডরাবি তুই? তার চেয়ে ডুবে মরু গিয়ে ঐ গলায়।”

পক্ষাও তখন তৈরী হ'ল। মালটুকু গলায় ঢেলে একথানা বাঁশ তুলে নিলে আমার বেড়া থেকে। বাবাজী দু'হাতের চেটো ঘষে নিলে মাটিতে—। নিয়ে সেই ধুলো-মাখা হাত দিয়ে আমার দু'পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। তারপর তুলে নিলে নিজের পায়ের কাছ থেকে লাঠিখানা। ঝাড়া সাড়ে চার হাত লম্বা চিতার ধোঁয়া খাওথানো রামহরে ডোমের হাতের পাকা বংশদণ্ড। বখন যে ওথানা বাবাজী নামিয়ে নিয়েছে আমার চাল থেকে তাও জানতে পাবি নি।

খুব নরম সুরেই আর একবার জিজ্ঞাসা করলাম বাবাজীকে—“কিন্তু এত তোড়জোড় কিসের জন্তে তাও ত জানতে পারলাম না চরণদাস, মানে সবটাই একটা—”

আজুল তুলে বাবাজী হুকুম দিলে—“চুপ, একটিও কথা নয়,—সোজা উঠে যাও তোমার গদির ওপর, সোজা—”

তার কথা শেষ হবার আগেই রে রে রে রে ধনি উঠল বড় সড়কের ওপর। সে আওয়াজ মেলাবার আগেই দু'তিন হাত আকাশেব দিকে ছিটকে উঠল চরণদাস। তারপর যেন হাওয়ায় ভেসেই উঠে চলে গেল নিমগাছটার দিকে।

তখু তার শেষ কথাটা কানে গেল আমার—“চলে আর পক্ষা!”

মহুর্ভের মধ্যে ঠক্ ঠকা-ঠক্-ঠক্ আওয়াজ ভেসে এল ওখার থেকে। সে শব্দ ছাপিয়ে হাহাকার ধনি উঠল উজ্জারণপুরের আকাশ বাতীস তোলপাড় ক'রে। তার সঙ্গে বড় সড়কের ওপর থেকে বহু নারী-কণ্ঠের তুয়ল চিৎকার মিলে এমন একটা বীভৎস রসের সৃষ্টি করলে যা শুনে সাদা হাড়গুলোও শিউরে উঠল।

ঝপ্ ক'রে একসঙ্গে সব আওয়াজ গেল থেমে। হঠাৎ যেন মা ধরিত্রী গাস ক'রে ফেললে সকলকে।

আবার শোনা গেল বাবাজীর গলা ঠিক তিন মুহূর্ত পরে ।

“কৈ, এগো, এগিয়ে আয় না কে বাপের বেটা আছিল । ধব্ব লাঠি হাতে,—
তোল মাথা, তোল—”

আবার রৈ রৈ ক’রে উঠল একসঙ্গে বহু নারীকণ্ঠ । তার মধ্যে একটা গলা খুব চেনা মনে হল । হাঁ, ঐ ত রামহরির বউ কথা বলছে, মানে আমাদের সীতের মা । সীতের মা হুকুম দিচ্ছে—“লে, লিয়ে চল সব কটা বাগদীকে ঝেঁটিয়ে বাবার নামনে । কডমডিয়ে চিবিয়ে থাক বাবা মাথাগুলো ওদের ।”

তার হুকুম দেওয়া শেষ হতে না হতেই হডমুড করে নামতে লাগল মেয়েরা । ভোমপাড়ার সবাই আর ময়নাপাড়ার ওরা সকলে । প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু রয়েছে । লাঠি ঝাঁটা বঁটি দা বাটারি যে যা পেয়েছে নিয়ে এসেছে । সব চেয়ে বেশী যা রয়েছে তা হচ্ছে ঝাঁটা । বড় সড়কের ওপর থেকে ওদের দৌড়ে নামতে দেখলাম । তারপর আর দেখতে পেলাম না । নিমগাছের আড়ালে আবার আরম্ভ হল নানা রকমের আওয়াজ । সাঁই সাঁই ঝাঁটা চালাবার শব্দের সঙ্গে আবার উঠল বিকট চিংকার আর তার সঙ্গে অকথ্য গালিগালাজ । ব্যেক মুহূর্ত পরেই দেখতে পেলাম সকলকে । মস্ত একটা দল এগিয়ে আসছে এদিকে । মেয়েরাই ঘিরে নিয়ে আসছে ওদের ।

এবার শোনা গেল আর একটা গলা । খুবই চেনা-চেনা লাগল গলাটা । নিদারুণ কষ্টে গোঙাচ্ছে যেন কে । কাকূতি-মিনতি করছে—“আমায় তোমরা এবার ক্ষ্যামা দাও গো ভাল মানুষের বেটিরা । বুড়ো মনিষ্টিটাকে আর মেরে ফেলুনি বাপু ।”

অনেকগুলো নারীকণ্ঠ একসঙ্গে টেঁচিয়ে উঠল—“লাগা খেংরা বুড়ো মডার মুয়ে ।” পডলও বোধ হয় দু’এক ঘা সঙ্গে সঙ্গে, সাঁই সাঁই করে শব্দ উঠল, তার সঙ্গে কুকুরের মত কাঁই কাঁই করে কৈদে উঠল কে ।

সমস্ত দলটা হডমুড ক’রে এসে পডল আমার গদির সামনে ।

একসঙ্গে নারী পুরুষ বহু লোক । একসঙ্গে সবাই কথা বলতে চায় । আমি তখন হুঁচোখ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজছি একজনকে । বাবাজী চরণদাস বৈরাগীকে খুঁজছি আমি তখন । কোথায় গেল ? গেল কোথায় সে ? হঠাৎ যেন বজ্রাবাত পডল । বাজ্রথাই গলায় কে দাবাড়ি দিলে একটা : “কি রে, ব্যাপার কি ? এথেনে রথ উঠলো নাকি রে বাবা ! এত ভিড কেন ?”

খস্তা ঘোষ । সকলের চেয়ে মাথায় উচু খস্তা ঘোষের মাথাটা দেখা গেল আবার পেছনে ।

সবাই চুপ একেবারে। দলটাকে জান দিক দিয়ে ঘুরে থম্বা এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। আবার সেই বকম বিকট গর্জন দিলে একটা—“কি গোসাঁই, হয়েছে কি এদের? ক’ ব্যাটার মাথায় মুখে রক্ত দেখলুম যেন। হল কি হারামজাদাদের?”

যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হল চরণদাস থম্বা ঘোষের সামনে। তার কপাল থেকেও গড়িয়ে নামছে রক্ত। কিন্তু সেদিকে ভ্রক্ষেপ নেই বাবাজীর। দাঁত বার করে বললে—“একটু অঙ্গসেবন ক’রে দিলাম দাদা আমার বাগদী ভায়াদের। ওনারা দল বেঁধে লাঠি ঘাড়ে নিয়ে ছুটে এসেছিলেন গোসাঁইকে ঠাণ্ডা করবার জন্তে।”

দ্বারকণ বিশ্বসে যেন ক্ষেটে যাচ্ছে থম্বাব চোখ। সব ক’থানা দাঁত তার হিংস্র জন্তুর মত বেরিয়ে পড়ল মুখের ভেতর থেকে। সামনের দলটার দিকে তাকিয়ে প্রায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে থেমে থেমে—“ঠাণ্ডা করতে এসেছিল গোসাঁইকে। এঁরা—গোসাঁইকে ঠাণ্ডা করবে ওরা? কেন? কি করলে গোসাঁই? কে পাঠিয়েছে ওদের?”

পক্ষেপ্ত হাউমাউ করে বললে—“খুঁড়ো, ঐ শালা আম মোডল লেনিয়ে দিয়েছে ওদের। ঐ হাড়ে হারামজাদা খুন করাতে চেয়েছিল গোসাঁইকে। ঐ যে ঐ, ওধারে মডার মত চিত হয়ে পড়ে রয়েছে ভিটকিলিমি ক’রে।”

দু’তিনি জনকে ডিঙিয়ে কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল থম্বা। লেখান থেকে ধপাস করে একটা আওয়াজ হল। কাঁউ কাঁউ ক’রে কঁদে উঠল মোডল। থম্বা খিঁচিয়ে উঠল—“এই চুপ বব্ব বলছি বুড়ো ভায়। জ্বাবামি ক’রে কাঁদবি যদি ত ফের এক লাখি লাগাব মুখে। উঠে আয় সামনে। ওঠ—”

“ওগো—আমি গতর লাডতে পারবুনি গো বাবা, আর আমায় লেখিও না গো বাবা।” ডুকরে কঁদে উঠল এবার মোডল।

আর সম্ব হল না। বুকে যত জোর ছিল তা দিয়ে টেঁচিয়ে উঠলাম—“থামা, থামা এখন তোরা শাসন থম্বা। আর পারি নে সহিতে সকলের ধাটামো। এই, এই তয়োরের বাচ্চারা, ধরে তুলে আন না মানুষটাকে। যদি নামতে হয় আমাকে গদি থেকে, তা’হলে জ্যান্ত চিবিয়ে খাব সব কটার মাথা। যা বলছি, উঠিয়ে আন মোডলকে।”

বাগদীরা নড়েচড়ে উঠল। ওদের মধ্যে চারজন গিয়ে বয়ে নিয়ে এসে মোড়লকে। এনে শুইয়ে দিলে আমার সামনে।

মোড়ল চম্ব্ব বুজাই পড়ে রইল। এতটুকু নড়াচড়া পর্যন্ত নেই তার। যেন

পতিয়াই লোকটা ম'রে কাঠ হয়ে গেছে ।

আমু বাগদী মুক্কা মাফুয । ওর ছেলে হল বাগদী বহবার এসেছে গেছে উদ্ধারণপুরে আগানে । বাপ-বেটা দু'জনকেই চিনি ভাল ক'রে । আমুর কপালে লেগেছে চোট, রক্ত গড়াচ্ছে । হলার একথানা হাত বোধ হয় ভেঙেছে । বা হাত দিয়ে ডান হাতখানা বকের কাছে তুলে ধ'রে আছে সে । আমু আর হল মাথা নিচু করে বসে ছিল অন্য সকলের থেকে একটু তফাতে । আমুকেই ডাক দিলাম ।

“মুক্কা, উঠে এস না গো । এক টেরে বসে রইলে কেন ? এস, একটু পেসাদ নাও মায়ের । তারপর শুনি তোমার কাছ থেকে, কি ক'রে বাধল এত বড় হুজুতটা ।”

বাগদী আগে তার যৎসামান্ত কাপড়ের খুঁটটা তুলে গলায় দিলে । তারপর উঠে এসে গড় হল আমার সামনে ।

তখন ডাক দিলাম হলধর মানে হল বাগদীকে ।

“বলি—হ্যাঁয়ে শালা হল, ব'সে রইলি কেন তফাতে ? শালা যেন আমার ঘরের মাগ, মাথা হুইয়ে আছে । উঠে আর শালা পেঁচি মাতাল, আগে গেল দু'টোক, মুখ খুলুক । দু'টোক গলা দিয়ে না গল'লে শালার নজ্জা ঘুচবে না ।” বলে এটা খুব জবর গোছের রসিকতার হাসি হাসলাম ।

অনেকটা হালকা হল ঐমথমে ভাবটা । মেয়েদের মধ্যে উসখুস ক'রে উঠল কয়েকজন । হলধর উঠে এল সামনে, এসে হঠাৎ মাটির ওপর বসে পড়ল হাঁটুতে মুখ গুঁজে । তারপর ভেউ ভেউ ক'রে কাশা ।

খস্তা এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করে দেখছিল আর পৌনে অধখানা সিগ্রেটে টান দিচ্ছিল । তার দিকে চেয়ে হুকার দিয়ে উঠলাম—“দাঁড়িয়ে দেখ-ছিস কি খস্তা ? আনা, আনা শিগ'গির মাল দু' বোতল । আমু এসেছে—এসেছে ওদের সমাজসুদ্ধ প্রায় সকলেই । আগে সকলের গলা ভিজুক । এত আর ওরা মড়া নিয়ে আসে নি যে ওদের খরচ দিতে হবে । খরচ দিতে হবে এখন আমায় । কারণ আমার দোষ-অপরাধের বিচার করতে এসেছে ওরা । গোঁসাই হই আর যাই হই, দোষ-অপরাধের বিচার হবে না কেন ? সমাজ মানবে না কেন ? পঞ্চায়েতের পাঁচজনে যা বিচার করে দেবে, কেন তা মাথা পেতে নোব না ? নিশ্চয়ই নিতে হবে, দশের কাছে যদি দণ্ড নিতে না পারি ত দশে আমার কথা মানবে কেন ? কি বল মুক্কা ?”

ছ'ম ক'রে আছুকেই যার দিতে বলে বললাম।

তখন দাঁড়িয়ে উঠল আছু। গলায় তুলে দিয়েছিল যে খুঁটা সেটা আবার নামিয়ে কোমরে জড়িয়ে ফেললে। কোমর বেঁধে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে আরম্ভ করলে বক্তৃতা। প্রথমে নাম নিলে গুরু, তারপর গুরু গুরু 'ছিঃরণে' গড় করে গঙ্গা আর শ্মশানকালীকে সেবা দিলে। দিয়ে নাক-কান মলে তিন সত্যি ক'রে নিলে। অর্থাৎ সে যা বলবে দেশের সামনে, তার একটি কথাও মিথ্যে নয়। মিথ্যে যদি হয় তা'হলে ঐ তার একমাত্র ছেলে বসে রয়েছে, ঐ ছেলেই রইল মা কালীর কাছে জামিন।

তারপর সে গড়গড় ক'রে বলে গেল স্ববৃহৎ কাহিনী। আম্মতন মোড়লদের পাশের গ্রামে ওরা থাকে, ওদের কেউ ম'লে ওরা গাঁয়ের ধারেই পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু মোড়ল মাঝে মধ্যে এসে ওদের মড়া ছোঁ মেয়ে তুলে নিয়ে নিজের খরচার গঙ্গায় দিয়ে যায়। বিশেষতঃ সোমন্ত বয়সের ঝি-বউ ম'লে মোড়ল বলে যে তাকে গঙ্গায় দেওয়াই বিধি। নয়ত অপদেবতা হয়ে গাঁয়ে-ঘরে অভ্যাচার করবে। সোমন্ত বয়সে মরেছে কিনা, সোমন্ত মাস্তুরের নাকি টানটা সহজে যায় না নিজের আত্মীয়স্বজনের ওপর থেকে।

সেবার—মানে এই ক'দিন আগে—নোটন বাগদীর ভবকা মেয়েটা ক'দিন ভুগে ম'ল। মোড়ল একরকম জোর ক'রে তাকে কেড়ে নিয়ে এল গঙ্গায় দিতে। নোটন বেচারী একটা আখলাও দিতে পারলে না। ওর জামাই, যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছিল এই সামনের পোষ মানে, সে ছোকড়া সঙ্গে আসতে চেয়ে-ছিল। তাকেও সঙ্গে আসতে দিলে না মোড়ল। ভয় দেখালে, বললে, সঙ্গে গেলে শ্মশান থেকে ছুঁড়ী আবার ফিরে যাবে তার কাঁধে চেপে। পরে যে কাউকে বিয়ে ক'রে ঘরসংসার করবে তারও জো থাকবে না।

নোটনের মেয়েকে গঙ্গায় দিয়ে যাবার ক'দিন পরেই পঙ্ক ভোম গিয়ে হাজির হল ওদের গ্রামে। গিয়ে তার পাশার ছক পেতে একেবারে জাঁকিয়ে বসল সেখানে। বাগদীর ছেলে-ছোকরারা ছ'দিনেই পঙ্কর ভক্ত হয়ে উঠল।

হঠাৎ ঘটে গেল একটা দুর্ঘটনা। নেড়া বাগদীর বোনটাকে কিসে কামড়াল 'রেতের বেলায়'। সকালেই বোনটা দুটো খাবি খেয়ে চক্ষু কপালে তুললে। জুটল গিয়ে মোড়ল এবং যথাবিহিত ছোঁ মেয়ে মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে ভাইপো আম্মজীবন সহ গঙ্গার দিকে রওয়ানা হল।

এক তৎক্ষণাৎ পঙ্কেশ্বর তার সান্নোপাঙ্গদের জুটিয়ে নিয়ে দূর থেকে ছায়ার মত অনুসরণ করল ওদের।

আহু হল মুকুবা গায়ের। এক বকম ওর পায়ে ধরে পক্ষা শুকে টেনে নিয়ে এল সঙ্গে।

প্রথম দিন রাতেই ঘটল ঘটনা।

অন্ধকার রাত, নবাবী সড়কের ওপিঠে একটা ‘কাদোড়ের’ ধারে ওরা থামল ‘সন্দেশ-কালে’। পক্ষা আর হল লুকিয়ে গিয়ে বসে রইল একটা গাছের ওপর। ঠিক রইল যে তিনবার কাল পেঁচার ডাক ডাকলেই সবাই ছুটে গিয়ে পড়বে সেখানে।

আগ্রাতটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। সবাই প’ড়ে ঘুচ্ছে মাঠের মধ্যে। শুধু জেগে আছে মুকুবা—আহু বাগদী নিজে। হঠাৎ তার চমক ভাঙল, স্পষ্ট শুনতে পেলো তিনবার কাল পেঁচার ডাক। চুপি চুপি ঠেলা দিয়ে তুললে সে সবাইকে। নিঃশব্দে রওয়ানা হল সকলে সেই গাছতলায় যেখানে মোড়লেরা বিশ্রাম নিচ্ছিল।

অন্ধকারে বাগদীদের চোখ জলে, অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা দেখলে—

কি দেখলে তা আর বলতে পারলে না আহু। ঝটক’রে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধাঁক’রে একটা লাথি মেরে দিলে অতন মোড়লের মাথায়।

আবার রৈ রৈ ক’রে উঠল সকলে। তার মধ্যে মোড়লের ক্ষীণ আর্তনাদ মিলিয়ে গেল। দৌড়ে এসে সপাসপ কয়েক ঘা ঝাঁটার-বাড়ি লাগালে সীতের মা।

ময়নাপাড়ার দু চারজনও ঝাঁটা উচিয়ে ছুটে এল।

হুকার ছাডলে একটা খন্তা ঘোষ।

“এই চুপ কর সবাই, নয়ত ছিঁড়ে দোব সবায়ের মুখ জুতিয়ে।”

সাক্ষাৎ খন্তার হুকুম। হুতরাং আবার সকলে চুপ করলে।

ফাঁক পেয়ে তখন জিজ্ঞাসা করলাম আহুকেই—

“কিন্তু মুকুবা, আমি এর মধ্যে দোষ করলাম কোথায়? আমাকে শাস্তি দিতে তোমরা তেড়ে এলে কেন? আমার অপরাধটা কোথায় তাই বল? দশের লামনে আমার বিচারটা হয়ে যাক।”

আহু কিছু বলবার আগেই দাঁড়িয়ে উঠল হল। ছুটে এসে আহুড়ে পড়ল ‘আমার গদির ওপর। প’ড়ে আমার দু’ হাঁটু জড়িয়ে ধরে কোলের ওপর মুখ ঝগড়াতে লাগল।

এমদম শুরু হয়ে আছে সকলে। আমিও চূপ ক'রে বসে হাত বুলাতে লাগলাম হলধরের মাথায়।

পঞ্চদশর সামনে এসে দাঁড়াল আম্ম বাগদীর। বাগদীর হাতখানা ধরে বললে—“বল মায়া বল—কি বলেছিল ঐ বুড়ো মড়াটা, যা শুনে তোমরা ক্ষেপে গেলে। হুঁশ হারিয়ে একেবারে ছুটে এলে গোঁসাইকে খুন করতে।” আম্ম মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। একটু শব্দ বার হল না তার গলা দিয়ে।

আমার কোলের ওপর তখনও হলধরের মাথাটা। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম—“খাক, আর ব'লে কাজ নেই কারও। আমার সেড়া হলাই শোনাবে সেকথা। সেড়াতের মুখ থেকে শোন সকলে—”

ছিটকে উঠল হলধর। আঙ্গুল বাড়িয়ে মোড়লকে দেখিয়ে বললে—“ঐ শালা, ঐ শয়তানের বাচ্চা, ঘাকতক দিতে ঐ শয়তানের বাচ্চা তোমার নাম করলে গোঁসাই। তুমি নাকি ওকে শিখিয়েছ ওই খেলা। তুমিই নাকি ওর গুরু। ঐ শয়তান আমাদের মাথায় খুন চাপিয়ে দিলে, ঐ শয়তান—” বলতে বলতে ছুটে গিয়ে থুং ক'রে এক ধ্যাবড়া থুতু দিলে মোড়লের মুখে। খস্তা ঘোষ আর একবার চিংকার ক'রে উঠল—

“ব্যাস, ব্যাস, যেতে দাও এবার। এই পঙ্কা, এই লে টাকা, লিয়ে আয় এক টিন মাল। মাথা ঠাণ্ডা কর সবাই। আর নয়, এবার হাস, গাও, নাচ। সবই সেই বোম-ভোলা বাবার খেলা। জয় বাবা আশান-ভৈরব!”

আশান-ভৈরবের নামে সমবেত বঠে তিনবার জয়ধ্বনি পড়ল।

উদ্ধারণপুরের বাস্তব।

বাস্তব—বেহেস্ত বাতিকগ্রস্তদের বিচক্ষণ বাদশাহু। বিজ্ঞা-বুদ্ধি বিচার-বিশ্বাস এই সব বখেড়া তাঁর কাছে বিকল মনের বিচিত্র বিকার ছাড়া অস্ত কিছু নয়। বাদশাহু বেতাল বেরগিক, বখারি বটকেরা বজ্জাতি বিন্দুমাত্র বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। তাঁর বজ্রমুষ্টির বর্ষর বিমর্দনে বিশ্বপিতার বাহাস্তুরে বিধানের দম বন্ধ হ'য়ে আসে। তাঁর বিক্রমে বহুমুখী ব্যাপনের বেলেন্না বেগাতী বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ে। বাদশাহের বিলোল কটাক্ষের সামনে বিবসনা বিভীষিকা লজ্জাবতী লতার মত কোথায় মুখ লুকোবে তা ভেবে পায় না।

জ্ঞাটা চণ্ডীর দেয়ালি আম্ম অন্তর ভেবে পায় না কোথায় লুকোবে তার বাস্তবস্থানা। বাগদীরা যখন ফিরে গেল তখন তাদের সঙ্গেও গেল না মোড়ল।

বলে—“আমায় আর ‘দোপ্পো’ নি বাবা, গতর আমি লাড়তে পারবু নি।”
 আসল কথা—গ্রামে ফিরে গেলে মোড়লের স্বজাতি থেকে শুরু ক’রে বাগদী
 বোয়েরা পৰ্যন্ত কেউ যে তাকে রেহাই দেবে না, একথা মোড়ল জানত। কিন্তু
 আশানেও তাকে রেহাই দেবে না রামহরের বউ। সবাই চলে গেল, রামহরের বউ
 গেল না। পা ছড়িয়ে সে বসল মোড়লের মুখের সামনে। ব’সে আরম্ভ করলে
 তাকে বচন-সুধা পান করাতে। শোধ সে তুলবেই, স্বদে-আমলে সীতের মা উতুল
 করে ছাড়বে তার ইচ্ছার দাম। বুক নিঙুড়ে অনেক দুধ নিয়েছে মোড়ল তামাক
 ভেজাতে। দুধও নিয়েছে, আরও অনেক কিছু নিয়েছে তার সঙ্গে লুকিয়ে-চুকিয়ে।
 শুধু একখন শুয়ে শুয়ে তার ফিরিস্তি।

শেষ পর্যন্ত রেহাই পেল মোড়ল। রামহরে ডোম মাছ ধরে ফিরে এসে উদ্ধার
 করলে মোড়লকে উদ্ধারণপুরের ঘাট থেকে। যে নৌকোয় মাছ ধরে ফিরল সেই
 নৌকোয় তুলে মোড়লকে ও-কূলে পাচার করে দিলে সে। একূল প্রতিকূল হলেও
 ও-কূল তখনও অন্তকূল মোড়লের কপালধোরে। তাই মোড়ল কূল পেয়ে গেল।

কিন্তু যার একূল একূল দু’কূলই প্রতিকূল তার তরাঁ ভিড়বে কোন্ কূলে?

সেই কথাটি বলছে চরণদাস।

সব জুড়িয়ে গেলে গঙ্গায় স্নান করে এসে এক মুঠো গাঁদাপাতা বচলে ফাটা
 কপালের ওপর বেঁধে আবার বাবাজী তার ‘গুব-গুব-গুব’টা বাধলে। বেঁধে স্মর
 ধরলে—

“ওরে ও প্রাণবন্ধু রে—

তোমার জন্তে জীবন করলাম ক্ষয়।

আর জ্বালা পোড়া প্রাণে কত সয়।

প্রাণবন্ধু রে—তোমার জন্তে জীবন করলাম ক্ষয় ॥”

যতক্ষণ দিনের আলো ছিল ততক্ষণ চরণদাস পারেনি আমার মুখের দিকে
 চোখ তুলে চাইতে, আমি পারিনি বাবাজীর মুখের দিকে তাকাতে। কিছুতেই
 ভুলতে পারছিলাম না যে দু’হাতে আমি ওর গলা টিপে ধরেছিলাম এবং তার
 প্রতিদানে ও নিম্নমুখের মধ্যে একলা ছুটে গেল এক গুপ্তি বাগদী লেঠেলেন সামনে
 —আমাকে বাঁচাবার জন্তে। সেই সঙ্গে একথাও ভুলতে পারছিলাম না যে
 বাবাজী আমাকে দায়ী করেছে। আমিই নাকি দায়ী নিভাইয়ের জন্তে। মড়ার
 গদীর মায়া ছেড়ে যদি আমি উঠে যেতাম ওদের সঙ্গে, তা’হলে নাকি এ সর্বনাশটা
 ঠিক এমন ভাবে ঘটতে পেত না এবং সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে যে আমি ওদের

লস্ক গেলো, যেভাবে ঘটতে পারত তখন সর্বনাশটা, তাতে চরণদ্বালের একটুও
আপত্তি ছিল না।

এটি কি ?

চরণদ্বাস তখন কেমন ক'রে সহ্য করত আমাকে ?

অথবা বাবাজী কি এই মনে করে যে ভাগের কারবারে তার সঙ্গে আমি মনের
স্থখে ঠাট বজায় রেখে চলতাম।

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল। আজ যখন ছ'হাতে ওর গলা টিপে ধরে দম বন্ধ
করে মারতে চেয়েছিলাম তখন নিশ্চয়ই চরণদ্বাস বুঝেছে যে আমি উদ্ধারগণপূরের
বাস্তব বাদশাহের খাস তালুকের প্রজা। রক্ত-মাংস পুড়ে ছাই হয়ে গেলে পরে যে
হাড়গুলো পড়ে থাকে সেগুলোর মায়াও আমি ছাড়তে পারি নি। স্বতরাং কাঁচা
রক্ত-মাংসেও ওপর ভাগের কারবার অস্ত্র আমার সঙ্গে চলে না।

চলে না, এটুকু ভাল কবে বুঝতে পারার ফলেই বাবাজী আর আমার চোখের
দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছে না বোধ হয়।

কিন্তু বাবাজী তাকে ভালবাসে। শুধু ভালবাসার গবন্ধে ভালবাসে তাকে।
তাই সে আবাব বসেছে তার বাত-যজ্ঞটা বেধে নিয়ে।

গাইছে—

“তোমাকে ভালবাসি

এ জগতে হইলাম দোষী

পাড়ার লোকে কত মন্দ কয়।

বন্ধু রে—”

সুনলেও গা জ্বলে ওঠে।

পাড়ার লোকে কে কি বলেছে না বলেছে তাই নিয়েই গুর যত মাথাব্যথা।
কিন্তু যাকে তুই ভালবাসিস সে যে তোর মুখে লাগি মেয়ে চলে গেল, তা নিয়ে
তোর ছিঁচকাঁহুনি কাঁদতে লজ্জা করে না ?

মুড়ো জ্বলে দিতে হয় অমন প্রেমের মুখে।

আমি হ'লে—

কি করতাম আমি হ'লে ? ওর মত যদি ভালবাসার কাঁদে পড়ে যেতাম তা-
হলে ? কি করতে পারি এখন আমি তার ?

লাগি ত শুধু বাবাজীর মুখেই মারে নি নিতাই, আমার মুখেও ত ঠিক সমান
জ্বারে সমান ওজনের লাগি সে মেয়ে গেছে একটা।

বয়ং বলা উচিত যে লাখিটা সে সটান আমার মুখের ওপরেই তাক ক'রে ছুঁড়েছে। বাবাজী জানত, অনেককাল আগেই স্পষ্ট করে জানত যে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই প্রয়োজন ছিল নিতাইয়ের বাবাজীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার। ছাই ফেলা হয়ে গেলে ভাঙা কুলোখানা আবার কেউ বস ক'রে ঘরে তুলে রাখে না। ওটাকে ছায়ের সঙ্গে আন্তাকুড়ে বিসর্জন দেয়। দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। আমাকেও কি সেই ভাবে বিসর্জন দিয়ে গেল নিতাই ?

আন্তাকুড়ের আবর্জনার সামিল মনে করলে আমাকেও ?

সোনার গয়না আর ঘর-বাড়াই তার কাছে বড় হ'ল ?

একটা সাধারণ লম্পট, যে তাকে দু'দিন পরে কুকুরের মত মূর মূর ক'রে খেদিয়ে দিয়ে আবার আর একটা কারও পেছনে জিব লকলক ক'রে ছুটতে থাকবে তার ওপরে কি ক'রে নির্ভর করতে পারলে নিতাই ?

এ-হেন হীন প্রবৃত্তি কি ক'রে গ্রাস হ'ল ?

কি লোভে সে গেল ? কি পাবে সে তার কাছে ? কি দিতে পারে সে নিতাইকে ?

আমি বা কি দিতে পারতাম তাকে ?

মডার গদি, কাপা, লেপ-তোষকের স্পুট কি কাছে লাগত নিতাইয়ের ? কিছু যদি দেবারই থাকত আমার, তা'হলে বার বার তাকে ওভাবে বিদায় দিলাম কেন ? মডাব গদিতে গদিয়ান হয়ে মডাব মধ্যদার গরমে বড় ছোট ক'রে দেখে-ছিলাম নিতাইকে। দেবার মতো কিছুই নেই আমার কস্মিনকালে, ছিলও না কিছু। তবু যে কিসের গর্বে অন্ধ হয়ে বার বার অপমান কবেছি ওকে।

উদ্ধারগপুরের বাস্তব।

বাদশাহ বাস্তব সামনে এসে দাঁড়ালেন—তার চলন্ত চাবুকখানা হাতে নিয়ে। দাঁড়িয়ে তার খাস বান্দার মুখের ওপর সাঁই সাঁই করে চালিয়ে দিলেন কয়েক ঘা। বললেন—“বেকুব—শুধু সাদা হাড আর কালো কয়লার জলুস দেখিয়ে চোখ বলসে দিতে চেয়েছিলি তার—লজ্জা করে না তোরা ?”

লজ্জা নয়, ক'রে উঠল জালা। সারা মুখখানা ফালা ফালা হয়ে চিরে গেল সেই চাবুকের ঘায়ে। এ-মুখ দেখাব আমি কার কাছে ? কেমন ক'রে তুলব এ মুখ আমি দুনিয়ার সামনে ? কোথায় লুকোব আমি আমার এই পোড়ার মুখখানা জিজ্ঞাগতে ?

বাবাজী চরণদাস আছে মহাশাস্তিতে । সে যে কিছুই চায় নি তার কাছে ।
এতটুকু প্রতিদানের আশা না রেখেই সে শুধু দিতে চেয়েছে, একেবারে নিঃশেষে
দিয়ে ফেলেছে নিজেকে । তাই তার মনে এতটুকু আক্ষেপ নেই । তাই সে চোখ
বুজে প্রাণ দিয়ে গাইতে পারছে—

“নিরালায় বসিয়া গো

আমার প্রাণ কাদে তাহারি লাগিয়া ।

আমায় ঘুমের ঘোরে দেয় সে দেখা গো

তারে না দেখি জাগিয়া ।

আমার প্রাণ কাদে তাহারি লাগিয়া ॥”

আছে বেশ ।

শুধু কৈদেই ও তৃপ্ত ।

আর করবেই বা কি ? আছেই বা কি আর করবার ?

কৈদে যদি ওর চাওয়া-পাওয়ার চরম শান্তি হয় ত হোক, কার কি বলবার
আছে ?

কিন্তু ওটুকু তৃপ্তিলাভও আমার কপালে নেই ।

ওতে আমার আত্মমর্খাদায় আঘাত লাগে ।

সেদিনও লেগেছিল আঘাত আত্মমর্খাদায় গায়ে । সেই জগ্গেই আমার করা
হয় নি আত্মসমর্পণ । অনবরত নিজেকে নিজে বুঝিয়েছি—ছিঃ, কেন যাচ্ছ ওর
কাছে নিচু হ’তে ? থাকলেই বা ওব রূপ-যৌবন, তুমি কি কম নাকি কিছু ওর
কাছে ? তুমি উদ্ধারণপুরের সাঁইবাবা, ছনিয়াস্বক্ মাছুং এসে তোমার পায়ে
গড়াচ্ছে, তোমার প্রসাদলাভের আশায় কত মাছুবে মাথা খুঁড়ে মরছে, মড়ার গদীর
ওপর চেপে ব’সে যে মোক্ষম ধাক্কা দিতে পেরেছ তুমি মাছুষকে, তার তুলনায় ঐ
দুখে-আলতা রঙের রক্ত-মাংসের ডেলাটা হ’তে গেল বড় ? ছিঃ !

শুধু কি তাই ?

শুধু কি নিজেকে অনেক উচুতে তুলেছিলাম বলেই পারি নি সেদিন নিতাইয়ের
ডাকে সাড়া দিতে ?

ওর সঙ্গে আরও কিছু ছিল না ?

ছিল এবং সেই কীটাটাই সবচেয়ে বড় হয়ে খচখচ করে উঠেছিল তখন । সেই
কীটা ঐ চরণদাস, ঐ যে বৃন্দ হয়ে বসে গাইছে—

“মন রে বুঝাইলাম কত—

হইলাম না তার মনের মত
না পাইলাম সে চিকন কালিয়া ।”

কি যেন বললে বাবাজী ?

“মন রে বুঝাইলাম কত

হইলাম না তার মনের মত—”

ই্যা—ঐ আর একটি রোগ। তার মনের মত হ’তে পারব ত ? এট ভয়েই
মরেছি তখন কেঁপে । ঐ মারাত্মক রোগেই তখন পেয়ে বসেছিল আমার ।

নিজেকে বড় বলেও ভাবতাম, খাটো করেও ভাবতাম । অনবরত কে যেন
ভেতর থেকে অতি চুপি চুপি বলত আমার তখন—

বলত—“সাবধান—ও আগুন ছুঁতে যেও না । নিজের দিকে একবার তাকিয়ে
দেখ, কি আছে তোমার ! কি দেবে ঐ জ্বলন্ত আগুনের সর্বগ্রাসী ক্ষধার মুখে !
কি দিয়ে ঐ লেলিহান অগ্নিশিখার তৃপ্তিসাধন করবে তুমি ?”

মানে—ভয় । একটা নির্জলা বোবা ভয় পেয়ে বসত আমার নিতাইকে সামনে
দেখলেই ।

তাই অনেকগুলো মহেন্দ্রকর্ণ পিছনে পালিয়ে গেছে ।

এখন কপাল কুটে ম’লে কতটুকু ফললাভ হবে ?

কিন্তু চরণদাসের লাভ-ক্ষতির পরোয়া নেই ।

তার সকল জ্বালা জুড়োবার পথ খোলা আছে ।

সে গাইলে—

“সে যদি না আসে ফিরে—

ঝাঁপিব যমুনার নারে—

সকল জ্বালা জুড়াইব—

এ ছার পরাণ দিয়া ।

আমার প্রাণ কাঁদে তাহারি লাগিয়া ॥”

সহজ পদ্ম বটে, সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ।

কিন্তু ওর যে প্রাণ কাঁদে তার জন্তে । আমার তাও কাঁদে না । উদ্ধারণপুরের
বাদশার গোলামের গোলাম আমি । অত সহজে কাঁদে না আমার প্রাণ । সাদা
হাড় আর কালো কয়লা দেখতে দেখতে—আর বলসানো মাংসের গন্ধ শুঁকতে
শুঁকতে—কান্না-টান্নার মত তুচ্ছাতুচ্ছ রোগগুলো দূর হয়ে গেছে আমার

জিলীমানা ছেড়ে। লোক আর যাই লক্ষ করুক, সাঁইবাবার চোখে জল—এই কুৎসিত দৃশ্য কিছুতেই লক্ষ করতে পারবে না কেউ। আর তাতে যে আমি লজ্জাতেই মরে যাব। কোন নদ-নদীর ধারে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার দরকারই যে হবে না আমার তখন।

উদ্ধারগপুরের বাস্তব।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর রূপের বর্ণনা।

“মহাকালং যজ্ঞেন্দ্রব্যো দক্ষিণে ধুম্রবর্ণকং।

বিভ্রতং দন্তখট্টাঙ্গং দংষ্ট্রাভীমুখং শিষ্ঠং।

ব্যাস্র চর্মাবৃত কটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।

ত্রিনেত্রমূর্দকেশঞ্চ মৃণুমালাবিভূষিতং।

জটাতারলসচ্চন্দ্র খণ্ডমুগ্ধং জলগ্নিব ॥”

মনে মনে বললাম—হে সর্বভ্রষ্টা, তুমি ত জান যে নিজেকে নিজে ঠকাই নি আমি। তবু আজ জলে মরছি কেন? কেন আমার শ্মশান-শয্যা আজ আমার শাস্তি দিতে পারছে না? কেন আজ বার বার মনে হচ্ছে যে হয়ত সত্যিই আমি দায়ী নিতাইয়ের ওভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলার জন্তে। কি করতে পারতাম আমি? এখনই বা কি করতে পারি আমি তার?

নেপথ্য থেকে হাঁক দিয়ে কে গাইলে—

“মানব-তরী মাল্লা রে ছয়জন।

ছয়জন। ছয়দিকে টানে কোনও কথা মানে না।”

সোজা হয়ে উঠে বসলাম।

খস্তা ঘোষ। খস্তা ঘোষ উদ্ধারগপুরের জ্যাস্ত বাস্তব। ফিরে আসছে খস্তা। রাতে সে শ্মশানে নামে না। আজ নেমে আসছে, আসছে শুধু চরণদাসের জন্তে। চরণদাসের জন্তে—কাঁচা গাঁজা নিয়ে আসছে খস্তা। বাবাজীর কষ্ট হবে যে সারারাত।

আরও কাছে এসে গেল। শোনা গেল তার দরাজ গলা—

“মানব-তরী মাল্লা রে ছয়জন।

ছয়জন। ছয়দিকে টানে কোনও কথা মানে না।

এখন শুন ছাড়িয়া সব পলাইল

একা রহিলাম পড়ি ।

মন রে আমার—ডুবল মানব-তরী ॥”

বাউতুলে বাউল খন্ডা ঘোষ গাইতে লাগল—

“মন রে আমার

ডুবল মানব-তরী ।

ভব সাগর পাকে 'পড়ে

মন রে আমার

ডুবল মানব-তরী ॥

দয়াল গুরু বিনে—

কে আছে রে—

তুলে নেবে হাত ধরি ॥

মন বে আমাব—

ডুবল মানব-তরী ॥”

গুব্-গুব্-গুব্-বগলে চেপে ধরে চরণদাস উঠে দাঁড়িয়েছে তখন । তারেতে ছুঁটো ঘা দিতেই খন্ডা ঝপ্ করে থামিয়ে ফেললে গান । থামিয়েই হাসি—হি হি হা হা হো হো । হাসতে হাসতে খন্ডা এসে থামল বাবাজীর সামনে ।

চটে গেল বাবাজী—“এই, হাসছো যে বড ?”

“হাসবো না ? ওরে বাপরে, হাসবো না ? হি হি হি হা হা হা হো হো হো ।”
আরও বেদম হাসি হাসতে লাগল খন্ডা ঘোষ পাগলের মত ।

আরও বেদম চটে গেল চরণদাস—“দেখ, থামাও বলছি হাসি, নয়ত দোব ঘাড মটকে গজায় ফেলে ।”

“তা তুমি পার বাবা । একশবার পার সে কাজ । আমি ত তোমার কাছে নস্তি । গণ্ডাকতক বাগদী লেঠেলকে ঠেঙিয়ে লাশ ক'রে ছেড়ে দিলে একলা । সে তুলনায় আমি ত ফডিং । আমাকে ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলতেও পাব বাবা তুমি । তাতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না । কি সর্বনেশে বাবাজী বে বাবা ।”

এবার চরণদাসও হেসে ফেললে । বললে—“ভাঁট বেরসিক হ্যা তুমি । অমন গানটা ঝপ্ ক'রে বন্ধ করতে আছে ?”

“কি করি বল, ঘাস দেখে যে ঘোড়ার মুখ চুনকে উঠল ।”

চরণদাস এবার প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল—“আজ দূর দূর, তোমার মত তাল-কানার সঙ্গে বাজায় কে ?”

খন্ডা হাত জোড় ক'রে বললে—“ঠিক বলেছ দাদা, একটা লাখ কথার এক

কথা বলেছ। তাল-কানা হয়েছি বলেই এখনও হেসে-খেলে বেঁচে আছি। তোমাদের মত তাল-জ্ঞান থাকলে শুধু তাল ঝুঁকেই মরতে হ'ত আজ। নাও ধর, তোমার জটা এনেছি, এবার জুত করে ব'সে টান।”

প্রসন্ন হয়ে উঠল বাবাজী। বললে—“মাইরি বলছি তোমায় ঘোষ মশাই, গান যদি শিখতে তুমি তা'হলে বাজিমাতে ক'রে ছাড়তে একেবাবে।”

খস্তা আর কান দিলে না ওর কথায়। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে—“কোথায় নামাব এগুলো গোসাঁই?”

তখন নজর করে দেখলাম—একটা বেশ বড় ময়রার দোকানেব খুঁড়ি রয়েছে ওব হাতে। একটু ঘেন সন্কোচ ফুটে উঠলো খস্তার স্বরে।

“খাবাব নিয়ে এলুম গোসাঁই বাজার থেকে। যে ছল্লোড চলল আজ সাবা দিন এখানে—খাওয়া-দাওয়ার কথা মাথায় উঠে গেছে সকলের। তাই আনলুম কিছু কিনে। আমাদের বাবাজী ত আবার খিদে সহিতে পারেন না।”

তখন আমারও খেয়াল হ'ল। তাই ত। সত্যিই তখনও কিছু মুখে দেয় নি চরণদাস। নিতাই থাকলে অনেকক্ষণ আগেই ওর খাওয়ার যোগাড় করত। একটা লঙ্কা পোড়া আর একটু হুন মেখে একরাশ ভাত গিলে এতক্ষণে টানটান হয়ে শুয়ে নাক ডাকাত বাবাজী। খিদে পেলে ওর জ্ঞান থাকে না। ছোট ছেলেব মত আনচান করতে থাকে। সেই চরণদাস আজ সাবাটা দিন কিছু মুখে দেয় নি। তার ওপর কপাল ফেটেছে ওর, একরাশ রক্তপাত হয়েছে।

রাগে ক্ষোভে গুম হয়ে বসে রইলাম।

হতভাগী—সোনা ফেঁলে কাঁচ নিয়ে আঁচলে বাঁধলি। চরণদাস সোনা, সোনার চেয়ে ঢের বড় চরণদাস বাবাজী—সোনা যাতে ঘষে পরীক্ষা করা হয় সেই কষ্টি-পাথর। বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল তোকে। পাছে ওকে ঠকাতে হয় এই ভয়ে আমি কিছুতেই নামিনি আমার মডার গদি ছেড়ে তোর ডাকে। সেই চরণদাসকে ভাসিয়ে দিয়ে আজ তুই মজা লুটছিল একটা মাকালফল নিয়ে।

খস্তা একটা ধমক লাগালে আমার।

“এগুলো ধরবে, না টেনে ফেলে দোব গজায়?”

চমকে উঠে নেমে গেলাম গদি থেকে। মিনতি ক'রে বললাম—“একটু সব্ব কর খস্তা। হাতট ধুয়ে আসি।”

ব'লে চলে গেলাম গদির পেছনদিকে। সেখানে কলসীতে ছিল খাবার জল। হাত ধুয়ে কলসীটাই উঠিয়ে নিয়ে এলাম। খাবার খেয়ে ওরা জল খাবে।

ততক্ষণে ধুনিটে উলকে দিয়ে কলকেতে আগুন চাপিয়েছে বাবাজী। খস্তার

হাত থেকে ঝুড়িটা নিয়ে ধূনির পাশে নামালাম। হুঁখানা শালপাতা খুলে নিয়ে ছুঁটো ঠোঙা বানিয়ে ভাগ করতে বললাম খাবার। খস্কা গেল গন্ধায় মুখ হাত ধুতে। বাবাজী চোখ বুজে বসে বললেন দম লাগাতে লাগল।

একটা ঠোঙায় খাবার ভরে চবণদাসকে বললাম—“নাও ধর, এবার মুখে দাও কিছু।”

রক্তবর্ণ চোখ দুটো মেনে বাবাজী শাকালে আমান দিকে। হাত বাডালে না।

আবাব বললাম—“ধব এটা, খস্কা খাবাবটাও তুলে ফেলি ঠোঙায়।”

চবণদাস মুখ নামিয়ে নিয়ে বললে—“খাক, ওতে আর আমাব কাজ নেই।”

একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম—“সে কি। খাবে না তুমি কিছু?”

আবাব ঠাণ্ডা আবাব মুহূর্তে বাবাজী বললে—“ও সমস্ত আব আমাব ভাল লাগে না গোসাঁই।”

আবাব আশ্চর্য হয়ে গেলাম—“দোকানেন খাবাব ত তুমি খাও বাবাজী। এখন ভাতের যোগাড় হয় কি করে? নাও ধর, যা জুটছে শাই খেয়ে শতটা কাটাও এস।

বাবাজী শুধু মাথা নাড়লে।

তখন একটু চটেই গেলাম—বেশ একটু অভিমানও হ'ল। বললাম—“চবণদাস তা'হলে নেনে না তুমি আমাব হাত থেকে খাবার?”

মাথাটা এগিয়ে এনে বাবাজী আমাব হাতে-ধরা ঠোঙায় নপাল ঠেকালে। খুব চুপি চুপি বললে—“কারণ হা • থেকেই আর কিছু নোব না গোসাঁই। যে হাত থেকে খাবাব জিনিস নিতাম আমি, খাওয়ার জগে যান মপর জুলুম চালাতাম, সে আব নেই। সে হাত ছুঁখানা থইয়েছি আমি। শাই ও কাজ • মি নজ ক'রে দিযেছি।”

আতকে উঠলাম—“সে কি। সেই থেকে খান ন তুমি কিছু?”

তেমনি ভাবে ফিফিস ক'রেই বললে বাবাজী—“না গোসাঁই, আমাব আর দবকার করে না খাওয়াব। এটা বেশ আছি। শুধু মন খেয়ে কেমন ভাজা রয়েছে। শুধু জল খেয়েই কাটার যতদিন না সে ফেবে।”

আর সামলাতে পারলাম না নিজে। খাবারের ঠোঙাটা নামিয়ে রেখে ছুঁ হাতে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলাম। একটা অবাক্ত যন্ত্রণায় গলাটা ব্যাৎ গেছে আমার তখন। শুধু কোনও বকমে বলতে পারলাম—“চবণদাস।”

চবণদাস হাত ছাডালে না। ওর কণ্ঠ থেকে মর্মান্তিক অহুনের বার হ'ল—
“একটা কথা তোমায় বলব গোসাঁই। বল রাখবে? বল?”

পাৰাণ গলে যায় এমন আকৃতি ।

বললাম—“বল চরণদাস, বল তোমার কথা । তোমার কথা রাখতে যদি মড়াও গদিও ছাড়তে হয়, তাও আমি ছাড়ব এবার—বল তোমার কথা—”

অনেকটা সময় বাবাজী মুখ নিচু ক’রে রইল, যেন বলতে গিয়ে তার কোথায় আটকাচ্ছে । শেষে মুখ নিচু করেই বললে, বললে যেন একটি একান্ত লজ্জার কথা, একটি অতি গোপনীয় কথা বললে যেন চরণদাস ।

বললে—“যদি সে কোনও দিন ফেরে ত তাকে বোল যে আমি শেষ সময় পর্যন্ত এ বিশ্বাস বুকে রাখতে পেরেছি যে সে কোনও ছোট কাজ করতে পারে না ।”

ঝট করে হাত টেনে নিলাম আমি । গর্জে উঠলাম—“কি ? কি বললে তুমি চরণদাস ? এর পরও তুমি বলতে চাও যে সে ছোট কাজ করতে পারে না ?”

ওর লাল চোখ দু’টোয় অস্বাভাবিক একটা আলো দেখা গেল । অতি মধুর হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে—“হ্যাঁ তাই গোঁসাই, ঠিক তাই, ঠিক তাই, ঠিক তাই । নিতাই দাসী কোনও দিন ছোট কাজ করতে পারে না এই বিশ্বাস নিয়েই যেতে পেরেছে চরণদাস বৈরাগী—এইটুকুই শুধু জানিয়ে দিও তাকে । এই আমার শেষ আব্দার তোমার কাছে ।”

কয়েকটা মুহূর্ত ইঁাকরে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে । ধূনির আলোয় চরণদাসের কালো মুখখানা আলোয় আলো হয়ে উঠেছে । চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হ’ল—কোথায় যেন একটা কিছু বুঝতে ভুল হচ্ছে আমার । থেই হারিয়ে ফেলেছি যেন আমি সব ব্যাপারটার । চরণদাস আর নিতাই দাসী এই দু’টো জট-পাকানো স্বতোর জট খোলার সাধ্য আর যারই থাক, উদ্ধারণপুরের সাঁই-বাবার নেই । বুকের মধ্যে যে জিনিস থাকলে তাই দিয়ে ভিজিয়ে ও জট নরম করা যায় সে জিনিস নেই আমার বুকে । শুকিয়ে গেছে । উদ্ধারণপুরের বাস্তব বাদশার গোলামী করতে করতে এ বান্দার বুকের ভেতরটা শুকনো ছোবড়া হয়ে গেছে । নিতাই দাসী আর চরণদাসের ব্যাপারে নাক গলাতে যাওয়া আমার মত শ্রমশীল-শকুনের পক্ষে চরম বিড়ম্বনা ।

কিন্তু শুধু জল খেয়ে বেঁচে আছে যে ও ! শ্রমশীল বসেও যে আমরা থাকি । শেয়াল-শকুন-কুকুর আমি—আমরা যে শ্রমশীল বাস করছি, শুধু মজা ক’রে পেট ভরাবার আশায় । সেই পেটের দাবিও যে অগ্রাহ্য ক’রে বসেছে বাবাজী । ও হতভাগা বুঝে না কেন, যে আগুন পেটের মধ্যে জলছে সে আগুনে কিছু না দিলে তা বাইরে বেরিয়ে এসে ওকেই নিঃশেষে ছাই ক’রে ছাড়বে । তখন কোথায় থাকবে ও নিজে, আর কোথায় থাকবে ওর নিষ্পাপ নিতাই বোউমী । শুধু এই

দশাননর পড়ে থাকবে কিছু সাদা হাড় আর কালো করলা । সাদা হাড় আর কালো করলার বুক ভরা বেদনা বুঝবে কে তখন ?

শেষ বারের মত শেষ চেষ্টা করতে গেলাম । আবার ধরলাম ওর হাত ছুঁখানা আপটে । ধরে ধরা-গলায় বললাম—“চরণদাস বাবাজী, এই তো একটু আগে বললে—দোষ সব আমার । আমার দোষেই নিতাই গেছে । আমার দোষের জন্তে তুমি কেন প্রায়শ্চিত্ত ক’রে মরবে ? করতে হয় সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব । যেভাবে পারি, যেমন ক’রে পারি, আমি ফিরিয়ে এনে দোব তোমার নিতাইকে—”

আমার কথাটা শেষ হ’তে পেল না ।

উদ্ধারণপুরের বেহেড বাস্তব হি হি ক’রে হেসে উঠল পেছন থেকে ।

“বলি হচ্ছে কি ও ? যেন মানভঞ্জন-পালা চলছে ! ব্যাপার কি ?”

দীনতম দীনের মত হয়ে উঠল বাবাজীর চোখের দৃষ্টি । সে দৃষ্টি কি বলতে চায় আমায় বুঝলাম । বলতে চায়—“দোহাই তোমার, যা একান্ত ভেতরের ব্যাপার—তাকে বাইরে টেনে এনে বে-ইজ্জৎ কোর না ।”

দিলাম বাবাজীর সেই দৃষ্টির মূলা । ওর হাত ছেড়ে দিখে বললাম—“আষ খস্তা, এট তোমার কথাই হচ্ছিল । বাবাজীকে তাই বোঝাচ্ছিলাম—না হয় করেই ফেলেছে একটা কাজ, ব্যাটাছেলে মানুষ, ও-রকম হয়ই একটু-আধটু । তা’বলে সেই মেয়েকেই যে এনে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে এই বা কেমন কথা ।”

উবু হয়ে বসে পড়ল খস্তা । চোখ দু’টো বড় বড় ক’রে বললে—“তার মানে ?”

খুব ভালমানুষী গলায় বলতে লাগলাম—“মানে সেই মেয়েটার আশ্পর্শের বহরটা দেখে একেবারে খ’ হয়ে গেছি কিনা । বলে কিনা, আর একটা মাস দেখব তাবপর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলব ।”

“কে আবার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে যাচ্ছে কোথায় ? কি ব্যাপার কি গোসাঁই ? কে সে ? আর ঐ সঙ্গে আমার কথাই বা হচ্ছিল কেন ?”

খস্তার ঠোঁড়ায় খাবার তুলতে তুলতে বললাম—“ঐ যে রে, সেই যেন কি নাম ওদের গায়ের ? সেই গায়ের শীলের বাড়ীর ভাগনী না কি । কি যেন তার নামটা ছাই, মনেই আসছে না ।”

ঠোঁড়াটা বাড়িয়ে ধরলাম খস্তার দিকে ।

হাত দিয়ে ঠেলে দিল খস্তা আমার হাতখানা । দম-আটকানো স্বরে বললে “সে মেয়েকে তুমি জানলে কেমন ক’রে গোসাঁই ?”

বেশ বিরক্ত হয়ে গেলাম—“আর বলিস কেন সে ঝগড়াটের কথা ? সেই যে তুই গেলি দারোগাকে নিয়ে—আর ত এমুখো হলি না । এখারে কত কাণ্ডই

যে ঘটল। এস কৈচরের বায়ুনদিদি, সঙ্গে এক খন্দের। ভাবলুম ছুঁটো টাকার মুখ দেখতে পাব। ওমা, তা নয়, যত সব ‘অনাছিটি’ কাণ্ড। বায়ুনদিদির চোখ এড়িয়ে খন্দের এসে চুপি চুপি আমায় বললে যে সে ওষধ-পস্তুর নিতে আসে নি! এসেছে তোমার খোঁজে। কে নাকি তাকে বলেছে যে আমার ধরতে পারলেই আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারব, যাতে তুমি গিয়ে তার হাতের ভেতর ঢুকিস।”

দাঁত-বার-করা চেহারাটার দিকে একবার আড়চোখে চাইলাম। দাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে খস্তা ধুনির আগুনের দিকে। ও যেন নেই সেই দেহের মধ্যে।

আবাব বাড়িয়ে ধবলাম ঠোঙাটা।

“নে, ধবু খস্তা, এবার মুখে দে কিছু।”

গ্রাহণ করলে না খস্তা ঘোষ। সেইভাবে একদৃষ্টে আগুনের মধ্যে কি দেখতে দেখতে বললে—“সেই মেয়েটার খুতনিতে একটা বেশ বড় তিল আছে না গোসাঁই? কথা বলতে বলতে তার নাকের ভগাটা কেমন যেন ঘেমে ওঠে না? আর কেমন যেন ভুরু দুটো কঁসকে কথা বলে না সে?”

বললাম—“হাঁ হাঁ হাঁ, ঠিকই ত, মনে পড়েছে এবার। তিল ত একটা ছিল বটে তার মুখে। আর নামটাও যেন পড়েছে এবার—সোনা—সোনাই বোধ হয় হবে তার নাম—”

“সোনা নয় গোসাঁই, ভুল হচ্ছে তোমার। মেয়েটার নাম সুবর্ণ।” শরীরের অনেক ভেতর থেকে যেন কথা কটা উচ্চারণ করলে খস্তা ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে কিসে যেন একটা সজোবে ধাক্কা দিলে ওর ভেতর থেকে।

সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল খস্তা। দাঁত কটা আবার বেরিয়ে পড়ল তার। চরণদাসের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলে—“বাবাজী, ছোড়দি কোথায়?”

একটিবার মাত্র তাকিয়ে দেখলাম বাবাজীর মুখের দিকে। খস্তাব গ্রন্থ শুনে ভয়ে ওর চোখ দুটো কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হাঁ ক’রে কি বলতে গেল বাবাজী, গলা দিয়ে আওয়াজ বার হ’ল না।

একটুও দ্বিধা না ক’রে তৎক্ষণাৎ শুরু করে দিলাম—“সেই কথাই ত হচ্ছিল যে এতক্ষণ। চরণদাস জানবে কেমন ক’রে নিতাই আছে কোথায়? সেই সোনা না সুবর্ণ, সে ত এসে বলে গেল আমার ক’দিন আগে, যে তোমার ছোড়দি গিয়ে নাকি তাকে বলেছে আমার কথা। সেইখানেই নাকি আজ্ঞা গেড়েছে আজকাল তোমার ছোড়দি। নিজে তিনি আসতে পারলেন না আমার সামনে, মেয়েটাকে

পাঠালেন বামুনদিদ্বির সঙ্গে। তুই যেন আমার কেনা গোলাম, আমি হুকুম করলেই। অমনি ছুটে গিয়ে সেই মেয়ের আঁচল ধরে খুলে পড়বি।”

এবার একটু সহজ হ’ল খস্তা ঘোষ, সোজা পথে এল এতক্ষণে। সাদা গলায় বললে—“ও, তাই বল। সে কথা বল নি কেন এতক্ষণ? তাই ত ভাবছি আমার ঠিকানাটা সে ঘোগাড় করলে কোথা থেকে? তা বলে গেল কি সে তোমার কাছে গোসাঁই?”

“কি আবার বলবে? বললে সেই একই কথা, আর সে এক মাস দেখবে। এক মাসের ভেতর যদি তুই তাকে সেখান থেকে উদ্ধার না করিস ত গলায় দড়ি দেবে।”

“কেন, গলায় দড়ি দেবে কেন? কি এমন হ’ল এর মধ্যে যে গলায় দড়ি দিতে হবে তাকে?” বলে খস্তা নিজের গলাটাই একবার হাত দিয়ে ঘষে নিলে।

খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—“হবে আর কি? যা হয়ে থাকে। বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি? সাঁইথের এক বডলোক মহাজন বহু টাকা দিতে চায় তাকে বিয়ে করার জন্য। লোকটার বয়েস নাকি ষাট পেবিয়েছে। স্ববর্ণর আমার; খুঁকে পড়েছে টাকার লোভে।”

ঝাঁক’রে উঠে দাঁড়াল খস্তা—“কি? কি বললে তুমি গোসাঁই? স্ববর্ণ যে বিধবা, খুব ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল, বিধবাও হয়েছে ছোটবেলায়। আবার তার বিয়ে হবে কেন?”

“কি করে জানব বল? শীল-ফিলেদের ঘরে হয় বোধ হয় বিধবার বিয়ে। ত’ ছাড়া অত ছোটবেলায় বিধবা হ’লে বিয়ে হওয়াই ত উচিত।”

দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে বললে খস্তা ঘোষ—“তা বলে সেই শুয়োদের বাচ্চা বাটের মড়া সাঁইথের মোথরো শীল? শকুন উডছে শালার সাদা মাথাও ওপন। ছ’ হাতে শালার টুঁটিটা টিপে যদি না ধরি এক দিন—”

খস্তা আর শেষ করলে না কথাটা। এক লাফে বাবাজী’র সামনে প’ড়ে ছ’ হাতে জড়িয়ে ধরলে তাকে। ধরে টানাটানি জুড়ে দিলে—“ওহ বাবাজী, ওঠ লীগঙ্গীর। আজ রাতারাতি যেভাবে হোক পৌঁছতে হবে পাঁচুন্দি। বিয়ে দেবার শখ শালাদের ঘুচিয়ে দোব জন্মের শোধ।”

বাবাজীও উঠে দাঁড়াল তড়াক করে। একেবারে অস্ত্র মাতুষ, এতক্ষণ যেন আশুন ছিল না চরণদাসের শরীরে। যে মাতুষটা এতটু আগে বেদনার হয়ে পড়েছিল এ যেন সে মাতুষ নয়। ধূনির আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর শরীরের পেশীগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে।

একবার বলতে গেলাম খন্ডাকে যে চরণদাস শুধু জল খেয়ে বেঁচে আছে ।
কথাটা বেরোল না মুখ দিয়ে । শুধু কোনও রকমে বলতে পারলাম—“নিয়ে ঘাস
নি খন্ডা, না থাইয়ে নিয়ে ঘাস নি বাবাজীকে । ভুইও দিয়ে যা কিছু মুখে ।”

অন্ধকার নিমগ্নাছতলা থেকে ভেসে এল খন্ডার জবাব—“দূর ক’রে ফেলে দাও
ও-গুলো, শেরাল-কুকুরের পেট ভরুক ।”

উদ্ধারণপুরের ঘাট ।

ঘাটের কিনারায় মাথা কুটছে গঙ্গা ।

মাথা কুটছে উদ্ধারণপুরের বাস্তবের পায়ে ।

নিরাসক্ত নিরিকার বাস্তব একটানা পায়চারি ক’রে বেড়াচ্ছেন গঙ্গার
কিনারায় । তাঁর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে—ছলাৎ ছলাৎ । এতটুকু বাস্তবতা নেই,
নেই বিন্দুমাত্র উবেগ-উৎকর্ষা তাঁর পা ফেলার ছন্দে । সবই যে জানেন তিনি,
উদ্ধারণপুরের অন্ধকারের ওপারে কি ঘটবে, কি ঘটেছে, কি ঘটতে পারে, সবই যে
তিনি দেখতে পাচ্ছেন । তাই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বোত্তম, সর্বেশ্বর,
সর্বসহ । তাই কোনও সর্বনাশই তাঁকে টলাতে পারে না ।

কিন্তু মডার গদির ওপর বসেও যে আমার বুক কাঁপে ।

কল্পিত বৃকের মধ্যে গুমরে ওঠে তাঁর মহামন্ত্র—

“হুঁ ক্ষেঁ, যাং বাং লাং বাং ঝাং ক্ষেঁ । মহাকাল ভৈরব সর্ববিশ্বনাশ নাশয় নাশয়
হুঁ ত্রী ফট ঝাহা ।”

আকুল হয়ে বার বার তাঁকে জানাই—“ফিরিয়ে দাও, ওদের দু’জনকে ফিরিয়ে
দাও, নিও না গো, কেড়ে নিও না ওদের—”

গঙ্গার এপার-ওপার দু’পার জুড়ে হঠাৎ হাসাহাসি শুরু হয়ে যায়—“হুয়া-হুয়া
হুয়া-হুয়া—”

উদ্ধারণপুরের বিশ্বয় ।

বিশ্বয় বর্ণচোরা বহুদণ্ডী ।

সাদা হাড় আদ্র কালো কয়লার চোখে তাক লাগাবার অন্তে ভোল ফিরিয়ে
আসে সে, এসে হাসে কীদে বাচে গায় আর ঝঙ্করা করে । এমন মারাত্মক জাতের
ঝঙ্করা করে যে তা শুনে কালো মুখ সাদা হয়ে যায় আর সাদা মুখ কালো আধার

হয়ে ওঠে । যারা নুখ পুড়িয়ে চিতার চড়ে শুয়ে থাকে তাদের ঝাঁতে এমন আচমকা
বা দেয় সেই মকরা যে বেচারারা খলখল ক'রে হেসে উঠতে গিয়ে কুঁপিয়ে কেঁদে
কেলে ।

উদ্ধারণপুরের বিশ্বয় ।

বিশ্বয় বিস্তার করে বাগজাল ।

বলে—“বড আরামে আছ বাবা—এ্যা ? বেশ মজা ক'রে পুড়ছো বসে বসে ।
পোডো—চিরকাল ধরে পোডো । কিছুতেই নিভবে না আগুন, কোনও কালে
শেষ হবে না তোমার জ্বলনির । মরণকে ফাঁকি দেবার জন্তে পালিয়ে এসে লুকিয়ে
ব'সে আছ এখানে, থাক । কে দেবে তোমায় নিষ্কৃতি ? চুপি চুপি এসে ফুঁ দিয়ে
আলো নিভিয়ে যে বন্ধু বৃকে টেনে নেয় সে যে ভয়ে ঢুকতে পারে না এখানে ।
এই হংস হ্যাংলা নিলজ্জ জীবনের গ্রাস থেকে কে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে রেহাট
দেবে ?”

উদ্ধারণপুরের বিশ্বয় ।

বিশ্বয় বাধায় বাগডা ।

খতমত খেয়ে যাই । হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি গুর মুখের দিকে । বিলকুল ভোল
ফিরিয়ে এসেছে । কোথায় গেল সেই কপাল-জোড়া ডগডগে সিঁড়রের ফোটাটা !
কোথায় গেল সেই বীতৎস চুল-দাড়ির জঙ্গল । কোথায় গেল সেই ভাঁটার মত
অগ্নিবর্ণ চোখ দুটো । আর কোথায়ই বা লুকোনো সেই বৃকের রক্ত-শোষা ভয়াবহ
দৃষ্টি ! তার বদলে গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দুধের মত সাদা আলখাল পরে যে
মাহুঘটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার মাথায় মুখে কোথাও চুল-দাড়ির চিহ্নমাত্র
নেই । চক্ষু দু'টিতে নেই এতটুকু আকাজ্জক আগুন । সব পাওয়ার যা বড
পাওয়া তার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি যেন উপছে পড়ছে চক্ষু দু'টি থেকে । সব জানার
যা বড জানা তা জানা হয়ে গেলে যে জাতের রহস্যময় হাসি হাসতে পারে লোকে,
সেই জাতের হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে । এমন কি গলার আগুয়াজও
গেছে পালটে । যে গলা উদ্ধারণপুর ঘাটের শেয়াল-শকুনের পিলে চমকে দ্বিত, সে
গলার উঁকি দিচ্ছে রসিকতার রহস্য ।

বলে—“বলি হ'ল কি হে তোমার ? ভিরমি গেছে, নাকি ? চেনা মাহুঘকে
চিনতে পার না ? শুধু খোলসটা পালটেছি বাবা, ভেতরে যে কালসাপ সেই
কালসাপই আছি । এখন শুধু একটু কপা, এতটুকু করুণা যদি পাই তা'হলেই

হয়। নব্বত আমার সাধ্য কি ওপর-ভেতর এক ক'রে দোব তাঁকে !”

বলতে বলতে ছ'চোখে জল এসে গেল। বুজে এল চোখের পাতা। ধরা গলায় আরম্ভ করে দিলে—

“যদপি সমাধিযু বিধিরপি পশ্চতি

ন তব নখাণ্ড-মরীচং ।

ইদমিচ্ছামি নিশ্ম্য তবাচ্যুত

তদপি কৃপাভূত-বারিচং ॥

দেব ভবন্তং বন্দে ।

মন্মানস-মধুকরমর্ষ নিজ-

পদ-পঙ্কজ-মরকন্দে ॥

ভক্তি-কদম্বতি যতপি মাধব

ন ত্বয়ি মম তিলমাত্মী ।

পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক—

দুর্ঘট-ঘটন বিধাত্মী ॥

অয়মবিলোলতয়াগ্ৰ সনাতন

কলিতাভূত-রস-ভারং ।

নিবসতু নিত্যমহামৃত-নিব্ধিনি

বিন্দয়ধু-রিম-সারং ॥”

এক বর্ণও মাখায় ঢুকল না। তবু বেশ লাগল শুনতে। আগমবাগীশের গলায় সব রকমের স্তোত্রই খোলে ভাল। সব রকম সাজেই মানায় আগমবাগীশকে। কিন্তু একলা যে। আর একজন কই? বাসি ফুলে ত পূজো হয় না ঠর! টাটকা ফুল চাই। কিন্তু কই, কেউ ত এসে দাঁড়ালো না এবার ঠর পেছনে!

না আশুক, কিন্তু উপযুক্ত সমাদর করতে হবে আগমবাগীশকে। তাড়াতাড়ি গদির পাশ থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে লাফিয়ে নামলাম।

“চলুন, আসন করুন, আগে একটু তর্পণ করুন।”

বেশ ধীরেস্থস্থে নেড়া মাথাটি ছ'পাশে দোলাতে লাগলেন আগমবাগীশ। বেশ স্বর ক'রে বলতে লাগলেন—“না, না না, ও আর মুখে এন না গোঁসাই। ও কথা কানে চোকাও পাপ। শুধু একটু চরণায়ত আর একখানি চরণ-তুলসী, সেই সকালে একটিবার মাত্র গ্রহণ করি। বাস—বাস—আর কিছু না। জিতাপছালা জুড়িয়ে শীতল হয়ে যায়। তারপর নাম, শুধু নামায়ত, আর কিছু না, আর

কিছুই প্রয়োজন করে না এখন ।”

ঘাবড়ে গিয়ে বোভগটা পেছনে লুকিয়ে ফেলি। আগমবাগীশ হুঁচোথ বুজে ফেলেছেন। যুহু যুহু কাঁপছে তাঁর ঠোঁট হুঁখানা। অতি চাপা স্বরে আবার আরম্ভ হোল—

“যুহুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লব—

বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্ ।

তিলক-বিভবিত-মরুত-মণিতল—

বিবিত-শশধর-খণ্ডম্ ॥

যুবতি-মনোহর-বেশম্ ।

কলয়কলানিধিমিব-ধরণীময়—

পরিণত-রূপ-বিশেষম্ ॥”

হঠাৎ হুঁচোথ খুলে ফেললেন আগমবাগীশ। আমার মুখের ওপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—“দেখেছ ? কখনও দেখেছ এ রূপ ? কখনও এ রূপের ছায়া পড়েছে তোমার চোখে ? পড়ে নি, পড়লে আর ও চোখের দৃষ্টিতে ভয় লুকিয়ে থাকত না। মরণের ভয়ে লুকিয়ে ব’সে থাকতে না এখানে। তুমিও বলতে পারতে—
মরণ রে তুঁছ মম শ্রাম সমান ।”

আচম্বিতে নাকী স্বরে খ্যাক খ্যাক ক’রে কে হেসে উঠল আমার গদির পেছন থেকে। হুঁজনেই চমকে উঠে ফিরে চাইলাম সেদিকে। চেয়ে কন্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরিষ্কার দিনদুপুরে কে ওখানে ওভাবে প্রেতের হাসি হাসছে ?

এক দুই তিন চার—কয়েকটা দমে ভারী মুহূর্ত সেরে গেল। তারপব আবার—আবার সেই থিঁ থিঁ থিঁক থিঁক হাসি। হাসির শেষে ভেঁচানো না’ী স্বরে বার হ’ল—

“মরণ রে তুঁছ মম শ্রাম সমান—”

মুখ ফিরিয়ে চাইলাম আগমবাগীশের মুখের দিকে। কালি ঢেলে দিয়েছে মুখে। উদ্ধারণপুরের ভাস্কর মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আগমবাগীশের মুখখানা। দুই চোখের দৃষ্টিতে—যেখানে এইমাত্র উপছে পড়ছিল পরিতৃপ্তি—সেই দৃষ্টিতে এখন ফুটে উঠেছে আতঙ্ক আর আকুলতা আর আত্মগোপন। গদির পেছন দিকে চেয়ে আছেন তিনি একদৃষ্টে—আর পিছুছেন। একটু একটু ক’রে পিছুতে লাগলেন আগমবাগীশ, আর একটু একটু ক’রে আবির্ভূত হ’ল—আপাদ-মন্তক মিসমিলে

কালো কাপড়ে ঢাকা এক মূর্তি আমার গদির পেছন থেকে । হঠাৎ আগমবাগীশ উদ্ভট একটা চিৎকার ক’রে পেছন ফিরে দিলেন একটা লাক’গন্ধার দিকে, হাত চার-পাঁচ দূরে ঢালু পাড়ের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে হডহড করে পিছলে নেমে গেলেন গন্ধার জলে । সেখান থেকে আবার একটা বুককাটা চিৎকার শোনা গেল । ওধারে দু’টো চিতার পাশে যারা খোঁচাখুঁচি করছিল তারা দৌড়ে এসে পৌঁছে গেল যেখানে আগমবাগীশ জলে পড়েছেন সেখানে । তাবাও লাগল চোঁচাতে, কিছু না বুঝেই চোঁচাতে লাগল তাবা । গন্ধার ভেতর অনেকটা দূরে আর একবার দেখা গেল আগমবাগীশের মুখখানা, দেখা গেল শূন্যে দু’টো হাত তুলে কি যেন তিনি ধরবার চেষ্টা করছেন । নিমেষের মধ্যে তলিয়ে গেল মুঠো-বাঁধা হাত দু’খানা । আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়ালো কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটা—“হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল ।

সেই বীভৎস হাসি থামাবাব আগেই প্রাণপণে চিৎকাব ক’রে উঠলাম—“কে তুই ? কি চাস ?”

দস্তুরমত ধমক দিয়েই বলতে গেলাম কথা ক’টা, শোনাল ঠিক উল্টো । শোনাল যেন প্রাণেব দায়ে পবিত্রাচি ডাক ছাড়ছি আমি । আমার সেই আতঁনাদ শুনেই বোধ হয় শ্মশান-স্বদ্ধ মানুষ ছুটে এল এধারে । আর একবার চোঁচাতে গেলাম—“কে তুই ? খোল মুখ—”

ভালো ক’রে আগুয়াজই বেরোল না মুখ দিয়ে, কে যেন সজোবে চেপে ধরেছে আমার গলা, দম বন্ধ হয়ে আসছে । কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া সেহ ভয়ঙ্কর মূর্তিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি ।

খুব আস্তে আস্তে নড়ে উঠল মূর্তিটা । প্রথমে কালো কাপড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দু’খানা হাতের কবজি পর্বন্ত । কি কদর্ঘ, কি কদাকার হাত । দু’হাতের দশটা আঙ্গুলই নেই, দগদগে লাল বোঁচা হাত দু’খানা । আস্তে আস্তে হাত দু’খানা উঠল মুখের কাছে । আস্তে আস্তে মুখের ওপরের কাপড় কপাল পর্যন্ত উঠল, আর সেই মুহূর্তে আমি একটা বিকট চিৎকার করে উঠলাম । চিৎকার ক’রেই বুজে ফেললাম দু’চোখ । আর তৎক্ষণাৎ আবার আরম্ভ হয়ে গেল সেই পৈশাচিক হাসি—“হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ ।”

হঠাৎ ঝপ ক’রে বন্ধ হয়ে গেল হাসিটা । দূর থেকে টেঁচিয়ে উঠল রামহরের বউ—“তবে যে মড়াখাকী, ফের তুই ঢুকেছিল শ্মশানে ! দাঁড়া—আজ তোমার বিধ ঝাড়ব খেঁয়েরে ।”

চোখ চেয়ে কিরে দেখি, ছুটে আসছে রামহরের বউ একথানা আধপোড়া কাঠের চেলা হাতে ক'রে। তার আর এসে পৌঁছতে হ'ল না, মার মার ক'রে উঠল অস্ত্র সকলে। কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটা ছুটল, ছুটে গিয়ে শেয়ালের মত ঢুকে পড়ল আকন্দ গাছের জঙ্গলের মধ্যে। হাতের কাঠখানা প্রাণপণে ছুঁড়লে রামহরের বউ সেদিকে। তার দেখাদেখি আর সবাই যে যা হাতের কাছে পেল ছুঁড়তে লাগল জঙ্গল লক্ষ্য ক'রে। পোড়া বাঁশ, চেলা কাঠ, ভাঙ্গা কলসী—খশানোর যাবতীয় জঞ্জাল সব সাফ হয়ে গেল।

তখন আমার সামনে এসে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে রামহরের বউ—
“হারামজাদী কি বলছিল তোমায় জামাই ?”

অনেকটা ধাতস্থ হয়ে গেছি আমি তখন। ধীরেস্থে গিয়ে চড়ে বসলাম গদির ওপর। বসে রামহরের বউকেই জিজ্ঞাসা করলাম—“ও কে বউ ? কাকে তোরা খেদালি কুকুর-খেদা ক'রে ?”

“ও মা ! তুমিও চিনতে পাকনি নাকি গো ওকে ?”

চিনতে সে নষ্টাই পারিনি তা বোধ হয় আমার চোখে-মুখেই ফুটে উঠল। রামহরের বউ তা বুঝলে। বুঝে বললে—“সেই যে গো, সেই ছিনাল মাগী, সোয়ামীর মুখে আগুন দিয়েই গলগল ক'রে মদ গিলতে লাগল। তারপর গিয়ে উঠে বসল সেই পোড়ারমুখো কাপালিকটার কোলে। সেই যে—”

আর বলতে হ'ল না তাকে। ঠিক যেন একটা বিচ্ছেদ কামড়ালে আমার। তীব্র যন্ত্রণায় চিংকার ক'রে উঠলাম—“উঃ।” আবার হুঁচোখ বুজে ফেললাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর ভেসে উঠল একথানা বিকটাকার মুখ। নাকটা নেহ, ঠোট দু'খানাও নেই। বীভৎস লাল একটা গর্ত আর দাঁতগুলো। মরা ম' অনেক রকমের অনেক মড়ার মুখ দেখেছি, খসে গলে যাচ্ছে মাংস তাও হামেশা দেখাছ, পোড়া মুখ যে কত দেখছি তার হিসেবও দেওয়া যায় না। কিন্তু একটা জ্যাঠ মাল্লুষের মুখ যে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে তা কি কাম্বিন্কেলে কল্পনা করতে পেরেছিলাম ? মড়ার বীভৎসতার চেয়ে জ্যাঠের বীভৎসতা কি মারাত্মক রকমের ভয়াবহ !

তবু আর একবার টপ ক'রে আমার বোজা চোখের ওপর ভেসে উঠল এক সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মূর্তি। দুধের মত সাদা রঙ, অতি আশ্চর্য রকমের কালো এক-জোড়া ভুরু নিচে অতল রহস্তের আধার দু'টি অতি আশ্চর্য চক্ষু, সেই ছোট্ট কপালখানি জোড়া গুণ্ডগে সিঁচুরের টিপটি আর মুখ-ভিত্তি পান। আর একবার আমার কানে এসে বাজল সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর—“আগে আমার ঐ বোনটিকে ওর স্বামীর হাতে পৌঁছে দোব, তারপর চলে যাব কাশ্মীরে।” সেদিন অজ্ঞাতে আমার

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—“আগমবাগীশ। আগমবাগীশ কোথায়?”

আগমবাগীশের কথা মনে পড়তেই বিহ্যৎপৃষ্ঠের মত শিউরে উঠলাম। হুঁচোখ খুলে চিংকার করে উঠলাম গঙ্গার দিকে চেয়ে—“আগমবাগীশ—আগমবাগীশ, ডুবল যে রে—”

কেউই উত্তর দিলে না। বেশ খানিকক্ষণ পরে রামহরের বউ জবাব দিলে—“ডুবল না হাড জুড়োল মিন্সের। ঐ রাক্ষসী মাগী হাঁ করে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। এতদিনে রেহাই পেলে ওব হাত থেকে।

উদ্ধারণপুরের বিস্ময়।

বিস্ময় বিলীন হ’ল বিশ্বস্তির বদন-বিবরে।

তবু কিছু থেকে গেল বাকী। বাকী রইল একটি চিরস্তন জিজ্ঞাসা। গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার পূর্ব-মুহুর্তে আগমবাগীশ করেছিলেন সেই জিজ্ঞাসা। জানতে চেয়েছিলেন তিনি আমার কাছে যে, কখনও আমার চোখে পড়েছে কিনা সেই রূপের ছায়া—

“সুবতি মনোহর-বেশম্।

কলয়কলানিধিমিব-ধরণীমতু—

পরিণত-রূপ-বিশেষম্ ॥”

জীবন্ত জীবনের রূপ। ও রূপের ছায়া কখনও আমার চোখে পড়লে আমি নাকি মরণের ভয়ে আশানে এসে লুকিয়ে থাকতাম না।

কিন্তু কি হতে কি হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে আগমবাগীশ জীবনের ভয়ে ঝাঁপ দিলেন বিশ্বস্তির বদন-বিবরে। কাকে ফাঁকি দিয়ে পালালেন তিনি? জীবনকে না মরণকে? এই চিরস্তন জিজ্ঞাসা শুধু বাকী রইল ডুবতে। ভেসে চলল গঙ্গার চেউয়ের সঙ্গে। আর উদ্ধারণপুরের ঘাট একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই দিকে।

আর রামহরের বউ আশানময় নাচতে লাগল গাল পাডতে পাডতে। সে যে ‘পেত্যথ্য’ জানে যে ‘ধন্যের কল বাতাসে নড়ে!’ যোল আনা ‘পেত্যথ্য’ জানতে পেরেছিল সেদিন, যেদিন নাক ঠোঁট হাতের আঙ্গুল খুইয়ে সিঁদ্রী গিন্নী এসে সর্বপ্রথম আগমবাগীশের খোঁজ করেন। আমার সামনে তিনি আসেন নি, কারণ আমাকে তাঁর কালামুখ দেখাতে নাকি শরম লাগত। আর ওরা আসতেও দিত না গুঁকে আমার কাছে। দূর থেকেই খেদিয়ে দিত। তবু তিনি আসতেন, প্রায়ই নাকি আসতেন উদ্ধারণপুর ঘাটের ধারেকাছে। এসে খোঁজ করতেন আগমবাগীশের।

ওধারে আগমবাগীশ ভোল ফিরিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন শুধু তাঁর শেষ শক্তির ভয়ে ।

কিন্তু সিন্ধী গিন্নী জানতেন । ভয়ানক ভাবে বিশ্বাস করতেন যে একদিন পাবেনই তিনি আগমবাগীশকে উদ্ধারগপুরের ঘাটে । তাই তিনি নজর রেখেছিলেন শ্মশানের ওপর । এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর আশা পূর্ণ হ'ল । 'যত মড়া উদ্ধারগপুরের ঘাটে' এই মহাবাক্যটি সার্থক করবার জন্তে আগমবাগীশ ফিরে এলেন শ্মশানে । এবং আর ফিরে গেলেন না ।

ফেরে না কেউ ।

উদ্ধারগপুরের ঘাট কাউকে ফিরিয়ে দেয় না ।

যায় আবার আসে । আসবার জন্তে যায় । অনর্থক ফিরে যায়, শুধু আবার ঘুরে আসবার জন্তে । তারপর একদিন ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে । এবং তারপর আর যায় না । উদ্ধারগপুর ঘাটের কোলে তখন শান্তিতে শুয়ে পড়ে ঘুমোয় ।

শুধু আমি যাই না কোথাও । আমি যে পালিয়ে এসে লুকিয়ে বসে আছি শ্মশানে । পালিয়ে এসেছি মরণের ভয়ে । এ কথাটি সব শেখা শুনিয়ে গেলেন আগমবাগীশ ।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা তিনিও পালিয়ে এসেছিলেন উদ্ধারগপুরের ঘাটে । মরণের ভয়ে নয়, জীবনের ভয়ে । জীবনকে চাখতেন আগমবাগীশ, হৃদয় মুখ বদলাতেন জীবনের মুখে চুমো খেয়ে । গুস্তাদ সাপুড়েও কালকেউটেব মুখে চুমো খায় । আর কালকেউটে যেদিন চুমো দেয় সাপুড়ের মুখে, সেদিন নৌল স্নায় ঢুলে পড়ে সাপুড়ে তার পোষা সাপেব কোলে ।

ডাক ছেড়ে শোনাতে ইচ্ছে হ'ল আগমবাগীশকে যে সামান্য একটু ভুল বুঝে গেলেন তিনি । মরণের ভয়ে পালিয়ে আসিনি শ্মশানে, এসেছি জীবনের ভয়ে । মরণের ক্ষুধাকে আমার ভয় নয়, আমি ভয় করি জীবনের স্বধাকে । মরণের ক্ষুধাকে ফাঁকি দেবার কায়দা জানে উদ্ধারগপুরের ঘাট কিন্তু জীবনের স্বধা থেকে যে মারাত্মক নেশা জন্মায়, সে নেশার হাত থেকে কি ক'বে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা কেউ জানে না !

উদ্ধারগপুরের ঘাট ।

কান্না হাসির হাট ।

হুনিয়ার সর্বত্র দিনের শেষে নামে রাত, রাতের পিছু পিছু আসে দিন । উদ্ধারগ-

পুরের ঘাটেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

দিন আর রাত ঘুরে আসে আর ফিরে যায়—আর আবার ঘুরে আসে। যেন নেশা করেছে। বন্ধ মাতালের মত অনর্থক ঘুরে মরছে।

কিন্তু ঘুরে আসে না খস্কা ঘোষ, আসে না চরণদ্বন্দ্ব। আর আসে না একজন। অবশ্য সে আর আসবেও না কোনও দিন। কোন্ মুখে আসবে? আর একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াবার স্পর্শ। কিছুতেই হ'তে পারে না তার। অথবা এও হ'তে পারে যে উদ্ধারণপুরের ঘাটে ফিরে আসবার প্রয়োজন তার চিরকালের মত ফুরিয়েছে। জীবনের সুখা আকর্ষণ পান ক'রে তীব্র নেশায় বুদ্ধি হয়ে আছে এখন সে। থাকুক, শান্তিতে থাকুক যেখানে আছে। যত দিন পারে থাকুক, তারপর আসতেই হবে একদিন ফিরে, পরিজ্ঞান নেই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ফিরে আসে স্বর্ণ। এসে মাথা খুঁড়তে থাকে উদ্ধারণ-পুরের ভন্মের ওপর। বলে—“জল দাও, একটু জল দাও ওগো আমায়। তেঁটায় যে প্রাণ যায়।”

ছুটে আসে পঙ্কা, রামহরে, রামহরের বউ। আসে ময়নাপাড়ার ওরা সকলে। কিন্তু কেউ মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারে না। লজ্জা নেই, শরম নেই, প্রায় উলঙ্গ একটা যুবতী মেয়ে মাথা-কপাল চাপড়াচ্ছে, চুল ছিঁড়ছে, আর শ্মশান-ভন্মের ওপর মুখ রগড়াচ্ছে। জল দিতে গেলে তেঁড়ে মারতে আসছে। আর সমানে চিৎকার করছে—“জল দাও, ওগো একটু জল দাও, গলা শুকিয়ে গেছে আমার, বুক ফেটে গেল, উঃ, মা গো”—হ'হাতে বুক চেপে ধরে আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, কাছে যাবার জো নেই কারও। এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছে যে কাছে গেলেই বোধ হয় কামড়ে দেবে। অবশেষে একটা মন্তলব এসে গেল মাথায়। মুখ তুলে আমার দিকে চাইতেই চিৎকার ক'রে উঠলাম—“ভাক্ ত রে কেউ খস্কাকে, ডেকে আন্ খস্কাকে এখনই, তেঁঙিয়ে ঠাণ্ডা করুক এটাকে।”

অভ্যাশ্চর্য ফল ফলল। স্থির হয়ে বসে মাথা কাত করে যেন শুনতে চেষ্টা করলে আমি কি বললুম। সে সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করলাম আমি। প্রাণপণে টেঁচিয়ে উঠলাম—“খস্কা, কোথায় গেলি রে খস্কা, আয় ত একবার এদিকে। ভয়ানক ত্যাঁদডামো করছে এ বেটা—”

তাড়াতাড়ি গিয়ে মাথায় কাপড় জড়াতে লাগল আর ভীত চকিত আঁখি দু'টি তুলে এধার ওধার দেখতে লাগল। তারপর ঝট ক'রে উঠে পড়ল শ্মশান-ভন্মের ওপর থেকে, ছুটে এসে দাঁড়াল আমার গদি ঘেঁষে। একগলা ঘোমটার ভেতর

থেকে ফিসফিস ক'রে বললে—তা'হলে ছেড়ে দিয়েছে ওকে ? পাগিয়ে আসতে পেয়েছে ও ? জল খেয়েছে, খুব জল খেয়ে নিয়েছে ত ? আঃ—” বলে দু'হাত দিয়ে নিজের গলাটা রগড়াতে লাগল ।

সবাই হাঁ ক'রে চেয়ে আছে ওর দিকে । আমিও একদৃষ্টে চেয়ে আছি ওর মুখের দিকে । একটু পরে আরও খানিক খুঁকে পড়ে ফিসফিস ক'রে বললে—“আমার কথা বলবেন না যেন আর তাকে । কিছুতেই বলবেন না । তা'হলে আবার ও ছুটে যাবে । আর আবার—” বলতে বলতে হঠাৎ থামল । তারপর দু'চোখ বুজে বার বার শিউরে উঠল । তারপর “উঃ মাগো” বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আন্তে আন্তে ঢলে পড়ল আমার গদির কিনারায় ।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল ময়না । এসে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার ক'রে উঠল—“ওগো, কি হবে গো ! দাদাবাবুকে কারা কোথায় আটকে রেখেছে গো ! আমাদের দাদাবাবু সেখানে জল জল ক'রে মরছে গো । ওরে বাবা গো, কি হবে গো—”

ময়নার সুর-চান। শেখ হবার আগেই সিধু ঠাকুর ভিড় তেলে সামনে এসে দাঁড়ালেন । ঠাণ্ডা মাসুখ সিধু ঠাকুর, নেহাতই ভাল মানুষ । হঠাৎ তাঁর চোখে মুখে সর্বান্নে যেন আগুন জ্বলে উঠল । মাথার ওপর দু'হাত তুলে হুংকার ছাড়তে ছাড়তে নাচতে লাগলেন তিনি :

“চলে আয় । মানুষ যদি কেউ থাকিস ত আয় আমার সঙ্গে । আমি জানি কোথায় সে গেছে । যাবার সময় ব'লে গেছে আমাকে । খস্তা ঘোষের হুন যদি কেউ খেয়ে থাকিস ত আয় আমার সঙ্গে । আজ সে হুনের দাম দিতে হবে ।”

সাড়া দিলে । খস্তা ঘোষের হুনের দাম দিতে তৎক্ষণাৎ দশজন ঠোঁট হয়ে দাঁড়ালো । দশখানা লাঠি সডকি বেরিয়ে গেল ভোমপাড়া থেকে । যাবার সময় শ্মশানে এসে শ্মশানভঙ্গ্য ছুয়ে শ্মশানকালীর নামে কি যে শপথ ক'রে গেল ওরা তা শ্মশানকালীই জানে ।

কিন্তু শ্মশানকালীও জানে না কি হবে এই মেয়েটার । হৈ হৈ কবতে করতে যে যার নিজের পথে পা বাড়ালে । ময়না ওকে তুলে আমার গদির এক কোণে ফেলে রেখে গেল । ওর সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার আর এতটুকু গরজ নেই কারও । খস্তা ঘোষ মরছে যে, স্বল জল ক'রে মরছে কোথাও । খস্তা ঘোষ উদ্ধারপন্থর ঘাটের দাদা, সকলেরই দাদা খস্তা ঘোষ । অনেক পুন খেয়েছে অনেকে খস্তা ঘোষের । আজ তার দাম দিতে ছুটল সকলে ।

সুত্তরায় রাজশয্যার এক কিনারায় পড়ে রইল সুবর্ণ । খস্তা ঘোষের অনেক

হুন্ আমার পেটেও গেছে। সেই হুনের নাম দেবার জন্তে আমি বলে রইলাম কাঠ হয়ে তার দিকে চেয়ে। হতভাগী হুমোতে লাগল নিশ্চিন্তে। খস্তা পালিয়ে আসতে পেরেছে, এসে খুব অনেকটা জল খেয়েছে, এ সংবাদ জেনে খস্তার প্রাণ-পাখী মহাশান্তিতে হুমিয়ে পড়ল মডার গদির ওপর। কে জানে কতদিন ও হুমোয় নি এভাবে। হুমোবে কি করে, খস্তা যে জল জল করে তিলে তিলে শুকিয়ে মরছিল!

ওর দিকে চেয়ে বসে থাকতে থাকতে দাঁত-বার করা খস্তার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলাম যেন। দিবারাত্র অষ্টপ্রহর এই মেয়ে মানসচক্ষে দেখতে পায় খস্তার সেই হতচ্ছাড়া রূপ। দেখতে দেখতে সে রূপের ছায়া পড়েছে ওর চোখে মুখে। হঠাৎ মনে হল, খস্তার চেয়ে সৌভাগ্যবান কে আছে এ দুনিয়ায়? জল জল করে তিলে তিলে যদি মরেও থাকে খস্তা ত তার মরণ সার্থক হয়েছে। মরবার পরেও সে বেঁচে আছে, বেঁচে রয়েছে স্ববর্ণর চোখে-মুখে, বুকের মধ্যে, বস্তুর সঙ্গে মিশে। সেখান থেকে কোনও যম তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না কোন দিন।

কিন্তু আর একজন?

আর একজনও যে গেছে খস্তার সঙ্গে।

তার কি হ'ল?

কেউ ভাবছে না তার কথা, তার কথা বারও মনেই পড়ল না। জানে না বোধ হয় কেউ যে চবণদাসও মবতে গেছে খস্তার সঙ্গে। তাকেও হয়ত বন্ধ করে রাখা হয়েছে খস্তার সঙ্গে। সে কিন্তু টেঁচাবে না জল জল ক'রে, টেঁচাবে না কারণ চবণদাস ত্যাগ করেছে জলশর্শ করা। স্বেচ্ছায় ত্যাগ কবেছে বাবাজী অন্নজল এবং সেও আর একটি নারীর জন্তে। তফাৎ হচ্ছে খস্তা যার জন্তে শুকিয়ে মরছে সে ছুটে এসেছে আগেই উদ্ধারণপুরের ঘাটে আর বাবাজী যার জন্তে স্বেচ্ছায় শুকিয়ে মরছে সে এখন জীবনের সুধাপাত্র হু'হাতে মুখে তুলে আরামে চুমুক মারছে আর একজনের বুকের কাছে শুয়ে।

কে যেন সজোরে মোচড়াতে লাগল আমার হৃৎপিণ্ডটাকে। অসহ্য যন্ত্রণায় হু'হাতে চেপে ধরলাম বুকেটা। মনে হ'ল যেন এখনই ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে আসবে নাক-মুখ দিয়ে আমার।

এক ফৌটা হাওয়া নে- উদ্ধারণপুর ঘাটের আকাশে। চতুর্দিক যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে আসছে। ক্রমে ক্রমে আধার হয়ে উঠছে হু'চোখ আমার। দম কেটে মারা যাব, শুধু এক ফৌটা হাওয়ার জন্তে দম কেটে মারা যাব উদ্ধারণপুর ঘাটের রাজশয্যার ওপর বসে।

উদ্ধারণপুরের রাত্রি ।

রাত্রি ছায়া দিয়ে গড়া কায়াহীন নিশীথিনী নয় ।

আঁখিতে স্বপন দেখার সূর্য্য প'রে যে রজনীরা হুনিয়ার বৃকে আসে যায়, সেই ছলনাময়ী অভিসারিণীরা উদ্ধারণপুরের ত্রিসীমানা মাড়ায় না ।

উদ্ধারণপুরের রাত্রি উলজিনী বিভীষণা অতি ক্ষুধার্ত রাক্ষসী । অস্থিচর্ম্মসার পেটে-পিঠে-লাগা ভয়ঙ্করী মূর্তি সে রাক্ষসীর । উদ্ধারণপুর ঘাটের পোড়া কয়লার চেয়ে হাজার গুণ বালো তার রঙ, কোটরে-বশা দুই ক্ষুধার্ত চোখে অভল অন্ধকার । হাড়িসার হাত দু'থানা বিস্তার ক'রে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাক্ষসী শ্মশানময় । খুঁজছে, হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যদি কিছু হাতে ঠেকে ত টপ করে ধরে মুখে পুরে ফেলবে ।

উদ্ধারণপুরের রাত্রি কাঁদছে । ক্ষুধাব জ্বালায় হিসহিস করে কাঁদছে । কাঁদছে আব এগিয়ে আসছে আমার গদির দিকে । হাতডাতে হাডাতে এগোচ্ছে । অন্ধ রাত্রি ভাগ্যে দেওতে পায় না । পেলো অনেক আগেই গিলে ফেলত আমাদের । অবশেষে এসে পৌঁছে গেল । গদির সামনে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে হাডাতে লাগল । আরও এগিয়ে আনলে মুখথানা, খানিক নিচু হ'ল । স্পষ্ট শ্বাস পড়তে লাগল আমার মুখের ওপর । দম বন্ধ হয়ে গেছে আমার, নির্নিমেষ চক্ষু চেয়ে আছি ওব চোখের দিকে । কালো কয়লার চেয়ে হাজার-গুণ কালো উদ্ধারণ-পুরের রাত্রির দুই কোটরে বশা চক্ষু, চক্ষু ছুটিতে ক্ষমাত'ন ক্ষুধা ধিকিধিকি জ্বলছে ।

জলে উঠল একটা ক্ষমাত'ন প্রতিহিংসা আমার বুকের মধ্যে । চরণদাস তোমা'য় ক্ষমা করতে পারে, না, বিশ্বাস করতে পারে সে যে কোনও ঐশ্বর্য্য তুমি করতে পাবে । কিন্তু আমি—আমি বসে থাকি উদ্ধারণপুর ঘাটের মডাব বিছানার ওপর । এতটুকু রসকস নেই আমার গদিতে, এক ফোঁটা রসও নেই আমার দেহ-মনে কোথাও । চরণদাসকেও তুমি ফাঁকি দিয়েছ, আমায় দিতে পারবে না । আসতেই হবে তোমা'য় এখানে, ফিরে আসতেই হবে । উদ্ধারণপুরের ঘাট ক্ষমা করতে জানে না, চিতাভস্মের সাদর আমন্ত্রণ অলঙ্ঘনীয়, অমোঘ । পালিয়ে থাকবে তুমি কত কাল ? অন্নজল ত্যাগ ক'রে মরেছে চরণদাস, কিন্তু আমি মরব না । যুগ যুগ ধরে বসে থাকব আমার এই গদির ওপর, আব ব'য়ে চলবে ঐ গন্ধা, আর ব'য়ে চলবে কাল । তজ্রাহারা জেগে রব আমরা তিনজন তোমার জন্তে । তার-পর তুমি ফিরে আসবে একদিন, আসবে ঐ সিঁদৌ গিন্নীর মত হয়ে । নাক টোঁট হাতের আঙ্গুল কিছু থাকবে না । রক্ত-মাংসের গরবও থাকবে না তোমার সেদিন ।

লোকে ভোমার কুকুরের মত দূর দূর করে খেদাবে। যতক্ষণ না তা দেখছি এই চক্ষে, ততক্ষণ নড়ছি না আমি গদি ছেড়ে।

ব'য়ে চলল গজা, ব'য়ে চলল কাল, ষিকিখিক জলতে লাগল প্রতিহিংসার আগুন আমার বৃকের মধ্যে। আর উদ্ধারণপুরের রাত্রি হিসহিস ক'রে কঁদে ঘুরে বেড়াতে লাগল শ্মশানময়। অন্ধ রাত্রি হাতড়ে বেড়াতে লাগল যদি কিছু জোটে হাতের কাছে। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে লাগল খস্তা ঘোষের সুবর্ণ আমার গদির এক কোণে শুয়ে, আর রাতজাগা পাখীরা প্রহরে প্রহরে ঘোষণা ক'রে চলল গজার এপারে ওপারে উঁচু গাছের ডালে বসে। তারপর বড় সড়কের ওপর হুস করে একটা আওয়াজ হ'ল। একটা দমকা হাওয়া যেন ছুটে চলে গেল বড় সড়কের ওপর দিয়ে। একবার একটু চমকে উঠলাম। তারপর আবার চোখ বুজে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। বসে বসে শুনতে লাগলাম মুহূর্তগুলি। খস্তা ঘোষ আব চরণদাসও হয়ত ঠিক এই সময় এইভাবে মুহূর্ত শুনতে শুনতে এগিয়ে আসছে। এক বিন্দু জলের জন্তে তিলে তিলে মরছে ওবা। মরছে অতি তুচ্ছ কারণে। মরছে একটা নারী-দেহের জন্তে, যে নারী-দেহটা প'ড়ে রয়েছে আমার ডান পাশে ঠিক দু'হাত দূরে।

আচম্বিতে ভয়ানক রকম চমকে উঠলাম। সত্যিই যেন কার তপ্ত শ্বাস পড়ল আমার মুখের ওপর। আরও জোরে দু'চোখের পাতা টিপে রইলাম।

কয়েক মুহূর্ত পরেই কানে গেল, স্পষ্ট কানে গেল হিসহিস শব্দ, কে যেন বললে—“গোসাঁই, আমি এসেছি।”

প্রাণপণে বুজে আছি দুই চোখ। কিছুতেই খুলব না। খুললেই ভুল ভেঙ্গে যাবে। দেখতে হবে উদ্ধারণপুরের রাত্রির কোটর-বসা দুই চক্ষের অভলম্পর্শ অন্ধকার।

তারপর কানে গেল খসখস শব্দ। ভারী গরদের কাপড় প'রে একটু নড়াচড়া করলে যে রকমের শব্দ হয় সেই রকম শব্দ গেল কানে। মনে হ'ল যেন কে বসে পড়ল একেবারে আমার কোল ঘেঁষে। হঠাৎ উগ্র গোলাপ ফুলের গন্ধে ছেয়ে গেল বাতাস। এবার একেবারে কানের কাছে শুনতে পেলাম, কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বলে উঠল—“গোসাঁই, আমি এসেছি। পালিয়ে এসেছি আমি। চোখ খুলবে না গোসাঁই?”

কিছুতেই না, কিছুতেই খুলব না চোখ আমি। শব্দশয্যায় চড়ে বসে আছি আমি, আমার সঙ্গে কোনও চালাকি চলবে না। কোটরে বসা চক্ষুর অভলম্পর্শ

চাহনিতে যেমন আমি ভয় খাই না, তেমন ফুলের গন্ধে বা কান-জুড়োনো ভাক দিয়েও আমাকে ভোলানো যাবে না। বছরের পর বছর শব্দশব্দ্যার ওপর বসে সাধনা করে যে সিদ্ধিলাভ করেছি আমি, অত সহজে সে সিদ্ধিকে টলানো যায় না।

তখন আরম্ভ হ'ল গান। গুনগুন ক'বে গান আরম্ভ হ'ল আমার কানের কাছে।

“বঁধু হে—নয়নে লুকায়ে থোব।

প্রেম চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,

হৃদয়ে ভুলিয়া পব ॥

তোমায় নয়নে লুকায়ে থোব ॥

শিশুকাল হৈতে, আন নাতি চিত্তে—

ও পদ কবেছি সাব।

ধন জন মন, জীবন যৌবন,

তুমি সে গলার হাব ॥

শয়নে স্বপনে, নিদ্রা ভাগ্যপে

কভু না পাসরি তোম'।

অবলাব ক্রটি, হয় শত কোটি—

সকলি করিবে ক্ষমা ॥”

ঠাণ্ডা আমাব দুই গালের ওপর সাঙা দু'খানি হাত এসে পড়ল। দু'হাত দিয়ে কে যেন চেপে ধ'লে আমাব মুখখানা। তখন চাইতেই হ'ল চোখ। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে ধ'লে ফেনলাম তার হাত দু'খানা। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়েও দিলাম তটস্থ হয়ে। একি। কার হাত ধ'লাম আমি? এত গরম গাটি স্নেহ হাত দু'খানি কার?

অন্ধকারের মধ্যে তীব্র দৃষ্টিতে খেঁয়ে বইলাম তার মুখের দিকে। মুখখানা তখন আমার মুখ থেকে মাত্র এক বিঘা তফাতে এসে গেছে। দু'হাতে আমার মুখখানা ধবে সে রুদ্ধনিশ্বাসে চেয়ে আছে আমার চোখের দিকে।

কিন্তু একি। কাব মুখ এ। নাকের পাশে জলজল করছে ওটা কি? নিশ্চয়ই ওটা চৌরুর নাকছাবি। কপালের ওপর ঝুলছে ওটা কি? সিঁথির ওপর দিয়ে নেমে এসেছে একটা চকচক চেন, তার নিচে ঠিক কপালের ওপর একখানি টিকলি ঝুলছে। খুব ছোট ছোট উজ্জ্বল পাখব অনেকগুলো লাগানো রয়েছে টিকলিতে। দুই কানেও ঝুলছে দুটো গয়না, এত অন্ধকারেও তা থেকে আলো ঠিকরে বেরচ্ছে, গলাভেঙে যেন কি একটা দেখা যাচ্ছে। কে এ। কাব তপ্ত শ্বাস পড়ছে আমার মুখের ওপর?

ধীরে ধীরে আবার নড়ে উঠল ঠোট দু'খানি। আবার কানে গেল—“গোসাঁই আমি এসেছি। পালিয়ে এসেছি গোসাঁই। আর পারি না আমি, আর পারি না। চল গোসাঁই, পালিয়ে চল এখান থেকে। তোমায় নিতে এসেছি। তোমায় নিয়ে পালিয়ে যাব।”

অজ্ঞাতে খুব চুপি চুপি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—“কোথায়?”

আরও কাছে সরে এল মুখখানি, প্রায় ঠেকল এসে আমার মুখের সঙ্গে।

আরও চুপি চুপি বলল সে—“যেখানে দু'চক্ষু যায়। যেখানে মাহুঁষ নেই। যেখানে কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি থাকব সেখানে। সেখানে কেউ কাঁদবে না, কেউ মরবে না, কেউ কাউকে হিংসা করবে না, কারও জন্তো কারও জিত দিয়ে জলও পড়বে না। সেখানে মড়ার বিছানার ওপর চড়ে বসে থাকতে হবে না তোমায়, গলগল ক'রে গিলতে হবে না ওই বিষগুলো। আমাকে সাত দরজায় লাখি ঝাঁটা খেয়ে ঘুরে মরতে হবে না। সাতজনের মন যোগাতে হবে না। হাজার হাজার হাংলা চোখের চাউনির ছোঁয়াচ লাগবে না আমার গায়ে। চল গোসাঁই চল, আর দেরি করা নয়, ঐ দেখ ফিকে রঙে ধরছে গঙ্গার ওপারে।

বলতে বলতে—আমার মুখ ছেড়ে দিয়ে হাত দু'খানা চেপে ধরলে। গঙ্গার ওপারের আকাশে তাকলাম চোখ তুলে। চোখ নামিয়ে ভালো করে চেয়ে দেখলাম সামনে-বনা মূর্তিটির দিকে। তারপর আস্তে আস্তে হাত দু'খানা ছাড়িয়ে নিলাম।

অপরূপ ভঙ্গিমায় হাঁটু গেড়ে বসেছে আমার সামনে। হাঁটু দুটি ঠেকে আছে আমার কোলের সঙ্গে। মুখখানি ঝুঁকে পড়েছে। ছোট্ট কপালখানিতে চন্দন দিয়ে আলপনা আঁকা রয়েছে। মাথার মাঝখানে সিঁথি কেটে বেগী ঝুলিয়ে দিয়েছে পিঠে। সিঁথির ওপর দিয়ে এসেছে টিকলি। বোধ হয় এতক্ষণ ঘোমটা দিয়েছিল, তাই কাপড়ের ঘষায় অনেকগুলি চূর্ণ কুস্তল এসে পড়েছে কপালের ওপর। অসম্ভব কালো চোখের দুই কোণায় খুব সরু করে টেনে দিয়েছে কাজল। প্রায় কাঁধের ওপর ঠেকছে দু'কান থেকে ঝোলানো দুই কুমকো। নাকছাঁবি থেকে যে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে তাইতে মুখের ঝাঁ দিকটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। হাঁ, মানিয়েছে বটে, সব কিছু এমনভাবে মানিয়েছে যে মনে হ'ল এই সমস্ত বাদ দিয়ে ওকে ভাবাই যায় না। ওর পিছন দিক আরও পরিষ্কার হয়ে উঠল। নজর পড়ল ওর গলায়। পর পর তিনটি সরু দাগ ওর গলায় স্তম্ভিকর্ভাই এঁকে দিয়েছেন। তার নিচে থাকে তিন ফের খুব সরু তুলসীর মালা। এখন সেই মালার ওপর চড়েছে সোনার টিক, নানা রঙের পাথর

বলানো। ভারপর নেমেছে সাতনরী বুকের ওপর। বুকের অনেকটা অংশ খোলা, বুকা বেশ ওঠানামা করছে।

বাস্তব হয়ে বুকের ওপর কাপড়টা একটু টেনে দিল। খুব মিষ্টি করে হেসে বেশ একটু জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—“অত করে কি দেখছো গো?” এবার আবার আমার দৃষ্টি উঠে এল ওর চোখের ওপর। চোখের দৃষ্টিতে কি রকম একটা মাদকতা।

সুকনো গলায় একটা ঢোক গিলে বললাম—“না, এমনিই। বেশ মানিয়েছে কিন্তু সই তোমায়।”

বোধ হয় একটু লজ্জা পেলে। মুখখানি ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর। পরমুহুর্তেই একেবারে ধড়ফড়িয়ে উঠল। ওর দু’হাতের গয়নাগুলো উঠল বেজে। থপ করে আবার ধরে ফেললে আমার হাত দু’খানা। ধরে টানাটানি শুরু কবলে—“ওঠ গোঁসাই ওঠ। আর দেরি নয়। এখনি সবাই জেগে উঠবে। মানুষজ্ঞান এসে পড়বে এখানে। এইসব নিয়ে আমি লুকোব কোথায়? চল গোঁসাই, আধার থাকতে থাকতে পালাই—”

আর বলতে দিলাম না। খুব আস্তে আস্তে আবার জিজ্ঞাসা কবলাম—“কোথায়? কোথায় লুকোবে সই মুখ তোমার?”

আকুল কণ্ঠে বলে উঠল—“যেখানে তুমি নিয়ে যাবে গোঁসাই, যেখানে তুমি লুকিয়ে রাখবে আমায়, সেখানেই লুকিয়ে রাখব এ মুখ, শুধু তুমি ছাড়া কখনও আর কেউ দেখতে পাবে না এ মুখ আমার। চল গোঁসাই, ঐ দেখ আলো হয়ে উঠল যে—”

নেমে পড়ল গদি থেকে। নেমে টানতে লাগল আমার দু’হাত ধরে। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলাম না। শুধু একটু শক্ত হয়ে চেপে বসলাম। একটু শক্ত করে ধীরে ধীরে উচ্চারণ কবলাম ওব চোখেব দিকে চেয়ে—“কিন্তু তিনি তোমাষ ঠিক খুঁজে বার করবেন।”

বেশ চমকে উঠল। খামল হাত টানাটানি, কিন্তু হাত ছাড়লে না। থতমত থেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—“কে। কে আবার খুঁজতে বেরোবে আমায়?”

চোখ দু’টির দিকে চেয়ে আছি। অকপট উৎকর্ষ উপচে পড়ছে সেই আশ্চর্য চোখ দু’টি থেকে। বললাম—“তিনি, যিনি এত সব গয়না কাপড় ঢেলে দিয়েছেন তোমার পায়ে।”

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দু’হাত নাড়তে লাগল আমার চোখের সামনে।

“না, না, না গোঁসাই। এই সব গয়নাগাটি এমনি আমি পেয়েছি। তাদের

পদ্মার সাথ হইছিল তাই আমার পরিয়ে দিয়েছে। এ সব আর ক্ষেত্র নেবে না তারা। তাদের অনেক আছে—”

ধুবুরিস্নেহে রসিয়ে বললাম—“আহা, আমি কি বলছি নাকি যে তাদের আর নেই! আছে বলেই ত তোমার পরাবার সাধ হয়েছে! তবে সাধ ত আর এক রকমের নয়। আরও নানা রকমের সাধও ত তাদের মনে উথলে উঠতে পারে—”

কিছুতেই বলতে দেবে না আমার, কানেও তুলবে না আমার কথা। আমার জড়িয়ে ধরলে আমার একখানা হাত। তারপরই পিছন ফিরল। আমার হাতখানা ওর ডান বগলের ভেতর দিয়ে গিয়ে ওর বুকের সঙ্গে রইল চেপে ধরা। টেনে নিয়ে চলল একেবারে।

“কোনও কথা শুনব না আমি আর। চুলোয় যাক লোকের সাধ-আহ্লাদ। আগে পালাই চল এখান থেকে। তারপর দেখা যাবে কে কি করতে পারে আমাদের!”

সত্যিই এবার টানের চোটে নামতে হ’ল গদি থেকে। নেমে দাঁড়িয়ে আর এক হাতে ধরলাম ওর কাঁধ। ধরে থামলাম ওকে। বললাম—“কিন্তু আমার নিয়ে গিয়ে লাভ হবে কি তোমার সই? এত সব গয়না কাপড় আমি পাব কোথায়? কি দিয়ে মন যোগাব তোমার?”

ঘুরে দাঁড়ালো, মুখখানি তুলে কষেকটি মুহূর্ত চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে। কি অদ্ভুত চাউনি। পাথর গলিয়ে জল ক’রে দিতে পারে ওই চাউনি দিয়েই! সাধে কি আর মানুষ ওকে এত জিনিস দিয়ে সাজায়।

থরথর করে কাঁপতে লাগল ঠোঁট দুখানি। দুই আঁখির লম্বা পল্লবগুলোও যেন একটু কাঁপল। আমার বুকের সঙ্গে এক রকম মিশে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে তুলে আছে মুখখানি ওপর দিকে। কানে গেল—“গয়না কাপড়ের দাবি করব আমি তোমার কাছে? তোমার চেয়ে এগুলোর দাম আমার কাছে বেশী হবে? তোমায় নিতে এসেছি আমি সোনা-দানার লোভে?”

আর বলতে পারলে না। ভেতর থেকে কি যেন একটা ঠেলে উঠে ওর গলার ভেতরে আটকে গেল। শুধু চেয়ে রইল আমার দিকে মুখ তুলে, আর চোখ দুটো ভর্তি হয়ে এল।

ওর মুখের ওপর থেকে নজর সরিয়ে গঙ্গার অপর পারের আকাশের দিকে চাইলাম। অন্ধকার লালচে হয়ে উঠছে।

আর সেই দৈব লালচে আকাশের গায়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম চরণদাসের শুকনো মুখখানা। স্পষ্ট শুনতে পেলাম যেন বাবাজী বলছে—“যদি সে কোনও

দিন ফেরে ত ভাকে বোল যে, শেষ সময় পর্যন্ত এ বিশ্বাস আমি কুকে রাখতে পেরেছি যে, সে কোনও ছোট কাজ করতে পারে না।”

লালচে পূব আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হ’ল কে যেন ওখানে লুকিয়ে বসে ভেংচি কাটছে। আন্তে আন্তে লালচে হয়ে উঠল আমার মনের ভেতরটা। আগমবাগীশ ঐ সামনের ওখানটায় ঝাঁপ দিয়ে বৈচেছে। চরণদাস বলে গেল—এই ত বেশ আছি, শুধু জল খেয়েই কাটাব—যতদিন না সে ফেরে। আর খন্ডা ঘোষ জল জল করে শুকিয়ে মবছে হয়ত এতক্ষণে। সিন্ধী গিন্নীর নাক-স্টোঁট খসা মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে স্বৰ্ণ ঐ গদির ওপর শুয়ে। আব আমার বুক ঘেঁষে মুখের কাছে মুখ তুলে ধরে জবাবের জন্তে একজন চেয়ে রয়েছে, চোখে জল টল টল করছে।

এবং এত কাপড় গয়না সোনাদানা ঢেলে দিয়েও যে ওকে ধবে রাখতে পারল না, সে এতক্ষণে কি করছে তাই বা কে জানে?

আন্তে আন্তে টেনে নিলাম হাতখানা। আন্তে আন্তে দু’পা পিছিয়ে গিয়ে গদিব কিনারায় ৮ পড়লাম। বসে আব একবার আপাদমস্তক দেখলাম ওর। ওর নজর তখনও স্থির হয়ে বয়েছে আমার ওপর। তারপর বললাম।

বললাম—“এত চট করে শখ মিটে গেল? না, পাঁচিষে এলে এই সব সোনাদানা নিয়ে? এবং সোনাদানার লোভ দেখিয়ে আমাকে গিলতে পার কিনা তাই দেখতে এলে? সেই কুমার বাহাদুরেব সঙ্গে পরামর্শ করে আসনি ত? যাক, সেজেছ ভাল। পছন্দ আছে বলতে হবে কুমার বাহাদুরেব। এত কিছু দিয়েছে যখন তখন মন্দ করনি ওর অন্দরমহলে তুকে। মকক গে বেটা চরণদাস শুকিয়ে। আর সে ত কাষমনোবাক্যে বিশ্বাস করে বসে আছে যে কুমার বাহাদুরেব অন্দরমহলের ভেতর বসে তুমি শুধু নামজপ কবে দিন কাটাচ্ছ। হা হা হা হা হা হা—এখন যদি একবার দেখাতে পারতাম তাকে তোমার সোনাদানা গয়নাগাঁটিব বহব। হা হা হা হা হা হা—এ সমস্ত শুধু নামজপ করেই পাওয়া যায়—অন্দরমহলের ভেতর বসে—হা হা হা হা—” দুলে দুলে অট্টহাসি হাসতে লাগলাম।

হাসতে লাগলাম গলা ছেড়ে। তারপর দম ফুরিয়ে গেল। তখন চেয়ে দেখলাম ওর দিকে। জলে উঠেছে ওর দুই চক্ষু। শানদেওয়া ইম্পাতের মত দেখাচ্ছে ওর চেহারাখানা। মাল্লুষটাই যেন আবও খানিক লম্বা হয়ে গেল। তুক কুঁচকে ঘাড় বঁকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে। দু’টো আঙুলের শিখা বেরিয়ে আসছে ওর দুই চোখ থেকে। বেশ জ্বালা ক’রে উঠল আমার চোখ মুখ।

তবু ছাড়লাম না। শেষ কথাটুকু ভালো করে শেষ করার অন্তে আবার আরও-
করলাম।

“মনে পড়ে তোমার সই—আগে আগে প্রায়ই বলতে—তোমার ঐ রক্তমাংসে
গড়া দেহটা পুড়িয়ে আগুয় করে নেবার কথা। তখন নাকি তোমার বিষ লাগত
কেউ তোমার দিকে চাইলে। হায় রে হায়, সেই রূপকে কি সাজেই সাজিয়েছে
কুমার বাহাদুর! এখন একবার পরামর্শ করে এস না গো তোমার বাবুর সঙ্গে,
পুড়িয়ে আগুয় করে নিলে তাঁর মন উঠবে কি না! এ ত আর হতভাগা চরণদাস
নয়, শুধু একটা একতারা সখল ক’রে ঘুরে বেডাত তোমায় আগলে। তাই তোমার
পোডাতে ইচ্ছে করত রূপ। আজ কপের দাম দেবার লোক জুটেছে। তবু তোমার
মন উঠছে না কেন গো সই, তবু তোমার—”

হঠাৎ ঝট করে ছিটকে এসে পড়ল সাতনরী ছড়া আমার গদির ওপর।
তারপর টিকলিটা, তারপর কতকগুলো চুড়ি বালা কঙ্কণ তাবিজ বাজু, তারপর
গলার চিকটা। অবশেষে চন্দ্রহারটা। পাগলের মত টেনে টেনে খুলতে লাগল
সব গা থেকে আর ছুঁড়ে মারতে লাগল আমার গদির ওপর। স্ববর্ণ গায়ের পড়ল
অনেক কিছু। খডমডিয়ে উঠে বসে মেয়েটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ওর
দিকে। ততক্ষণে একটানে একটা কান থেকে স্কুমকো খুলে আনলো। দবদরিয়ে
রক্ত গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। আর সহ্য হ’ল না, লাফিয়ে নামলাম গদির ওপর
থেকে। দেখেই মারলে দৌড়। খপ কবে ধরে ফেললাম ওর কচি কলাপাতা-
রঙের বেনারসী জরির কাজ-করা আঁচলটা। সঙ্গে সঙ্গে তিন পাক ঘুরে অনেকটা
দূরে চলে গেল। কাপড়খানি এক খুঁট রইল আমার হাতেব মুঠোয় আর বাদ-
বাকীটা লম্বা হয়ে পড়ে রইল উদ্ধারণপুরের ভবের ওপর। আর অনেকটা দূরে
ঝড়িয়ে ছুথের মত সাদা থান-পরা এক কালসাপিনী ঘাড় বেকিয়ে চেয়ে রইল
আমার হতভম্ব মুখের দিকে।

চিল-চেলিয়ে উঠল স্ববর্ণ—“রাঙাদিদি গো, আমার ফেলে পালিও না গো।”
বলেই গদি থেকে লাফিয়ে পড়ে দিল দৌড়। দৌড়ে গিয়ে হু’হাতে জাপাট ধরলে
তার রাঙাদিদিকে।

রাঙাদিদিও ওকে হু’হাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে অগ্নিবর্ণ করতে লাগল হু’-
চোখ দিয়ে আমার ওপর।

এগোলাম সামনের দিকে। ছু’পা না ফেলতেই একটা কান-ফাটানো চিংকার
—“খবরদার—আর এক পা এগিও না, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।”

খামল আমার পা, একেবারে গেড়ে বসে গেল মাটিতে। কানে এল—“এ।

এল কি করে গোসাঁই তোমার গদির ওপর ?”

জবাব দিলাম তৎক্ষণাৎ—“সে উত্তর তোমার দিতে বাধ্য নই আমি।”

“অ—আচ্ছা, চলে আয় সুবর্ণ।” বলে মেয়েটাকে জড়িয়ে নিয়ে সামনে পা বাড়ালে।

ছুটে গিয়ে দু’হাত মেলে দাঁড়ালাম সামনে।

“না পারবে না ওকে নিয়ে যেতে। ছেড়ে দাও ওকে। ও ভাল ঘরের মেয়ে, তোমাকে ছোঁয়াও ওর পাপ।”

চোখ দুটো আরও ছোট ছোট করে চাপা গলায় বললে—“অ—আর তোমার ঐ মডার চ্যাকডার ওপর শুয়ে রাত কাটানো বুঝি পাপ নয়? আমিই ওকে পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে। কিন্তু সে অস্বস্তি কারণে। তুমি যে ওকে গ্রাস করবে তা বুঝতে পারিনি।”

জোর করে মেয়েটাকে নিজের গা থেকে ছাড়িয়ে ঠেলে দিলে আমার দিকে—
“আচ্ছা, এই নাও—”

সুবর্ণ আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বকের ওপর।

“রাঙাদিদি গো—”

তখন বার দুয়েক তাকাল তাঁর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে আর মেয়েটার মুখের দিকে। তাবপব মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে পা বাড়ালে সামনে।

আমাব মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—“কোথায় চললে ওকে নিয়ে ?”

তৎক্ষণাৎ জবাব পেলাম—“যেখানে খুশি। ও নিজে ইচ্ছা করে চলেছে আমার সঙ্গে। পার ত রোক না,—দাঁড়িয়ে আছ কেন? সে জোর আর তোমার নেই গোসাঁই, সব এই শ্মশানের চিতায় পুড়িয়ে বসে আছে। দাঁড়াত-দিন মনে করতুম মডার গদি-বিছানায় বুঝি জ্বালা নেই। মনে করতুম মডার গদিতে চেপে যে বসে আছে তার বুকটাও বুঝি ঐ বিছনার মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আজ দেখলাম তা নয়। ওই ছাই-ভস্ম গয়নাগুলোই আগুন জ্বালালে তোমার বুক। আচ্ছা এইবার বসে বসে পোড়ো নিজের আগুনে—”

আবার পা বাড়ালে সামনে।

এই পাশে সরে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে করে দাঁড়ালাম না, কে যেন ঠেলে দিলে আমার এক পাশে। ঠিক দু’হাত সামনে দিয়ে চলে গেল। অনেক চেষ্টায় পেছন থেকে বলতে পারলাম : “যেও না নিতাই, ফের।”

আরও অনেকটা এগিয়ে গিয়ে কিরে দাঁড়ালো। পূর্ব আকাশ থেকে চোখ-খাখানো লাল আলো এসে পড়ল ওর মুখ-চোখের ওপর। যেন জ্বলছে ওর রূপ।

বীর শাস্ত কঠে বললে—“না গোঁসাই, আর নয়। যা পাবার আমি শেয়েছি। আমি যদি অপরের দেওয়া গয়নাগাটি পরি বা কারও অঙ্গরমহলে গিয়ে ঢুকি তা’হলে যে তোমার বুক পুড়ে যায়—এইটুকু ত জানতে পারলাম। এই আমার সব পাওয়ার বড় পাওয়া হ’ল। আর কখনও জ্বালাতে আসব না তোমায়। প্রেতের দৃষ্টি তোমার চোখে। মরণের ওপার থেকে জীবনকে দেখে তুমি। শুধু সন্দেহ আর অবিশ্বাস আর মনগড়া মিথ্যে অভিমান। আচ্ছা, ওই সব নিয়ে শাস্তিতে বসে প্রেতের রাজত্ব চালাও তুমি—”

বলতে বলতে চলে গেল। মিলিয়ে গেল নিমগাছটার আড়ালে ওরা দু’জন। পাথরের মত দাঁড়িয়ে দেখলাম।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

রঙতামাসার ঠাট।

ঠাট দেখে সাদা হাড় আর কালো কয়লায় গা টেপাটেপি করে হাসে। শেয়ালে শকুনে ভেঁচি কাটে। কুকুরগুলো আকাশের দিকে মুখ তুলে বাহবা দেয়। আর উদ্ধারণপুরের আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দিয়ে যারা লুকিয়ে থাকে তারা তাদের অস্থিসার হাতে খট খটা খট্ তালি বাজায়।

তালি বাজায় উদ্ধারণপুরের ওস্তাদ বাজিকর। এক দো তিন—আসমান থেকে একে একে আমদানি হয় রসদ। চিতায় চিতায় ভিমান চড়ে যায়। রাস্তাঘরে কাঁধে করে কাঠ বয়, তার বউ-টাকা গুনে আঁচলে বাঁধে। ধোঁয়ায় কালো আঁধার হয়ে ওঠে উদ্ধারণপুরের আকাশ। নবরসের রসায়নাগারে পুরোদমে শুরু হয়ে যায় রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হাড় মাস মেদ মজ্জা পুড়িয়ে পুড়িয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়। কোথায় গেল সে? হাসি-কান্না আশা-আকাজ্জা দেবত্ব-পিশাচত্ব দিয়ে গভা যে ছিল ঐ খাঁচার মধ্যে, সে গেল কোথা? খোলস ছেড়ে লুকোলো কোথায় কাল-সাপটা?

খোলস পুড়তে থাকে। উদ্ধারণপুরের চিতার ক্ষুধা কিন্তু মেটে না কিছুতে। আসল মাল চায়। আসল মাল ত আসে না উদ্ধারণপুরের ঘাটে। উদ্ধারণপুরের বাজিকর তুড়ি দিয়ে যা আমদানি করে তার ওপর-ভেতর ফক্কির। উদ্ধারণপুর ঘাটের পশ্চিমে বড় সড়ক। বড় সড়ক দিয়ে আসে যায় আসল মালেরা। খোলস ছাড়লে খোলসটা নেমে আসে উদ্ধারণপুরের ঘাটে পুড়তে।

কিন্তু এল। হস করে একটা আওয়াজ হ’ল বড় সড়কের ওপর। থামল

এসে একথানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী। তারপর তারা নেমে এল; নিম্নগাছটার এখানে আসতে চিনতে পারলাম। স্বয়ং কুমার বাহাদুর। হাঁ—আসল মাল্‌ই বটে। কিন্তু ওটিকে? কতগুলি মনের মানুষকে মনের মত করে সাজান কুমার বাহাদুর? নাঃ—শখ আছে বটে, শখ আর সামর্থ্য দুইই আছে! যাকে পাচ্ছে তাকেই সাজাচ্ছে পটের বিবির মত। কিন্তু এখানে আবার কেন? আর ত কেউ নেই এখানে যে ধরে নিয়ে গিয়ে সাজাবেন। যাক্, ভালোই হ'ল। গয়না-গুলো আর কাপড়খানা ফিরিয়ে নিয়ে যাক্। আবার কোনও মনের মানুষ ছুটলে তাকে সাজাবে মনের মত ক'রে। বেশ ক'রে সমঝে দিতে হবে শুঁকে যে এবার যেন একটু বুঝেবুঝে মনের মানুষ পাকড়াও করেন। পাখীকে সোনার শেকল পরালেও সে তা কাটবেই।

আরে একি! দামী সাজ-পোশাক স্ফুটাই যে লুটিয়ে পড়ল হুঁজন আশানভঙ্গের ওপর। খামকা এত ভক্তি চাচ্ছে কেন শুকনো ভাষে?

প্রণাম সেরে গলায় আঁচলস্বন্ধ জোড়হাতে দাঁড়ালেন কুমারের সঙ্গিনী। খুব মুহূ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—“বাবা, মাতাজী কোথায়? তাঁকে দেখছি না ত!”

মাতাজী!

ভুলে ফুঁকে চেয়ে রইলাম তাঁদের মুখের দিকে। এক পা এগিয়ে এলেন কুমার। বললেন—“খুব ভোরে আমরা তাঁকে নামিয়ে দি এখানে। ঐ বাজারের ওধারে গাড়ী নিয়ে আমরা বসেছিলাম। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন সেই রকম। আপনাকে তিনি আশান থেকে বার করে নিয়ে যাবেন, তারপর আপনাদের হুঁজনকে আমরা নিয়ে যাব।”

যতদূর সম্ভব গলা থেকে বাঁজটা তাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—“কোন্ চুলো?”

খতমত খেয়ে গেলেন কুমার। কিন্তু তাঁর সঙ্গিনী গ্রাহ্য করলেন না কিছু। সেইভাবে জোড়হাতে বলতে লাগলেন—“মাতাজীর কাছে কামনা জানালাম যে অন্তত একটিবার আপনার চরণের ধুলো আমাদের সংসারে পড়া চাই। আপনার দয়াতেই আমাদের ভাড়া সংসার জোড়া লাগল। আপনাকে দেখে, মাতাজীর মুখ থেকে আপনার কথা শুনে আমার স্বামীর চোখ ফুটল। তাই একটিবার আপনাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব আমরা—এই প্রার্থনা জানালাম মাতাজীর কাছে। তাঁর দয়া হ'ল, নিজেই এলেন আপনাকে নিতে। তিনি ছাড়া আর কারই বা সাধ্য হবে আপনাকে আসন থেকে তোলবার? কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেল যে! আর থাকতে না পেরে আমরাই নেমে এলাম। মাতাজী গেলেন কোথায়?” এধার ওধার চেয়ে খুঁজতে লাগলেন হুঁজনে তাঁদের মাতাজীকে।

গম্বির ওপর ছড়ানো গয়নাগুলো তখন নজরে পড়ে গেল ঈদের। ঘরের চালের ওপর ফেলে রেখেছিলাম শাড়ীখানা। সেখানাও এতক্ষণে দেখতে পেলেন ঈরা। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে চাইলেন। তারপর বোবা হয়ে চেয়ে রইলেন আমার চোখের দিকে।

ঈদের মুখের অবস্থা দেখে ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল। আর সামলাতে পারলাম না, হা হা করে হেসে উঠলাম।

সেই নৃশংস উল্লাস দেখে দু'জোড়া চোখে ফুটে উঠল আতঙ্ক। একটি বাক্যও বার হ'ল না কারও মুখ থেকে, ফ্যাল ফ্যাল কবে চেয়ে রইলেন দু'জনে আমার মুখের দিকে।

গয়নাগুলোর দিকে আঙ্গুল উচিয়ে হুকুম করলাম—“নিযে যাও এগুলো।”

চমকে উঠলেন কুমার—“নিযে যাব। কেন?”

বেশ রসিয়ে জবাব দিলাম—“আবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে তখন তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোর।”

কান্না উথলে উঠল কুমারের সঙ্গিনীর গলায়—“তাহ'লে কি মাতাজী আমাদের একেবারে ত্যাগ করে গেলেন? মাত্র কাল আমরা তাঁব কাছে দীক্ষা পেয়েছি, আর দু'টো দিনও তাঁকে ধরে রাখতে পারলাম না! কিছুই যে কবা হ'ল না তাঁর, কিছুই যে আমরা দিতে পাবলাম না তাঁকে।”

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাব দিকে তাকিয়ে ছদ্মুরের স্বে জিজ্ঞাসা করলেন কুমার—“কোথায় গেছেন তিনি?”

আরও চড়া গলায় জবাব দিলাম—“বলব কেন তোমাদেব?”

সমস্ত রক্ত চলে গেল কুমারের মুখ থেকে। চেষ্টা করে একটা ঢৌক গিললেন।

এক ঝলক আগুনের হলকা বার হ'ল তখন শ্রীমতীর মুখ থেকে।

“বলবেন না আপনি? কেন, কি অপরাধ করেছি আমরা? আমরা আপনাদের সন্তান, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছি আমরা। আপনি আমাদের গুরু গুরু। আপনাকে দেখে আমার স্বামী পাগল হয়ে উঠলেন। অমন স্ত্রীকে ত্যাগ করে কিসের টানে মানুষ প্রশানে বসে থাকে, প্রশানে বাস করে কি শাস্তি পান আপনি, এই সব চিন্তা করে উনি মানুষ হয়ে গেলেন। মাতাজী আমাকে গিয়ে ধরলেন আমার বাপের বাড়ীতে। আমাকে ফিরিয়ে আনলেন। স্বামী প্রশানবাসী হলেও স্ত্রী তাকে ছাড়ার মত আগলে থাকে কেন, তা বুঝতে পারলাম মাতাজীকে দেখে। আমার মনের কালি ঘুচে গেল। জন্মের মত বিদেয় নিজে ছিলাম স্বামীর সংসার থেকে। আবার ফিরে এলাম, এসে দেখলাম স্বামী মানুষ

হয়ে গেছেন। তখন হুঁজনে তাঁর পায়ে আশ্রয় চাইলাম। কাল আমাদের দীক্ষা হয়েছে। ঐ কাপড় ঐ গয়নাগাটি আমি তাঁকে আপন হাতে পরিয়ে দিয়েছি। আমাদের ভিখারিণী মা কিন্তু নিজের সাজ ছাড়লেন না। বললেন—দাঁও পরিয়ে এই সাদা কাপড়ের ওপরেই। এ আমি ছাড়তে পারব না। যদি কোনও দিন তাঁকে তুলে আনতে পারি শ্মশান থেকে, ছাড়াতে পারি তার গা থেকে মড়ার কাপড়, তবেই ছাড়ব এই ভিখারীর সাজ। বড় আশায় তিনি এসেছিলেন আপনাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে। কোথায় গেলেন তিনি? এভাবে আমাদের তিনি ভ্যাগ করে চলে যাবেন এ যে ভাবতেই পারি না। কার কাছে আর দাঁড়াব আমরা—”

এল হরি—হরি বোল।

আকাশ-নাটা ঢাকা উঠল বড় মড়কের ওপর। বজ্রার জ্বলের মত নেমে আসছে মানুষ। ডোমপাড়া ময়নাপাড়া আর বাজারের দোকানদাররা সবাই ছুটে আসছে, তাদের মাঝে আসছে মাথা উঁচু করে অনেকগুলো লাঠি। আব আসছে—

বল হরি—হরি বোল।

নিমগাছের এভাবে এসে গেছে। কে ও। কাকে আনছে ওরা? রাজার রাজা এলেও ত এত জাঁকজমক হয় না। নার আবির্ভাবে এভাবে খেপে উঠল উদ্ধারগপুরের মানুষ। এ কোন্ মহারাজাধিরাজ?

ছ হু করে চলে এল সমলে। সামনের লোক দু'পাশে সরে পথ ক' দিলে। সেই ফাঁক দিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালে চারজন আমার গদির সামনে। তাদের কাঁধে বাঁশ। বাঁশেব মাঝে ঝুলছে—রক্তমাখা কাপড় জড়ানো একটা জাহুর পৌটলা। টপ টপ করে রক্ত পড়ল কয়েক ফোঁটা শ্মশান-ভস্মের ওপর। তারপর ভিড়ের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সিধু ঠাকুর। আছড়ে পড়ল আমার গদির সামনে। আকাশটা চিরে গেল সিধু ঠাকুরের বুক-ফাটা চিংকারে—

“গোসাঁই বাবা গো—খস্মাকে নিয়ে এলাম গো আমরা—”

বাকীটুকু শোনা গেল না। শতকণ্ঠ একসঙ্গে ডুকে উঠল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাহাকার ক'রে উঠল উদ্ধারগপুরের শেয়ালগুলো, বিকট গর্জন করতে লাগল শ্মশানের কুকুৎগুলো, নিশ্ফল আক্রোশে শব্দগুলো ডানা ঝাপটাতে লাগল মাথার ওপর। আর নিচে উদ্ধারগপুরের গঙ্গা মাথা কুটেতে লাগল উদ্ধারগপুর ঘাটের পায়ে।

এনেছে ওরা।

লাঠালাঠি করে কেড়ে এনেছে। খস্তার ছনের দাম দিতে গিয়েছিল যারা তারা খুন দিয়ে দাম শোধ করেছে। বিনা জলে শুকিয়ে মারবার মতলবে যে ঘরে খস্তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল সেই ঘরের জানালা ভেঙে খস্তা উঠে পড়ে শীলেন্দর তেতলার ছাদে। সেখানেও তাকে তাড়া করা হয়। সেই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে খস্তা নিচের শান-বাধানো উঠানে। কার সাধ্য রোখে খস্তাকে? খস্তা পালিয়ে এল ঠিক। তাঁরা মতলব করেছিলেন খস্তার ছাতু-হওয়া খোলসটা পাচার করে ফেলবার। সে স্বযোগটুকু আর মিলল না। এরা গিয়ে পড়ল আর লাঠি হাঁকরে ছিনিয়ে নিয়ে এল খস্তা ঘোষকে।

সুনলাম সিধু ঠাকুরের মুখ থেকে খস্তা ঘোষের বিজয়-কাহিনী। তারপর দু'-চোখ বুজে বসে রইলাম। কানে বাজতে লাগল শতকণ্ঠের আকুল আর্তনাদ। দুর্দান্ত খস্তা মরে নি, মরতে পারে না খস্তা। শত শত বৃকের ভেতর ভয়ানক রকম বঁচে রয়েছে। “মোহন প্যারে”কে জাগাবার জন্তে তান তুলত খস্তা ঘোষ। উদ্ধারগপুরের ঘাট তোলপাড় করত দাপাদাপি করে। “মোহন প্যারে” জেগেছে সকলের বৃকের মধ্যে। কার সাধ্য মারে খস্তাকে। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে উদ্ধারগপুরের ঘাট থেকে খস্তাকে ছিনিয়ে নেবে।

ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল কান্নার কলরোল। কি হ'ল! দু'চোখ মেলে দেখলাম। দেখলাম আবার ফাঁক হয়ে গেল সামনের মাহুঘের ভিড়। পথ করে দিল সবাই। আর ওরা দু'জন এগিয়ে এল ধীরে ধীরে। খস্তা ঘোষের ছোড়দি এসে দাঁড়ালো খস্তা ঘোষের জীবনের আলোয় হাত ধরে। একটা ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যায়। দম বন্ধ করে চেয়ে আছে সকলে। তারপর শোনা গেল :

“চোখ খোল্ স্ববর্ণ। যা দেখতে চাস, চেয়ে দেখ্। ভাই আমার নেমক-হারাম নয়। ঐ দেখ্ পড়ে আছে তার বিদঘুটে খোলসটা। ওই ছেড়ে ফেলে সে এসে লুকিয়েছে তোরা বৃকের ভেতর। আর কেউ দেখতে পাবে না তাকে, শুধু তুই দেখবি তোরা বৃকের ভেতর। সে তোকে দেখবে আর তুই তাকে দেখবি। হয়ে গেল তোদের বিয়ে। এখন আর কে বাধা দেবে! বঁচে রইল আমার ভাই তোরা বৃকে। চল—এবার পালাই এখান থেকে।”

মেয়েটা চোখ খুললে না। দু' শব্দ করলে না। মুখটা গুঁজে দিলে রাজাদিদির বৃকে।

আবার ওরা ফিরে চলল ধীরে ধীরে শত শত জোড়া বোবা চোখের সামনে দিয়ে। ছুটে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়ালো কুমারের স্ত্রী।



“মা—”

এগিয়ে গেলেন কুমার। খুব ভারী গলায় বললেন—“আমরা কি করব বলে গেলে না ত ?”

হাসতে জানে নিতাই। খুব মিষ্টি করে হাসতে জানে। মিষ্টি করে হেসে ওদের দিকে চেয়ে বলল—“কেন, তোমার আবার ভাবনা কি ? ঐ ত বসে রইলেন উনি। ষাঁর কুপা তোমরা পেলে, ষাঁর মস্ত্র আমি দিয়েছি তোমাদের, ষাঁর দিকে চেয়ে তোমরা সংসার করবে, সেই গুরু গুরু ত ঐ বসে আছেন। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমি ভিথিরী মেয়েমানুষ। পথে পথে ঘুরে বেড়ানো আমার কাজ। আমাকে বাধা দিও না।”

বাধা আর দিল না ওরা। পথ ছেড়ে দিল। এগিয়ে চলল আবার—স্ববর্ণকে জড়িয়ে ধরে।

আর থাকতে পারলাম না। ডাক ছেড়ে উঠলাম।

“নিতাই, একেবারে ভুলে গেলে বাবাজীর কথা ?”

ধমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরেও তাকালো না, আবার পা বাড়ালে।

আবার চোঁচিয়ে উঠলাম—“বাবাজী অল্পজল ত্যাগ কবেছে নিতাই। সেও গিয়েছিল খন্তার সঙ্গে। খন্তাকে ত আনলে এরা, তাকে বোধ হয় শেষ করেই দিলে।”

ফিবে দাঁড়াল এবাব। পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেললে আমার চোখের ওপর। জিজ্ঞাসা করলে—“তা আমি কি করব ?”

তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম—“কিন্তু যদি ধব সে ফিরেই আসে ও তা তার মুখে জল তুলে দেবে কে ? তোমার হাতে ছাড়া আর কারও হাতে সে জলও থাকবে না।”

আবার বললে সেই একই কথা—“তা আমি কি করব ?”

এবার সত্যিই ব্যাকুল হয়ে উঠলাম—“নিতাই, তুমি যা বলবে তাই করব আমি। উঠে যাব আমি এখান থেকে তোমার সঙ্গে। শুধু তুমি বাবাজীকে বাঁচাও। যদি সে ফেরে তার মুখে জল দিয়ে তাকে বাঁচাও তুমি। আর আমি কিছু চাই না তোমার কাছে—”

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল বোষ্টমী। হাসি যেন উপচে পড়তে লাগল ওর চোখ-মুখ সর্বাঙ্গ থেকে। হাসি সামলাতে সামলাতে বললে—“বাবাজীর জন্তে তুমি আর কি করতে রাজী আছ গোঁসাই ? যাক আর কয়েকটা দিন। ভুল তোমার ভাঙবেই একদিন। সেদিন বুঝতে পারবে একটা একেবারে

মিথ্যে মরীচিকা নিয়ে তুমি মাথা খুঁড়ে মরছ। আচ্ছা যদি তোমার বাবাজী সঙ্গে আবার দেখা হয় ত তাকে বোল যে মড়া নিয়ে মেতে থাকার ফুরসৎ নেই আমার। জ্যান্তদের যদি একটু শাস্তি দিতে পারি তাহ'লেই আমি নিজে মরে শাস্তি পাব। মড়ার আবদার তুমিই শোন বসে বসে গোসাঁই। ও বিলাসিতা আমার পোষাবে না।”

বলতে বলতে পেছন ফিরে আবার পা বাডালে। তারপর ওরা মিলিয়ে গেল লোকজনদের পেছনে। কুমার আর তাঁর স্ত্রীও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

ভয়ানক অগ্ন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অভ্যাস-দোষে বলে ফেললাম—“খন্তা, একটা বোতল খোল ত বাবা, গলাটা ভিজিয়ে নিই।”

বলেই ভয়ানক চমকে উঠলাম। রক্তমাখা কাপড়ের পোটলাটা তখনও পড়ে আছে ঠিক সামনে। ইঁ করে চেয়ে রইলাম সেদিকে।

একটা খোলা বোতল কে হাতে ধরিয়ে দিল। অভ্যাস-দোষে সবটুকু গলগল করে চলে দিলাম গলায়। দিয়ে আবার চোখ বুজে রইলাম।

উদ্ধারণপুরের উপসংহার।

নেমে এল উদ্ধারণপুরের মাথার ওপর উদ্দাম উপগ্নবের বেশ ধরে। খুব কাছে সরে এল উদ্ধারণপুরের আকাশ। হাডের শিঙা ফোঁকা ভুলে গিয়ে উদ্ধারণপুরের বাতাস মেতে উঠল আকাশের ছুই কালামুখী দেবীকে নিয়ে। বাসনা আর বঞ্চনা, উদ্ধারণপুরের ছুই দেবীর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিতে লাগল উদ্ধারণপুরের উন্নত বাতাস। ছুঁদাস্ত খন্তা ঘোষ মাঝে মাঝে থেপে গিয়ে ময়নাপাড়ার চোঁটা মেয়ে-গুলোর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাত। বলত, মবু তোরা, মবু। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে মরার চেয়ে আয় তোদের আমিই মেরে ফেলি। মেরে চুলোয় তুলে দিয়ে নিশ্চিস্ত হয়ে চলে যাই যেখানে ছুঁচক্ষু যায়। মড়াকান্না উঠত ময়নাপাড়ায়। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করা মূলতুবী রেখে ওরা সবাই গলা মিলিয়ে লেগে যেত খন্তার বাপাস্ত চোদপুক্কাস্ত করতে। হি হি করে হাসতে হাসতে সরে আসত খন্তা। বলত—দে যত পারিস গালাগাল দে আমায় চুলোমুখীরা। কিন্তু থেকী কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করে মরিস নে।

হি হি করে হাসছে উদ্ধারণপুরের বাতাস। কাঁই কাঁই করে কাঁদছে উদ্ধারণপুর আকাশের ছুই কালামুখী দেবী বাসনা আর বঞ্চনা। কড়-কড়-কড়াং করে ছুঁহাতের দশটা আঙ্গুলের দশখানা ধারালো নখ দিয়ে চিরছে উদ্ধারণপুর রক্তমঞ্চের পর্দাখানা। উদ্ধারণপুরের উপসংহার। আয় কোনও চালাকি চলবে না জাঁহাবাজ

জাহুকরের। যবনিকাথানা ছিঁড়ে খানখান করে দেখাবেই উপসংহার কি লুকোনো আছে ওর আড়ালে। জারিজুয়ি ভাঙবে আজ জাহুকরের। উদ্ধারণপুর বঙ্গমঞ্চের ওপর ভেলকিবাজির খেল দেখানো ভেস্বে যাবে চিবকালের মত। ঠসক দেখিয়ে ঠকানো আর চলবে না।

হু হু করে জলে উঠেছে খস্তা ঘোষের চিতাটা। লাকিয়ে উঠেছে আশুন আকাশ হোঁবাব জন্তে। আশুনে বাতাসে লড়াই চলেছে চিতার ওপর। উদ্ধারণপুরের বাতাস নেতাবেই খস্তা ঘোষের চিতা। নবরসের একটারও ধার ধারত না খস্তা। কোনও লাভ নেই ওকে জ্বালে চড়িয়ে। খস্তা ঘোষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ঐ খোলসেব মধ্যে। লোকের বুকেব মধ্যে যে চিতা জ্বলছে তাতে চড়ে আরামে পুড়েছে খস্তা ঘোষ। পুড়বেও চিরকাল। কোনও কালে সে পোড়ার শেষ হবে না।

উদ্ধারণপুরেব উপসংহার।

উপসংহার উড়িয়ে নিয়ে গেল আমার গদির ওপরের চালখানা। নিয়ে গিয়ে ফেললে গঙ্গাব জলে। গঙ্গা ভাসিয়ে নিয়ে চলল সাগরের বুকে বিসর্জন দিতে। সাফ্ হয়ে গেল মাথাটা। ঠিক সেই সময় কড়-কড় কড়াং—একটা ঝিলিক দিলে গঙ্গার এপার ওপার জুড়ে। আর সেই আলোয় দেখতে পেলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম কে যেন কি খুঁজছে উদ্ধারণপুরের ঘাটে। অন্ধের মত হুঁহাত বাড়িয়ে হাতডাতে হাতডাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে শূশানে। নিমেষেব জন্তে দেখতে পেলাম। মিলিয়ে গেল সে কালো যবনিকার অন্তবালে। তারপর স্তনতে পেলাম।

অনেক দূর থেকে, খস্তা ঘোষেব চিতার ওধাব থেকে ভেসে এল ওয়াজটা, উদ্ধারণপুরের উন্মাদ বাতাসের বুর্কিচিবে ভেসে এল।

এগিয়ে আসছে, ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

সর্বৈন্দ্ৰিয় দিয়ে শোনবাব চেষ্টা করছি।

আর একবার, আর একটিবার চিরে ফেলুক কালো যবনিকাথানা উদ্ধারণপুরেব উপসংহার। তাহ'লেই হবে সাধ্য থাকবে না—চিতাব আঁচে পোড়া আমাব চোখ দুটোকে ফাঁকি দেবার। ঠিক ধরে ফেলব জাহুকরকে। ধরবই হুঁহাতে জাপটে। তারপর গলা টিপে তুলে দোব ঐ খস্তা ঘোষের লেলিহান চিতাটার ওপর।

হাত দুটো গদির ওপর দিয়ে হস্তে কুকুরের মত উবু হয়ে বসলাম। দেখা মাত্রই কাঁপিয়ে পড়ব তার ঘাড়ে। বেরিয়ে যাবে আমার সঙ্গে চালাকি করা।

এবার আরও স্পষ্ট স্তনতে পেলাম। ধরতে পারলাম কথাগুলো—

“তোমার চরণ পাব বলে

মনে বড় আশা ছিল।

আমার মনে বড় আশা ছিল।”

লাকিয়ে পড়লাম গদির ওপর থেকে। আন্দাজ করে ছুটলাম যেথান থেকে
আওয়াজটা আসছিল সেখানে।

সরে গেল অস্ত্র দিকে। আবার কানে এল—

“আশা-নদীর কূলে বসে গো

আমার আশায় আশায় জনম গেল।”

আর ফাঁকি দেওয়া চলল না। এক লাফে গিয়ে জাপটে ধরলাম তাকে দু’-
হাতে বুকের সঙ্গে। টেনে নিয়ে চললাম আলোর দিকে। খস্কা ঘোষের চিতার
আলোয় চিনব এবাব ওকে।

চিতার কাছে পৌঁছে ও আমার বুকের ওপর মাথাটা রেখে এলিয়ে পড়ল।
বললে—“আঃ, বাঁচলাম গোঁসাঁই। বড় ভয় ছিল তোমায় বোধ হয় খুঁজে
পাব না।”

“কেন মোহন্ত ? কেন খুঁজে পাবে না আমায় ? শুধু তোমার জগ্গেই আমি
বলে আছি মোহন্ত। জানতুম আমি যে তুমি আসবে। এবার তোমার সঙ্গে
আমি চলে যাব মোহন্ত। এখানের কাজ আমার ফুরিয়েছে।”

সমস্ত দেহটা তখন ছেড়ে দিয়েছে চরণদাস আমার গায়ে। ভয়ানক রোগা
হয়ে গেছে, আধখানা হয়ে এসেছে চরণদাস। যাক, তবু ত এসেছে। এবার
পালাই ওকে নিয়ে। রাতটা কোনও রকমে কাটলে হয়।

চরণদাস ছোট ছেলের মত আবদারে হুঁরে বললে, “একটু বোস গোঁসাঁই,
আমি শুই তোমার কোলে মাথা রেখে। আর যে পারি না খাড়া থাকতে।” বলে
পড়লাম খস্কা ঘোষের চিতার পাশে। চরণদাস শুয়ে পড়ল আমার কোলে মাথা
দিয়ে। শুয়ে খুব আস্তে আস্তে আবার গেয়ে উঠল—

“তোমার চরণ পাব বলে গো

মনে বড় আশা ছিল।”

হঠাৎ বাবাজীর সমস্ত দেহটা দু’বার শিউরে উঠল। মাথাটা ভূলে থক থক
করে কাশতে লাগল। হঠাৎ করে এক ঝলক বেরিয়ে এসে পড়ল আমার কোলের
ওপর। দেখলাম চিতার আলোয়—খস্কা ঘোষের চিতার আলোয় দেখতে পেলাম
—কালোর কালো হয়ে গেল আমার কোলটা। আর তার ওপরেই আবার মুখ-
খুঁড়ে পড়ল চরণদাস।

কাঠ হয়ে বসে রইলাম গুর দিকে চেয়ে। অনেকক্ষণ পরে সামলে নিলে বাবাজী। তারপর আবার আরম্ভ করলে—

“আশা-নদীর কূলে বসে গো

আমার আশায় আশায় জনম গেল।”

আবার কেঁপে উঠল গুর দেহটা। তেউড়ে উঠল দেহটা। আবার সেই কাশি। কাশির সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—“তোমায় যে দেখতে পাচ্ছি না গোসাঁই, আর কিছুই যে দেখতে পাই না আমি। আমার চোখের আলো অনেক দিন নিভে গেছে গোসাঁই। তাই বড় ভয় ছিল হয়ত তোমায় খুঁজে পাব না।”

আবার উঠল একটা কাশির দমক। বেরিয়ে এল আর এক বলক কালো রক্ত, পডল আমার কোলের ওপব। তারপর খুব আস্তে আস্তে চরণদাস শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পডল।

উদ্ধারণপুর, উপসংহার।

উপসংহার উপহার দিবে গেল আমার কোলে।

খস্তা ঘোষের চিতার আলোষ উপহারের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

উদ্ধারণপুরের বাতাস লডতে লাগল চিতার আগুনের সঙ্গে।

ওকে নামিয়ে দিলাম ভস্মে উপর। দিঘে উঠে দাঁড়িলাম।

একটা কলসী চাই। তাড়া-নাড়ি চাই। গজাজল আনতে হবে। স্নান করাতে হবে চরণদাসকে। বড় জ্বালায় জ্বলছে। তেষ্ঠায় ছাঁতি ফেটে গেছে ত- জল মুখে দেয় নি। ওকে ঠাণ্ডা করতে হবে। জল মুখে দিতে হবে গুর। গুর দারা অজু ধুইয়ে দোব গজাজল দিয়ে। তারপর তুলে দোব খস্তা ঘোষের চিতার ওপর। শেষ হয়ে যাবে, রাতের অন্ধকারে শেষ করে দোব ওকে। চিহ্নমাত্র রাখব না। কেউ জানবে না কোথায় গেল চরণদাস বাবাজী।

পেলাম একটা ভাঙা কলসী।

দৌড়ে গিয়ে আনলাম জল। তাড়া-নাড়ি লেগে গেলাম কাজে। ঝটনে খুলে ফেললাম গুর কাপড়খানা। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম সেখানা আগের চিতার আগুনে। দাঁড় দাঁড় করে জলে উঠল আগুনটা। উলটে ফেল ম বাবাজীকে। ছুটে এল আবার বাতাস। আগুনের শিখাটা জ্বয়ে পডল এদিকে। আর—

আর পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম বাবাজীর দিকে। খস্তা ঘোষের চিতার আলোর দেখলাম।

দেখলাম—একটা অসমাপ্ত রচনা। স্রষ্টিকর্তার মনের ভুল। মনের ভুল নয় শুধু, একটু গাফিলতি। অতি-বৃদ্ধ ওস্তাদের হাতের কাজে খুঁত থেকে গেছে।

বাবাজী নয় নয়, নারী নয়। কিছুই নয়। বিধাতার অমার্জনীয় ভ্রান্তির নিষ্ঠুর সাক্ষ্য।

উদ্ধারণপুরের উপসংহার।

উপসংহার উপহাস করে বিদায় নিলে। বিধাতার সামান্য ভুলের জের টেনে ভুলের দিকে পড়ে খাবি খেয়ে মরছি আমি!

ওকে তুলে দিলাম। খস্তা ঘোষ আর চরণদাস, সাদা হাড় আর কালো কয়লা জ্বলতে লাগল একসঙ্গে। চরণদাসের লজ্জা লুকিয়ে ফেললাম। সেই চিতা থেকে একখানা কাঠ টেনে নিয়ে গিয়ে গুঁজে দিলাম গদিটায়। বাতাস এসে লাগল তার পেছনেও। উদ্ধারণপুরের গদি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। রাসীকৃত ভুল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে উদ্ধারণপুর ঘাটের অনেকটা আধার ফিকে করে আনলে। সেই আগুনে পুরতে লাগল কুমার বাহাদুরের গয়নাগুলো আর কাপড়খানা। পুড়ুক—অনেক আছে তাঁর। কিছু ক্ষতি হবে না।

উঠে এলাম বড় সড়কের ওপর।

অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে পালাতে হবে।

নেমে এল আকাশ। কাদতে লাগল বাসনা আর বঞ্চনা। কেঁদে বিদেয় দিচ্ছে উদ্ধারণপুরের দেবীরা।

এগিয়ে চললাম বড় সড়ক ধরে।

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই টের পেলাম! স্রষ্টা বুঝতে পারলাম কে হাঁটছে আমার পাশে পাশে!

তারপর ধরলে আমার একখানা হাত।

কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে—“চল, পা চালিয়ে চল একটু। আধার থাকতে থাকতে পার হয়ে যাই এই পথটুকু।”

নিশ্চিন্ত হয়ে পা চালালাম।

হাত শুঁ ধরেই আছে, আর ভয় কি!

বশীকরণ

উৎসগ
অমণের
মা
সুখময়ী দেবীকে

নাম তোরাব আলি।

জেলে আমার খাবার জোগাত তোরাব। বিশ্বাসী লোক। জেলের বাবরা, সাহেবরা, আর বড় বড় জমাদার সাহেব—এঁদের সকলেই আস্থা আছে তোরাবের ওপর। কয়েদী যদি বেগডায়—তোরাব তাকে বাগে স্থানতে পারবে, শুধু তাই নয়, সকলেই জানেন যে, তোরাব একটি অপার্থিব শক্তির অধিকারী। এত বড় জেলে এতগুলো বন্দীর মধ্যে যদি একজনেরও মনের কোণে বিন্দুমাত্র স্বপ্ন জাগে শিকল কাটবার, তা হলে তৎক্ষণাৎ তোরাব তা জানতে পারে। তারপর সে সংবাদ যথাস্থানে পৌছে দিতে তোরাবের আর কতটুকু সময় লাগে ?

সকলেই শ্রুতির করে তোরাব মেটকে, আর সাধ্যমত এড়িয়ে চলে তাকে। তার চেয়ে পুনেন। এট যাবা, তারাপ্ত সাবধানে থাকে। বলা তো যায় না, কখন ওর দিল্ তডপে উঠবে তা হলেই কেলেকারি। মুখে যা আসবে তাই বলে বসবে হজুরদের সামনে। তারপর দিক্‌দারির শুরু। একজন থেকে আর একজন, তারপর আর একজন ধরে টান পড়বে। কার বরাতে কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না। মার ভাগাবেডি, মাডভাত, মেট থেকে কালাপাগডিভে নামানো, কালাপাগডি থেকে সাধারণ কয়েদী। তার ওপর লে আও টিকিট—কাটো পনেরো দিন, কাটো এক মাস। লাহনার একশেষ।

সকলের চেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তোরাব মেট। চুল-দাঁড় কামায়, প্রতিদিন সাবান দেওয়া সাজপোশাক পরে। রং তার ফরসা—বেশ ফরসা, ভ্রু আর মাথাব চুল কটা, চোখের তারা ছুটিও কটা। আমার সেলের সামনে কোমরের তোয়ালেখানা পেতে হাঁটু গেড়ে বসে যখন নামাজ পড়ত তোরাব, তখন আমি একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম গরাদেব তেতর থেকে। চোখ বুজে ও ঠোট নাড়ত।

বেলা ছটো তিনটের সময় বোজই তোরাব এসে সেলের গরাদ ধরে দাঁড়াত। তা এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। সময়টা কাটত হিসেব করতে করতে। হিসেব সোজা নয়। চোদ্দ থেকে আট বাদ গেলে মাত্র ছয় থাকে বাকি, আর ছয় থেকে কত বাদ গেলে কিছুই থাকে না ?

হিসেব করত তোরাব—“আজ্ঞে জানমু না ক্যা বাবু মশায়। ^১তাই ধরেন হুঁস সন—আর এড়া অইল গ্যা মহরমের মাস, তা অইল গ্যা ছয় সন আর নয়খান মাস। কাবার কইব্যা ছালাম সাত সন। কি কন?”

তাড়াতাড়ি উত্তর দিই আমি, “বটেই তো। সাত বছরের আর বাকি কোথায় তোমার?”

উত্তর শোনার অপেক্ষা বাথে না তোরাব, হিসেব চালিয়ে যায় আপন মনে—“তার সাথে ধইব্যা বাথেন আবও ছয়খান মাস, ওই হাতখানা মাসই গোনতি পারেন। ছার পাইমু না?”—বলে এমনভাবে চেয়ে থাকে আমার দিকে যেন বছরে এক মাস হিসেব ছাড় পাওয়া না পাওয়াটা আমার মতামতের ওপরেই নির্ভর করছে।

বিশ্বয় প্রকাশ করি, “পাবে না মানে? না পাবাব কি হয়েছে?”

চকচকে দাঁতগুলি বার ক’রে তোরাব বলে—“হক কথা কইছেন কর্তা।” তারপর হঠাৎ যেন তার মনে প’ড়ে যায়। আবার শুরু করে—“আরও ধরেন তিনভা মাস। হেবার মাইরভাকায় বব সাহেব মাক ছালেন তিনভা মাস, একারে পাকা কইব্যা লেইখ্যা খুইয়া গ্যাছেন মোর টিন্ডিখানার প’র। আহন-জোবেন হেসাবখান। তাহেন আটভা সন কাবার কইব্যা ছালাম কিনা কন?”

হু’ হাত মেলে আঙ্গুল গুনতে থাকে। চৌদ্দ থেকে আট বাদ গেলে থাকে মাত্র ছয়। মাত্র ছটি বছরই বাকি আছে তাব খালাস পেতে। এব মধ্যে যদি আর দু-একবার দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগে জেলে, তবে খোদার দোয়ায় কি আরও অন্তত ছটা মাস মাক করিয়ে নিতে পারবে না সে? খুব পাববে।

সেবারের সেই হাঙ্গামার কাহিনী কমপক্ষে একশোবার আমার শোনা হয়ে গেছে তোবাবের মুখ থেকে। গুনতে গুনতে এমনই দাঁড়িয়েছিল যেন সেই মাঝামাঝি পালাটি আগাগোড়া ঘাটে গেছে আমার চোখের ওপর, চোখ বুজে ছবছ আমি দেখতে পেতাম সে-দিনের সেই কাণ্ডকারখানা।

বেলা তখন এগারোটা। হঠাৎ হৈ হৈ উঠল চারদিক থেকে। এক সঙ্গে হুঁসিয়ে উঠল সাড়ে সাতশো লোক। খোস্তা কোদাল যে যা পেলো হাতের কাছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াল। তিনশো বাট দিন শুধু পুঁইশাকদেহু খেতে আর কেউ রাজী নয়।

বড় সাহেব, জেলার সাহেব, ছোট হুকুমেরা সকলেই অফিসের মধ্যে। সকলেরই মুখ চুন। পেট-মৌটা জমাদার সাহেবরা ছুটে গিয়ে জড়ো হয়েছেন গেটের ওধারে অফিসের সামনে। ওয়ার্ডাররা কে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে তার

পাত্তা নেই। পাগলা-ঘটি বাজছে তো বেজেই চলেছে। সাড়ে সাতশো লোক মরীয়া হয়ে একটু একটু করে এগুচ্ছে গেটের দিকে।

তোরাবের তখন মাত্র তিন বছর। কয়েদীর ভেতরের সব খবরাখবর যথাস্থানে সরবরাহ করে সে তখন নূতন কালাপাগড়ি পেয়েছে। দিনে অফিসের মধ্যে কাজ-কর্ম করে, ঝাড়ে পৌছে, ফাইফরমাস খাটে। রাতে নিজের ওয়ার্ডে ভাল-চাবির মধ্যে বন্ধ থাকে। প্রকাণ্ড হলটার দু'ধারে সারবন্দি ঘুমোচ্ছে কন্ডল বিছিয়ে যে কয়জন লোক, তাদের মাঝখান দিয়ে হলটার এ-ধার থেকে ও ধার হাঁটা আর বিচিত্র স্বরে গান গেয়ে গোনা 'এক দো তিন চার—সাতচল্লিশ উনপঁচাশ পঁচাশ—ঠিক হায় চার লম্বা।' মনে মনে হযতো আলাদা করে গুণতে থাকত তখন চোদ্দ থেকে তিন বাদ গেলে হাতে থাকে এগারো আর এগারো থেকে কত বাদ গেলে হাতে কিছুই থাকে না আব।

নশিবের জোরে সেদিন তখন কালাপাগড়ি তোরাবালি অফিসের মধ্যেই আটক পড়েছিল হুজুরদের সঙ্গে।

প্রতি মুহর্তে অবস্থা ক্রমেই সন্ধিন হয়ে উঠছে। সরকাণী ভাষায় যাকে বলে আযন্তেব বাইরে চলে যাওয়া, অবস্থাটা প্রায় সেই একমেরই হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সাহেববা পরামর্শ করছেন—গুলি চালাবার হুকুম এই মুহর্তেই দেবেন, না আরও কয়েকটা মুহর্ত অপেক্ষা কবে দেখবেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে লোক ছুটছে।

গোশাব গিয়ে দাঁড়াল শেলাম ঠুকে সুপার সাহেবের সামনে, তখন তাব কপালের ওপব খাড়া হয়ে নীল শিরগুলো।

তাব চোখের দিকে চেয়ে সাহেব তাঁর পিস্তলটা হাতে তুলে নিলেন।

কেয়া মাংতা ?

বক্তে তার আগুন ধবে গেছে তখন। সাহেব শুনলেন তাব আবজ্জি, পিস্তল-সুদ্ব হাত নামালেন না বা তোরাবের ওপর থেকে নজর সবালেন না। কয়েকটা কথা-কাটাকাটি করলেন জেলার সাহেবের সঙ্গে। তোরাবের আরজি মঞ্জুর হল, হাত-পাঁচেক লম্বা একখানা পাকা লাঠি দেওয়া হল তাকে। পিস্তল বাগিয়ে ধরে স্বয়ং বড় সাহেব চললেন তার পিছু পিছু ফটকের ছাদের ওপর। ভেতরের গেট তখন খুলবে কে ? গেট খুললেই যদি লাফিয়ে পড়ে সাড়ে সাতশো লোক গেটের ওপর।

তারপর—

র্যা র্যা কইরা একডা চিকুর ছাইড়া জালাম লাক আর লামলাম গ্যা একারে

হালাগোর মন্দির। তখন বুইঝা লন ব্যাপারখান। মুই ভোরাবালি, মোর ওস্তাদের নাম আসমতালি ছায়েব। গরের মন্দির ছুইয়া ছাশের মানুষ কাঁপে মোর ওস্তাদের নামে। চক্ষু পালডাতি না পালডাতি ছালাম এক কুড়ি খতম কইর্যা। ব্যাস, হালাগর গুপ্তি কাইত। ফটক খুইল্যা ছুইটা আইয়া পডল প্যাট-মোটা জমাদার ছায়েবরা। হালাগো সামাল ছাওয়া গ্যাল, তালা পডল, লোক গোনতি হল। বর ছায়েব আপন হাতে আধস্তার লাল পানি টাইলা ছালেন মোর মগে। আর তিনখান মাস রাহাই প্যালাম।

বলতে বলতে ভোবাবেব চোখ-মুখেব চেহাৰা যেত বদলে। আমার বুকেব ভিতরটা কেমন যেন কাঁপে উঠত ওর মুখেব দিকে চেয়ে। তবু বক্ষে যে দুইফি মোটা লোহার গবাদগুলোর এক ধাবে সে, আব অন্য ধারে আমি। বাইবে থেকে হাত বাড়িয়ে গলা টিপে ধরবে, সে উপায় নেই।

জেলের মধ্যে জেল, তাব মধ্যে সেন। বিচারকতা বাইরে থেকে লিখে দিলেন, আমি বি ক্লাস। সি ক্লাস হলে সকলের সঙ্গে থাকতে পেতাম। বি ক্লাসেব জন্তে বিশেষ ব্যবস্থা। আলাদা কবে বাথতে হবে তো। কাজেই ফাঁসির আসামীব সেল একটি ছেড়ে দেওয়া হল আমায়। দশ হাত লম্বা আব পাঁচ হাত চওড়া একটি ঘর, যার একমাত্র প্রবেশ ও নির্গমন-পথে দুইফি মোটা লোহার গবাদেব গায়ে শক্ত লোহার জাল। হাওয়া আলো বুষ্টির ছাট এ সকলের জন্য অবাবি-দ্বার। সেই ঘরের মধ্যে সি ক্লাসেব মত কখন একখানি আব থালা মগ নিয়ে থাকতে পাবলও স্বস্তি পেতাম। তা তো নয়। একবাশ অস্তাবব সম্পত্তি বি ক্লাসেব। চাব হাত লম্বা, দু'হাত চওড়া লোহার খাট। তাব ওপর ছোবডাব গদি, ছোবডার বালিশ। নাবকেলের থেকে ছোবডা ছাডিয়ে নিয়ে সত্ত সত্ত একটা চটের থলেয় পুরে দেওয়া হয়েছে। ছোবডাগুলোকে পেটানো বা পেঁজা হয়নি। তারপর মশারি, যার চার দিকের ঝুল চার রকমের। এক দিকেব এক হাত, এক দিকের দু'হাত, এক দিকের তিন হাত আর এক দিকের চার হাত। একখানি টেবিল ও একটি চেয়ার। কি মহাপরাধেব দরুন ওরা দু'জন আমাব সঙ্গে সেলে বন্দী হয়ে বইল ন নটা মাস, তা বলতে পারব না। ওদের অবস্থা দেখে আমি ঘরের এক কোণে অতি সাবধানে একজনকে আর একজনের ওপর চাপিয়ে রেখে দিলাম। একেবারে বিকলাঙ্গ পক্ষু কিনা বেচারারা।

আর একটি জিনিসও ছিল আমার অস্তাবব সম্পত্তির মধ্যে। তাত্ত্বিক সাধকরা পূজার বসতে হলে আসনের পিছনে হাত ধুয়ে জল-টল ফেলবার জন্তে একটি পাত্র রাখেন। ওটির নাম ক্ষেপণী-পাত্র। আমার সেই দশ হাত পাঁচ হাত ঘরের মধ্যে

চব্বিশ ঘণ্টার জন্তে দেওয়া হত একটি ক্ষেপণী-পাত্র। চার সের আন্ডাজ জল ধরে এই রকমের গোল একটি আলকাতরা মাথানো ঢাকনাওয়ালা জিনিস। বেহিসেবী হলে রক্ষে নেই। ঘর ভাসতে থাকবে নিজের অন্তরের অন্তরতম মালমসলায়। তারই মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে পরদিন সকালে অব্যথা গালাগালি উপরি পাওনা।

প্রথম দিন জিনিসপত্র সমস্ত সমঝে দিয়ে ছোট জেলারবাবু তোরাব আলির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—“বড় বিশ্বাসী লোক এ, আর এ জানে কি কবে সম্মানী লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।” তাবপর থেকে ন’ মাস আমি রইলাম তোরাব আলির হেপাজতে।

ঠিক সকাল সাতটায় সেলেব সামনে এসে দাড়াতে তোবাব। বলত, “সালাম কর্তা।” জমাদার এসে সেলের তালা খুলে দিয়ে যেত।

সেলের মাপেব সমান এক টুকরো উঠান সেলের সামনে। তিন-মাত্রা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেঁষা। উঠান থেকে বাইরে বেরুবার দরজাটি সেলেব দরজার কুঁকু-কুঁকু। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলে পাওয়া যাবে তিন হাত চওড়া গলি। গলিটা সব কটা সেলেব সামনে দিয়ে চলে গেছে। তারপর হচ্ছে লাল হটের ছ-মাত্রা উঁচু পাঁচিল। সেই গলি দিয়ে দিশাবাত্র ওয়ার্ডারব, কল হাতে এ ধাব থেকে ও-বার আব ন ধাব থেকে এ-ধাব খট খট মন মন কবে ঢল দেব। উঠানেব দরজা দিয়ে নজর বাখে, সেলের মধ্যেব জীবটি কিছু কণ্ঠে কিনা। কবাব অবস্থা কিছুই ছিল না, তাঁদের প্রীবপু কতাব উঠানেব দরজা দবে দেখা যাব তা গণনা করা ছাড়া।

সেল থেকে বেরিয়ে এসে তোরাবেব সঙ্গে উঠানেব দরজা পাব হতাম। সেই তিন হাত চওড়া গলিটাব এক প্রান্তে পৌঁছে কলের নীচে মাথা পেতে বসে থাকতাম। সকালের ছুটির পূর্বে আধ-ঘণ্টাই বসে থাকতাম কলের নীচে। বি ক্লাসেব ওইটুকু বিশেষ স্বাবধা। নযতো সাবাত্রাৎ ক্ষেপণী-পাত্রের সঙ্গে কাটিয়ে কার সাব্য সকালে এক ঢোক জল গেলে।

আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়ে তোবাব নযে আসত চা আর চায়েব সরঞ্জাম। সাড়ে-পনেরো আনা কলাই-ওঠা একখানি থালায় করে আনত সে সমস্ত অপূর্ব খাদ্যসামগ্রী। সি ক্লাস তো নই, কাজেই বিলকুল অসাধারণ হওয়া চাই। থালাব ওপর পাকত, বড় বড় আবশোলা সৈকে দিলে যেমন দেখতে হয় ঠিক সেই বকম দেখতে, দশ-বারো টুকরো পোড়া পাঁউরুটি। তাব পাশে এক ধ্যাবড়া সাদা থকথকে পদার্থ। ওই পদার্থ দিয়ে আরশোলা-সৈকা খেতে হবে। খেলে বি ক্লাসের ব্রেকফাস্ট করার ফল মিলবে। আর থাকত খানিকটা মাথা তামাক। সেজে খাবার জন্তে নয়। চেটে খাবাব জন্তে। জেলের আইনে বি ক্লাসকে শুড

দেবার নিয়ম লেখা আছে কিনা। সামান্য একটু চিনিও থাকত তার পাশে।

একটা কলাই-করা মগের তলদেশে খানিকটা সাদা তরল পদার্থ আর একটা পাঁচ-সের ওজনের লোহার কেটলিতে গুচ্ছের-খানিক চা-পাতা-ভিজানো এক কেটলি গরম জল। প্রথমেই মগেব মধ্যে খানিকটা চাষের জল ঢেলে আমি তোরাবের হাতে তুলে দিতাম। কটি-মাখন গুড় সমস্ত তোরাবের দেবার লাগত। তোরাব প্রবল আপত্তি তুলেছিল। তাকে বোঝালাম, আমি জন্ম পেটরোগা, এ সমস্ত ভালমন্দ জিনিস একদম পেটে সয না। আমাব নিজের এলুমিনিয়ামেব গেলাসটির মধ্যে চাষের জল ঢালতাম আব চিনি মিশিয়ে খেতাম।

চা-পর্বের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রাত্যহিক আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যেত।

বিষয়বস্তু সেই একই, তবু আলাপটি তোলবার বায়দাব দকন কোনও দিন একঘেয়ে মনে হত না। প্রতিদিনই বেশ চমক লাগত তোরাবের ক্ষমতা দেখে। চাষের মগে চুমুক দিয়ে হঠাৎ তোরাব জিজ্ঞাসা কবে বমল তার নিজস্ব ভাষায়, “কর্তা, আপনাব পোলাপান কটি?”

হেসে ফেলতাম—“নাও মিঞা সাহেব, যেমন তোমাব কথা। আরে, বিঘে করবারই তো ফুরসত মিলল না এখনও। পোলাপান কি ছপ্পব ফুটো হয়ে পড়বে নাকি?”

ক্রক্ষেপ নেই আমাব বসিকতায়। ততক্ষণে তোরাব তার মগেব মধ্যে এবদুট্টে কি দেখছে। একটু পরে যেন বহু দূর থেকে সে বলতে থাকত, “সব কটা না থেবে পেয়ে শুকিয়ে মবেছে এতদিনে। আমাব সাকিনাব বয়স হল এই বারো, তুবব গঠ দশ, আর ছোটটার—তা অটি তো বটেই। কি থাকে? ওদের মা নিজের পেট চালিয়ে আরও তিনটে পেট কি কবে চালাবে? মেয়েটাকে হয়তো কারও ঘরে কাজে দিয়েছে। ওরা দু’ভাইও হয়তো কাবও গল্প-বাছুর রাখে। নাঃ, না থেবে শুকিয়ে মবেবে না—কি বলেন কর্তা?” আমাব মুখেব দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাইত তোরাব। বলতাম—“দূব, না থেয়ে মরে নাকি কেউ কোথাও? তোমারও যেমন মাথা খারাপ। দেশে কি মানুষ নেই নাকি, কেউ না কেউ ওদের দেখাশুনো করছেই।”

সামান্য একটু সময় কি ভাবত তোরাব। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেই আরশোলা-সৈঁকা কটি ঝটুকরো মুখে ফেলে চিবুতে থাকত। আবার বলে উঠত হঠাৎ—“আচ্ছা কর্তা, আপনাদের ঘরে এ রকম হলে কি করত?”

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম—“কি আবার করত, কোন আত্মীয়স্বজনকে কাছে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে আশ্রয় নিত।”

তোরাব একেবারে ফেটে পড়ত—“আর ওরা যদি কারও কাছে আশ্রয় পেয়েও থাকে, তার বদলে কি দিতে হয়েছে জানেন? দিতে হয়েছে ইজ্জৎ। কোথাও মাথা গৌজবার ঠাই মিলবে না, যদি সে কারও সঙ্গে নিকের না বসে থাকে। নিজের বলতে যা কিছু তার সবটুকু ধুয়ে মুছে না ফেললে কারও দরজায় আশ্রয় নেই। আমার সাকিনা, আমার ছুক, আমার বাচ্চারা যতক্ষণ না আর একজনকে বাপজান বলে ডাকবে, যতক্ষণ না তাদের মা আর একজনের সম্মানকে পেটে ধরতে রাজী হবে, ততক্ষণ তাদের মুখে দানাপানি পড়বার কোনও আশা নেই।”

আর কথা জোগাত না তোরাবের। তার সেই কটা-চোখের চাহনি তখন বাকিটুকু বলে দিত। কোনও পশুকে বেঁধে খাঁড়ার তলায় গলাটা টেনে ধরলে যে ভাষা তাব চোখে ফুটে ওঠে, সেই মর্মান্তিক অসহায় ভাষা মুখর হয়ে উঠত তোরাব আলির দুই চোখে।

আমার সাকিনা, আমার ছুক—হাগ আল্লা, কে জানে আজ তারা কোথায়! আর কি এখনও আমি তাদের ফিরে পাব?

সকালে বাসাপটী খেতে বসে শুয়ে শুয়ে। আমার মুখেও আর কিছু জোগাত না।

চায়ের সবজ্যাম নিয়ে ফিরে যাবার সময় পিছন দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেলে একটু দোকাপাতা আমার হাতে গুঁজে দিত তোরাব। দেওয়ালের গা থেকে আঙুলের নখ দিয়ে চুন কুরে নিয়ে গুটিকুর সঙ্গে হাতের তেলোয় পিষে দাঁতের গোড়ায় টিপে রাখতে হবে। তুধের শাধ বোলে মেটানো। প্রথম প্রথম বেয়াড়া রকমের মাথা ধবৎ। সদামবদা এক চিন্তা, কি কবে কবে টান দেওয়া যায় একটা বডি বা সিগারেটে। লক্ষ্য করল তোরাব। শেখালে দাঁতের গোঁড়ায় দোকাপাতা টিপে রাখা। স্বস্তি পেলাম। কতবার প্রশ্ন করেছি, কি করে আসে এসব জিনিস জেলের মধ্যে? তোরাব শুধু দাঁত বের করে হেসেছে। সকালে দুপুরে আর সন্ধ্যায় তিনবার সে এই জিনিস পরিমাণমত দিয়ে গেছে আমার হাতে। এতটুকু বেশি কাছে রাখার উপায় নেই। কখন যে ঝাড়া নেবে কে জানে। যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে তবে নাজেহাল করে ছাড়বে।

জমাদার সাহেব এসে দরজায় তালা লাগাত। গরাদের পাশে বসে চেয়ে থাকতাম উঠানের পাঁচিলের ওপারে বড় পাঁচিলটার মাথার ওপর এক ফালি আকাশের দিকে। বসে বসে গুনতাম কতবার পাক খেল দুটো শকুন আমার সেই ছোট্ট আকাশখানির গায়ে। তারা চলে গেলে আসত একটু টুকরো সাদা

মেঘ । এসে চুপ করে চেয়ে থাকত গরাদের ভেতর দিয়ে আমার দিকে । আন্তে আন্তে তার রূপ পালটাতে । একটু একটু করে চারটে ঠ্যাং গজাল গজাল শুঁড় । দেখতে দেখতে বেশ স্পষ্ট একটা হাতি হয়ে উঠল । তারপর, ধীরে ধীরে বড় পাঁচিলের ও-ধারে কোথায় চলে গেল ।

বেলা দশটা নাগাদ পাঁচিলের ওপব এসে বসত এক শালিক দম্পতি । কলহ-কচকচির সীমা নেই ওদের । আব কি ব্যস্ত । একটা কিছু ফয়সালা না করেই আবাব ছুঁজনেই ফুডুং ।

বিরক্ত হয়ে নিজেব ছোট্ট কুলায় নজর ফিবিষে আনতাম । রিক্ততা—চবম নিঃস্বতা যেন দু’হাত মেলে আঁকড়ে ধবতে আসত । কিছু নেই, দেওয়াল চাদ সমস্ত নিখুঁত সাদা—সাদা ধপধপ কবছে । চোখ বলসে যেত । চোখ বৃজতাম । চিত হয়ে শুয়ে পড়তাম আমাব সেই রাজ-শয্যায় । কিছুক্ষণ পবে সব পালটে যেত ।

বন্ধ চোখের ওপব ভেসে উঠত আঁকাবাঁকা একটি সন্ধ্যা । দু’পাশের হোগলা আর নলবন হয়ে পড়েছে খালের ওপব । খাল দিয়ে চলেছে একখানি শালতি, মাঝখানে বসে আছি আমি । একটি লোক আমাব পিছনে দাঁড়িয়ে লগি ঘেরে শালতিখানাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে । মাঝে মাঝে মাথা হুটয়ে নিতে হচ্ছে, নযতো নলপাতায় মুখ মাথা কেটে ফালা ফালা হবে । চলেছি তো চলেছিই । অনেক দূব যেতে হবে যে আমাকে । যাচ্ছি সেই নলবুনিয়া । উমেদালি মোল্লার ব্যাটা তোবাব আলির ঘর নলবুনিয়ায় ।

শালতি গিয়ে লাগবে তোরাবের বাড়ির ঘাটে । সেই ঘাটে উঠে আমি পাব সাকিনাকে, হুককে আব তোরাবের ছোট ব্যাটাকে—যাকে সে মাত্র এক বছরেবটি ফেলে এসেছে, আর ওদের মাকে । তাদের সকলকে বুঝিয়ে বলে আসতে হবে আমায় যে, চোদ থেকে আট বাদ দিলে থাকে মাত্র ছয় । আর ছয় তো কিছুই নয় । দেখতে দেখতে এই ছয়ও পাব হয়ে যাবে । তখন আর কিছুই থাকবে না । তোরাব ফিরে আসবে । আব কিসের ভাবনা ।

বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বলে আসতে হবে যে, তোরাবের হিসেবে বিন্দুমাত্র ভুল হয় নি । তারাও যেন হিসেবে ভুল না করে । যেন ভুলে না যায় যে, উমেদালি মোল্লার ছেলে তোরাব আলির রক্ত মাংস হাড় দিয়ে তারা তৈরী । কোনও ভেজাল যেন না মেশে সেই রক্তে, কারণ তাদের খুন হচ্ছে একদম আলাদা জাতের খুন । তাদের বাপজান তাদের ভোলেনি । নিমকহারাম নয় সে, তারাও যেন তাদের বাপজানের কথা না ভোলে ।

সাকিনার মাকে আমি বুঝিয়ে আসতে চলেছি। আমাকে একটু নরম হয়ে মিনতি করে বলে আসতে হবে সাকিনার মাকে—তুমি তো জান, তোরাব তোমায় ভুলতে পারে না। আটটা বছর নিমিসের তরেও তোমার কথা আর তোমার ছেলেমেয়ের কথা সে ভুলতে পারে নি। তুমি কি করে ভুলতে পারো তোরাবকে? কি সে না করেছে তোমার জন্তে। কোন্ আবদাবতি সে রাখেনি তোমার? যখন যা চেয়েছ তাই—রূপোর মল, বাউটি, কোমরের বিছা, গলার চিক, ধানগাছ রঙের রেশমী ডুরে। কোনও দিন তোমায় ছোট কাজ করতে দেয় নি তোরাব—মাঠে যাওয়া, ধান ভাড়া, বা মাছ ধরা! তোমার ইজ্জত আবরু নিখুঁত বজায় রেখে গেছে সে—সে-সব কথা কি তুমি ভুলতে পারো? নিজের কামাত তোরাব। যে করে কামিয়ে ‘আম্বুক সে, এনে তোমার ছ’ হাত ভরে দিত। আর মাত্র ছ-টা বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। যখন ফিরে এসে তোরাব তোমাদের—

তোরাব ফিরে এসে সস্তর্পণে ডাক দিত, “কর্তা, ধুমিয়েছেন নাকি?” উঠে পড়তাম। হানিমুখে তোরাব জানানত, “ভাত খাবার বেলা হল যে। এবার গিয়ে ভাত নিয়ে আসব। —বলে নিজের জামার তলা থেকে আধখানা কাগজি নেবু বার করে দিত। ব্যবস্থা করে হাসপাতাল থেকে আনিয়েছে আমার জন্তে।

বলতুম, “আবার এসবেব বুঁকি কেন নিতে যাও তুমি? একটা ফাসাদ বাধতে কতক্ষণ!”

গ্রাস্ত করত না তোরাব, মুখ টিপে হাসত। বলত, “একবার হুকুম করুন না হুজুর, সব হাফিজ করে দিচ্ছি। বোতল থেকে কালাচাঁদ পষন্ত। এখানকার সব মামুকেই চিনি। কে কি করে না-করে চোখ বুজে টের পাই আমি। হয় মামদোবাজি ছাড়, নয়তো আমার মুখ বন্ধ কর—বাস্!”

ঝন ঝন ঘটং ঘট শব্দ করে সেলের দরজাগুলো খুলতে খুলতে জমাদার সাহেব এগিয়ে আসত। তোরাব চলে যেত। মিনিট দশেক পরে সঙ্গে নিয়ে আসত আর একটি লোককে। তার উর্বার্জ সম্পূর্ণ উলঙ্গ, টস টস করে ঘাম ঝরছে। সেই লোকটির হাতে প্রকাণ্ড একখানা বারকোশের ওপর ভাতের খালা, ডালের মগ আর দুটো এলুমিনিয়ামের বাটি।

বারকোশ নামিয়ে দিয়ে লোকটি চলে গেলে তোরাব নামিয়ে দিত ছখানি গরম আটার কুটি তার বোয়ালের ভেতর থেকে। দিয়ে এমন মুখ করে আমার দিকে চাইত যেন সে হচ্ছে এ বাড়ি কর্তা আর আমি তা. অতিথি। মরমে সে মরে যাচ্ছে আমার সামনে শুধু কুটি নামিয়ে দিতে।

তাড়াতাড়ি সেই গরম কুটি কখানি লবণ সহযোগে গোগ্রাসে গলাধঃকরণ

করতাম। এ ভিন্ন অন্য উপায়ও ছিল না। বি ক্লাসের জন্তে বিশেষভাবে প্রস্তুত সেই ভাত-তবকারি-বাঞ্জন কোনও দিন স্পর্শও করিনি। করবার সাহসও ছিল না আমার। দর্শনেই পেটের ক্ষুধা মাথায় উঠে যেত। তোবাবের লুকিয়ে আনা ওই কুটি কথানিই ছিল অগতির গতি। জেলের কয়েদীরা জাঁতায গম ভাঙে। সেই আটায বানানো হয় কুটি। জেলে ওই একটি জিনিস পাওয়া যেও যার মধ্যে অন্য কিছু মেশানো নেই। ওই-জিনিসটি না থাকলে একটি লোকও বাঁচত না জেলে গিয়ে।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে আবাব দরজায় তালা পড়ত। তোবাব যেত থেয়ে আসতে তখন। বেলা দুটো নাগাদ আবাব এসে দাঁডাত গরাদ ধরে। তখন একটানা দু' ঘণ্টা গল্প চলত আমাদের। কে আসছে দেখতে?

সেই সময় তাব মেজাজটা থাকত নবম গরম কিছুই না হয়ে। সেই সময় আমি তাব সহজ সবল অনাড়ম্বর জীবন-কাহিনী শুনতাম। আজ প্রথম দিকের একটু শুনলাম, তারপর শেষের দিকে খানিকটা হয়তো শোনাতে সে দশদিন পবে। মাঝখানের সবটুকু অনেক দিন ধবে আরও নানা কথার সঙ্গে মিলেমিশে বেকল তাব মুখ দিয়ে। এইভাবে শুনেছিলাম তাব জীবন-কাহিনী, আগাগোড়া সবটা সাজিয়ে শুঁচিয়ে নিলে তোরাবালিব জীবনী হচ্ছে এই—

নলবুনিষার উমেদালি মোল্লার ছেলে সে। উমেদালিব একমাত্র ছেলে। ঘরে ধান-পান ছিল উমেদালিব। তঠাৎ মাথায় কি খেয়াল চাপল। খয়রাত শুক কবে দিল। হাল-বলদ লাঙ্গল-জমি বিলকুল খয়রাত হয়ে গেল। শেষে নিজে চলে গেল হজ্জ কবতে। যাবার সময় ছেলের হাত ধবে বলে গেল, দেখিস বাপজান, বংশেব মুখে যেন কালি না পড়ে।

তোবাবের মা অনেক আগেই বেহেস্তে গিয়েছিলেন। হজ্জ থেকে তার বাপজানও আর ফিরে এলেন না। ঘরে রইল শুধু তোরাব, বোল বছরের মরিষম আর ছোট সাকিনা। অনেক খুঁজে পেতে উমেদালি ছেলের বিষে দিয়ে নবো বছরের মরিষমকে ঘরে এনেছিল। নাতনি সাকিনার মুখ দেখে সে হজ্জের পথে পা বাডাল।

ধর্মপ্রাণ লোক ছিল উমেদালি মোল্লা সায়েব। ও-তল্লাটে সকলেই এক ডাকে চিনবে তাকে। নলবুনিষার উমেদালি মোল্লার ঘর বললে, যে-কোনও নৌকো নিয়ে যাবে পিরোজপুর থেকে। কোনও কষ্ট হবে না।

বাপ চলে গেলে তোরাব নামল সংসার করতে বউ-বেটা নিয়ে। কিন্তু করবে কি? যতদিন বাপ ছিল, একমাত্র ছেলেকে সে কুটোটি ভাঙতে দেখনি। সর্বস্ব

খয়রাত করে বাপ নিজের পথ দেখলে, তোরাবকেও আপন পথ খুঁজতে হল। অবশেষে পথের সন্ধান পেল সে। ওস্তাদ আসমতালি সায়েব তাকে নিজের সাক্ষরদ করে নিলেন। এক ধারে বিষখালি, অপর ধারে বালেশ্বর। সমগ্র এলাকাটি জুড়ে ছিল ওস্তাদ আসমতালি সায়েবের কর্মক্ষেত্র। নিজের দল নিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারতেন তিনি। তারপর সকলকে ভাগ-বন্টন দিয়ে যা থাকত তাই নিজের বলে নিতেন। ওস্তাদের মেহেরবানিতে অল্পদিনেই তোরাব লায়ক হয়ে উঠল। দু-একটা জেদেব কাজে সবার আগে ওস্তাদের হুকুম পালন করে প্রমাণ করে দিলে যে, কিছুতেই তার প্রাণ কাঁপে না।

একবার এক জায়গায় হানা দিয়ে তারা বাড়ির কর্তাকে বেঁধে ফেললে, লোকটা কিছুতেই বলবে না, কোথায় টাকাকড়ি লুবিয়ে রেখেছে। বার বার জলন্ত মশাল চেপে ধরা হল তার শরীরে, 'তবু তোর মুখ ফুটল না'। একটা মাস চয়েকের ফুটফুটে বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে ধরে সেট লোকটার নাতবউ ধরধর করে কাঁপছিল। ওস্তাদ হুকুম দিলেন, ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে পা ধরে আছাড় মারতে। কেউই এগোয় না। হুকুম শুনে সব সাক্ষেদেব মাথা ঝেঁট। গোবান এগিয়ে গেল। এক ঠেঁচকায় ছেলেটাকে ছিঁনিয়ে নিয়ে তার পা ছুঁতে ধরে ঘুরিয়ে মারলে এক আছাড়। ফটাস করে মাথাটা ফেটে এক ঝলক রক্ত ছিটকে গিয়ে লাগল সেট লোকটার মুখে। তখন সে বাগে এল। টানাকড়ি যেখানে পুঁতে বেবে, হন সেট জায়গাটা দেখিয়ে দিলে।

ওস্তাদ আসমতালি খুশি হলেন। বড় বড় কাজেব তার দিতে লাগলেন তোরাবকে। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না। ভুল করে আবার বাতে নদীর বুকে পুলিশ সাহেবের নৌকোয় চড়াও হয়ে গুলির মুখে জ্ঞান দিলেন ও। পাঁচজন সাবরেদমত। জলের তলেই তাঁর সমাধি হল। দল ভেঙে গেল।

তোরাব ঈচ্ছে করলে দল বাঁধতে পারত। কিন্তু ও-কাজে বেজায় ঝুঁকি। বড় বড় কাজে হাত দিতে হবে। দল বাথতে গেলে, সকলেব চলা চাই, এমন সব কাজে হাত দিতে হবে। কিন্তু একজন ধরা পড়ে যদি বেইমানি করে বসে তা হলেই সর্বনাশ। দল নিয়ে মাসের পর গাস বউ-বেটা ঘরে ফেলে ঘুরে বেড়ানো চাই।

দল ঠাধবার অংশ ছেড়ে দিলে তোরাব। ছোটখাট ঠিকের কাজ চাপাতে লাগল, যা একলা সামাল দেওয়া যায়। ফুরনের কাজ। মজুরি আগে দিয়ে দিতে হবে। সব কাজের মজুরিও সমান নয়। যেমন ঝুঁকি তেমনি মজুরি। রাতের আধারে বেড়া কেটে ধরে ঢুকে রামদার এক কোপে কর্ম শেষ করে আসবার যা

মজুরি তাতে নদীর বুকে নৌকোর উপর হামলা করে জলে ডুবিয়ে রেখে আসা হয় না। যেমন কাজ তার উপযুক্ত দক্ষিণ। সম্পূর্ণ টাকা হাতে পেয়ে যজ্ঞমানকে কথা দেওয়া হত, এক মাস বা দু'মাসের মধ্যে তার পূজা বলিদান সব সুসম্পন্ন হয়ে যাবে।

বেশ চলছিল তোরাবের সংসার। মাসে দু' তিন রাত ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যাওয়া আবার শেষ রাতে ঘরে ফিরে শান্তিতে বউ-ছেলে নিয়ে ঘুমনো। তুচ্ছ তখন ঘরে এসেছে। মাসে দু-একটা ছাড়া কাজে হাতই দিত না তোরাব। প্রাণে কি চায় চাঁদপানা ছেলে-মেয়ে ঘরে ফেলে আঁধার রাতে শিকারে বেরতে! কিন্তু পোড়া পেট যে মানে না। তার ওপর নিত্য নতুন বায়না সাকিনার মায়ের। সে বেচারী তো জানত না, তোরাবের কজি-রোজগারের উপায়টি কি। সে জানত, তোরাব নৌকা বায়। গল্পে গিয়ে বেচাকেনা করে মাল।

হায়রে পোড়া নসিব, শুধু একগাছি রশি, হাতে পাকানো একগাছি সামান্য শণের দড়ি। তোরাবের এতবড় ভাগ্যবিপক্ষের হেতু হল শেষ পর্যন্ত ওই একগাছি সামান্য দড়ি।

জগতের অনেক নাম-করা কেতাবে বজ্রুতে সর্পজন্মের কথা লেখা আছে। তোরাবের জীবন-নাটকের সবচেয়ে জমজমাট দৃশ্যে একগাছি রজ্জু কালসর্প হয়ে তার শিরে দংশন করলে।

নলবুনিয়ার পাশের গ্রামের দুহু মিঞা। দুহু মিঞার পাঁচখানা হাল, তিনটে মরাই, চার-চারজন বিবি, একপাল নোকর-বাদী। যাকে বলে খানদানী ঘর। এমন যে দুহু মিঞা তিনি একদিন স্বয়ং তোরাবের ঘরে এসে তার হাতে পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়ে গেলেন। সামান্য কাজ। বলে গেলেন, কাজ খতম হলে আরও পাঁচ কুড়ি। তোরাব বলেছিল মিঞা সাহেবকে যে, টাকা আর সে নেবে না। তার পোলাপান দুধ পায় না। মিঞা সাহেবের অনেক গরু-বাছুর। যদি তার কাজে মালিক খুশি হন, তা হলে যেন একটা দুধালো গাই আর বাছুর দেন। তার পোলাপান দুধ খেয়ে বাঁচবে। রাজী হয়ে মিঞা সাহেব ফিরে গেলেন।

খোঁজখবর নিতে লাগল তোরাব। নিয়ে দেখলে, ব্যাপারটা একটা মেয়েছেলে নিয়ে রেবারেবি। দুহু মিঞা ঠিক করেছেন, তাঁর স্ত্রী সম্মানী লোকের অন্তত পাঁচটি বিবি থাকার একান্ত প্রয়োজন। পাঁচটা কেন, পঁচিশটারও অভাব হত না তাঁর বিবির। কিন্তু কি যে মরজি হোল তাঁর, গৌ ধরে বসলেন যে ওকেই চাই—আমিহুদিকে শেখের চোদ বহরের বউটিকে চাই স্ত্রীর। আমিহুদিকে সত্তাতে হবে। তাই একশো টাকা দানদন দিয়ে গেলেন দুহু মিঞা তোরাবকে।

কিন্তু জুতমত পাওয়াই মুশকিল ছোকরাকে। ভয়ানক হুঁশিয়ার। বউকে সরিয়ে ফেলেছে দূর গ্রামে এক আত্মীয়বাড়ি। তাতেই আরও ক্ষেপে উঠেছেন দুই মিঞা। কিন্তু করতে পারছেন না কিছুই। আমিহুদ্দির বিধবা মা একমাত্র ছেলেকে বুক দিয়ে আগলে আছে। সন্ধ্যার আগেই আমিহুদ্দিকে ঘরে ফিরে মার পাশে পাশে থাকতে হয়। কার সাধ্য তখন এগোয় মায়ের বুক থেকে ছেলেকে টেনে আনতে।

হঠাৎ একদিন আমিহুদ্দি এমে উপস্থিত তার মাকে নিয়ে তোবাবের কাছে। লজ্জা শরম ত্যাগ করে 'আকুল জননী' তোবাবের হুঁহাত চেপে ধরলে। তার একমাত্র ছেলের প্রাণভিক্ষা চায়

কি করে কোথা থেকে যে হৃদিস পেল ওঃ! 'তোবাব তো প্রথমে খুবই রেগে উঠল, এ-সব কথা তাকে বলবার মানে কি? ওই সমস্ত কাজ সে করে নাকি? কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মায়ের প্রাণ খোদাব দোয়ায় সব জানতে পেরেছে। তোবাবকে কথা দিতে হল, দুই মিঞার টাকা সে খাবে না।

মা-বেটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

কিন্তু কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেনে না তোবাব। তারপর মাস দুই আর কোথাও থেকে ডাক এল না। একটা পয়সা বায়না দিয়ে গেল না কেউ। শ্রাবণ মাস, ঘরে ক্ষুদ্রটুকুও বাড়ন্ত হল। তখন রক্তর পরে আব একটি এক বছরের বাচ্চা মরিয়মের কোলে। বাচ্চা মায়ের বুক চুষছে। চুষবে কি, বুকেও দুধ নেই, পেটে যে দানা পড়ে না মায়ের।

দিন আর কাটে না। একদিন আচলো চোখেব পানি মুছলো মুচলো মরিয়ম এসে দাঁড়াল তার সামনে। এভাবে আব চলতে পাবে না। ছেলেমে র হাত ধরে সে উঠবে গিয়ে ওই রয়জুদ্দির ঘবে।

খুন চেপে গেল তোবাবের মাথায়। তার বলিজার মধ্যে আঙুন ধরে গেল বেইমান রয়জুদ্দির নাম শুনে। হারামীর বাচ্চা চাটগাঁ থেকে জাহাজে করে সফর কেমিয়ে আসে। ন-মাসে ছ-মাসে ঘরে ফিবে দু দশ দিন থাকে। তখন তার বাহার কত। গোলাপী রঙের রেশমী কুমাল গলায় জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় শিস দিয়ে। পরনে পাজামা, ফুলতোলা আদ্রির পাঞ্জাবি, চোখে চশমা। যেন কত বড় এক নবাবজাদা! গায়ের সোমস্ত বউ-ঝিনের এটা-ওটা উপহার দেয়। দু-এম্বার তোবাবের দাওয়াতেও উঠে বসেছিল রয়জুদ্দি। বাঁকা বাঁকা বোলচাল ঝাড়ত তোবাবের বিবিকে শুনিয়ে। অসহ্য লাগল তোবাবের, একদিন রাম-দা দেখিয়ে দিলে। সেই থেকে তোবাবের ঘর এড়িয়ে চলত রয়জুদ্দি।

রয়জুদির নাম শুনে তোরাবের সংঘমেব বাঁধ ভেঙে পড়ল। চুপি চুপি আরও পঞ্চাশটা টাকা আর আধ মণ ধান নিয়ে এল দুহু মিঞার কাছ থেকে সে।

দুহু মিঞার চাপ যে বেড়েই চলল। আগে টাকা খেয়েছ, এখন না করলে চলবে কেন? এক নিষুত্তি বাতে বেকতে হ'ল তোরাবকে ঠিকের কাজ সারতে।

ঠিকঠাক হয়ে গেল সব। বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে কান পেতে শুনলে সে ঘুমন্ত লোকের নিঃশ্বাসেব শব্দ। অন্ধকাবেব মধ্যে চোখে ভেসে উঠল মাচান ওপর পাশ ফিরে শোওয়া যুবক আমিনুদ্দিন তাজা দেহটা। গুস্তাদেব নাম নিয়ে ঠিক ঠাহর কবে ঝাঙলে এক কোপ বাম দা তুলে। সামান্য একবার একটু আওয়াজ বেকল—বাপ। তারপর একেবাবে নিস্তব্ধ। তখন যদি আব একটা কোপ দিয়ে আসতে পারত সে।

পাশেব ঘবেব লোক জেগে উঠেছে তখন। আব ফুবসং পেলে না তোরাব। কাম যে ফতে—এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই সে ঘাবে ফিবল। গিরে তাব মাকিনা আব নুকে বকে জড়িয়ে ধবে নিশ্চিন্তে ঘুমাল।

কিন্তু সবই হচ্ছে খোদার মবজি। সবই তার পোড়া নসিবেব ফল। এক-গাছা দাড়ি গোড়ানো ছিল সেই মাচান ওপর। তোরাবের কোপ সেই দাড়ি কোটে তবে নামন লোকটাও ওপর। ফলে শুধু কাটা গেল তার একখানা হাত। হাত কেটে পাজরায় যেটুকু চোট লাগল, তাও তাব কিছুই হ'ল না। তাকে নৌকায তুলে মহকুমায় নিয়ে গেল গ্রামেব নৌকেবা। দেখানে হাকিমেব কাছে তোরাবের নাম কবে দিলে আমিনুদ্দিন।

গেল সব ভেসে। ঘব-সংসাং ছেলেমেয়ে বউ সন্ত বইল পড়ে। তোরাবকে চোন্দ বছবেব জন্তে ছেড়ে আসতে হ'ল তাব মাকিনাকে, তাব নুকে আব সেই এক বছরেব দুধের বাচ্চাটাকে। তাদের দুখ খাওয়াবান জন্তে একটা গাই আন বাছুব জোটাতে গিয়েই এই ফ্যাসাদ বাধল।

“হা খোদা, এই কি তোমার বিচার। কি অপরাধ করেছিল সেই দুধের বাচ্চারা তোমাব দরবাবে। কোন দোষে তাদের বাপজানকে হারাল তারা? কি পাপে আজ তারা পথের কুকুরের মত পরেব দবজায় পড়ে আছে?”

বলতে বলতে আর গলা দিয়ে আওয়াজ বেকত না তোরাবের।

যে হাত দিয়ে সে লে হার গরাদটা ধরে থাকত, সেই হাতখানা কাঁপত থরথর করে। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বছদূরে আকাশের গায়ে কি পড়ল তোরাব—তা আমি বলতে পারব না।

আমার নয় থেকে খরচা হয়ে গেল আট। আর তোরাবের চোদ্দ থেকে নয় বাদ গিয়ে রইল পাঁচ।

শেষের কটি দিন।

সকালে বিকেলে দুপুরে ত্রিশবার করে শুনতে লাগলাম, কোথা দিয়ে কেমন করে কত কম খবচে নলবুনিয়ায় গিয়ে পৌছতে পাবব আমি। একবার যে যেতেই হবে আমার দেখানে। তাদের যদি ভুল হয়ে গিয়ে থাকে তাদের মনে করিয়ে দিয়ে আসতে হবে যে, আব বাকি আছে মাত্র পাঁচ। এই পাঁচ থেকেও আর এক বছর ঠিক ছাড় পাওয়া যাবে। তাব মানে মাত্র আর চারটে বছর। এ আর কতটুকু সময়। খুব সাবধানে থাকে যেন তাবা। খুব সাবধানে, কোনও ছোঁয়াচ যেন না লাগে উমেদালি মোল্লাব ছেলে তোরাবালির বংশে।

কিছুতেই তোরাবকে বিশ্বাস করতে পারাম না যে, যাবই আমি তার বাড়িতে। যত খসচই লাগুক আব যতদিনই লাগুক। গোরাবের চুরি-করে আনা ক্রটি দোস্তা লেবু—এক কথায় তাব অতিথি হয়েই কাটালাম আমি ন'মাস। এ খন আমি শোধ করব।

কিছু ওখান থেকে তাদের দেখে এসে তোরাবকে সংবাদটা দেওয়া যাবে কি কবে।

তাবও কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু একবার সাকিনা, হুজুর আর মুরুর ভাইকে মনে করিয়ে দিয়ে আসতে হবে যে, তাদের বাপজান এল বলে। এসে সে তাদের তাব কাঁধে তুলে নেবে, তখন আর চিন্তা কি।

আমাব ছাড়া পাবাব আগের দিন তোরাব আব নিজেকে সামলাতে পারলে না। হু-হু কবে কঁদে ফেললে সে। বললে, “কত বাবুকেই ঠিক এই ভাবে পেয়াযঃ কবলাম হজুব। সকলেই কথা দিয়ে গেলেন। কে জানে, ওরা যেতে পেবেছেন কিনা! যদি তাঁরা একবার যেতেনই দেখানে, তাহলে এই আট বছরের মধ্যে অন্তত একবারও কি সাকিনার মা ছেলে-মেয়ে নিয়ে দেখা করতে আসত না এখানে?”

গরাদের ফাঁক দিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখি। কি জবাব দেওয়া যায়।

হঠাৎ দপ করে জলে উঠল তোরাব। একটা কাল-কেউটে যেন ফৌস ফৌস করে উঠল।—“সেই হারামজাদা রয়জুদ্দ। সে ঠিক দখল করেছে সব। তার গ্রামে নিশ্চয়ই গেছে আমার সমস্ত। হেই খোদা, যেন পাঁচটা বছর আর পার করতে পারি আমি। যদি তাই হয়, যদি তাই হয়ে থাকে—”

দাঁতগুলো সব কড়মড় করে উঠল তোরাবের।

পরদিন সকাল সাতটায় আমায় জেল-আপিসে পৌঁছে দিয়ে তোরাব মুখ বুজে ফিরে গেল। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ওর কাঁধের ওপর ডান হাত দিয়ে একটা চাপ দিতে পেরেছিলাম আমি।

জেলগেট পার হতেই মহা সমাদরে আমায় গ্রহণ করলেন বাইরের কর্তারা। এবং মহাযত্নে সোজা স্টামারে নিয়ে তুললেন।

তারপর নলবুনিয়ার বদলে বীরভূমের নলহাটি পৌঁছে মাঠের মাঝে একখানা খড়ের ঘরে তিন বছরের জন্তু আশ্রয় পেলাম। নলবুনিয়া অনেক পিছনে পড়ে রইল।

আরও সাত বছর পরে। অল্প এক জেল। এবার আমার ভাগ্যে সাগর ভিড়োনার ডাক এসেছে। জাহাজের আর কয়েকটা দিন দেয়। এক বোঝা অলঙ্কার পরিয়ে রাখা হয়েছে আমায়। তা প্রায় সবস্বচ্ছ সের পাঁচেক ওজন। দু'পায়ের গোছে দুটো লোহার বেড়ি। এক-একটা দু'হাত লম্বা লোহার ডাঙা আটকানো সেই বেড়ির সঙ্গে। ডাঙা দুটোর অল্প প্রান্ত দুটো আবার আর একটা লোহার বালায় লাগানো। একেবারে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত। একটা হাত দিয়ে সেই লোহার বালাটা কোমরের কাছে ধরে হবে চলাফেরা করতে হয়। ঝড়াং ঝড়াং বাজনা বাজে পা ফেললেই।

চালান হয়ে এলাম গয়নাগাটিস্থ কলকাতায়। তোলা হ'ল এক সেলে। দিন চারেক পরে তোলা হবে জাহাজের খোলে।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। পাশের সেল থেকে কে গোড়াচ্ছে। বর্শ-শালিয়া ভাষায় কে বলছে—“সাকিনা রে, স্তর রে, তোদের জন্তু কিছুই করে যেতে পারলাম না রে, কিছুই করে যেতে পারলাম না।”

কান খাড়া করে শুনে লাগলাম—“কোথায় তোরা পড়ে রইলি রে, তাও জেনে যেতে পারলাম না।” কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর হঠাৎ উৎকট শব্দে হা-হা করে হাসি।—“শেষ করে এসেছি হারামীর বাচ্চাদের। দুটোকেই জাহান্নামে পাঠিয়ে তবে এসেছি নিজে। সেখানেও কি তোরা শাস্তি পাবি মনে করেছিলি? দাঁড়া, আসি আমি। তারপর দেখাব তোদের।” আবার সেই প্রেতের হাসি রাতের আঁধারকে খান খান করে ফেললে।

হঠাৎ আমিও চিৎকার করে উঠলাম, “তোরাব, তোরাবাঁলি মেট!”

হাসি থামল। ভাঙা গলায় সাড়া দিলে, “কে?”

দু'হাতে সেলের গরাদ দুটো আঁকড়ে ধরে গরাদের কাঁকে মুখটা চেপে চেঁচাতে

খাকলাম, “আমি—আমি তোরাব। সেই যে বরিশাল জেলে আমি সেলে ছিলাম আর তুমি আমার ঋটি থাইয়ে বাঁচিয়েছিলে ন’ মাস। সেই যে—”

নিম্পূহ-কণ্ঠে জবাব এল, “তা কি বলছেন বলুন?”

আকুল হয়ে উঠলাম, “এবার আমার চিনতে পেরেছ তোরাব? সেই যে তুমি আমার নলবুনিয়া যেতে বলছিলে।”

সে জিজ্ঞাসা করলে, “তা কর্তা, আবাব এলেন কেন?”

কি উত্তর দেব? বললুম, “নসিব ভাই, সবই নসিব। এবার কালাপানি পেয়েছি। আর পাঁচ দিন পবেই জাহাজ ছাড়বে।”

একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা কবলাম, “কিন্তু তোমাব তো এতদিনে খালাস পাবাব কথা। সে সময়ে আমনি যেন হিসেব কবেছিলাম যে, আব মাত্র পাঁচ বছর বাকি ছিল তখন তোমাব।”

আবাব সেই প্রেতেব হাসি শোনা গেল পাশের সেল থেকে। হাসি থামলে স্তনতে পেলাম, “এবাব একেবারে খালাস পাব কর্তা। সেবাব হিসেবেব ভুল হয় নি। চার বছর পাবহ বাইরে বেগিয়েছিলাম সেবাব। তারপর তাদের খুঁজে বার করতে লেগে গেল পুরো এক বছর। এই শহরেবই এক বসতি। ওয়াচগঙ্গ না মুন্সিগঙ্গ কি নাম তাব। সেহখানে নাদের পানডাও কবলাম। বয়জুদ্দ সাংবে আব তার বেগম মবিখম দিবিকে কং তাব পদা, কং আবক, কত ইজ্জৎ। দবজায় চিক চাঙানো। পামে বাহাব চটি, গালে চোটে চাঙে রঙ, চোখে সুন্দম। আমমান নদের ফুল-তোলা ফুবুরে গাড। তা ওই সমস্ত বাহাব সুন্দর সে গেছে। একই সঙ্গে দু’জনকে ঠিক জায়গায় আশনাহ করতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আম এখানে এসেছি। আমাকেও তাডাতাডি যেতে হবে কিন ওদের পছন্দ পিছু।”

আবাব সেই উৎকট হাসি।

ওয়াডাব ভেডে এসে আমার সেলেব দবজায় কলেব ঘা মারতে লাগল, “এই, হল্লা বন্ধ ববো।”

ওকে গ্রাহুই করলাম না। চিংকার করে বললাম, “তোরাব ভাই, তোমাকে কথা দিয়ে রাখতে পারি নি আমি। তোমার ছেলেকে দেখতে যাওয়া হয় নি আমার। জেলগেটেই আবাব গ্রেপ্তার হয়ে—”

এবার আমার সেই আগেকাব তোরাবের গলা মত পেলাম। সেই একান্ত আত্মীয়ের গলা।—“সে খবর আমিও পেয়েছিলাম কর্তা। আপনি আর মনে হুংখ রাখবেন না। গেলেও আপনি তাদের দেখা পেতেন না। আমিও ফিরে

গিয়ে তাদের পাই নি। তাদের মা তাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার পর তাদের কি দশা হয়েছিল কেউ তার খোঁজ দিতে পারল না। ছেলোমেয়ে বউ ওসব শাঁখের করাত—কর্তা, একেবারে শাঁখেব করাত। আসতে কাটে, যেতেও কাটে।”

ওষাডীর তোরাবের দবজায় গিয়ে রুল ঠুকতে লাগল। তাব পরদিন সকালে অল্প প্রান্তের মেলে আমাকে সরানো হ'ল। আর জাহাজও ছাড়ল ঠিক পাঁচ দিন পরে।

আমি রওনা হলাম। আমার যাত্রাব আজও শেষ হয় নি। কিন্তু আমার বন্ধু তোবাব বোধ হয় ঠিক জায়গায় পৌঁছে এতদিনে শান্তি পেয়েছে।

২

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মত। হয় লুকিয়ে থাকা, নয় পালিয়ে বেড়ানো, এই কবে জীবন কাটছে তখন। যেখানে বহু লোকের ভিড় জমে, সেখানেই লুকিয়ে থাকার সব চেয়ে বড় সুযোগ। তাতেও যখন পোষায় না তখন পালিয়ে বেড়াই। কোনও কাবণ না থাকলেও পালাতাম, পাছে কেউ কিছু আমার সম্বন্ধে চিন্তা করে এই ভবে লুকাতাম। কয়েক বছর জেল খেটে বার হয়ে মনে কবলাম যে, আমি এমনই একটা ভয়কব কিছু হয়ে পড়েছি যার জন্তে দেশহুদু সবাই আমার সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে বাধ্য। দেশের জন্তে যখন জেল খাটলাম তখন দেশের লোকে হত্রে হয়ে খুঁজবে না কেন আমাকে? বিশেষতঃ গুঁরা, যাদের খা তায় জনজল করছে আমার নাম, নামের পাশে লেখা আছে—আত বিপজ্জনক জীব—তঁরা যে আমার গল্প-খোঁজা কবে খুঁজছেন সে সম্বন্ধে কি আর কোনও সন্দেহ আছে? হায়, তখন কে জানত যে, গুঁরাও এই দেশের লোক স্তরাং সমান সমান অকৃতজ্ঞ। আমার মত দেশসেবকের কথা শ্রদ্ধা ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছেন! শুধু লিখে রেখেছেন নিজের খাতায়—খামখেয়ালী লোক, কোনও ভয় নেই এর সম্বন্ধে।

কিন্তু ভুলতে দেব কেন আমি সকলকে আমার কথা? নিজেকে নিজে জড়িয়ে রাখব এমন রহস্যের মাঝে, করে বদব এমন সব তাজ্জব কাণ্ড-কাবখানা যার কোনও অর্থ খুঁজে না পেয়ে সবাই অস্থির হয়ে উঠবে। তবেই না মজা।

এই মজায় তখন পেয়ে বসেছে আমাকে।

জুটেছিলাম গিয়ে গঙ্গামাগর মেলায়। কাজও জুটেছিল একটি। তেলোভাজার দোকানে বেগুনী-ফুলুরি-পাঁপের ভাজার কাজ। মনের আনন্দে দিন কাটছে ভাজা ভেজে। একটা উহনে আমি বসেছি আর একটা দোকানদার নিজে বসেছে।

সে ভাজছে কচুরি-শিঙাড়া-জিলিপি। দোকানদারের ছেলে বেচছে আমাদের দু'জনের ভাজা, পরমা গুণে নিয়ে ফেলছে মস্ত একটা পেতলের ডাবের। ভেজে কুলিয়ে গুঠা যাব না, এত খন্দেব। গুণ্যমান করতে গিয়ে তেলে-ভাজা খাওয়ার ঝোঁকটাই যেন বেশি ভা'খ্যাতীদের। এতগুলো দোকানে যত তেলে ভাজা ভাজা হচ্ছে এ চক্ষের নিমেষে যাচ্ছে উধাও হয়ে। পৌষ মাসেব শীতেও দরদর কনে ঘাম ঝবেছে আমাদের কপাল থেকে, ধোঁয়ায় আধ পোড়া মেলের গন্ধে দম আটকে আসছে। প্রচণ্ড ভিড়ে আব উড্ডম্ব বুলোষ কোনও দিকেই কারও নজর যাচ্ছে না।

তখনও সন্ধ্যা হতে বেশ দেরি আছে। হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে এবটা ভয়ঙ্কর গোলমাল উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দিগ বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল মানুষ। হুডমুড কবে মস্ত একটা পাহাড় যেন ভেঙ্গে পড়ল আমাদের ওপর। উত্তন কড়া-তেল বেগুন-পাপব সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল এক নিমেষে। গোলমাল উঠতেই দোকানদার চিংকাব কবে দাড়িয়ে উঠল কড়া ছেড়ে—‘হুঁশিয়ার ভেহা, আপনা জান বাচাকে।’ গল ঢাকা পয়সাব ডাবব তুলে নিয়ে ঠেব হোল। আমিও খুঁস্তি-ঝাঁজবা নেনে উঠে দাড়ালাম। পাল্লা বাচখাবা নিয়ে দোকানদারের ছেলে আগেই দৌড় দিশে উত্তর দিকে। সমুদ্রেব স্রোত মত মানুষের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল হোগলা পাতার ছাউনি উত্তন কড়াহ পবাও গামলা-ভাজা আভাজা সমস্ত মালপত্র। হুঁশা দোকান বসেছিল যেখানে সেখানে আব কোনও কিছুব চিহ্নমাএ বহন না।

এই ছিল গখনকাব সরকারী বাতি। গোঢ়াকতক হা'দি দিয়ে বহুদূর থেকে নোক গাড়া কবা হো'। উদ্দেশ্য অর্থাৎ মহৎ, খাবারব দোকান খে' কলেবা চডায়, সেচ দোকানগুলো উঠিয়ে দিতে হবে। জর্মনদাবকে উপযুক্ত সেলা' দিয়ে যাবা দোকান দবে বসেছে তাদের উঠতে বা'নে সহজে উঠবে কেন? আব কে-ই বা যায় অত ঝঞ্জাটে? সব চেয়ে ঢের শোজা প'য়া হচ্ছে নোখো থেকে কলকাটি নেড়ে সব ওছনছ কবে দেওয়া। কার হাতি, কেন থামকা ক্ষেপে উঠল হাতিবা, কেনই বা নোক তাড়া কবতে গেল, এসব প্রশ্ন কাবেই বা কবা হবে আর কেনই বা জবাব দেবে? কখন কোথায় হাতি ক্ষেপবে তাব জন্তে সরকারী হুজুরা দায়ী হতে পারেন না। হয়ত কিছু নোকের সর্বাঙ্গ পুড়ে গেল গরম তেলে আর জলন্ত উত্তনে, কয়েকজন মেয়ে পুরুষ হয়ত সশরীরে স্বর্গলাভ ন'ল মানুষের পায়ে তলায় পড়ে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? পরিকল্পনা-মত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ল তো।

দোকানদারের যা লোকমান হত তা তারা গ্রাহ্যও করত না। এই একমের

হাক্কাম-হক্কতের সঙ্গে তারা তৈরী হয়েই দোকান সাজাত, মজুদ মাল কিছুই রাখত না, হাক্কামা ঠাণ্ডা হলে আবার দোকান খুলে বসত মেলায় অশ্রুদিকে ।

লক্ষ লোকের সঙ্গে দিশাহারা হয়ে ছুটতে লাগলাম । কি একটা ছিটকে এসে পড়ল পায়ের ওপর । সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তার ওপর পেছনের মাহুঘের ধাক্কায় । হাজার হাজার লাথি পড়তে লাগল পিঠে । পায়ের দুই হাঁটু আর দুই হাতে ভর রেখে মাথা গুঁজে দাঁতে দাঁত দিয়ে রইলাম । কিন্তু সে মাজ কয়েকটি মুহূর্ত । শহরের রাস্তা নয় যে দু'পাশে লোক সরতে পারবে না । আর মাহুঘ কখনও ইচ্ছে করে মাহুঘের ওপর দিয়ে চলে না । চারিদিকে ফাঁকা মাঠ, কাজেই মাহুঘের পায়ের চাপে আর চিঁড়ে-চেন্টা হতে হল না । দু'পাশ দিয়ে লোকজন ছুটে বেরিয়ে গেল । আবার কয়েকজন দাঁড়িয়েও পড়ল আমার চারপাশে । টেনে তুলল আমাকে তারা । তুলে দেখে বুকের নিচে একটা চার-পাঁচ বছরের ছেলে । ছেলেটা অক্ষত রয়েছে কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ গেছে খেঁতলে আর নাক-মুখ দিয়ে অঝোবে রক্ত ঝরছে ।

বোধ হয় সামান্যক্ষণ হাঁশ ছিল না আমার । হাঁশ হতে দেখি হুড় হুড় করে মাথায় মুখে জল ঢালা হচ্ছে । চোখ চাইতে জল ঢালা বন্ধ হ'ল আর তখন প্রথম খেয়াল হ'ল যে ছেলেটা নিজের ছোট দুখানি হাও দিয়ে আমার একটা হাত আঁকড়ে ধরে আছে ।

চারিদিক হতে হাজার রকমের প্রশ্ন বর্ষণ হচ্ছে আমাদের ওপর । আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি, সঙ্গে আর বেউ এসেছে কিনা, গোথায় পৌছে দিতে হবে ? কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না । উত্তর দেবার মত অবস্থাও নয় তখন । ঠোট মুখ ফুলে উঠছে, বাক্বোধ হবার মত অবস্থা ।

ছেলেটি কিন্তু সমানে উত্তর দিচ্ছে সব প্রশ্নের । আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, আমি তার ছোট মামা, ঠাকুমা-বাবা সবাই এসেছে মেলায়, বাবার নাম শ্রীহিমাত্মশেখর ঘোষ, বাড়ি ভবানীপুরে । অতটুকু ছেলে, কিন্তু বেশ চালাক-চতুর । আমি ওর ছোট মামা হতে গেলাম কি করে ! ওর কথা শুনিছি আর মনে মনে ভাবছি এবার আমার কর্তব্য কি । কর্তব্য ছেলেটিকে ওর আত্মীয়দের হাতে দিয়ে আমার সেই ভেলে-ভাজা মনিবের সন্ধান করা । উঠে দাঁড়াতে গেলাম, পারলাম না, হাঁটু ছুটো যেন কে মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে ।

“এই যে এখানে, এই যে অরণ্য,” বলে চৌচিয়ে উঠল কে ।

“ওরে আমার গোপাল রে, ওরে মানিক আমার,” হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ভিড় ঠেলে সামনে এসে দু'হাতে ছেলেটিকে বুকে জাপটে ধরলেন এক বুড়ি ।

“কই কোথায়, কোথায় অরুণ,” কোমরে-চাঁদর জড়ানো এক ভঙ্গলোক এগিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে দু’জন পুলিশ আর একজন বোধহয় ছোট দারোগা। ছেলের মা-মোনও এসে পৌঁছল ছেলের কাছে। ছেলে ফিরে পেয়ে তাঁদের আনন্দ উল্লেখনা চরমে গিয়ে পৌঁছল। ছেলে বুড়ির বৃকের ভেতর থেকে জোর করে বেরিয়ে এসে আমাকে জাপটে ধরলে। তখন তাঁদেরও নজর পড়ল আমাকে দিকে। সুনলেন সকলের মুখ থেকে যে, আমি বৃকের নিচে রেখে পায়ের তলায় পিনে মরণের হাত থেকে গাঁচিগেছি ছেলেকে। বুড়ি তখন আমাকে জাঁড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ে দিলেন।

আমার আর সহ্য হ’ল না গোলমাল। আবার বেহাশ হয়ে পড়লাম।

যখন ভাল করে বোঝাবার মত অবস্থা নিয়ে ঘুম ভাঙল তখন চোখ চেয়েই দেখতে পেলাম একটি ছোট্ট মুখ। এক মাথা কৌকড়া চুল সুন্দর ছোট্ট একটি মুখ— আমার মুখের ওপর ঝুঁকি নিয়েছে।

আমাকে জাগাতে দেবে চিববার কবে উঠল সে, “ও মা, ও দিদি, শিগগিরি এস, ছোট মামা চোখ চাখিয়েছে।” বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘব থেকে। ভাল কবে চেয়ে দেখলাম চাবপাশ। খাটের ওপর ভাল বিছানায় শুয়ে আছি, খাটের পাশে দুটো জানালা দিয়ে অগাপ্ত বোধ এসে পড়েছে বিছানায়। আলমারি টেবিল চোখ দিয়ে খবর জানা শাকানো। বুঝতে পারলাম নেহাৎ গরীব লোকের ঘর নয়।

সব মনে পড়ে গেল। গঙ্গাসাগর মেলা, হেলে-ভাজার দোকান, প্রাণ নিয়ে পালানো, লোকের পায়ের স্নায় পড়া, একে একে সব ফুটে উঠল আমার স্মৃতির পর্দায়। ছেলেটির সুন্দর মুখখানিও মনে পড়ে গেল।

কিন্তু এখন আমি এ কোথায় কার ঘরে শুয়ে আছি!

অরুণের সঙ্গে অনেকে ধরে ঢুকলেন। অরুণ এক লাফে উঠে এল খাটের ওপর। আমার বৃকের ওপর ঝুঁকি পড়ে চোখো লাগল, “ও মামা, চোখ খোলো না! এই তো খুলেছিলে চোখ একটু আগে—ও মামা।”

কে ধমক দিলেন, “ছি: অরুণ, চোঁচিও না অত, তোমার মামাব কষ্ট হবে যে।” এবার কান্দো কান্দো হয়ে ওঠল অরুণের গলা, “খা: চোঁচাছি নাকি আমা! এই তো মামা চোখ খুলে দেখলে আমাকে একটু আগে।”

সুতরাং আবার চোখ খুলতে হ’ল, হেসে ফেললাম অরুণের মুখের দিকে চেয়ে। অরুণ আরও জোরে চোঁচিয়ে উঠল, “ও মা—এই দেখ মামা হাসছে।”

অরুণের মা খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আমার কপালে হাত রাখলেন, “নাঃ, আজ আর জ্বর আসবে না বোধহয়।”

পেছন থেকে কে বললে, “আবার আসতে কতক্ষণ, বিকেলের দিকে আবার আসবে হয়ত।”

“ছিঃ, অমন অলক্ষণে কথা আর মুখে আনিস নি শিউলি। আবার জ্বর আসবে কি কবতে? বাছা এবার সেরে উঠবে ঠিক।”—এগিয়ে এলেন অরুণের ঠাকুমা। এসে আমার কপালে বুকে হাত বুলিয়ে দেখলেন।

শিউলি জিজ্ঞাসা করলে তাব মাকে, “এবার কমলাব বস কবে আনব মা?”

তাব মা নিচু হয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন আমায়, “কি খেতে ইচ্ছে কবচে ভাই?”

বললাম, “শুধু একটু গবম চা।”

“চা—এবার চা খাবে মামা,” অরুণ হাততালি দিয়ে উঠল।

পেছন থেকে শোনা গেল বেশ ভাবী গলাব আশ্বাস, “কই দেখি, একটু সব তো তোমবা, এই যে ভাষা, কেমন মনে হচ্ছে এখন?”

আমাকে কোনও উত্তর দিবে হ’ল না। অরুণ বললে, “মামা একদম সেরে গেছে। এইবার চা খেতে চাচ্ছে বাবা—শুধু চা।”

হিমাদ্রিবাবু বললেন, “চা নয়, ভাল কফি তৈরী কবে নিজে আয় শিউলি। আবার গেল, ক’দিন যেভাবে কেটেছে আমাদের। আপনার এ পাজী ভাগনেচাব জন্তে এক মিনিট কেউ মুখ বন্ধ কবে থাকবে পাইনি। কখন আপনি চোখ চাইবেন আর কথা বলবেন এই এক কথাব উত্তর দিতে দিবে আমবা প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম। এবাব যত পাবেন বকুন ঐ পাজীটাব সঙ্গে। যাই ডাক্তারনে খবরটা দিয়ে আসি। মা—এবার তুমি ভান-টা খাবে তো, আজ পাঁচদিন তো শুধু জল খেয়ে কাটালে।”

মা ধমক দিলেন ছেলেকে, “তুই থাম্ তো হিমু, আমার ভাত খাওয়া পালাচ্ছে না। আগে বাবার মুখে দুটি অন্ন-পথ্য দিহ, মা কালীর পূজো পাঠাই, তা না। আগেই আমার ভাত খাওয়া। ওবে ও শিউলি—গেলি তুই কফি কবতে?” বলতে বলতে তিনি বেবিষে গেলেন ঘব থেকে।

অরুণের মা বললেন, “এখন আর বকিও না তোমাব মামাকে অরুণ। চল এখন, স্নান করে ভাত খেয়ে আবার এসে বসবে মামাব কাছে।”

একান্ত অনিচ্ছায় অরুণ উঠে গেল মায়ের সঙ্গে। হিমাদ্রিবাবু এসে বসলেন খাটের পাশে।

বললেন, “আপনার বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে হবে।”

না। কিন্তু উপায় কি? চোখের আড়াল হবার যো নেই, কেউ না কেউ ঠিক পাহারা দিচ্ছেই।

সবচেয়ে বেশি পাহারা দিচ্ছে অরুণ আর তার দিদি শেফালী। শেফালীকে পড়াচ্ছি। আমার গরজেই সে পড়ছে। প্রথম শ্রেণীতে উঠে তার অস্থখ হওয়ার ফলে পড়া বন্ধ হয়। সে আজ তিন বছর আগেকার কথা। আমি বললাম, “দিয়ে দাও এবার ম্যাট্রিকটা। সামান্য খাটলেই হয়ে যাবে। খামকা ম্যাট্রিকটা না দিয়ে বসে আছ কেন যখন প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত ঠেঙিয়েছ।”

শেফালীর বাবা-মা-ঠাকুমা বলেন, “ও যদি ম্যাট্রিক পাশ করে তো করবে অরুণের মামার জন্তে। ও-রকম যত্ন করে গাধা পিটে ঘোড়া তৈরী করবে কে ওকে?” শুনে আমি নিজের মনকে বোঝাই যে, আমার জন্তে এদের যে খরচটা হচ্ছে তার বদলে তবু কিছু পরিশ্রম করছি শেফালীকে পড়িয়ে। পড়াবার মত বিত্ত আমার পেটে আছে জেনে ঠাণ্ডাও নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে আমার আত্মীয়স্বজনের, একটি লেখাপড়া জানা ভক্ত-সন্তান, যার জন্তে তাঁদের একমাত্র ছেলের জীবন বেঁচেছে, তাকে এভাবে আটকে রাখতে বিবেকে বাধছে তাঁদের। আমার আত্মীয়স্বজনকে একটা সংবাদ দিতে না পেরে হিমালিবাবু ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

আরও একটা ঝগড়া বাডছিল দিন দিন। এঁদের পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন হিমালিবাবুর অফিসের বন্ধুবান্ধব দল বেঁধে দেখতে আসা শুরু করলেন আমাকে। তা ছাড়া ষাঁদের কন্ঠনিকালে কোনও আপনার লোক হারিয়েছে তাঁরা বারবার এসে পরীক্ষা করে গেলেন—আমি তাঁদের সেই হারানো আপনার জন কিনা। শেষে একটা উপায় ঠাণ্ডালাম। কেউ দেখতে এলেই খাওয়া আর কথা বলা বন্ধ করে দিতাম। আবার এঁরা ছুটলেন মনের ভক্তারের কাছে। ভক্তার পরামর্শ দিলেন—“কেউ যেন বিরক্ত না করে রুগীকে। ভিডের মাঝে পড়ে মাথায় গোলমাল হয়েছে, সেইজন্তে ভিড দেখলেই ও রকম হয়ে যায়।” আমাকে দেখতে আসা বন্ধ হ’ল তারপর।

নিশ্চিন্ত হয়েই আছি এক রকম। ঠাণ্ডাও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন। কি দরকার অত খোঁজাখুঁজি করে, যেদিন মাথার ঠিক হবে সেদিন যাবে বাড়ি চলে। ছেলেমেয়ের একজন ভাল শিক্ষক পাওয়া গেছে। হিমালিবাবুর স্ত্রী নিজের ভাই বলেই মনে করেন, ছেলে অরুণও অষ্টপ্রহর আমাকে ছাড়া থাকে না। খাওয়া-শোওয়া সব আমার সঙ্গে। হিমালিবাবুর মা ভাবেন, আমি তাঁর আর একটি ছেলে। শুধু শেফালী মাঝে মাঝে উল্টো-পাল্টে এক-একটা প্রশ্ন করে:

বসে। কোন দিনও সে আমায় মামা বলে ডাকে না। কিছু বলেই ডাকে না। তার ডাকবারই দরকার করে না। যা বলবার সামনে এসে বলে।

এক-একদিন বলে বড় গোলমালে সব কথা। একদিন পড়তে পড়তে হঠাৎ চাপা গলায় বললে, “আপনার নাম আমি জানি।”

হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলাম, “তাঁই নাকি। ‘মাচ্ছা, বল তো আমার নাম কি?’”

সোজা আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বললে শেফালী, “আপনার নাম নিরঞ্জন।”

“কি করে জানলে?”

“অমুখেব গময় বেহঁশ অবস্থায় অনেকবার নিজে উচ্চারণ কবেছেন ঐ নাম।”

চূপ করে চেয়ে বইলাম ওব মুখেব দিকে। খুবই সম্ভব বেহঁশ অবস্থায় ও নামটি উচ্চারণ কবেছি। নিরঞ্জন আর আমি অনেক দিন এক মেলে ছিলাম। তাব ফাঁসি হয়ে গেছে, আন্দামানে একটা গুয়ার্ডাবকে খুন করেছিল বলে। ফাঁসি আমারও হোত, নিরঞ্জন সব দোষ নিজের মাথায় নিয়ে আমায় ঠাঁচিয়ে দেয়।

সে কথা শুনা মনে মনে খুশি বলা চলে না। কাজেই চূপ করে চেয়ে থাকি ওব মুখের দিকে। ও লাগ করে উঠে চলে যায়।

বেশিক্ষণ ওর রাগ থাকে না আমাব ওপর। চা কফি দুধ যাহোক একটা কিছু নিয়ে ফিরে আসে। বলে, “লাগ করলেন তো? আচ্ছা, কি করব বলুন তো আমি? আমারও আর কিছু ভাগ লাগে না। ইচ্ছে কবে—ইচ্ছে বরে—”

হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করি, “কি করে, কি ইচ্ছে করে তোমার শেফালী?”

“জানি না যান্।” বলে শেফালী মুখ ফিবিযে নেয়।

পড়াশোনা ভালোই চলছে। ওব মাথা ভালো, একবারেব বেশি ছুঁব কোনও কিছু বোঝাতে হয় না। তবু এক-একদিন যেন কিছুই বুঝতে চায় না শেফালী। আমি চটে উঠি, “যাও তুমি উঠে। কিছু হবে না তোমাব। মন দিয়ে না শুনলে কাকে বোঝাব?”

“এবার কেমন লাগছে মশাই? যে বুঝতে চায় না, তার কাছে শুধু শুধু মাথা খুঁড়তে হলে কেমন লাগে?” শেফালীর চোখে কোঁতুকেব হাসি।

আশ্চর্য হয়ে বলি, “তার মানে?”

“মানে, আমারও ঠিক ঐ রকম লাগে, বুঝলেন?”

আবার এক-একদিন প্রায় কেঁদে ফেলে, “আর এভাবে চলবে না বুঝলেন, আর আমি পারি না। কিছুতেই আপনি কাকেও বিশ্বাস করতে পারেন না। কেন, কেন আমায় বিশ্বাস করেন না আপনি?” কান্নায় ভেজে পড়ে ওর গলা।

না-বোঝার ভান করা বুঝা, প্রায় উনিশ বছর বয়স হয়েছে ওব। তবু চাপা দেবার চেষ্টা কবি।

“বই-খাতা তুলে বাথ শেফালী, নামাও তানপুবা তোমার। এবাব শোনাও গান একখানা।”

নিজেকে সামলে নেয় শেফালী। গানই আবস্ত হয় তখন, নিম্নরূপে দুপূবে সেই স্বব শুনে সতিাই ভেতবটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কি বকম একটা কণ্ঠস্বর হঠাৎ আচ্ছন্ন হয় যায মন। ইচ্ছে হয় অনর্থক এই ছন্দ চাতুবী বন্ধ কবে নিজেকে কাবণ হাতে সঁপে দিতে। শেফালীর দিকে চেয়ে দেখি ও তখন চোখ বুজে তানপুগাটা কাঁ গালে চেপে ধরে গমক না গিটকিবির প্যাচ কষছে গলায়। যদি ও ঠিক সেই মুহুর্তে ওর বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকত নাহলে হয়ত ঠিকই কিছু একটা কবে ফেনশাম।

কিন্তু না—আব দেবি কবা উচিত নয়। এঁদেব মূনেব দাম দিত্তেই হবে। অর্থাৎ আব একটুও অপেক্ষা না কবে পলায়ন।

হঠাৎ শেফালী গান বন্ধ কবে জিজ্ঞাসা কবে, “পালাবাব কথা ভাবছেন নো?” অবাক হয়ে যাই। মনেব কথাও জানতে পাবে নাকি না। আমার ভাবাচাকালিগা মুখেব দিকে চেয়ে এ হেসে ফেনে, “তা হবে না মশাই, যঃই সাধুপুরুষ হোন আপনি, আমি না ছেড়ে দিলে যাবেন কোথায়?”

নিম্পুহ কণ্ঠে বলি—“তাই ভাবছিলাম শেফালী, তোমার পরীক্ষাটা চূপে গেলে—”

“আমাব পরীক্ষা চকবে না কখনও, আব আপনাব যাওয়াও হবে না কোথাও।”

বলে উঠে পড়ে শেফালী।—“যাই এবাব চা করে আনি, তিনটে শাজ্ঞ, চা না দিলে মা উঠে বকাবকি কববে।” একটু বেশ বহুসময় হাসি হেসে ও চলে যায় বসে বসে ভাবতে থাকি, বড় জড়িয়ে পড়ছি। এবার সরে হচ্ছে, আবও দেবি কবাব মানে হচ্ছে—

মানে যে কি, তা আর কয়েকদিন পবেই বেশ ভাল কবে বুঝতে পারলাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় শেফালী এক মনে মূখ নিচু করে অঙ্ক কষছে, আমি পড়ছি সত্ত্ব প্রকাশিত একখানি উপন্যাস। নাযক তখন বিদায় নিচ্ছেন নাগিকার কাছে। একটি বেশ প্রাণ-মোচডানো বক্তৃতা দিচ্ছেন নাযক। এমন সময় শেফালী খাতা-খানা আমার দিকে ঠেলে দিলে। আমি এমন মশগুল হয়ে আছি নাযকের বিদায়-কালীন বক্তৃতায় যে, সেদিকে খেয়ালই করলাম না।

“আঃ, চট করে পড়ে ফেলুন না।”—চাপা গলায় বললে শেফালী। চমকে উঠে খাতাখানা টেনে নিয়ে দেখি—এ কি। এ যে—

“আপনি পালান, এখনই চলে যান এখান থেকে, আপনাব পরিচয় সকলে জেনে ফেলেছে। আমি লুকিয়ে শুনেছি কাল বাত্রে বাবা যা বলছিলেন মাকে। পুলিশ আপনাব সম্বন্ধে অনেক কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছে। বল মকালে কচো তোলা হলে আপনার, সেই দটোর এক কপি দিতে হবে পুলিশকে। আমি জানি আপনার মাথা খানাপ হয়নি। কিছু হয়নি আপনার। এবাব দয়া করে পালান আপনি।”

মুখ তুলে চাইলাম ওর দিকে। ঐ আছে ঐ চোখে। অগ্নি কোনও উদ্বেগে নেই তো এই চিঠি লেখার? পালানোর চেষ্টা করলেও নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে ফেলব। হ্যাং এই চিঠি পড়ে আমি কি করব? দেখবার জগ্নে আড়ালে সকলে সজাগ হবার আছে। তার তাই দান। হয়, বদ কান মকালে দটো তোলা হয় আর সেই ফাং গাং পালিয়ে চান, চান—

চান প ফাং ফাং করবে নাগল। ফাং চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে পটলায়।

খাতাখানা টেনে নিয়ে খাতাটা ছিঁড়ে নেলে ওর পুরনো চোখে চোবোতে আবান প লিখলে খসখস করে। লিখলে দিলে খাতাখানা পড়লাম—
“আপনার কথা বিশ্বাস হচ্ছে। আপনার? যখন বদলায় জেলে ছিলেন তখন আপনার যে দটো গোল? হয় সেখানা বাবাকে দিচ্ছে। আমি চুপ করেছি সে দটো। এ চোখের সম্বন্ধে সে চোখের ন মকালে ফাং ফাং চোখ দেখ আমি চিনেছি। ওর বদলায় ম? সময় নেই আ? আপনার দুই কপড অব দুটো জামা আমি বেধে রেখেছি। চলে যান মকালে দটো দটে। হাইবে হয়ত পুলিশে পাঠাবা দিচ্ছে। এখনও বাড়ি ফেনে নাবা ফান—”

গবনে কাগজে জড়ানো ছোট একটি পাকের টেবিলে নেচে থেকে বাব করলে।

ওর দৃষ্টি চোখ তখন জ্বলে। প্রায় টিলে টিলে উঠে দাডলাম। শেফালী উঠে গিয়ে ভেবে দিকের দরজায় মুখ বাড়িয়ে দেখে এল, কেউ এখানে আসছে কিনা। তারপর নিঃশব্দে বাইবেব শোখার দরজা লি কি দেখে এসে দাঁড়াল আমার বুক ঘেঁষে। ডান হাতে আমার ডান হাতখানা ধরে, বাঁ হাতে নিজের জামার বোতামগুলো এক টানে পচ পচ করে খুলে ফেললে। বাব করলে আমার ভেতর থেকে একখানা ফটো। একবার দেখেই চিনতে পাবলাম। জেলের

পোশাক পরে যে দাঁড়িয়ে আছে সে ব্যক্তি যে আমি, তাতে কোনও ভুল নেই। শেফালীর উদলা বৃকের ওপর নজর পড়ল। উত্তেজনায় ওঠানামা করছে উনিশ বছরের মেয়ের বৃক। ওর কোন লজ্জাশরম নেই সে সময়। আমার হাতখানা তুলে নিজের বৃকের ওপর চেপে ধরে বললে, “বল, কথা দাঁও আর একবার অন্ততঃ আমায় দেখা দেবে।”

আমার মুখ দিয়ে বার হল, “দেব।”

শেফালী কটোখানা বৃকে রেখে জামার বোতাম এঁটে দিল। প্যাকেটটা আমার বগলে গুঁজে দিয়ে হাত ধরে নিয়ে গেল দরজার কাছে। দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে কি দেখলে। দেখে এসে এক বকম ঠেলে বার করে দিলে আমাকে ঘর থেকে। সেই মুহূর্তে তার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর আমাব কানে এল, “মনে থাকে যেন, আমার বৃকে হাত দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা করে গেলে তুমি।”

বন্ধ হয়ে গেল কপাট। অন্ধকাব রোয়াকের ওপব দাঁড়িয়ে আমি কাঁপছি। ভয়ে অনন্দে না উত্তেজনায়—তা আজ ঠিক বলতে পাবব না।

দরজাটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে বইলাম কিছুক্ষণ। নিজের ডান হাতখানা কপালে মুখে বলিযে নিলাম। তারপর জামার দু’পকেটে দু’হাত পুবে মাথা নিচু করে পথে নেমে পড়লাম। হাতে কি ঠেকল পকেটের ভেতর। টিপে দেখলাম এক তাড়া কাগজ। এ কাগজগুলো আবার এল কি করে পকেটে—বার বার মুখের কাছে ধরে অন্ধকাবই চিনতে পারলাম এক তাড়া নোট।

শরীরের রক্তে আবার আগুন ধরে গেল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাত্রাষেব রক্তে এই আগুনই জ্বলত।

আচ্ছা, দেখাচ্ছি এবাব মজা—আমায় ধরতে কত কলসী জল খেতে হয়, বাছাধনদেয় তা দেখাচ্ছি। চিবপলাতকের চোখ-কান-নাক আবার সজাগ হয়ে উঠল। বড় রাস্তায় পড়ে মিশে গেলাম জনতার সঙ্গে। আর আমায় পায় কে ?

আবার পথ।

পথ তো নয়, একখানা ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপগ্রাস। দিনগুলি সেই উপগ্রাসের এক-একখানি পাতা, বছরগুলি এক-একটি পরিচ্ছেদ। পাতার পর পাতা উলটে যাচ্ছি, শেষ হয়ে যাচ্ছে পরিচ্ছেদ। রহস্য, রোমাঞ্চ, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা, হাসি-কান্নায় ভরা উপগ্রাস হচ্ছে পথ। এ উপগ্রাসখানি হাত থেকে নামিয়ে রাখলে জীবন হয়ে যায় একঘেয়ে, বিস্বাদ, বিড়ম্বনাময়। সেই বিরতিটুকু ভরে ওঠে বাজে আবর্জনায়, জঘন্যভাবে জট পাকিয়ে যায় নিজের ভাগ্যের সঙ্গে উপগ্রাসের নায়ক-

নায়িকার হাসি-কান্না মান-অভিমান। আর তখন জগদল পাথরের মত বৃকে চেপে বসে একটা অবস্থা অবসাদ। নেশার মত আস্তে আস্তে ছিড়িয়ে ধরে সেই অবসাদ, অজগব সাপের মত একটু একটু করে গ্রাস করতে থাকে।

তবু একটা অদ্ভুত মোহ আছে এই বিরতিটুকুর। বিগত পরিচ্ছেদগুলিতে যা পড়া হয়ে গেছে, সেগুলো মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ভাগ করে চেখে চেখে বসান্বাদন করা যায় সেই সময়। আর নিজের মনকে ঠেগা করে নেওয়া যায় নতুন পরিচ্ছেদ শুরু করার উপযুক্ত বলে।

কিন্তু সেবার যখন আবার ডুব দিলাম আমার পথ নামক উপন্যাসে, তখন কোথায় যেন কি গোলমাল হবে গেছে। অনববত একটা কাঁটা যেন খচ খচ করেছে কোথায়। ডান হা-খানা নিয়েই হয়েছে মুশকিল। বড় বেশি সচেতন হয়ে পড়েছি ডান দিকের কাঁধে ঝোলানো পুশানে হা-খানা সম্বন্ধে।

মাঝে মাঝে হাতখানা মুখে সামনে তুলে ধরে অনেকক্ষণ একদমট্টে চেয়ে থাকি। হিজিবিজি দাগ অনেকগুলি, কে জানে ঐ দাগগুলির গুট অর্থ কি। অনেকবার নিজের কপালের ওপর, মুখে, বৃকে চেপে ধবি হা-খানা। কৈ সে রকম গুঠানামা করেছে না তো। সেই ঝুং ঝুং কোথায়? অবহেলায় উপন্যাসের পাতাব পর পাতা উল্টে চলে চাহ। পাত্র পাত্রেরে হুথ হুথ হাসি কান্না আমায় স্পর্শ কবে না। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, সব পাত্র পাত্রেরে যেন এক কথা বলে—‘মনে থাক যেন, আমাব বুনে হাত দিয়ে ‘ক প্রীতিজ্ঞা করে গেলে তুমি।’

জুতো-জামা-কাপড়-অলংকারেব ম-মন নামক পদার্থটিকেও যদি খুলে ফেলে দিখে এক জাঘগা থেকে অস্তিত্ব চলে যাওয়া যেত, গ্রাহলে কত সহজ হত আমার মজা কবে উপন্যাস পড়া। কিন্তু তা হবার নয় সহজে, বড় বিলম্বী পোশ হচ্চে এই মন। এ খোলস সহজে খুলে ফেলা যায় না।...অনেকগুলো পাতা, আস্ত গোটা কতক পাবচ্ছেদ পড়া শেষ হয়ে গেল আমার পথ উপন্যাসের। তখন একদিন সবিন্ময়ে দেখলাম, কবে পুরনো হয়ে পচে গলে খসে পড়ে গেছে আমার সেই রঙ-মাখা পোশাকটি তা আমি ঢেবও পাই নি। আব ডান কাঁধে হাতখানি যথা নিয়মে একান্ত অবহেলায় ঝুলছে আগের মতই, ঝুলন্ত হাতখানা দোলাতে দোলাতে অনেক দূবে আমি পৌছে গেছি উপন্যাসে ডুবে।

ভোল ফিরিয়ে ফে লছি একেবারে। কাঁচা-পাকা চন-দাড়ি, রক্ত বহ্ন, রক্তাক্ত মালা, কপালে ইষা-বড় সিঁড়িরেব গুল আঁকা, তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মহাপাত্র আর মহা-কলকে। এতগুলি উপচারে সুসজ্জিত হয়ে নিজেকে নিজেকে কবিতা অবতারের লাক্ষ্যৎ বংশধর বলে জ্ঞান করছি তখন। চা-বাগানের কাঁচা পয়সা আর কাঁচি মদে

মশগুল হুগ্লে দীর্ঘ বিরতি উপভোগ করছি মেটেলি কালীবাড়িতে বসে। কাঁচা সাহেব থেকে শুরু করে পাকা বাবু পর্যন্ত সব আমার ভক্ত। চায়ের টেবিলের প্রেমের গল্প লিখতে লিখতে যাদের অরুচি ধরে গেছে, তাঁরা হয়ত জানেন না, ঐ প্রেম সোজা চা-বাগান থেকে চা-পাতার সঙ্গে মিশে শহরে এসে পৌঁছয়। কাঁচা চা-পাতা যারা তোলে আর যাবা তোলায়, তাদের মনেও বিধাক্ত জীবাপু সেই কাঁচা পাতার সঙ্গে মিশে যায়। সেই জন্তেই অত বিকার উৎপন্ন হয় চায়ের টোবল ঘিরে। কিন্তু তখন চ-পাতা থাকে কাঁচা, কাজেই সেই প্রেমও থাকে কাঁচা। সেই কাঁচা বিকাবের চিকিৎসা কবছি সর্বজনীন বাবাব ভূমিকা নিয়ে।

হাতিফাঁদা বাগানের বড় সাহেব বড় ভাল লোক। দুর্গাপূজার সময় বিস্তর আমোদ-প্রমোদেব বাবস্থা কবেন। কলকাতা থেকে গাইয়ে-বাজিয়ে নাচিয়ের আমদানি করান। সেবার এল এক মেয়ে-পুরুষের থিয়েটার পাটি। খার শার সঙ্গে একজন নাম করা কীর্তন-গায়িকা। ঐ কীর্তন-গায়িকা একাই মাও করে দিলেন সব বাগান। দুর্গাপূজা মিটে গেল, যাত্রা থিয়েটার ম্যাজিক-পাটি বিদেয় নিলে। কিন্তু কীর্তন-গায়িকা বয়ে গেলেন তাঁব দলবলসহ। আজ এ-বাগান কাল ও বাগান, তাঁব পব-দিন আব এক বাগানে গান হচ্ছে। গান নাকি এমনই গাইলেন তিন যে, স্ত্রী পুরুষ নিবিশেষে সবাই তাঁব ভক্ত হয়ে উঠছে। কালী-বাড়িতে বসেই শুনতে পাচ্ছি—তাঁব গানের সুখ্যাতি। আবও একটি কথাও কানে আসছে যে, কীর্তন গায়িকা তলেও তিন ধবা-ছোয়াব বাহবে। অর্থাৎ ‘বাজাবে’ নন।

দামডাচেরা বাগানের বড়বাবু আমার বড় ভক্ত। আমার দেওয়া এক মাছুলির দৌলতে তাঁর বেশি বয়সে বংশ-রক্ষা হয়েছে তৃতীয়বাব বিনাহ কবে। অবশ্য বজ্জাত লোকে বলে, গ্রামোফোন রেকর্ডের ক্যানভাসার গানবাবুকে ধর্মের ভাই সম্বন্ধ পাতিয়ে বাসায় স্থান না দিলে নাকি আমার কবচও কিছু করতে পারত না। গান-বাবু ছোকরাটিকে আমি চিনি, সেও আমার বিশেষ ভক্ত। কাজেই সং চরিত্র। আমি আমার কবচকেই বিশ্বাস করি।

বংশ-রক্ষার হেতু সেই ছেলেটির অন্তপ্রাশন। বড়বাবু দশটা খামি কিনে ফেললেন। দশখানা বাগানের বাবুদেব সপরিবারে নিমন্ত্রণ করলেন। কলকাতার কীর্তন-গায়িকাকে বায়না দিলেন তিন দিনের জন্য। আমাকে নিয়ে যাবার জন্তে বাগানের লরি পাঠালেন।

লরি থেকে নামতে বড়বাবু তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী নিজে হাত-পা ধুইয়ে আঁচল দিয়ে পা মুছে দিলেন। তাঁর ধর্মের ভাই সদা-সর্বদা একখানা পাখা হাতে খাড়া

আমার পেছনে। যার অন্তপ্রাশন তাকে আমার কোলে বসিয়ে ফটো তোলা হ'ল। খাসি খেতে ঝাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও আমার ভক্ত। কাজেই ধোয়া আর আঁচল-দিয়ে-মোছা পায়ের ধূলো নেবার জন্তে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাইকে মাথায় হাত দিয়ে চোখ বুজে আশীর্বাদ করলাম। জরে আর পেটের অহুখে অনবরত ভোগবার দরুন হাড়-জিরাঁজিরে ছেলেমেয়েগুলিকে 'দীর্ঘায়ু হয়ে বঁচে থাক' বলতে হ'ল। যদিও জানি এদের অনেকগুলিই আমার আশীর্বাদ নিঃফল প্রমাণ করবার জন্তে ডুয়াসের ব্র্যাক ওয়াটারের ঠেলায় কিছু দিনের মধ্যেই স্বস্থানে প্রস্থান করবে।

এমন সময়ে একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের মেয়ে এসে প্রণাম করলে আমায়। এর মাজপোশাক অত্র রকম, চোখেমুখে চাঁ-বাগানের ছাপ পড়েনি। ছোট শরীরটি স্বাস্থ্য আর লাবণ্যে টলমল করছে।

মাড়-পগন্ত-ছাটা এক মাথা নরম চুলে হাত বুলায়ে জিজ্ঞাসা করলাম—“নাম কি তোমার মা-লক্ষ্মী, কোথা থেকে এসেছ তুমি?”

মিষ্টি হাসি-বোকা গাউ হেঁচ করে বললে সে—“কি করে জানলেন আপনি আমার নাম?”

হো হো কবে হেঁচ বললাম—“এহ দেখ, তোমার নাম যে লক্ষ্মী তা তো দেখেই বোঝা যায়। তা কোথা থেকে এসেছ তোমরা?”

“কলকাতা থেকে। আমার কিছু আর একটা নাম আছে, শুধু মা আমায় লক্ষ্মী বলে ডাকেন।”

“ও তোমার মাও এসেছেন বুঝি—”

“আমারই মেয়ে ও।” নালপাড় দুধে-গরদ-পরা এক ভদ্রমহিলা গলগল আঁচল দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আমায় প্রণাম করলেন।

প্রণাম শেষে উঠে, হাঁটু গেড়ে, কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে, জোড় হাতে বসে রইলেন আমার সামনে। তার মুখ ঠিক আমার মুখের সামনে, বাবধান মাত্র দু'হাত, চতুর্দিকে অনেক জোড়া চোখ চেয়ে আছে আমার দিকে। আমার মাথাটা যেন কি-রকম ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুজে গেল আমার চোখ। তলিয়ে গেলাম নিজের মনের মধ্যে। হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম মনের অন্ধিসন্ধি। ঘুলিয়ে যাচ্ছে অনবরত সব ছবি। এতবড় উপাশ্রয়স্থানের সব ক-টা চরিত্র যেন মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আকুপাকু করছে বুকের ভেতরটা। একান্ত দামী জিনিস হঠাৎ হারিয়ে ফেললে যেমন অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি অবস্থা তখন আমার।

“আপনার সঙ্গে নিজনে একটু দেখা হতে পারে কি?”

চোখ চেয়ে দেখলাম, তিনি তখনও হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। পেছন থেকে বড়বার তাঁর খ্যান্থেনে গলায় বলে উঠলেন—“ইনিই এসেছেন, বাবা, কলকাতা থেকে, কীর্তন গেয়ে আমাদের মত পাপীদের উদ্ধার করতে। আপনিও পায়ের ধুলো দিলেন দয়া করে অধমের বাসায়। তিন দিন এঁর গানের ব্যবস্থা করেছি—তুধু আপনাকে শোনাব বলে। হেঁ হেঁ—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ—হেঁ হেঁ।”

নিজের ক্রাতক্ষে নিজেই দু’ হাত কচলে হাসতে লাগলেন—হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ।

তখনও চেয়ে আছি সেই চোখ দুটির দিকে, দেখাচ্ছি ঐ চোখে কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা। ঠুঁব পবিচয়। ওই মুখ, ওই চিবুক, কপালের ওই রেখা ক’টি, বা কানের ঠিক পাশে গালের ওপব ছোট্ট ঐ আঁচিলটি, অত লম্বা কালো চোখের পল্লব, এমন কি নাকের ওপর ঐ ঘামের বিন্দুগুলি পৰ্শন্ত কোথায যেন লুকিয়ে আছে আমার মনের মধ্যে। কিন্তু চিনতে পারছি না ঐ চোখের দৃষ্টি, হৃদীয় প্রতীক্ষা আব আত্ম-পীড়ন লুকিয়ে আছে ঐ দৃষ্টিতে, কার তপশ্চা করেন ইনি।

আবার কানে গেল সেই গলাব স্বর—“আমি আপনাকে কয়েকটি কথা নিজনে নিবেদন করতে চাই।” চমকে উঠলাম, কি জানি কেন বহুদিন পরে আবাব সচেতন হয়ে উঠলাম নিজের ডান হাতখানা সম্বন্ধে হাতখানা নিজের মুখেব সামনে মেলে থরে অল্পমনস্কভাবে ছকুম কবলাম বড়বাবুকে—“যোগীন, সকলকে এক বার বাইরে যেতে বলো তো, আগে শুনি এঁর কি বলবাব আছে।”

“হেঁ হেঁ—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, চলো চলো সব বাহবে যাও তোমরা। বাবা এখন কৃপা করবেন আমাদের মা-ঠাক্কণকে, হেঁ হেঁ।”

মেয়েটির মাথায় হাত বেখে তিনি বললেন—“লক্ষ্মী, তুমিও মা একটু বাইবে যাও তো, আমি এঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে আসছি।”

দরজা বন্ধ হ’ল বাইবে থেকে।

মাথা হেঁট করে উনি বসে আছেন আমার সামনে, কোলেব ওপর দুটি হাত রেখে। হঠাৎ নজর পড়ল ওঁর একখানি হাতে। বা হাতে তর্জনার মাথাটা নেই।

অনেকদিন আগে আচমকা একদিন একখানা জ্বলন্ত কয়লার ওপর পা পড়ে যায়। সেদিন যে-রকম একটা ধাক্কা লেগেছিল ভেতরে, ঠিক সেই রকম একটা ধাক্কা লাগল বুকে। পেন্সিল কাটতে গিয়ে একটি মেয়ে একদিন উড়িয়ে দিয়েছিল তর্জনার মাথাটা, কিন্তু একবার উহ-আহাও করে নি মুখে। বরং সে কি হাসি, যেন অমন মজা সহজে হয় না। যত আমি লাফালাফি করছি রক্ত বন্ধ করার জন্তে, মেয়ের তত ক্ষুতি। ডান হাতে বা হাতের আঙ্গুলটা টিপে ধরে হেসে গড়াগড়ি

আছে। শেষে ভক্তার এসে রক্ত বন্ধ করে।

‘হা করলাম, গলা পর্যন্ত ঠেলে এল নামটি। সেই মুহূর্তে উনি মাথা ভুলে জিহ্বা
করলেন—“ঐ মেয়ের বাবা এখন কোথায় তাই জানতে চাই আমি।”

প্রাণপণ চেষ্টায় একটা ঢৌক গিলে ফেললাম। তারপর বাব করলাম বাবা-
জনোচিত উচ্চাঙ্গের হাসি, দাঁড়ি-গোঁফের জঙ্কলের ভেতর থেকে। যতটা সম্ভব
পরিহাসের স্বর আমদানি কবলাম গলায়। বললাম—“আমি তা জানব কেমন
করে?”

অতি সংযত কণ্ঠে তিনি বললেন—“আপনি জানেন না বটে, কিন্তু ইচ্ছে করলে
বলতে পাবেন। চা-বাগানের সাহেব থেকে কুলিরা পর্যন্ত সবাই এক বাক্যে আমায়
বলেছে আপনাব শক্তিব কথা। কিছু না জেনেছি কি এসেছি আপনার কাছে।
কিন্তু আমার মত হতভাগিনার ওপর কি আপনাব দয়া হবে।”

তিনি মাথা নিচু করলেন আবার। ‘আমাব মাথার ভেতর, শুধু মাথার ভেতর
কেন, সাবা শব্দেব রক্তেব সঙ্গে ছুটোছুটি ক’ছে কয়েকটি কথা—“মনে থাকে যেন,
আমার বুকে।” দিয়া কি প্রাতঃজ করে গেলে তুমি।’

চেয়ে আছি ঠুং বুকের দিকে, মেদিনের নেই বুকেব চেয়ে অনেক উঁচু, অনেক
স্পষ্ট ঐ মেয়ে মায়েব বুকে, দু’ধ গরদের জামাব নিচে আজও যেন ঝঁঝ ঝঁঝ
নামা করছে। কিন্তু যদিহ বা কবে যেতাম একদিন, তাতেই বা কি হোত।
অন্ত এক ভ্রলোকেব সাক্ষী স্ত্রী খুব ভক্তিববে একটি প্রণাম করতেন ঠিক এই
আঙ্গকের মত। কিন্তু প্রণামে আমাব আব শোভ নেই, ওতে অকচি ধরে গেছে।
আমাব নিজেব ভান হাওথানাব দিকে চাইলাম। বড় বিতৃষ্ণা লাগল হাতখানার
ওপর। মিছামিছি যত্ন করে এতদিন বয়ে বেড়াচ্ছি এখানা।

“আমাকে কি দয়া কববেন না আপনি?”

আবার সেই কর্ণস্বব। কিন্তু এ হচ্ছে ভিত্তিগীর গলার আওয়াজ, বহুকাল
আগে শোনা নেই জীবন্ত মেয়েটির গলার আওয়াজ এ নয়।

সামলে নিলাম নিজেকে। বললাম—“কি নাম তাঁর?”

এবার অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে বললেন, “তাও জানি না।” স্পষ্ট
স্বনতে পেলাম ঠুং বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

এবার জালা আবস্ত হ’ল পায়েব তলার সেই জায়গাটায়, অনেকদিন আগে
জলন্ত কয়লাটা চেপে ধরেছিলাম যে জায়গাটা দিয়ে।

অর্থাৎ? ‘তাও জানি না’—এই ছোট্ট কথাটির অর্থ কি?

অতি সোজা অর্থ—পণ্যাজনা জানবে কি করে কে ওই মেয়ের জন্মদাতা!

অথচ ক্রাপনা করতে এসেছে—এখন সে কোথায় তাই আমার গুণে বলে দিতে হবে। যেন তাঁর নাম-ঠিকানা পেলে উনি ঘরে গিয়ে উঠবেন ঐ মেয়ে নিয়ে। নচ্ছার মেয়েমানুষ, গরদের লালপাড শাড়ি শাখা সিঁদুর পবে, গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝি়ের সঙ্গে মিশে, মা-ঠাকুরাণ হয়ে কাঁটন শুনিযে পাপীদের উদ্ধার করছেন। আজই ব্যবস্থা করছি যাতে ওঁকে কালই ঝাড়ু মেবে তাড়ায় সকলে চা-বাগান থেকে।

“আপনি তো সবই জানতে পাবেন ইচ্ছে করলে, আপনি অন্তর্ধামা”—তুই চোখ জলে ভরে উঠেছে গুঁর।

নিজেকে শক্ত কবে সামলে নিলাম, দেখি না কতদূর ছলনা জানে ও। বললাম—“জানতে তো অনেক কিছু পারাছি, তাবপব যে অনেকটা অন্ধকার দেখছি, কেন যে এ-রকম হচ্ছে। মানে আপনার উনিশ-কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ধকন আপনার ঐ আঙ্গুলটি মাথা কবে কাটা যায় তাও দেখছি, তখন আপনি একটুও কাঁদেন নি। আচ্ছা আপনার নাম আগে শেকালী ছিল না?”

উনি নির্বাক, ফ্যাল ফ্যাল কবে চেয়ে আছেন আমার মুখের দিকে, শুধু ঘাড় নাড়লেন। চোখ বুজে বেশ বসিয়ে গেলাম সেই পর্যন্ত। উনি ওঁর নিজের উদ্দেশ্য বুকেব ওপর অস্ত্র একজনেব হাত চেপে ধবে বলছেন—‘মনে থাকে যেন, আমার বুকে হাত দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা কবে গেলো তুমি।’

চেয়ে দেখি ওঁর তুই চোখ বোজা, আব তুই চোখ থেকে নেমেছে দুটি জলবাবা, বুকেব ওপরে দুধে-গরদ ভিজছে।

কিন্তু অস্ত্র ভেজাতে পাববে না আমাকে। নিজলা ভক্তি আব প্রণাম পেতে পেতে ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে অনেক দিন। এখন আমি যোল-আনা একজন মার্কি-মারা বাবা।

বললাম—“তাবপরই যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, যেন খেই হারিয়ে ফেলেছি। আপনি যদি তাবপর কিছু কিছু বলে যান তবে হয়ত শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখতে পারি ঐ মেয়ের বাবা এখন কোথায়।”

তিনি চোখ খুললেন। যেন একটি অতি গোপনীয় কথা বলছেন এইভাবে বললেন—“আচ্ছা, যদি তাঁর ফটো দেখাই তাহলে আপনি বলতে পারবেন কোথায় আছেন তিনি এখন?”

আবার ফটোও সঙ্গে রেখেছে, কিন্তু সে লোকটাই বা কেমন নির্বোধ, এই রূপাঙ্গীবার কাছে নিজের ফটো রেখে যায়। আছে, আছে বটে অনেক বড় ঘরের

পাঠা, যারা বিশেষ ভঙ্গিমায় এই জাতের মেয়েদের সঙ্গে নিজের ফটো তোলার বাহ্যুহরি করে—নিজের কু-চরিত্রের চিরস্থায়ী দলিল রাখবার জন্তে ।

দেখাই যাক না সে মহাপুরুষের মূর্তিখানি কেমন । বললাম—“সঙ্গে আছে নাকি আপনার সেই ফটো ? থাকে তো দেখান—দেখি যদি কিছু করতে পাবি ।”

আরে, এ-ও যে পটপট করে জামার বোতাম খুলছে ।—বার করলেন লাল ভেলভেট মোড়া কি একটা । অতি যত্নে ভেলভেট মোড়া খুলে ফটোখানি নিজের মাথায় ছুঁহয়ে আমার হাতে দিলেন ।

বোধহয় একটা অদ্ভুত আওয়াজও বেরিয়েছিল আমার গলা থেকে সেই মুহূর্তে । ফটোখানা আমার হাত থেকে পড়ে গেল ।

পড়ে গেল চিং হয়ে ফটোখানা, আমি বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলাম । তারপর চোখ তুলে চাইলাম সামনে বসে সেও রূপাজীবাব দিকে । সেও অবাক হয়ে দেখছে আমাকে ।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল । যবেব ভেতব কারও নিশ্বাস পড়বার শব্দও হচ্ছে না তখন । তিনিই প্রথম কথা বললেন—“কি হ’ল আপনার, একে আপনি চেনেন নাকি ।”

জড়িয়ে জড়িয়ে আমার গলা দিয়ে বার হ’ল—“কৈ না, চিনি না তো । তবে ঠিক এই বকমের একটি চেহারা ই ভেসে উঠেছিল কিনা আমার মানসচক্ষে । কিন্তু ঐ জেলের পোশাকে নয় । আব বয়সও অত কম নয় ।”

তিনি বললেন—“তাহ তো হবে । যখন তিনি আমার ছেড়ে চলে যান প্রথম বার, তখন শে তিনি জেলেব পোশাকে ছিলেন না, আর তখন তাঁব বয়স ৩ আরও বেশি হয়েছে । আমি শুধু ঐ চোখ দুটি দেখে ঠেকে চিনেছিলাম তখন ।”

বহুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলাম । নিশ্চয়ই সামনে বসে ভাবতে লাগলেন, আমি অন্তর্ধামাগিরি ফলাবাব চেষ্টায় চোখ বুজে বসে আছি । ভাবুক ওবা যা খুশি, আমি শুধু আশ্চর্য হয়ে ভাবছি তখন—কি হ’ল আমার সেই চোখের । আজ তুমি চিনতে পারছ না কেন আমার চোখ দেখে ? দাডি-গোঁফের জল গজিয়ে কি আমি আমার চোখ দুটিকে খুঁইয়েছি । সেদিন তো চিনেছিলে তুমি, আজ কেন পারছ না ? কেন পারছ না ? কেন ?

শেষ কেনটা মুখ ফুটে বেবিষে গেল । আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—“কেন কি ! কি কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?”

চোখ চাইলাম আবার । বললাম—“কেন যে তার পরের ব্যাপারগুলো জোড়া

দিতে পারছি না তাই ভাবছিলাম। আচ্ছা, এবার দয়া করে বলুন তো, আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হল এঁর।”

তখন শুনলাম সেই দীর্ঘ কাহিনী। আমি চলে আসবার পর ওর বাবার সরকারী চাকরিটি গেল বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে। ওকে নিতে হ’ল লোকের বাড়ি গিয়ে মেয়েদের গান শেখাবার কাজ। তাতেও কিছু হ’ল না, হিমালিবাবু কোথাও আর চাকরি পেলেন না, শেষে একরকম না খেতে পেয়ে অরুণ মারা গেল। হিমালিবাবু স্কুল-মাস্টারি নিয়ে চলে গেলেন রাজসাহী।

সেই রাজসাহীতে আর একবার দেখা হয় ফটোবঐ লোকটির সঙ্গে শেফালীর। বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে সে এসে আশ্রয় নেয় শেফালীর এক বন্ধুর বাড়িতে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দিন বাত তাব সেবা করে শেফালী। প্রায় এক মাস ছিল, তারপর সুস্থ হয়ে সে পালায়। শেফালীকে ধবে সরকার বাজবন্দিনী করে রাখে। সেই সময় ঐ মেয়ে জন্মায় দিনাজপুরে জেলে। তিন বছরের মেয়ে নিয়ে শেফালী যখন ছাড়া পায়, তখন বাপ-মায়ের আব পাত্তাই পেলো না কোথাও। তখন পেটের দায়ে আর মেয়েকে বাঁচাবার দায়ে নিজেব গলাব ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হ’ল।

“আমার আর কোনও বাসনা-কামনা নেই, শুধু তার মেয়েকে তার হাতে মর্পে দিয়ে মরতে চাই। আমি যে ওই মেয়েকেও জবাব দিতে পারছি না ওব বাবা কে?”

এবার আর আমার ছলনা বলে মনে হ’ল না ওব ঐ অশ্রুর প্লাবনকে। ডুবে মরার আগের মুহূর্তটিতে একগাছা খড়কুটো ভেসে যেতে দেখলেও আঁকুপাঁকু করে ধরতে যায় মানুষ। ঠিক তাই করতে গেলাম, অস্তিম চেষ্টায় আঁকড়ে ধরতে গেলাম এক গাছা খড়—“আচ্ছা—এমন কি হতে পাবে না যে, আপনি লোক ভুল করেছিলেন—”

কথাটা ভাল করে শেষ করতে দিলে না আমাকে। আর্তনাদ করে উঠল—“কি, কি বললেন? লোক চিনতে ভুল হয়েছে আমার? তার মানে এক মাস ধরে সেবা করে যাকে আমি যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম, তাকে চিনতে পারি নি আমি!”

ওর ছুই চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল।

সেই চোখের দিকে চেয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম। থাক, শান্তিতে থাক ও—ওর বিশ্বাস বুকে নিয়ে চিরকাল। আমি তাতে বাগড়া দেবার কে?

আরও অনেকটা সময় কেটে গেল। চোখ বুজে বসে রইলাম, অন্তর্ধামী যে

আমি, আমি যে একজন মার্কী-মারা বাবা ।

বললাম শেষে—“তিনি হয়ত এখন সম্মানী হয়ে ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছেন ।”

ধব্ব করে জলে উঠল শেফালীর চোখ—“কত্থনো নয়, কিছুতেই তা হতে পারে না। এত হীন, এত নীচ তিনি হতেই পারেন না। দেশকে স্বাধীন করবার জন্তে তাঁর বুকের ভেতর আগুন জ্বলছে। কোনও ভগবান সে আগুন নেবাতে পারবে না যতদিন না দেশ স্বাধীন হবে। বরং আমি বিশ্বাস করব, তিনি মরে গেছেন পুলিশের গুলিতে, তবু সম্মানী হয়ে গেছেন বিশ্বাস করতে পারব না।”

ছোঁ দিয়ে তুলে নিলে কটোখানা। নিয়ে সমস্তে ভেলভেটে জড়িয়ে বুকে রেখে জামার বোতাম আটতে লাগল।

একান্ত নিস্পৃহকণ্ঠে বললাম, “হরশ্ৰঙ্গার মানে জানেন?”

অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। অল্প হেসে বললাম—“হিন্দি ভাষায় শিউলি ফুলের নাম হরশ্ৰঙ্গার। তা আপনি তো শেফালী, আপনার গর্ভে ঐ যে জন্মেছে—গান করুন ওর বাবা স্বয়ং বিশ্বনাথ। মনে শাস্তি পাবেন, আপনার হরশ্ৰঙ্গার নামটিও সার্থক হবে।”

ও আবার চোখ বুজে ফেলেছে। যেন ধ্যানমগ্ন। কিছুক্ষণ পরে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলে—“আমি মরবার আগেও কি একবার দেখা পাব না, সে যে প্রতিজ্ঞা করে গেছে? একবার প্রতিজ্ঞা রেখেছে আর একবার কি রাখবে না?”

পেছনের দরজা খুলে ওর মেয়ে ঘরে ঢুকল।

“মা, সভায় সকলে এসে আছেন, আজ গাইবে না?”

আঁচলে চোখ মুছে আমায় প্রণাম ক’রে মেয়ের হাত ধরে শেফালী বর থেকে বেরিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ ঘোঁগীনকে ডেকে বললাম—“লরি ঠিক করে দাও ঘোঁগীন। মা-বেটি আমায় স্মরণ করেছে, আসন ছেড়ে থাকতে পারব না আজ রাত্রে।”

ততস্থ হয়ে ওরা লরি ঠিক করে দিলে। সোজা স্টেশন। তারপর আবার পথ—

উপস্থাসের না-পড়া পাতা ক’খানা যে শেষ করতেই হবে আমাকে।

দোসরা তারিখে হাতে পেতাম গুণে গুণে দশটি টাকা। ওরই মধ্যে সমস্ত। মা কালীর ভোগ-নৈবেদ্য ফুল-বেলপাতা-সন্ধ্যারতির ঘি থেকে আরম্ভ করে নিজের আহার-বিহার পর্যন্ত পুরোপুরি ত্রিশটি দিন চলা চাই। তার ওপর বিনা ভাড়ায় একখানি থাকবার ঘর। সিঁড়ির নিচের ঘর। মাথায় ঠেকে এই মাপের একটি দরজা। এক বিন্দু আলো যাবার অল্প কোনও পথ নেই ঘরে। আগে বোধ হয় সেই ঘরে কেরোসিন তেল আর তেলের আলো রাখা হত। বড় বড় বাড়িতে কেরোসিনের বাতিগুলো সাজাবার জন্তে ঐ রকমের আলাদা একটি ঘর থাকে। আমার ঘরখানাও বোধ হয় সেই কাজেই ব্যবহৃত হত। যতদিন সে ঘরে আমি ছিলাম সদাসর্বদা কেরোসিনের গন্ধ পেয়েছি। যেন কেরোসিনের মধ্যে ডুবে আছি। একটা মাটির কলসিতে খাবার জল রাখতাম। সেই জল থেকেও কেরোসিনের গন্ধ বেরোত। চাকরি পাবার পর সেই ঘরখানিতেই আমাকে থাকতে দেওয়া হল। কারণ অত বড় বাড়ির ভেতর এই ঘরখানিতেই কোনও ভাড়াটে জুটত না।

চাকরি পেয়ে বর্তে গেলাম। মা কালীর নিত্য সেবা-পূজার কাজ। এটি হচ্ছে একটি মঠ। মহাত্মিক পরিব্রাজকচার্য শ্রীশ্রী ১-৮ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী তারানন্দ পরমহংস আগমবাগীশ মঠ আর কালী প্রতিষ্ঠা করেন। বিপুল ধন-সম্পত্তি আর বিরাট বাড়িখানি রেখে তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। তাঁর দৌহিত্র শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ শর্মা, এম-এ ডি-ফিল, এখন এই মঠ আর কালীর মালিক। ভদ্রলোক মনুষ্যত্বের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে ডি-ফিল পেয়েছেন। সমস্ত বাড়িটার একতলা দোতলা তিনতলার চব্বিশখানা ঘরে চব্বিশটি ভাড়াটে। ভাড়া আদায় হত মাসে একশ কুড়ি টাকা। শুধু মা কালীর ঘরখানি, তার সামনের দালানটি আর সিঁড়ির নিচের ঘরখানি ভাড়া দেওয়া হয় নি। এমন কি কালী-ঘরের সামনের উঠানেও ভাড়াটে ছিল। এক কবিব্রাজ সেই উঠানে মস্ত মস্ত উল্লু গঁথে তার ওপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়াই বসিয়ে তেল জ্বাল দিত।

শঙ্করীপ্রসাদ থাকতেন কালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বিলেত-ফেরত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা মাহিনায় চাকরি করতেন তিনি। দোসরা তারিখে যেতে হোত তাঁর বাংলায় দশটি টাকা আর একটি শিশিতে এক ছটাক দেশী মদ আনবার জন্তে। এক ফোটা মদ জলে ফেলে সেই জলে মা কালীকে

ঘর ধোয়া থেকে ভোগ পূজা সমস্ত সম্পন্ন করা চাই। কারণবারি ছাড়া মায়ের সেবা নিষিদ্ধ। এই কালীর পূজায় একমাত্র অভিবিক্ত কোলের অধিকার। চাকরি পাবার জন্তে আমাকেও অভিবিক্ত হতে হয়।

যিনি আমাকে কাজটি জুটিয়ে দেন, তিনিই সংক্ষিপ্ত পূজা-পদ্ধতি শিখিয়ে, অভিবিক্ত করে, কোলের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়ে দিয়ে তবে শঙ্করীপ্রসাদের সামনে নিয়ে দাঁড় করান আমাকে। তখন ঐ-জাতের একটা কাজকর্ম'না জুটলে আমার পাঁচবার কোনও উপায় ছিল না।

বাঙলাদেশে মাথা বাঁচাবার স্থান নেই। ধবা পড়লে হয় যাবজ্জীবন দ্বাপাস্তুর নয়ত বা একেবারে ঝুলিয়েই চাউবে। জলপাইগুড়ি ডুয়ার্শেব চা-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম রক্ত-বস্ত্র, রক্ত্রাক্ষের মালা আর কপালে সিন্দুরের ফোটা পরে। জ্বর আর বক্ত-আমাশয় ধরল বাগে পেয়ে। ওখানে এক কুলীন জাতের জ্বর আছে। নামটিও ভাল। ব্রাক ওয়াটার ফিভার। একবার ধরলে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যায় যাকে ধরে তাকে। সেই জ্বরেব ভয়ে ওখান থেকেও স'তে হল। ত্রাডা খেতে খেতে একদিন, মাত্র ঐ জ্বর আব বক্ত-আমাশা সম্বল করে, কালী গিয়ে পৌঁছলাম। বাঙ্গালীটোলার এক বাড়ির সামনের রোয়াকের ওপর থেকে এক ব্রাহ্মণ আমাকে তুলে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। জ্বর গেলে টাকেই ধরে বসলাম কোথাও যে কোন বকমের একটি কাজ জুটিয়ে দেবার জন্তে। যেখানে অন্ততঃ বছর দুই মাথা শুঁজে পড়ে থেকে সংস্কৃত ভাষাটা এপ্ত কবতে পারি। আমার আশ্রয়দাতার তিনটি গুণ ছিল একসঙ্গে। কালী'ব বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তিনি, সর্বজনপূজা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন—আব একবিন্দুও বিচার অহঙ্কার ছিল না তাঁর। কেউ পড়াশুনা করতে চাইছে অণ্ট স্থযোগ পাচ্ছে না, এ শুনলে তিনি আর স্থি'ব থাকতে পারতেন না। যে করে হোক একটা স্থযোগ কবে দেবাব জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা কবতেন। তাঁর সেই দুর্বলতার স্থযোগ নিলাম আমি। ফলে আমার থাকা-খাওয়া'ব ব্যবস্থা হয়ে গেল। যাকে বলে একেবারে রাজঘোটক ঘটে গেল। চুল দাড়ি অনেকদিন থেকে স্বাধীনতা পেয়ে বেড়েই ছিল। বক্তবস্ত্র, রক্ত্রাক্ষমালা তো ছিলই। এবার কালী-বাড়ির চাকরি পেয়ে খডম পায়ে দিয়ে খটখট কবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মহা-তাত্ত্বিক সাধক মাহু'ব হয়ে গেলাম দু'দিনেই।

তবু প্রথম প্রথম সেই অন্ধকার গুহা থেকে বেরুতে সাহস হত না। ভোরবেলা গল্যাস্তান করে এসে একটা ছোট পিতলের হাঁড়িতে চাল, ডাল, আলু, কচু যা যখন জুটত, একসঙ্গে চড়িয়ে দিতাম। সেটা সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিয়ে মা কালীর ঘরে গিয়ে ঢুকতাম। এক পয়সার ফুল-বেলপাতা ফুলওয়ালা শালপাতায় জড়িয়ে

জানালা গলিয়ে ঠাকুরঘরে কখন ফেলে রেখে যেত। বেলা দশটা এগারটা পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে মা কালীর সেবা-পূজা চলত। শেষে ঘণ্টা কাঁসরে ঘা-কতক বাড়ি দিয়ে, পূজা সমাপ্ত হল ঘোষণা করে পেতলের হাঁড়িটা হাতে করে নিজের ঘরে চুকতাম। তারপর সেই পিণ্ডি-প্রসাদ গিলে, সারাদিন দরজা বন্ধ করে সেই অঙ্ককার ঘবে পড়ে থাকতাম। সন্ধ্যার পর একবার ঠাকুরঘরে গিয়ে ঘণ্টা নেড়ে আবতি করে আসা। তাহলেই চাকবিব লেঠা চুকে যেত। কেউই আমার নিরবচ্ছিন্ন সাধন-ভজনের ব্যাঘাত করতে সাহস কবত না।

কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না। লোকে সমীহ করে কথাবার্তা বলতে শুরু করলে আমার সম্বন্ধে। কারও সঙ্গে মেশে না, কথা কয় না, সাবা দিন-রাত দরজা বন্ধ করে অঙ্ককার ঘরে কি করে? সহজ লোক নয় মানুষটি। অসীম ক্ষমতা-সম্পন্ন লোক যে আমি, আব সহজে কাউকে ধবা-ছোঁষা দেব না কিছুতেই—এ কথা চুপি চুপি এ মুখ থেকে ও কানে আব ও-কান থেকে সে-মুখে বটতে লাগলো।

ফলও ফলল। স্বয়ং ডি-ফিল সাহেব একদিন সস্ত্রীক উপস্থিত হলেন তাঁর কালীবাড়িতে। উদ্দেশ্য—তাঁর দশ-টাকা-মাইনের পূজারী বামুনকে একটু বাজিয়ে দেখা। অনেকের মুখ থেকে অনেক রকমের কথা শুনে তাঁর খেয়াল হয়েছে লোকটি আসল না মেকী একটু যাচাই কববার।

একথা অবশ্য মানতেই হবে যে, তাত্ত্বিক সাধকের মধ্যে কে কেমন দরের ‘চিহ্ন’, তা এক আঁচড়ে বোঝবার শক্তি তাঁর মত লোকেব খাৰা উচিত। তাবানন্দ পরমহংসের সাক্ষাৎ মেয়েব ছেলে তিনি। কান্দীর বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ঠারা তারানন্দকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন বা জানতেন, তাঁরা এখনও স্বামীজীর নাম করলে কঁপে ওঠেন। শুধু তাঁরা কেন—এত সব অজুত বাহিনী চালু আছে তারানন্দ আর তাঁর এই মঠবাড়ি সম্বন্ধে—যে এখনও লোকে এই কালী আব কালীবাড়ির নামে কপালে জোড়হাত ঠেকায়। সাক্ষাৎ ভৈরব ছিলেন তারানন্দ। দুধকে মদ আর মদকে দুধ বানানো কর্মটি ছিল তাঁর কাছে ছেলে-খেলা। গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে কতদিনের মড়া কে জানে, গা থেকে মাংস খসে গলে পড়ছে। তাই তুলে নিয়ে এসে মা কালীর ঘরে চুকে দরজা বন্ধ করেছেন। একপক্ষ কাল পরে দরজা খুলে তার হাত ধরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছেন। এই ধরনের নাকি সমস্ত অমাহুষিক শক্তি ছিল তাঁর। কালে-ভদ্রে যখন তিনি বার হতেন তখন মঠ থেকে দামামা বেজে উঠত। তা শুনে রাস্তার দু-পাশের বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ হয়ে যেত। লোকে বিশ্বাস করত, তাঁর চোখের সঙ্গে চোখ মিললে আর রক্ষে নেই। ঘরের বউ-ঝি, যাকে তাঁর ইচ্ছে হবে, তাকেই টেনে নিয়ে যাবেন মঠের মধ্যে।

বহু নয়বলি নাকি হয়ে গেছে তাঁর সময়ে কালীর সামনে ।

বড় বড় রাজা-মহারাজা ছিল তাঁর শিষ্য-ভক্ত । আর ছিল তাঁর তিনটি শক্তি । প্রথমা তাঁর বিবাহিতা পত্নী ; দ্বিতীয়া এক অন্ধদেবীয়া কন্যা—তাকে তিনি গ্রহণ করেন, যখন পরিত্রাজক অবস্থায় দক্ষিণ ভারতে তীর্থ দর্শন করে বেড়াচ্ছিলেন ; শেষ বয়সে তৃতীয় শক্তি পান গুরু-দক্ষিণা হিসেবে তাঁরই এক শিষ্যের মেয়েকে ।

ঐ তেলেঙ্গী শক্তির গর্ভে জন্মায় এক মেয়ে । মেয়ে তো নয় যেন অগ্নিশিখা ! আট বছর বয়সেই সে মেয়ের দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যেত । সেট জন্মেই বোধ হয় মেয়ের নাম রেখেছিলেন স্বামীজী—স্বাহা । বয়স যখন তার ঠিক নবছর, তখন কোথা থেকে এক অতি সূদর্শন ষোল বছরের ব্রাহ্মণ সন্তানকে জোগাড় করে আনলেন স্বামীজী । এনে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন । শৈব বিবাহ হল শাস্ত্রমতে । গৌরীদানের ফল লাভ করলেন তারানন্দ । বিয়ের পর মেয়ে-জামাইকে কাছে রেখে দিলেন । জামাইকে দীক্ষা দিলেন, শাস্ত্রাভিষেক থেকে পূর্ণাভিষেক পর্যন্ত করলেন । মেয়ে জামাইকে মঠ আর কালীর ভবিষ্যৎ সেবায়েত করে রেখে যাবেন এই ছিল তাঁর বাসনা । সেজন্ত উপযুক্ত বিধিও তিনি দিচ্ছিলেন জামাইকে । কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল । তারানন্দ হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন । শোনা যায় তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল ।

তার অল্প কিছুদিন পরে তাঁর জামাইও রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হলেন । বোধ হয় উচ্চতর সাধনমার্গে প্রবেশ করবার জন্তে চলে গেলেন হিমালয়ে । মেয়ের বয়স তখন মাত্র উনিশ-কুড়ি । অতুলনীয় রূপ-লাবণ্যবতী সেই মেয়ে সেই বয়সেই যথোচিত আডম্বরের সঙ্গে ভৈরবী-পদে অভিষিক্তা হলেন । হয়ে কায়মনোবাক্যে সাধন-ভজনের শ্রোতে গা ভাসালেন । পা পর্যন্ত এলোচুলে আর রক্তাংগ মহামূল্য বেনারসীতে তাঁকে এমন মানান মানালো যে, সাক্ষাৎ শিবও দেখতে হয়ত তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তেন ।

স্বাহা ভৈরবীর হাতে এল প্রচুর সোনাদানা হীরে-জহরত । মঠের এক গুপ্ত ঘরে ছিল কয়েক ঘড়া গিনি আর মোহর । দেহত্যাগের আগে মেয়েকেই সে সন্ধান দিয়ে যান তারানন্দ । স্তব্ধ স্বাহা ভৈরবীর আমলেই হচ্ছে মঠের সব-চেয়ে গৌরবময় অধ্যায় । ধন-দৌলতের সঙ্গে একপাল শিষ্য-সেবক সাধক-সাধিকা এসে জুটল ফাউ হিসেবে স্বাহা ভৈরবীর পায়ের তলায় । আরম্ভ হল স্বর্ণযুগ । তান্ত্রিক সাধন অস্ত্রাঙ্গাদির বিপুল সমারোহ আরম্ভ হল । মণ্ড, মাংস, মৎস্য, মূত্রা ইত্যাদির ঢেউ বয়ে যেতে লাগল মঠে । দিবারাত্র অষ্টপ্রহর শোনা যেতে লাগল কেউ বলছে ‘জুহোমি’—তৎক্ষণাৎ কেউ উত্তর দিচ্ছে ‘জুহুং পরমানন্দে’ । এক-

সঙ্গে বহু-বিচিত্রকণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল যখন তখন—

“ও ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিত্রাক্ষ্যো ব্রহ্মণা হৃতম ।

ব্রহ্মৈব তেন গম্ভব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা ॥”

তখন এই বাড়ির বন্ধ ঘরের দরজার গায়ে কান পাতলে শোনা যেত আরও কত বিচিত্র বহুস্রময় শব্দ । কত হাসি আর সঙ্গে মর্মস্পর্ক চাপা আর্তনাদ । আরও কত বিচিত্র সব মন্ত্র । যেখন—

“ও ধর্মাধর্মহবির্দীপ্তে আত্মায়ো মনসা স্রুচা ।

স্বযুগ্মাবয়্বানা নিত্যমক্ষবৃন্তিভূহোম্যাহং ॥”

ভৈববী স্বাহা দেবীব আমলে এই মঠ থেকে জলন্ত অন্ধার-তুল্য এক দল সাধক-সাধিকা বার হল—যারা প্রকাশে তত্ত্বের মহিমা চারিদিকে প্রচার করে বেড়াতে লাগল । কিছুদিন পরেই শঙ্কবীপ্রসাদের জন্ম হয় । অতি অল্প দিনই মাষের বৃকের দুধ পায় সে । ছেলে জন্মাবাব পর আরও প্রচণ্ডভাবে স্বাহা ভৈববী সাধন-মার্গে প্রবেশ কবলেন । একটি উল্লেখযোগ্য ভাল কাজও তিনি কবে-ছিলেন সে সময় । প্রচুব টাকা আর তাঁব শিল্প সস্তানটি তিনি দিয়ে এসেছিলেন খুঁটান মিশনারীদের কাছে । দিয়ে এসে নিকরপ্লাট হয়ে ডুবে গেলেন আধ্যাত্মিক জগতে ।

মাত্র বত্রিশ বছর বয়স পষন্তু দেহ রাখতে পেরেছিলেন তিনি । বড় বড় কয়েকটা মামলা মকদ্দমা করতে হয় তাঁকে তাবানন্দেব অন্ত আর একদল শিল্পেব সঙ্গে । শেষে যখন সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন তিনি জীবনের মাত্র বত্রিশটি বছর পাব হয়ে—তখন সোনা-রূপো-হীরে-জহবতের এতটুকুও আব পাওয়া গেল না মঠে । রটল শুধু তাঁকে আর মঠকে ঘিবে সব ভয়াবহ বদনাম । এতবড় শিন-মহল বাড়িখানার ঘরে ঘরে তালা ঝুলতে লাগল । কালীর সেবা বন্ধ হল । তখন প্রাণহীন বাড়িখানার পাশ দিয়ে যেতে আসতে লোকের বুক কেঁপে উঠত । বাশি রাশি আজগুবি গল্প চালু হয়ে গেল মঠ আর কালী সম্বন্ধে । বন্ধ বাড়িখানার ভেতর থেকে নাকি দিনের বেলাতেও অদ্ভুত সব আওয়াজ পাওয়া যেত । কখনও পাওয়া যেত হোমের গন্ধ, কখনও শোনা যেত বিচিত্র সুরে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ । কখনও বা বুকফাটা হাহাকার আর আকুল কান্না । যেন অব্যাহতি পাওয়ার জন্তে কোন এক হতভাগিনী মাথা খুঁড়ছে মঠবাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে । লোকে বলে, কুলবৃন্দের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ধরে এনে মঠে ঢোকানো হয়েছে কিন্তু তারা আর কখনও এখান থেকে বার হতে পারেনি । আরও কত কি লোকে বলে । এমন কথাও অনেকে বলে যে, যাকেই এ কালীর সেবায় লাগানো হয়, তারই নাকি

মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। একবার বলতে আরম্ভ করলে লোকে কীই বা না বলতে পারে ?

স্বাহা ভৈরবীর মহাপ্রয়াণের ঠিক সতেরো বছর পরে বিলেত থেকে কিরে এলেন শঙ্করীপ্রসাদ। এসে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ে মঠ আর কালী অধিকার করলেন। ঘরে ঘরে ভাড়াটে বসালেন। পুনরায় সেবা-পূজার ব্যবস্থা করলেন মা কালীর। বরাদ্দ করলেন মাসে দশটি টাকা আর এক চটাক মদ। কিন্তু মুখ দিয়ে রক্ত ওঠার ভয়ে সহজে কোনও ব্রাহ্মণ মেলে না কালীর নিতাপূজার জন্তে। এমনও হতে পারে যে, মাত্র দশটাকার মধ্যে ত্রিশ দিন পূজার খরচা আর পারিশ্রমিক পোষায় না বলেই সহজে কেউ রাজী হয় না এ-কাজ নিতে। এটা আমারই বরাত জোর বলতে হবে। তার ওপর তিন মাস কালীর পূজা চালাবার পবেও যখন মুখ দিয়ে রক্ত উঠল না—তখন সহজ লোক যে আমি নই, সেটাও তো প্রমাণ হয়ে গেল। তাই স্বয়ং মালিক আর মালিক-পত্নী এসে উপস্থিত হলেন।

জুতা পায়ে খট খট মস মস আওয়াজ তুলে তাঁরা একতলা-দোতলা-তেতলা ঘুরে সব দেখে-শুনেন। ভাড়াটেদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করে শিঁড়ির তলায় আমার ঘবের সামানে এসে দাঁড়ালেন। বন্ধ দরজাব ভেতর থেকে ওঁদের আলাপ আলোচনা শুনেতে পেলাম। ভাড়াটেদের মধ্যে মিমুর মা কইয়ে-বলিয়ে মানুষ। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কানপুরে তাঁর ভাই-ভাইপোবা ভাল চাকরি করেন। অতি বুদ্ধা মাকে নিয়ে কালীবাস কবছেন মিমুর মা। মাকে নিয়ে কেন্দার-বদরী পর্যন্ত করে এসেছেন। শত্রু পাকানো শরীর। বার-ব্রত-উপবাস আর নিত্য ছ'ঘণ্টা জপ—তার ওপর চলতে-ফিরতে অশক্ত জননীকে শিশুর মত করে নাওয়ানো খাওয়ানো, এই সমস্ত করতে করতে ক'ন চক্ষু দুটিতে স্নিগ্ধ প্রশান্ত জ্যোতি ফুটে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, পবে লক্ষ্য করেছিলাম—তাঁর স্তন্যর ইংরেজী হাতের লেখা। ইংরেজীতে নাম সহ কবে তিনি মনি-অর্ডার নিতেন।

তিনি সঙ্গে ছিলেন বাড়িওয়ালাদের। দরজার বাইরে দাড়িয়ে ওঁরা চাপা গলায় আলাপ করতে লাগলেন।

“কি করেন সারাদিন ঘরের মধ্যে ?”

“ধ্যান-জপ করেন নিশ্চয়।”

“কখনও কথাবার্তা বলেন না আপনাদের সঙ্গে ?”

“আমাদের দিকে কোনও দিন একবার চেয়েও দেখেননি !”

“কেউ কখনও দেখা করতে আসে না ঠুঁর সঙ্গে ?”

“কাকেও দেখিনি ত কোনও দিন আসতে ।”

“চিঠিপত্র কিংবা টাকা-কড়ি কখনও আসে না ঠুঁর নামে ?”

“আজ পর্যন্ত একখানি চিঠিও আসে নি ।”

“কোনও অলৌকিক কিছু কখনও টেব পেয়েছেন আপনারা ?”

“উনি যখন মায়ের ঘরে থাকেন তখন কার সঙ্গে যেন কথাবার্তা বলেন । দরজা তো বন্ধ থাকে, কাজেই ঘরের ভিতর কি যে করেন তা দেখতে পাই না তো । শুধু বাইরে থেকে কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যায় ।”

মেঘলি গলায় ইংরেজীতে কে বললেন, “দবকার নেই আর ঠুঁকে ডেকে । হয়ত বিরক্ত হবেন । চল আমরা পালাই এখন ।”

“একবার ডেকে দেখলে হয় না ?”

মিহুর মা বললেন—“কি দরকার এখন বিবর্তন করে ? মাসকাবারে যেদিন টাকা আনতে যাবেন সেইদিনই আলাপ করবেন ।”

“সেই ভাল । চল আমরা আজ পালাই এখন ।”

ঠুঁরা চলে গেলেন ।

পরদিন পূজা সেরে ঠাকুরঘর থেকে বেরুচ্ছি, একটা ঘটি হাতে করে সামনে এসে দাঁড়ালেন মিহুর মা ।

“বাড়িওখালার কাল এসেছিলেন । আজ থেকে মায়ের ভোগে একসের করে দুধেব ব্যবস্থা কবে গেছেন । আপনি যখন মায়ের ঘবে ছিলেন গয়লা তখন দুধ দিষে গেছে ।”

চাকরি আরও বাড়ল । ‘দুধ জাল দাও, তারপর আবার বাসনটা মাজো ধোও । দশটাকায় আব কত হতে পারে ! ভুরু কুঁচকে ঘটিটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম । মিহুর মা মুশকিল আসান করলেন ।

“যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে দুধ জাল দিয়ে পাথরের বাটিতে করে মায়ের ঘরে রেখে দোব । সন্ধ্যায় মায়ের ভোগ দেবেন ।”

বৈঁচে গেলাম । “তাই করবেন” বলে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম ।

সন্ধ্যার পর দুধের বাটি হাতে নিয়ে মিহুর মার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়লাম ।

“প্রসাদ নিন ।”

“না-না-না । আমরা প্রসাদ নোব কেন ? রাতে ওটুকু আপনি সেবা করবেন বাবা,”—ব্যাকুল মিনতি ঠাঁর গলায় ।

“তবে এক কাজ করুন। যে অঙ্ক বুড়িটা বাইরের দালানে পড়ে থাকে তাকে দিয়ে দিন।” বাটিটা ঠুঁদের দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম।

মাসকাবারে টাকা আনতে গেছি। টাকা কটা আর মদটুকু চাকরের হাতেই প্রতিবার বাড়ির থেকে আসে। এবার শঙ্করীপ্রসাদ সাহেব নিজেকে বেরিয়ে এলেন। সম্বর্ধনা করে নিয়ে গিয়ে বসালেন ড্রয়িংরুমের গদিমোড়া চেয়ারে। জ্বীকে ডেকে আনলেন। আরম্ভ হল আলাপ-পরিচয়।

“আপনার কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো?”

“কষ্ট আর কি, বেশ আরামেই তো আছি।” উত্তর না দিয়ে উপায় নেই।

“দোতলার দুটো ঘর খালি আছে। ও ঘর-দুটো আর ভাড়া দোব না আমি।” বলে অপেক্ষা করতে লাগলেন কিছু শোনবার জন্তে আমার মুখ থেকে। কিন্তু আমি কি বলব—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

“ওপরের ঘরে থাকতে আপনার অসুবিধে হবে?” জিজ্ঞাসা করলেন স্বামী, জ্বী তার সঙ্গে যোগ করে দিলেন : “বাসন মাজা, উত্তন ধরানো, ঘর-দরজা ধোয়া-মোছার জন্মে একজন লোক দেখতে আমি ভাড়াটেদের বলে এসেছি।”

“ওপরের ঘর দু’খানার চুনকাম হয়ে গেলে আপনি ওপরেই থাকবেন।”

জ্বী আরও একটু যুক্ত করলেন—“এ মাস থেকে আমরা দুজনে পূজো দিচ্ছি।” বলে দশটাকার দু’খানা নোট রাখলেন আমার সামনে।

তৎপাশ্বে, আমার আপত্তি করবার কি আছে? নোট দু’খানা তুলে নিয়ে চলে এলাম। মায়ের পূজার দাঁর হয়ে যাচ্ছে। এলাম ঝুঁদেরই গাড়িতে চেপে। মনিব-ঠাকুর একঝুড়ি ফল দিয়ে দিলেন সঙ্গে। রাতারাতি কপাল ফিরে গেল। একেই বলে মায়ী দয়া!

ঝঙ্কাট বেড়েই চলল দিন দিন।

মায়ের মন্দিরের ভেতর ইলেকট্রিক আলো হল। প্রতি অমাবস্তার রাতে বিশেষ পূজা-ভোগ-হোম। শঙ্করীপ্রসাদ আর তাঁর জ্বী বন্ধু-বান্ধবরা প্রসাদ পেতে লাগলেন। বাড়ির ভাড়াটেরা সবাই বিধবা কান্দীবাসিনী। সকলেই ভক্ত-সংসার থেকে এসেছেন। এঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের কাজ-কর্ম সমস্ত বাঁধা-ধরা। ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে জপে বসেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে বেলা দশটা এগারটা পর্যন্ত জপ চলে। জপ থেকে উঠে কেদারঘাটে গিয়ে গন্ধান্নান করে কেদারনাথের পূজা সেবে বাড়ি ফিরতে সেট একটা-দেড়টা। তখন উল্লে আশুন দিয়ে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ায় বণ্টা তিনেক ২.৫২ বায় হয়। এই সময়ই সমস্ত বাড়িটা জেগে উঠে। বেলা চারটের মধ্যে ঘর দরজা ধুয়ে মুছে, বাসন কোসন

যেহে পনের দিনের ভিত্তে উঠুন সাজিয়ে রেখে কোথাও পাঠ বা কীর্তন শুনতে যান। সন্ধ্যার সময় ফিরে আসেন ছ'চার পয়সার বাজার হাট করে নিয়ে। সেই সময় আর একবার বাড়িতে সকলের গলায় আওয়াজ পাওয়া যায়। তারপরই আন্তে আন্তে সমস্ত বাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। ওঁরা নিজের নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে আবাব ভূপে বসেন।

এতদিন শান্তিতেই সমস্ত চলছিল—ঘড়ি-ধরা সময়ে মায়ের সেবা-পূজার ধুমধাম বাড়াব সঙ্গে সঙ্গে এঁদেরও কাজকর্ম বেড়ে গেল। সকলকেই এটা ওটা কবে দিতে হয় প্রতিদিন। মা কালীকে নিয়ে মেতে উঠলেন সকলে। প্রাণহীন বাড়িটায় আবাব প্রাণ ফিরে এল। কঁাসর ঘণ্টাব শব্দেব সঙ্গে আবাব গুরু গুরু শব্দে বেজে উঠল ঠাকুরদালানের কোণে বসানো প্রকাণ্ড তামার খেলের উপর নতুন চামড়া লাগানো মঠেব বহু পুণাতন দামামাটা। গঙ্গাস্নান কবে যাবার সময় শত শত স্ত্রী-পুরুষ মায়ের পায়ে ফুল-জল দিতে লাগলেন রোজ সকালে।

তবু লোকেব মন থেকে ভয় ঘুচল না। সে ভয়টা আবো কালো হয়ে উঠল আমাদের ঘিবেই। কই—বকু তো উঠপ না এব মুখ দিয়ে। স্মৃত্যং এ লোক সহজ লোক নয়। মা কালীর ভক্ত যত না বাড়ুক, আমরা ভক্ত বেড়ে চলল দিন দিন। রোজই নতুন নতুন মুখ। সকলেবই গুহু কথা আছে। সময় করে দেওয়া হল—বিকেল চাপ্টে থেকে ছাঁটা। তখন সকলে সাক্ষাৎ পাবে আমরা। সবার মুশকিল শুনব তখন।

দু'ঘণ্টা ধৈষ ধরে বসে শুনতে হত সকলেব গুহু কথা। বলতে হত মাত্র একটা উত্তর। “ইচ্ছামযাব ইচ্ছা।” মা যা কবেন।” তাতেই কাজ হত। মায়ের ইচ্ছেটা যাতে তাঁদের অন্তকূলে মোড় ফেবে তাব দকন বেশ মোটা হাতে প্রণামী দিয়ে বিদেয় নিতেন সকলে।

শঙ্করীপ্রসাদরা মহা সন্তুষ্ট। তাঁদের কালীবাড়িব উন্নতি হচ্ছে। এমন কী বাড়িভাড়া আদায় করাও ওঁরা ছেড়ে দিলেন। সে কাজটিও আমার ঘাড়ে পড়ল। ওটা আদায় হলে বায় করাও আমরা দায়। ওঁরা শুধু অমাবস্তা পূজাব একখালা প্রসাদ পেয়েই খুশী। মাঝে মাঝে ইজিত করতেন যে, মায়ের পূজায় মদের বরাদ্দটা না বেড়ে যায়। ঐতেই একবার ঘুচে গিয়েছিল কিনা সেবা-পূজা সমস্ত। সে ভয়টা আমারও ছিল। কাজেই তর্পণ করতে বা করাতে ধাঁরা এলেন তাঁরা মনঃপীড়া পেয়ে ফিরলেন।

এই রকমে যখন সব দিক দিয়ে অসজ্জলে অবস্থা কালীবাড়ির—তখন একদিন

বিকেলবেলা মোটা একগাছি জুই ফুলের গোড়ে হাতে নিয়ে আমাকে দর্শন করতে এল একটি ছোকরা। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম দেবে উঠে সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। মালাটি আমার গলায় পরিয়ে দেবে।

“আরে, এ আবার কি আপদ! ফুলের মালা আমাকে কেন?”

কোনও গুজর আপত্তি শুনলে না সে। আমাকে পরাবে বলে কিনে এনেছে মালা, সুতরাং পরাবেই আমার গলায়। সামনে যে কজন বসে ছিলেন তাঁরাও ওর হয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। ঠৈ-ঠৈ গোলমাল আরম্ভ হল। বিরক্ত হয়ে বললাম, “দাঁও পরিয়ে।” গলা বাড়িয়ে দিলাম। মালা পরিয়ে দিয়ে আবার প্রণাম করে যখন সে উঠে বসল সামনে, তখন ভাল করে চেয়ে দেখলাম ছোকরার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

এমন অপরূপ রূপ সত্যিই কোনও দিন চোখে পড়েনি। ছিপছিপে গড়নের কালোবরণ একখানি দেহ। এমনই মানানসই তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি যে মনে হয়, কোনও গুস্তাদ বারিগর মাপজোপ করে হাতে গড়েছে। মাথার মাঝখানে সিঁদি, লম্বা চুল দু’ভাগ হয়ে গলার দু’ধাং দিয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে। চুলের শেষটুকু আবার বেশ কোঁকড়ানো। কপালের সঙ্গে সমান টিকোলো নাক। মুখের দু’ধারে প্রায় কানের কাছে গিছে পৌঁচেছে টানা টানা দুই চক্ষু। কেমন যেন ভাববিহীন সেই চোখের চাহনি। আরও আছে অনেক কিছু সেই মুখে। ছোট্ট কপালখানিতে আব নাকেব ওপর যত্ন করে তিলক আঁকা। কালো রঙ-এর ওপর সাদা তিলক। এমন থলেছে যেন তিলক না থাকটাই অস্বাভাবিক হত। দুই কানের পাতায় সাদা পাথর বসানো দুটি সোনার ফুল—সে দু’টি দিয়ে আলো ঠিকরে পড়েছে। লম্বা গলায় জড়ানে’ তিন ফের তুলসীর মালা। একখানি সিল্কের চাদরে বিশেষ ছাঁদে জড়ানো তার দেহখানি। চাদরের নিচে আরও কিছু আছে কিনা দেখতে পেলাম না। নবকিছুর ওপর প্রথমই নজরে পড়ে তার ঠোঁটের একফালি অদ্ভুত ধরনের হাসি। যাদের জীবনে জালা-যন্ত্রণা কিছু নেই—ঐ জাতের হাসি তাদের ঠোঁটেই লেগে থাকে।

“আপনার কাছে এলাম, মাকে একখানা পালা গান শোনাব বলে।” এমনভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে যেন সেই অপূর্ব চক্ষু দু’টির চাউনি আমার দেহের মধ্যে স্ফুটন্ত দ্বিতে লাগল।

তখন পরিচয় পেলাম তার। সকলেই চেনে তার। প্রায় একমাস এসেছে কালীতে দলবল নিয়ে। নাম মনোহর দাস। লীলা-কীর্তন গায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে, কুচবিহারের কালীবাড়িতে, ছাতুবার-লাটুবার ঠাকুর-বাড়িতে কয়েকখানা

পালা গান ইতিমধ্যেই গাওয়া হয়ে গেছে। তার গান শুনে হৈ-টৈ পড়ে গেছে চারিদিকে। এমন গানই সে গায়, যা নাকি কাকপক্ষী ‘ধির’ হয়ে শোনে। নিজে সেধে আমাদের কাশীবাড়িতে গান শোনাতে এসেছে মনোহর দাস—এটা একেবারে আশাতীত কাণ্ড। সে সময় যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের আয় ভাঙাটোদের মুখ থেকে মনোহর সম্বন্ধে যা শুনেতে পেলাম, যে একমের খাতির সম্মান সকলে করলে তাকে, তাতে বুঝতে বাকি বইল না যে, মনোহর অতটুকু মানুষ হলে হবে কি—তার খ্যাতি অনেক বড়।

বললাম, “আমি টাকা পয়সা দিতে পাবব না বাবাজী, সে সামর্থ্য নেই আমার।” মনোহর আরও বিনীতভাবে উত্তর দিলে, “সে জগ্নে অল্প স্থান আছে। আপনার কাছে আমিই তো সেধে এসেছি।”

সুতরাং আমার আব আপত্তি করবার কি আছে?

কবিবাজ মশাই স্বেচ্ছায় উঠুন ভেঙে তেলের কড়াই সবিয়ে মায়ের সামনের উঠান সাফ কবে দিলেন পবদিন সকাল বেলাতেই। বিকেলে মনোহরের গানের আসর। লোকজন জমতে লাগল বেলা একটা থেকে। ছোট্ট উঠানে শ’তিন-চার লোক ধবে বড় জোর। লোক এল তার চেয়ে ঢের বেশি। মেয়েদের ভিড়ই অত্যধিক।

আসরের মাঝখানে বল পাঁচজন—একটি হাবমোনিয়াম, দু’খানি থোল, একটি বেহালা আর একজোড়া কন্ডাল নিয়ে। তাদের মাঝখানে সামান্ত একটু জাষগাষ দাঁড়াল মনোহর। গলায় প্রকাণ্ড জুঁই ফুলের মালা। গায়ে চাঁপা বঙ-এর শিকের নামাবলী। একহাতে ছলছে রূপো-বাধানো মস্ত বড় সাদা চামর। মনোহরের দিক থেকে তখন চোখ ফেরায় কার সাধ্য।

পালার নাম কলকলজন।

শতছিন্ন একটি কলসী। যমুনা থেকে জল আনতে হবে ঐ কলসীতে কবে। মনে প্রাণে যে সতী—সে-ই পারবে এই অসাধ্য সাধন করতে।

বুকে তুলে নিলেন সেই কলসী বাধারাপী। তাঁর ভেতর-বার শ্রামকলকে কালো হয়ে গেছে। সেই কলকে কলসীর শতছিন্ন লেপে যাক। শ্রামকলকে কি কিছুতেই ভঞ্জন হবে রাই কলকিনীর? বললেন তিনি অন্তর দিয়ে অন্তরের অন্তরতমকে, “আমি শ্রামকলকে গরবিনী, দেখি কেমন করে এই হেঁদা কলসী আমার সে গরব ভাঙে? তা যদি হয় তবে তোমার কালা মুখ তুমি দেখাবে কেমন করে জিজগতে? তোমার চেয়ে আরও বড় কিছু আছে নাকি, আরও বড় লজ্জা, আরও নিবিড় কোন কালো! ঐ কালো রূপ দেখতে দেখতে আমার চোখের তারা দু’টি কালো

হয়ে গেছে। ঐ কালো রূপের আগুনে গুড়ে আমি যে আঙার হয়ে গেছি। আঙারের কালিমা কোনও কিছুতে ঘোচে নাকি কখনও? শতবার ধুলেও কয়লা কয়লাই থেকে যায়। কি করবে এই শতছিন্ন কলসী আমার?” বলে তিনি জল আনতে চলে গেলেন। যমুনার কালো জল, জল তো নয়। এও যে সেই শ্রামরূপ। শ্রামরূপে ছেঁদা কলসীর ছেঁদা গেল লেপে। জল তো নয়, এক কলসী শ্রামরূপ ভরে নিয়ে এলেন রাই। তাঁর শ্রামকলঙ্কের ভঞ্জন হল না।

মনোহর গাইছে। গাইছে নাম-মাত্রই। করছে যা তার নাম ব্যাখ্যান। হাত নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে চোখের তারা দু’টিতে কখনো আলো কখনো আঁধার ফুটিয়ে তুলে নিজের মনের মত করে বোঝাচ্ছে তাব শ্রোতাদের। তার কণ্ঠ দিয়ে যেন মধু ঝরে পড়ছে। কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে, কখনও বা অভিমানে ফুলে ফুলে উঠছে। সহস্র-জোড়া চক্ষু তার ওপর স্থির হয়ে আছে, একটি চোখের পাতাও পড়ছে না। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সবাই। আমিও।

মনোহরের কথা বিন্দুবিসর্গও কানে যাচ্ছে না। শুধু চেয়ে আছি তার চক্ষু দু’টির দিকে। ‘সর্বনেশে চোখ দু’টিই এতগুলো মেয়ে-পুরুষের বাহ্যজ্ঞান লোপ করে ফেলেছে।

সঙ্ঘার পর শেখ হল সেদিনের পালা। চাল-ডাল, ঘি-মসলা, আনাঙ্গ-তরকারি দিয়ে সাজানো বড় বড় কয়েকটা সিধা পড়ল। টাকা পয়সাও মন্দ পড়ল না।

বিদায়ের সময় তাকে দু’হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। মনোহর জানিয়ে গেল কালকের পালা রাইরাজা।

আরও একদিন আরও এক পালা—এই করে করে পর পর সাতদিন গান হয়ে গেল। নেশা ধরে গেছে সকলেরই। বেলা একটা না বাজতেই ৫০ ক জমতে শুরু করে। আগে এমে সামনের জায়গা দখল করবার জন্তে সকলেই সচেষ্ট। বডলোকে বড়ির ঝি এসে মনিব ঠাকরনের জন্তে কার্পেটের আসন পেতে পাহারা দেয়। গান আরম্ভ হবার একটু আগে আসেন স্বয়ং গিন্নী ঠাকরন। পিছনে চাকরের মাথায় মস্ত এক ভালা। তাতে চাল ডাল আনাঙ্গ ঘি মসলা ক্ষীর সন্দেশ ফুলের মালা। রূপার পানের কোঁটা আর সিধের ভালা সামনে নিয়ে গিয়ে গিন্নী-মা তিন জনের জায়গা জুড়ে কার্পেটের আসনে বসেন। গানের শেষে নিজে সিধা তুলে দিয়ে যাবেন মনোহরের হাতে। তারপর আরও আছে, পরদিন দুপুরে তাঁর কাছে সেবা করে আসবার সনির্বন্ধ অহুরোধ। কিন্তু মনোহর একজন মাত্র—আর তার পেটও একটাই। রোজ দশজনের কাছে সেবা গ্রহণ করেই বা কি করে সে? স্তব্র্য তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়ানো নিয়ে বেবারেখির অন্ত ছিল না।

মা কালীর সামনে প্রণামী পড়ার বহরও বেড়ে গেল। বেশ চলছিল কদিন। সকালের দিকটা একটু চুপচাপ, তারপর ছুপুর থেকেই উৎসব আরম্ভ। লোক সমাগম, হৈ চৈ কলহ কোলাহল। বিকেলে গান আরম্ভ হলে আর এক রূপ। খোল কস্তাল হারমোনিয়াম বেহালা বেজে উঠলে চারিদিক একেবারে নিম্পন্দ নিস্তব্ধ। তখন মনোহরের মধুকণ্ঠ থেকে অপরূপ রূপে জন্মগ্রহণ করে থাঁওতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বিদ্রলকার দল। মান-অভিমান হাসি-অশ্রু বিরহ-মিলনের এক মায়া-জগৎ সৃষ্টি করে মনোহরের কণ্ঠ, যারা শোনে তারা নিজেদের হারিয়ে ফেলে সেই কল্পনার স্বরলোকের মাঝে।

সেদিন পালা হচ্ছে কলহাস্তরিতা।

নতমুখে দাঁড়িয়ে শ্রামসুন্দর। চম্পাবলীর কাছে রাত কাটিয়ে এসেছেন। তার চিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে। গালে সিন্দুরের দাগ, অঙ্গে নথের আঁচড়, মোহন চূড়টি খসে পড়েছে বুকের উপর। আরও কত কি!

ছি ছি ছি, লজ্জা করে না তোমার সারা রাত কাটিয়ে এসে মুখ দেখাতে? কি দশা হয়েছে তোমার রূপেব! কে করেছে অমন দশা তোমার? আমরা হলে লজ্জায় মরে যেতাম। না, তুমি ফিরে যাও। তোমার ও-মুখ আমি আর দেখতে চাই না।

গল্পনা দিচ্ছেন রাধারাগী। তখন করুণ-ভাবে মিনতি করলেন, ক্ষমা চাহলেন শ্রামরায়। মান ভাঙ্গাবার শতচেষ্টা করে নতমুখে ফিরেই গেলেন শ্রীমতার হৃদয়-বল্লভ। সঙ্গে সঙ্গে রাগ পড়ে গেল। দুজয় মান কোথায় গেল কে জানে, তার বদলে যা আরম্ভ হল তার নামই কলহাস্তরিতা।

কেন ফিরিয়ে দিলাম তাকে—হায়, কোন্ প্রাণে ফিরিয়ে দিলাম। আরম্ভ হল অন্তর্দাহ। সেই অন্তর্দাহের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছে মনোহর নিজেই। তার দুই চোখ দিয়ে, গলা দিয়ে, সর্বাঙ্গ দিয়ে বিচ্ছেদের জ্বালা বেদনার মধুরস হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। এত জোড়া চোখের মধ্যে এক জোড়া চোখও শুষ্ক রহল না। আসরের চতুর্দিক থেকে আরম্ভ হল ফৌস ফৌস শব্দ আর নাকঝাড়ার আওয়াজ।

মা কালীর দরজায় বসে গান শুনছি। মিহুর মা এসে ডাকলেন।

“একবার উঠে ভেতরে আহ্নন বাবা। একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।”

মিহুর মা ভয়ানক হিসেবী মানুষ। গুরুতর কিছু না হলে আমার উঠে আসতে বলবেন না। কি হতে পারে? কে আবার এল এ-সময় দেখা করতে?!

উঠে গেলাম বাড়ির মধ্যে ।

“কই, কে ডাকছে আমার ?”

মিছুর মা দেখিয়ে দিলেন, “এই এরা ।”

এরা বলতে অন্ততঃ দু’জনকে বোঝায় কিন্তু দেখতে পেলাম মাত্র একজন । এক ছোট্ট বউ । মুখের অর্ধেক ঘোমটা ঢাকা । গলায় আঁচল দিয়ে ঠাট্টা গেড়ে বসে বউটি প্রণাম করলে । এতটুকু বউ মানুষ—কি চায় আমার কাছে ? নিজে থেকে কিছু বলবে, এই আশায় চেয়ে রইলাম । হঠাৎ কানে এল—কান্না চাপবার শব্দ । ঘোমটার মধ্যে বউটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ।

বেশ ঘাবড়ে গেলাম । মুখ দিয়ে কোনও কথা আসছে না আমার । মিছুর মার দিকে চাইলাম । তিনিই পরিচয় দিলেন—“মনোহর দাস বাবাজীর বউ । আপনি না বাঁচালে মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে যাবে ।”

আকাশ থেকে পড়লাম । মনোহরের আবার বউ আছে একটি । তার মানে এর মধ্যেই মনোহর বিয়ে-থা করে ফেলেছে । মনোহর পুরোপুরি সংসারী মানুষ এ কথা যে কল্পনা করাও সহজ নয় । মান-অভিমান বিরহ-মিলন ইত্যাদি কাণ্ড-কারখানাগুলোয় জ্ঞে যে আলাদা এক জগৎ আছে, মনোহর হচ্ছে সেখানকার মানুষ । জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, জী-পুত্র, ক্ষুধা, অভাব-অনটন কামড়া কামড়ি এ সমস্ত হচ্ছে এই মাটির জগতের ব্যাপার । মনোহর এই মাটির জগতের মানুষ নয়—তবু সাত-তাড়াতাড়ি একটি বিয়েও করে ফেলেছে । কিন্তু যতই আশ্চর্য মনে হোক, এই বউটি তো আর মিথ্যে হতে পারে না । মনোহরের বিয়ে-করা বউ চাক্ষুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছে । কোন জাতের রস যে এর কান্না থেকে ঝরে পড়ছে, তার সঠিক ব্যাখ্যা মনোহরই করতে পারে সব চেয়ে ভাল করে !

আপাততঃ তা না জানলেও আমার চলবে । এখন কি থেকে বাঁচাতে পারলে মেয়েটির সর্বনাশ হবে না, এইটুকু জানতে পারলেই যথেষ্ট !

মিছুর মা বউটিকে সাহস দিলেন, “বলো না মা—সব কথা খুলে বলো বাবার কাছে । কোনও ভয় নেই তোমার । ঠাঁর দয়া হলে এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে ।”

অতএব স্তন্যদেহ হল মনোহরের বউ-এর মুখ থেকে তার দুঃখের কাহিনী । আস্তে আস্তে তার কান্না কমে এল, একটু একটু করে ঘোমটাও উঠল কপাল পর্যন্ত । বসে বসে হাঁ করে স্তন্যদেহ মনোহরের ব্যক্তিগত জীবনের পদাবলী কীর্তন । সেও বড় সহজ ব্যাপার নয়, আগাগোড়া সহজিয়া-পরকীয়ার ছড়াছড়ি তাতে । ওস্তাদ

পদ্মকর্তার হাতে পড়লে সমস্ত মাল মসলা নিয়েই এমন মুখরোচক জিনিস তৈরী হত, যা শুনে পাষণ্ড গলে জল হয়ে যেত ।

সবকিছু বলা হয়ে গেলে পর মনোহরের বউ এই বলে শেষ করলে যে, সে এবার গলায় দড়ি দেবে । কারণ গলায় দড়ি দেওয়া ভিন্ন তার আর কোনও উপায় নেই ।

হয়ত তা নেইও । নিজের স্বামী, আর মনোহরের মত অমন স্বামী যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য গলায় দড়ি দেওয়া কিনা, তা আমি জানব কেমন করে ! এসব ব্যাপারের যথাবিহিত আইন-কানুন আমার জানা নেই । জানবার কথাও নয় । কিন্তু আমাকে এখন করতে হবে কি ?

কথাটি অবশেষে খুলে বললেন মিস্ত্র মা । বশীকরণ করে দিতে হবে । মনোহর যাতে বউটির হাতের মুঠোয় ঢুকে পড়ে, সেই রকমের শক্ত জাতের বশীকরণ করে দেওয়া চাই । এমন একটি তাত্ত্বিক ক্রিয়া করতে হবে, যাব ফলে মনোহর বাবাজী এই বউ ভিন্ন আর কোনও দিকে কল্পনাকালে চোখ তুলেও চাইবে না । ব্যাস্, তাহলেই নিশ্চিত ।

একদম হতভম্ব ! বশীকরণ করা কাকে বলে, তার হাডহদ্দ কিছু ধারণা নেই । কিন্তু সে কথা শোনে কে ? এই কালী পূজা ক'বেও যার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে না, সে কি সোজা মানুষ্য নাকি ? মিস্ত্র মা'র চোখে পুলো দেওয়া অত সহজ নয় । ইচ্ছে করলে সব পারি । সুতবাং এই একটিবার দয়া করতেই হবে নয়ত বউটি'ব গতি হবে কি ?

মিস্ত্র মা কোনও কথা শুনবেন না । বউটিও তাই পা জড়িয়ে ধবতে এল । ওধারে গান শেষ হয়ে আঁগছে । মায়ের আবতি'র সময় হ'ল । এখন এদের হাত ছাড়াতে পারলে ঝাঁচি ।

বললাম, “মা যা করেন । সবই ইচ্ছাময়ী'ব ইচ্ছা । আজ তুমি যাও মা । দেখি কতদূর কি করতে পারি ।”

এতেই মিস্ত্র মা একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, “এই তো কথা পেয়ে গেলে । এইবার তুমি নিশ্চিত হয়ে যাও মা । আমার বাবা তেমন বাবা নয় । কথা যখন পেয়েছো আর ভাবনা কি তোমার । তোমার দুঃখের দিন এবার ঘুচল বলে ।”

দিন চার-পাঁচ কাটল । ভাবছি মনোহর বাবাজীকে একদিন বেশ করে বুঝিয়ে বলে দেব—নিজের ধর্মপত্নীকে অবহেলা করাটা কতবড় অজ্ঞান । রস নিয়ে তার কারবার । নব রসের নিগূঢ় অর্থ আর তার অলিগলি সব সে নিজে অত ভাল

করে বোঝে কিন্তু তার নিজের ঘরে কোন্ রসের ভিমান চড়ছে, সে কি তার কোনও খবরই রাখে না! শেষে যে রস জ্বল হতে হতে বিপদ ঘটে যাবে। বউটি গলায় দড়ি-ফড়ি যদি দেয়, তখন কতদূর কেলেঙ্কারি হবে, সে যেন একটু ভেবে দেখে।

মনোহরের গান তখনও চলছে। হয়ত আরও কিছুদিন চলতও। হঠাৎ একদিন এক অভাবনায় কাণ্ড ঘটে গেল। সেদিন কি পালা হচ্ছিল মনে নেই। মনোহর রূপ বর্ণনা করছে একেবারে জীবন্ত ভাষায়। ঝু-ঝুগল হচ্ছে এই একমের, নিত্য হচ্ছে ঐ রকমের আরও অমুকটা হচ্ছে ঠিক অমুক জিনিসের মত দেখতে। যারা শুনেছেন তাঁদেরও কান-মন গরম হয়ে উঠেছে। এমন সময় দারুণ হৈ চৈ লেগে গেল। কোথা থেকে একপাটি চিটি এসে পড়ল মনোহরের গায়ে। গান ভেঙে গেল। কাকেও ধরা গেল না।

এতবড় দুঃসাহস কার হ'ল, কালোবাড়ির মধ্যে জুতো ছোড়বার? ধরতে পারলে তৎক্ষণাত্ তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত মনোহরের ভক্তরা। ধরা গেল না নোকটাকে—এজন্তে আপসোসের অস্ত রহল না কারও। চোখা চোখা গালাগাল ঘোররবে বষণ চাত লাগল সেহ অদৃশ্য শত্রুকে তাক করে। তবু কি সহজে কারও গায়ের ঝাল কমে! কিন্তু একেবারে কাটা গেল আমার মাথাটা। কারণ, আমাদের কালোবাড়িতে গান গাঠিতে এসেই সকলের প্রাণতুল্য মনোহর বাবাজীর এ হেন পাঙ্কনা। এ নিশ্চয়ই সেহ পুংনো পচা তাত্ত্বিক বৈষ্ণবের ঝগড়া। তন্ত্রের জীবন্ত পীঠস্থান, যেখানে নরবাল পশু হইয়া গেছে একদিন, সেখানে দিনের পর দিন এই হা-হুতাশ অভিসার আভমান আর সহ্য করতে না পেরে মঠেরই ভক্ত কোন ব্যাটা তাত্ত্বিক এই দুষ্কর্ম করে গা ঢাকা দিয়েছে। নয়ত আর কি কারণ থাকতে পারে মনোহরের মত সকলের নয়ন-দুলালের এ হেন অপন করবার। সুতরাং সেহ অদৃশ্য তাত্ত্বিক ব্যাটার অপকর্মের জন্ত মাথা হেঁট করে কন্নোড়ে সবায় কাছে ক্ষমা চাইলাম আমি।

আর পরদিন সকালে মনিব-বাড়ি থেকে একখানি পত্র এল। শঙ্করাগ্রসাদরা তাঁদের ঠাকুরবাড়িতে কোনও রকমের ইতরামো বরদাস্ত করতে রাজী নন। চিঠির শেষে আমাকে এই বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, আমি শাধক মানুষ, কি এমন দরকার আমার কালোবাড়িতে গান-বাজনা করবার। এ-ও লেখা আছে শেষে যে, আমার মত লোকের পক্ষে ঐ সমস্ত ফচকে কীর্তনাদির কীতিকলাপ বোঝার সাধ্য নেই।

চিঠিখানা পড়ে বেশ গরম হওয়াই হয়ত উচিত ছিল আমার, কিন্তু তা আর

হয়ে উঠল না। শরীরের হাড় মজ্জা তখন চাকরির রসে বেশ জারিয়ে উঠেছে। বরং বেঁচে গেলাম রোজ রোজ হৈ-হট্টগোল খামল বলে। সকলকে মালিকের চিঠিখানা দেখিয়ে কীর্জন বন্ধ করে দিলাম।

কীর্জন বন্ধ হ'ল বটে কিন্তু অত সহজে তার জের মিটল না। ছাই-চাপা আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলতেই লাগল। বরং বলা উচিত কীর্জনের আদি রস তখনই গাঢ় হয়ে জমে উঠল।

মনোহর কোথাও গান-গাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে। যেখান থেকেই ডাক আসুক, যত টাকার বায়নাই হোক না কেন, সে আর কাশীতে গান গাইবে না। একান্ত মনমরা হয়ে আমার কাছে বা মা কালীর দরজায় মা'র দিকে চেয়ে বসে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে লাগল। দলের লোকদের টাকাকড়ি গাডিভাড়া সব চুকিয়ে বিদেয় করে দিলে। খোল কত্তাল হারমোনিয়াম বেহালা সব চলে গেল। কাজেই গান আর হয়ই বা কি করে।

ছোকরার অবস্থা দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে গেল। ওর চক্ষু দুটির আলো যেন নিতে গেছে। মুখ একেবারে অন্ধকার। কি বললে যে ওর মুখে একটু হাসি ফোটে, সেই চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

মায়ের পূজা দিতে এল একদিন মনোহরের ছোট্ট বউটি। মা কালীকে সোনার নখ দেবে সে। মা তার কামনা পূর্ণ করেছেন ষোল আনা। স্বামী একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। আমার দম্মাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। যাকে বলে হাতে হাতে ফল। মিষ্টির মা চুপি চুপি সকলকে বললেন যে, মানুষ চেনবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। তিনিই টের পেয়েছিলেন যে, কতবড় তত্ত্বমন্ত্র জানা সাধক পুরুষ আমি। সবাই এবার চোখ মেলে চেয়ে দেখুন, কি ভাবে বশীভূত করে দিয়েছি আমি মনোহরকে তার বউ-এর কাছে। ঠাচ্ছে করলে চোখের পলকে দিনকে রাত আর রাতকে দিনে পরিণত করা যে আমার পক্ষে কিছুই নয়—এ-কথা যত্ন-তত্ন বলে বেড়াতে লাগলেন মিষ্টির মা আর কালীবাড়ির অল্প সব ভাড়াটেরা। এর ফলও হাতে হাতে পেলাম।

আমার মনিব-ঠাকরুন একদিন বিকেল বেলা তাঁর এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন কালী দর্শন করতে। বান্ধবীটির বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। আট-নাট দোহারি গড়ন। রাজা-ঘষা রঙ, একরকম ফর্গাই বলা চলে। গোলগাল মুখ, মুখে পান-জর্দা। মাথার চুল যত্ন ক'রে সাজানো। বুকের দিকটায় অনেক নিচু পষন্ত কাটা পাতলা সাদা কাপড়ের জামা আর খুব ভালো কালোপাড় একখানি তাঁদের ধৃতি তাঁর পরনে। গলায় আধ ইঞ্চি চওড়া সোনার বিছা হার, দু'হাতের

আজুলে গোটা তিনেক মূল্যবান পাথর বসানো আংটি। সিঁথিতে সিন্দূর নেই।
দেখে চিনতে কষ্ট হয় না ইনি কোন বড় ঘরের বিধবা কাশীবাসিনী।

কালী দর্শনাদি সমাপন করে ওঁরা এমে আসন গ্রহণ করলেন আমার সামনে।
শঙ্করাগ্রসাদেব গৃহিণী সন্তমেব সঙ্গে নিচু গলায় পরিচয় দিলেন শ্রীর সঙ্গিনী। নাম
করা ঘরের বউই বটে। কাশীতে খান চাবেক আর কলকাতায় খান-পাঁচ-ছয়
বাড়ি আছে এঁর। কলকাতাব পাশে কোথায় একটা বিরাট বাগান-বাড়িও আছে।
প্রায় দশ বছর বিধবা হয়েছেন। সদগুরু খুঁজছেন। শাস্ত্রপাঠ আর ক'র্তনাদি
শ্রুত, সাধু-বৈষ্ণবের সেবা করে কাশীতে দিন কাটান। এঁর সংকল্প একদিন আমায়
হাত দেখাবেন।

এই মেরেছে। হাত-দেখা মানে কবিরাজের নাড়ী টেপা নয়। এ হাত-
দেখাব অর্থ হচ্ছে হাতের চেটোর ওপর নঙ্গর বেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বাতলানো। হে
মা কালী! বক্ষা করো মা এবার আমানে। আমার চোদপুরুষের মধ্যে কেউ এ
বিজ্ঞা জানতেন কিনা তা আমি জানি না। আমি নিজে যে একজন ক'বড
হাত দেখিয়ে সেটুকু অন্তঃ আমি ভাল করে জানি। শত পোহালে কাল আমার
ভাগ্যে কি ঘটবে, মাত্র এইটুকু জানবাব বাসনায় বহুবাব নিজের দু'হাতের চেটো
তাই চোখের সামনে মেলে ধরেছি। ফল সেই একই—বড় বড় কড়াগুলো গড়গড়
ক'বে মনে করিয়ে দিয়েছে 'বগত জীবনেব দুঃখময় কাহিনীগুলি। আর তা দেখে
অনাগত ভাবশ্রুটুকু সম্বন্ধে আশা করবার মত কোনও কিছুই খুঁজে পাইনি। কিন্তু
এখন উপায় কি? এঁর হাত নাকের ডগায় মেলে না ধরও স্পষ্ট এইটুকু মাত্র
বুঝতে পারছি যে, ঐ নয়ম হাত দু'খানি দিবে একে জীবনে কুটোটি ভেঙে দুটো
কবতে হয়নি। এর অতিরিক্ত যে একবর্ণও বলার সাধ্য নেই আমার।

কিন্তু অত সহজে ভোলবাব পাত্রী ওঁরা নন। বেশী স্কাতি কবতে ভয়ও
হ'ল। মনিব-পত্নীকে চটানো কাজেব কথা নয়। মুখ বুজে বইলাম। পরদিন
সকাল সাতটায় পূজোয় বসবাব আগে আসবেন হাত দেখাতে, এই বলে মোটা হাতে
প্রণাম দিয়ে ওঁরা বিদায় হলেন। তখনকার মত বাঁচলাম।

সন্ধ্যার পর আরতি সেরে মন্দিরেব দরজা বন্ধ কবছি, মনোহর একান্ত করুণ
মুখে নিবেদন করলে যে তাব বক্তব্যটুকু দয়া করে শুনতেই হবে আমাকে। আর
যা সে বলতে চায়, তা শোনাবার জন্তে আমাকে সে একটু একলা পেতে চায়।

তাই হ'ল, মন্দির বন্ধ ক'রে দোতলায় আমার ঘরে এনে তাকে বসালাম।
ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে হ'ল। কেউ কোথাও থেকে কান পেতে শুনছে না,
এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে মনোহর তখন উন্মোচন করলে তার হৃদয়-দুয়ার। আর

আমি নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললাম সেখানকার আলো-আঁধারের মাঝে ।
রহস্য-রোমাঞ্চ-উৎকর্ষা-উত্তেজনা-হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ—এই সব নিয়ে মনোহরের
সে গুহ জগৎ । স্তন্যে স্তন্যে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম ।

ভাগ্য পরীক্ষা করতে দলবল নিয়ে কাশীতে এসে ওরা প্রথমে গুঠে বাঙ্গালী-
টোলার এক তিনতলা বাড়ির একতলার ছু'খানা ঘুপসি ঘরে । সাত টাকা ভাডায়
ঘর দু'খানা মিলে যায় । ঘরের মেঝেয় শতরঞ্জি বিছানা পাতলে ভিজে উঠত ।
ওই একখানায় থাকত দলের পাঁচজন আর একখানায় মনোহর আর তার বউ ।
এতদিন সেখানে বাস করতে হলে নির্ধাত সবাই মরতে বসত । মনোহরের বউ
তো কিছুতেই বীচত না । দশ-পনেরো দিনেব মধ্যেই গলা ফুলে তাব জ্বব
এসেছিল ।

থাকবাব জায়গার তো ঐ অবস্থা । এধাবে হাতের সামান্য পুঁজি ফুবিয়ে
আসছে । দলের পাঁচজন লোকেব খাই-খরচা চালাতে হচ্ছে । অনেক জায়গায়
চু' দিলে মনোহর । একটা দশ টাকার বায়নাও কোথাও জুটল না । শেষে
মরিয়া হয়ে লজ্জা-শব্দের মাথা খেয়ে ভিখারীর মত দশাশ্বমেধ ঘাটে বসতে হ'ল
একদিন । নিজেদের বিছানায় জড়ানো শতবজি খুলে নিয়ে গিয়ে তাই পেতে
গানের আসর বসাল ঘাটের সিঁড়ির ওপর বিনা নিমন্ত্রণে বিনা বায়নায় । দেখতে
দেখতে লোক জমতে লাগল । লোকে লোকারণ্য । সন্ধ্যার পর পালা শেষ হলে
শতরঞ্জির ওপর পাতা চাদরখানা ঝেড়ে-ঝুড়ে যা পাওয়া গেল তা বাড়িতে নিয়ে
এসে গুণে দেখে সবাইয়ের চক্ষু স্থির । নগদ তেইশ টাকা দশ আনা, দুটো সোনার
আংটি, আর একটা সোনার কানের দুল । পরদিন থেকে সিধে পড়া শুরু হ'ল ।
চাল ডাল, আনাজ-তরকারি, ফল-মিষ্টি, ঘি-মসলায় ঘব বোঝাই । কত বাঁধবে
বউ—কত খাবে সকলে ! দশাশ্বমেধ ঘাটে দিন-পাচেক গান হয় । তখন পাওয়া
যায় প্রথম বায়না—প্রতি পালা ত্রিশ টাকা ।

মাসখানেকের মধ্যে বউ-এর হাতের আট গাছা নিরেট চুড়ি গড়াতে দিলে
মনোহর । দলের সকলে বাড়িতে এক মাসের মাহিনা মনি-অর্ডার করলে ।
প্রত্যেকের ছ' জোড়া করে ধুতি আর জামা-জুতো কেনা হয়ে গেল । রান্নাবান্না
বাসন-কোসন মাজা-ধোয়ার জন্তে দু'জন লোক রাখতে হ'ল । এধারে বউ বিছানা
নিলে । তখন আরম্ভ হ'ল একটা ভাল বাসা খোঁজা ।

বাড়ি পাওয়া গেল । প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ি । কাশীর ঘিঞ্জি বসতি এড়িয়ে
সেই দুর্গা বাড়ির ওধারে । কিন্তু বিনা ভাডায় । সে বাড়ি ভাড়া দেবার বাড়ি
নয় । আর তার ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য মনোহরের ছিলও না । তার গান শুনে

মুক্ত হয়ে সেই রাজপ্রাসাদে তাদের থাকতে দেওয়া হ'ল যতদিন খুশি ততদিনের জন্তে। এই রকমের বাড়ি মিলবে—এ আশা করা একেবারে আকাশ-কুসুম। সে বাড়ির সাজসজ্জা আসবাব-পত্র জন্মেও তারা চোখে দেখেনি। চাকর বামুন দারোয়ান মালী সব মিলে চৌদ্দজন লেগে গেল তাদের সেবা-যত্ন করতে। একেবারে যাকে বলে রাজসুখ।

যে ভক্তলোক সেধে আলাপ করে তাদের নিয়ে গিয়ে তুললেন সেই বাড়িতে—তিনি মালদহ জেলার কোন্ এক জমিদারের পদস্থ কর্মচারী। তাঁর মুখ থেকে মনোহর শুনে যে, বাড়ির মালিক স্বকর্ণে তার গান শুনেছেন কুচবিহারের কালীবাড়িতে। শুনে এতদূর সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, তখন মনোহরকে দলবল সমেত তাঁর নিজের দেশ সেই মালদহে নিয়ে যাবেন। সেখানে তাঁর বিরাট ঠাকুরবাড়ি। জামরায়ের সেবা। বার মাসে তের পার্বণ। সেই ঠাকুরবাড়িতে থাকবার স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। নিত্য জামরায়কে গান শোনাতে হবে।

বাগান-বাড়িতে গিয়ে মনোহরের বউ সেরে উঠল। তখন শহরময় সর্বত্র ডাক মনোহরের। একদিনও কামাই নেই গানের। টাকা পয়সা জিনিসপত্র যা আমদানী হচ্ছে তা গোনেই বা কে, দেখেই বা কে! কিন্তু এত সুখ কপালে সঠিক কেন। অতীতকে অবস্থা জটিল হয়ে উঠল দিন দিন।

ডাক এল বাগানবাড়ির মালিকের কাছ থেকে ওদের স্বামী-স্ত্রীর! এক-গা গয়না পরে ফিরল মনোহরের বউ। মনোহরকেও অন্দর মহল পর্যন্ত যেতে হ'ল। পর্দার আড়ালে বসে মনোহরের খাওয়ার তত্ত্বাবধান করলেন মালিক নিজে। সেই-দিনই মনোহর প্রথম জানতে পারল যে, মালিক পুরুষ নন। তিনি বিধবা এবং নিঃসন্তান। তারপর যেদিন চাক্ষুষ পরিচয় হবার সৌভাগ্য হ'ল তৎক্ষণাৎ সন্দেশ মনোহর দেখলে যে বয়সও তাঁর বেশী নয়—চল্লিশের মধ্যেই। শেষে রাজ মনোহরকে ছুপুরবেলা যেতে হ'ত সেই রানীর কাছে। ওখানকার কর্মচারী চাকর বামুন সবাই তাঁকে রানী-মা বলে ডাকে। সেখানে আহাতি করে বেলা তিনটে-চারটে পর্যন্ত রানীকে নিরালস্য কৃষ্ণতন্ত শোনানো ছিল তার কাজ। কিন্তু এতটা সন্তুষ্ট হ'ল না মনোহরের বউ-এর এক গা সোনার গয়না পরেও। গোলমাল শুরু করে দিলে।

এ সব তো গেল ঘরোয়া ব্যাপার। বাইরেও ঝড় বইতে লাগল। কানীতে ঐ একজন ভক্তিমতী রানী আর বাকি সবাই গাঙ্গীয়া মেথরানী এই বা কেমন কথা! গানের শেষে কোথাও না কোথাও তাকে একটু জলযোগ করে আসতেই হ'ত। সেখানে খেতে বসে সন্দেশ ভাঙলে বেরুত সোনার আংটি, কীরের বাড়ির

মধ্যে সোনার হার। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যেত মনোহরের। জল খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে বাইরে আরম্ভ হ'ল নিদারুণ অশান্তি। কানা-ঘুষোয় আকাশ-বাতাস ভরে গেল। কবে কোথায় কোন্ বাড়ি থেকে অনেক রাতে তাকে বেকতে দেখা গেছে, কে কোথায় কোন্ বাড়িতে তাকে অসময়ে ঢুকতে দেখেছে, এইসব আলোচনা আর গা টেপাটেপি একরকম প্রকাশ্যেই চলতে লাগল তার গানের আসরের মধ্যে—সামনের সারিতে। আসতে লাগল বেনামী চিঠি। ঐ বিশেষ বাড়িটিতে জলযোগ কবা যদি না সে ত্যাগ করে, তাহলে তার প্রাণ যাবে—এই ধরনের মধুর সম্ভাষণ থাকত সেইসব চিঠিতে।

এধারে মাথা খুঁড়ে, গলায় দড়ি দিতে গিয়ে মহা অনর্থ বাধালে এউ। শেষ পর্যন্ত বাগানবাড়ি ছাড়তে হ'ল। একটা বাসা ভাড়া করে উঠে গেল সেখানে সবাই। কিন্তু রানী একেবারে বৈকে বসলেন। মনোহর আর তাঁর সঙ্গে দেখাই করতে পারলে না।

বাইরে জলযোগ কবা ছেড়ে দিলে মনোহর। কিন্তু তাতে কি বেতাই আছে? যারা জলযোগ না করিয়ে ছাড়বেন না, তাঁরা তার বাসায় হানা দিতে শুরু করলেন। গানের আসরের মধ্যে বচসা কলেঙ্কারি শুরু হ'ল তাঁদের মধ্যে। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে আমার শরণাপন্ন হ'ল মনোহর। তাব ধারণা ছিল, কালীবাড়িকে লোকে যে রকম ভয়-ভক্তি করে তাতে এখানে সব গোলমাল হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অদৃষ্ট এমনি খারাপ যে, চরম কাণ্ডটা এখানেই ঘটে গেল।

এই পর্যন্ত বলতে বলতে দুঃখে ক্ষোভে মনোহরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। মাথা হেঁট করে বসে রইল সে। আর এতক্ষণে একটু একটু আলোর রশ্মি দেখতে পেলাম আমি। তাহলে চটি জুতোখানা কোনও উৎকট তান্ত্রিকের পায়ের নয়। ওখানাকে দক্ষিণা হিসাবেও ধরা যায়—বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মনোহরকে নিরিবিাল জল খাওয়ানোরই জের ওখানা। অথচ খামকা আঁমি জোড় হাতে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে ম'লাম। একেই বলে উদার পিণ্ডি বৃন্দাব ঘাড়ে।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে চাইলে মনোহর। অনেকদিন পরে আবার তার চোখে আলো দেখতে পেলাম। প্রথম দিন আমার গলায় মালা পরাতে এসে যে জাতের চাউনি চেয়েছিল সে আমার দিকে, এ হচ্ছে সেই জাতের চাউনি। বড বিষম জিনিস। শরীর-মনের ভিতরে কেমন যেন সুডসুড়ি দিতে থাকে। এটি হচ্ছে তার মোক্ষম অস্ত্র। সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করে মনোহর তখন আসল কথাটা পাড়লে।

আমাকে একটি বশীকরণ করে দিতে হবে!

মনোহরের উপর বৈকে-বসা সেই মালদহের রানীর মনটা যাতে একটু ফেরে

গুর দিকে—তাই করে দিতে হবে আমাকে। তা'হলেই ওরা কানী ছেড়ে মালদহ চলে যেতে পারে। সেখানে আমায়কে নিত্য গান শোনার চাকরিটি পেলে বেঁচে যায়। নয়ত এখানে না থেয়ে মরতে হবে যে !

সে-ই এক কথা। আর একটি বশীকরণ। সোজা বশীকরণ নয়—এবার রাজরানী বশীকরণ। কিন্তু যাকে কোনও দিন চোখে দেখিনি, এমন কি যার নাম পর্যন্ত জানি না—তাকে দূর থেকে বশীকরণ করব কেমন করে ?

কি একটু চিন্তা করে শেষে মনোহর নামটি বলে গেল।

নামটি হচ্ছে কল্যাণী রায়।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম সেই রানীকে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙল মনোহরের রানীর স্বপ্ন দেখতে দেখতে। ছটার সময় উপস্থিত হলেন আমার মনিব ঠাকুরনের সেই বান্ধবীটি। স্নান সেরে এসেছেন। গরদের ধূতি আর গরদের জামা পরা। এক হাতে ছোট একটি রুপার কমণ্ডলু। এক রাশ ভিজ়ে চুল বাঁকাধের ওপর দিয়ে সামনে এনে বুকেব ল্পব ফেলা রয়েছে। ঢলের বাঁশি নিচের দিকে পৌঁছেছে কোমর পর্যন্ত। ঢলের ডগায় একটি গিট বাঁধা। একটিমাত্র মাথায় এত চুল থাকতে পারে, এ না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

বুক চিপচিপ শুক হ'ল আমার। এ কি বিষম প্রতীক্ষায় ফেলে দিলি মা শেখশায়ে। চাকরিটুকু যাবেই দেখছি। দাঁতে দাঁত চেপে বসলাম তাঁর সামনে পরীক্ষা দিতে। কি একটা বেশ মিষ্টি গন্ধ ঢুকতে লাগল আমার নাকে। বোধ হয় ও গন্ধ তার ভিজ়ে চুল থেকেই আসছিল। তিনি বাঁ হাতখানি ঘেঁষা ধরলেন আমার সামনে। হাতখানি আর ছুঁলাম না। মিনিট তিন-চার এক ষ্ট্র চেয়ে রইলাম হাতের দিকে। তারপর মুখ তুলে বললাম—“এখন হাত আপনি তুলে নিতে পারেন। বলুন তো এবার কি জানতে চান। মনে পাখবেন, একদিনে মাত্র তিনটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারি আমি।.....সবই মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।”

বলে চোখ বুজে বসে রইলাম তাঁর প্রশ্ন করার অপেক্ষায়, বেশ কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। বোধ হয় একটু বিপাকেই পড়ে গেলেন তিনি। মাত্র তিনটি প্রশ্ন—তার মধ্যেই তাঁর যা জানার সব জেনে নিতে হবে। এই রকমের বাঁধাবাধির মধ্যে পড়বেন এ নিশ্চয়ই তিনি ভেবে-চিন্তে আসেননি। কিন্তু সবই যখন মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা তখন আর উপায় কি ? অবশেষে তাঁর প্রথম প্রশ্ন কানে এল।

“আমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে কিনা ?”

সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরের সঙ্গে উত্তর দিলাম—“না।”

আবার নিঃশব্দে কাটল কিছুক্ষণ। চোখ বুজেই বসে আছি তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নটি শোনার জন্যে। অতি নিচু স্বরে বেশ কম্পিত-কণ্ঠে শোনা গেল আবার “কেন?”

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, “বাধা আছে।”

নিঃশ্বাস বন্ধ করে কথা বললে যেমন শোনায়, তেমনিভাবে তাঁর তৃতীয় প্রশ্ন শুনতে পেলাম।

“কি সেই বাধা।”

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই উত্তর দিলাম, “শত্রু।” উত্তর দিয়ে চোখ মেলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। মুখখানি একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ তিনি নতমুখে বসে রইলেন। আব তো প্রশ্ন করার উপায় নেই। তিনটি প্রশ্নই খতম। শেষে একটি নিঃশ্বাস চেপে বললেন, “আরও কত কথাই জানবার ছিল। কিন্তু আর তো কোনও উত্তর আজ পাওয়া যাবে না।”

বললাম, “আপনার আরও প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলে যেতে পারেন। রাত্রে আসনে বসে মার কাছ থেকে জেনে নেবার চেষ্টা করব। দেখি যদি বেটির দয়া হয়।”

তবুও সেইভাবে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ। তাবপব ধীরে ধীরে বললেন, “সে শত্রু যে কে, তাও আমি জানি। কিন্তু কি করে তাকে ভুলে গিয়ে”—বলতে বলতে হঠাৎ থামলেন। কে যেন তাঁর গলা চেপে ধরল। চকিতে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন তিনি। একটি ঢোক গিলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন—“মানে কি করে সেই শত্রুকে জব্দ করা যায়?”

বললাম, “যদি সে শত্রুর নাম আপনার জানা থাকে, তবে তা বলে যান আমার কাছে দেখি কি করতে পারি।”

বেশ কিছুক্ষণ আবার কি চিন্তা করলেন তিনি। শেষে একান্ত মিনতির স্বরে বললেন—“আমার বিশ্বাস আপনার কাছ থেকে আর কেউ এ নাম জানতে পারবে না। নাম—নামটি হচ্ছে কল্যাণী রায়।”

সাপের গায়ে পা পড়লে মানুষ যেভাবে চমকে ওঠে, সেইভাবে চমকে উঠলাম আমি। কিন্তু তা ভেতরে ভেতরে। রাতে আসনে বসে যা জানতে পারব তা তিনি কাল সকালে এলে শুনতে পাবেন, এই কথা বলে তাঁকে বিদায় দিলাম।

সকালের পূজা শেষ হল। কাঁসর-ঘণ্টা থামতে না থামতেই পিছন থেকে কানে এল, “মা—মা গো, মুখ তুলে চাও মা। হতচ্ছাড়ী আবাবীরা যেন দু’টি

চক্ষের মাথা খায়। যেন ভাতে হাত দিতে গুয়ে হাত দেয়। তাদের ভরা কোল খালি করে দাও মা—নিমূল করে খালি করে দাও। যে মুখ নেড়ে আমার গায়ে নোংরা ছিটোচ্ছে, সে মুখ দিয়ে যেন রক্ত ওঠে। তুমি যদি সত্যি মা হও—তাহলে যেন তেরান্তির না পেরোয় মা, তেরান্তির যেন না কাটে! যেন সব উঁচু বুক ভেঙে নেপটে যায়।” চিপচিপ করে শব্দ হতে লাগল দরজার চৌকাঠের ওপর।

এ আবার কোন্ মেয়েমানুষ-দুর্বাসা রে বাবা! সভয়ে পেছন ফিরে দেখলাম এক দশমই বুড়ি হাঁটু গেড়ে বসে ঠেঁট হয়ে মাথা খুঁড়ছে।

আরতি শেষের প্রণামটা করতেও ভুলে গেলাম। তিনি তাঁর বপুখানি খাড়া করে উঠে বসলেন। তারপর তাঁর ভাঁটার মত দুই ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি আমার ওপর ফেলে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটি বাড়িয়ে বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, “হ্যাঁ গা, তুমিই আমাদের শঙ্করীর পুরুত—নয় বাছা? তোমার সঙ্গেই দুটো কাজের কথা আছে।” বলে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত মুখব্যাদান করলেন। অর্থাৎ তাঁদের শঙ্করীর পুরুতকে একটু ‘আপায়িত’ করবার জন্তে হাসলেন।

ভয়ে দুর্ভাবনায় একেবারে কঁকড়ি-স্ককড়ি মেরে গেলাম। কিন্তু পালাবারও তো পথ নেই। দরজা জুড়ে তিনি অধিষ্ঠান করছেন। কোনক্রমে শুধ গলা দিয়ে বেকল, “বলুন।”

“এখানে কি বলা যায় বাছা সে-সব কথা। কোন্ হারামজাদী কোথা থেকে শুনে ফেলবে। পরের ঠান্ডির খবর গিলবে বলে সব ইঁ করে রয়েছে যে আবাগীর। তোমাব কাজ হয়ে থাকে তো চলো না তোমার ঘরে। সেখানেই সব কথা বলব।”

অগত্যা তাই করতে হ’ল। হুকুম তামিল না করে উপায় নেই। এ লোক সব করতে পারে। তাঁর কথা শোনার জন্তে আমার টুটিটা টিপে ধরে বিডাল বাচ্চার মত ঝুলিয়ে নিয়ে কোনও নির্জন স্থানে যদি রওয়ানা হন, তাহলেই বা কি করতে পারি আমি? তার চেয়ে ভালয় ভালয় তাঁর বক্তব্যটুকু শোনা টের নিরাপদ।

বললাম, “চলুন।”

চললেন তিনি আগে আগে। বোঝা গেল এ বাড়ির অন্ধ-সন্ধি সবই তাঁর জানা। কোন্ তলায় থাকি আমি, এইটুকু মাত্র জেনে নিয়ে এগিয়ে চললেন সিঁড়ির দিকে।

পেছন থেকে ইশারা করলেন মিছর মা থামাবার জন্তে। তাঁর অলক্ষ্যে কাছে এসে বললেন, “ওমা, এ যে গাঙ্গুলী গিন্নী গো—এ মাগী আবার জুটল কোথা

থেকে ? কোথায় যাচ্ছেন ওর সঙ্গে ?” আব্দুল দিয়ে ওপরটা দেখিয়ে তার পেছনে পেছনে উঠে এলাম দোতলায় ।

আমার ঘরের দরজা খুলে দিতে তিনিই আগে প্রবেশ করলেন । ঢুকেই ধপ করে মেঝের ওপর বসে পড়লেন । আবার হুকুম হ’ল, “দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস বাছা ।”

তাই করে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে । তিনি বসবার হুকুম দিলেন । কিন্তু এবার আর তাঁর হুকুম মানলাম না । উণ্টে তাঁকেই হুকুম করলাম দৃঢ়কণ্ঠে— “বলুন, আপনার কি বলবার আছে ? মনে থাকে যেন—পাঁচ মিনিটের বেশী আমি কারও সঙ্গে আলাপ করি না । আপনাকেও পাঁচ মিনিট সময় দিলাম ।”

বলেই চোখ বুজে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর সামনে ।

আমার কথা শুনে তাঁর মুখের অবস্থা কি দাঁড়ালো দেখতে পেলাম না । তবে তাঁর গলার আওয়াজ বদলানো । এতক্ষণ চলছিল হুকুম করার গলা, এবার তা থেকে নরম স্বর বার হ’ল । শুধু তাই নয়, বেশ বুঝলাম হঠাৎ মুখের ওপর চড় খেতে তিনি অভ্যস্ত নন । চিরকাল লোকের ওপর আধিপত্য করা যার স্বভাব, তাঁর সেই হামবড়া ভাবটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলে পায়ের নিচে মাটি থাকে না আর । তখন তিনি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন । আসল দুর্বল মানুষটি তখন বেরিয়ে পড়ে খোলস ছেড়ে ।

তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে আরম্ভ করলেন, “আমি—মানে আমার পবিচয়টা আগে দিই । আমি হলুম এই—” তখনই থামলাম তাঁকে, “আপনি গান্ধী গিন্নী । কথা বাড়াবেন না । দবকারী কথাটুকু বলুন আগে ।” চোখ বুজেই আছি আমি । যেন চোখ বুজে সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখছি । এবার আরও নরম হলেন তিনি, “তাই তো বলছি বাবা । তুমি তো সাক্ষাৎ অন্তর্ধামী, সবই তো বুঝতে পারছ তুমি । সবই আমার অদৃষ্ট, সবই আমার এই পোড়া—”

আবার থামলাম তাঁকে, “থাক, কপালের দোষ দেবেন না আমার সামনে । সবই সেই মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা । এখন বলুন কি চান আপনি ?”

ফাঁপরে পড়ে গেলেন । একটিও বাজে কথা বলা চলবে না, এ অবস্থায় পড়তে হবে বুঝলে হয়ত তিনি আসতেনই না আমার কাছে । একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি ।

“মেয়েটার মাথাটা যাতে ভাল হয়, তাই করে দাও বাবা । তাই তোমার কাছে এসে পড়েছি ।”

“সে মেয়ে আপনার কে ?”

“ভাইঝি। আমার একমাত্র ভায়ের ঐ একটি মাত্র মেয়ে। অগাধ ঐশ্বর্য আমার ভায়ের। ঐ মেয়েই এখন মালিক। হতভাগীর ভাল ঘরে বিয়েও দিয়ে-ছিলাম বাবা, কিন্তু কপাল পুড়ল এক বছর না পেরোতেই। সেখান থেকেও অগাধ সম্পত্তি তার হাতে এল। এখন এখানেই আমার কাছে আছে।”

“মাথা খারাপ হয়েছে জানলেন কি করে?”

“মাথা খারাপ নয় তো কি বাবা! লজ্জা-শরমেব মাথা একেবারে খেয়েছে। যা খুশি তাই করছে। লোকে কি বলছে না বলছে সোঁদকে মোটে খেয়াল নেই। কোথাকার কে এক হাডহাবাতে কেতনগুলোকে নিয়ে মেতে উঠেছে। তাকেই নাওয়ানো, তাকেই খাওয়ানো, তাকেই ঘুম পাড়ানো। আবার বলে কিনা—এই আমার সেই গাম, সেই কালোরূপ, সেই চোখ, সেই সব। অত আদিখ্যেতা আর বেলেজ্ঞাপনা লোকের গায়ে সইবে কেন বাবা। পাঁচজনে পাঁচ-কথা বলাবলি করবে না তো কি? এই তো আমি—এই যে বিধবা হয়ে আজ পঞ্চাশ বছর কালীবাস করছি—কই বলুক তো দেখি কোন ব্যাটাখাগীর পেটি কি বলতে পারে আমার নামে, বোঁটিয়ে বিব ঝেড়ে দোব না তার? কিন্তু ঐ মেয়ের দরুন আমার মাথা কাটা গেল গাং, লোকে আমার মুখে এবার ময়লা তুলে দিচ্ছে।”

এতখানি একসঙ্গে বলে তিনি হাপাতে লাগলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলাম, “আপনার সেই ভাইঝি কি মানদার কোনও জমিদার-বাড়ির বউ থাকে তাঁর কর্মচারীরা রানীমা বলে ডাকে?”

জলে উঠলেন গাঙ্গুলী গিন্নী দপ্ করে—“ঝাড়ু মারি সেই রানীর মুখে! সেই চলানীর জন্তেই তো আমার অমন সোনার ‘পিত্তিমের’ এমন মতিচ্ছন্ন আজ। সেই ছোঁড়া কেতনুনে প্রথমে সেই রানী-মাগীর কাছেই তো গিয়ে জুটেছিল। সে হচ্ছে আমার মেয়ের নন্দ। তার সেখান থেকেই তো ঐ ভূত ভরক ছ আমার মেয়ের ঘাড়ে। একটা কিছু তোমায় করে দিতে হবেই বাবা—যাতে মেয়েটা আমার কথা শোনে। আমি যে আর মুখ দেখাতে পারি না লোকসমাজে, আমার যে আর—”

আবার থামতে হ’ল তাঁকে। আর এবার দুই চোখ খুলে সোজা তাঁর চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনার ভাইঝির নাম হচ্ছে কল্যাণী রায়। কেমন—সত্যি কিনা?”

ভদ্রমহিলার নীচেকার পুক ঠোট একেবারে ঝুলে পড়ল। এতবড় অসুখধামী সত্যিই তিনি জন্মে কখনও চোখে দেখেননি। তাঁরও বিদায় করলাম। কথা দিতে হল যে, এমন ভাবেই বশীকরণ করে দেব যে ভাইঝি একেবারে তাঁর কথায়

উঠবে আর বসবে !

থেতে বসলাম । থেতে থেতে ভাবছি, এন্নার নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করব ।

“কি, খাচ্ছেন নাকি ? এত বেলায় খাওয়া-দাওয়া করলে শরীর টিকবে কেন ?”

ঘরে ঢুকলেন আবার মনিব খোদ ডক্টর শঙ্করীপ্রসাদ শর্মা । এমন সময় তিনি উপস্থিত হবেন, একথা ভাবাও যায় না । খান-তিনেক মোটা মোট বই তাঁর বগলে । বই ক’খানা আমার বিছানার ওপর ফেলে কোট-প্যান্টছদ্ধ মেঝের ওপর বসে পড়লেন তিনি ।

“আহা-হা, হাত তুলবেন না, হাত তুলবেন না । আপনার খাওয়াটা নষ্ট হলে সত্যি আমার দুঃখের সীমা থাকবে না । কোথাও শাস্তি-ফাস্তি নেই মশায় । ভাল লাগে না আর । ক্লাস না করেই চলে এলাম । অনর্থক ভূতের ব্যাগার খাটা । আপনারাই শাস্তিতে আছেন । মাকে নিয়ে আছেন । মা আনন্দময়ী—আনন্দে আছেন আপনারা মাঝ দয়ায় । ভাবছি এবার সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এই পথই ধবব ।”

তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে । টাক্ষায় করে এসেছেন এই ছুপুং রোদে । নিজের গাড়িও আনেননি । কে একজন এসে দরজার বাইরে থেকে জানালে যে, টাক্সাওয়ালা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে । শঙ্করীপ্রসাদ কোট প্যান্টেব সব কটা পকেট হাতভাবে লাগলেন । মুখ আবও লাল হয়ে উঠল তাঁর । কাছে টাকা-পয়সা কিছু নেই । থাক্সার কথাও নয় । তাঁর বাড়ীলো থেকে কলেজে যেতে গাড়ি লাগে না । হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে ক্লাসে পড়াতে পড়াতে পড়ানো বন্ধ করে টাক্সায় চড়ে এখানে চলে এসেছেন । কাছে যে কিছু নেই, এটুকুও খেয়াল হয়নি ।

খাওয়া আমার শেষ হয়েছিল । উঠে পড়ে একটা টাকা পাঠালাম নিচে ভাড়া দিতে । মিষ্টির মাকে এক গেলাস লেবু-চিনির সরবৎ করতে বলে এসে বসলাম তাঁর কাছে ।

“দেখুন দোঁখি, একটা পয়সাও সঙ্গে নেই । এমন নিঃসম্বল হয়ে কাকেও ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন কখনও ? একেই বলে ষোল আনা সন্ন্যাসী, কি বলেন ?” বলে হা-হা করে হাসতে লাগলেন ডক্টর সাহেব ।

বসলাম, “তাহলে আরও একটু সন্ন্যাসী হোন ! এই ছুপুং রোদে আর ও-গুলো

পরে থাকবেন না। ছেড়ে ফেলুন আমার এই কাপড়খানা পরে। দেখবেন, শাস্তি পাবেন।”

কাপড়খানা নিয়ে তিনি বললেন, “শেষ পর্যন্ত রক্তবস্ত্রই তো পরতে হবে একদিন। দিন, আজ থেকেই অভ্যাসটা হোক। মতাই এগুলো অসহ্য লাগছে।”

পাশের ঘরে কাপড় পালটাতে গেলেন তিনি। তারপর নিচে গিয়ে মুখে মাথায় জল দিয়ে আবার যখন এসে বসলেন তখন তাঁকে দেখে একেবারে থ হয়ে গেলাম। ধপধপে কর্তা রঙ মোটা-মোটা মাল্যুটি, গলায় এক গোছা শুভ্র পৈতা, তার ওপর লাল টকটকে রক্তবস্ত্র। মাল্যুটি যেন একদম বদলে গেছেন।

“কি দেখছেন অমন করে? একেবারে কাপালিক হয়ে গেছি তো! আরে মশাই—শরীরে রয়েছে যে কাপালিকের রক্ত। এ ভিন্ন আমায় মানবে কেন বলুন?”

বললাম, “বাস্তবিকই মানিয়েছে আপনাকে। শ্রীমতী শর্মা একবার দেখলে—”

যেন জলে উঠলেন তিনি, “কি করতেন? কি করতেন আপনার মনে হয়? জানেন না ঐ সমস্ত আলোক-প্রাপ্তাদের! শখ করেও একদিন এই বেশ পরেছি দেখলে তিনি শঙ্ক হবেন। মানে জাতকে উঠে ভিন্নি যাবেন। যেতে দিন, যেতে দিন গুঁদের কথা।”

সরবৎ এল। এক নিঃশ্বাসে গেলামটা শেষ করে মেঝের ওপরেই চিং হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি কড়িকাঠের দিকে চেয়ে।

বললাম, “এখন চোখ বুজে ঘুমোন একটু—এটু নিন বালিশটা।”

তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে বসলেন তিনি।

“আরে, ঘুমোব কি মশায়? ঘুমোতে এলাম নাকি এখানে! আপনার সঙ্গে অনেক কিছু আলোচনা করবার আছে যে। কোথায় গেল বইগুলো?”

বইগুলো নামিয়ে এনে থলে বসলেন।

তখন আরম্ভ হ’ল আসন আর মুদ্রা। তা থেকে তত্ত্ব আর আচার। আত্ম-তত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব শেষ করে যখন বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার পর্যন্ত আসা গেল তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম বিলেত-ফেরত ডক্টর সাহেবের পড়াশুনার বহর দেখে। সমস্ত পড়েছেন—সবই জানেন। কেবল মাত্র তর্ক করবার জ্ঞে বা একটিকে উঁচু অল্পটিকে নিচু প্রতিপন্ন করার বাসনা নিয়ে শাস্ত্রগুলো পড়েননি। তত্ত্ব আর আচার কোনটি কোন্ অবস্থায় কোন্ কাজে লাগে, তা তলিয়ে বোঝবার তাগিদে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঐব পড়েছেন। কিন্তু আর তো পারা যায় না। অন্ততঃ এবার একটু চা হলে হ’ত। বললাম—“এবার চা

করি—এ তো আর সহজে শেষ হচ্ছে না। এখনও দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাচার, বামা-
চার রয়েছে। তারপরও থাকবে অঘোরাচার, যোগাচার, কৌলাচার। সেই কৌলা-
চারে না পৌঁছে তো আর থামছেন না আজ। এধারে চায়ের সময় যে বয়ে যায়।
চায়ের সময় চা না খেলে সেটা কোন্ আচারেব মধ্যে পড়ে তা জানেন আপনি?”

বই বন্ধ করে আবার চিং হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। দুই চোখের ওপর এক-
থানা হাত চাপা দিখে বললেন, “শ্রেফ ভ্রষ্টাচার—চাই হোক—আর যা—” বলে
একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

চা দিলাম। ফলও দিলাম। আগে চায়ের বাটিটা টেনে নিয়ে চুমুক দিলেন
শঙ্করীপ্রসাদ। তারপর বেশ নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা, ঐ সমস্ত বিশ্বাস
করেন আপনি?”

“কি সমস্ত?”

“ঐ যে আপনাদের মারন উচাটন বিদ্রোহ স্তম্ভন এই সব বিদ্রুটে ব্যাপার-
গুলো?”

“আমার বিশ্বাসে কি যায় আসে? লোকে তো করে!”

“লোকে বোঝে ছাই! এই কালীতেই কত ব্যাটা ঐসব ধান্না দিয়ে কবে
খাচ্ছে।...কিন্তু আপনার কথা আলাদা। লোকে আপনাকে ভয়ানক ভয় করে।
আপনি নাকি হাতে হাতে মোক্ষম বশীকরণ করে দিতে পারেন। অল্পবার বিশ্বাস,
আপনি মরা বাঁচাতে পারেন, তাই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—এসব কি
সত্যি?”

বললাম, “লোকে তো আরও কত কথাই বলে। মিত্রর মা আর আপনার
অন্ত সব ভাড়াটেরাও এমন কথাও তো বলে বেড়াচ্ছেন যে, আসনে বসে ধ্যান
করতে করতে আমি এক-দেড় হাত শূন্তে উঠে যাই। একথা কি আপনি বিশ্বাস
করবেন?”

শঙ্করীপ্রসাদ ঠক করে বাটিটা নামিয়ে রেখে হাল ছেড়ে দিলেন।

“নাঃ, একটা লোককেও আপনার করে পেলাম না এ জীবনে। জন্মের পরই
মা দিলেন দূর করে। মাহুষ হলাম পরের কাছে। ছুনিয়া পর রয়ে গেল চিরদিন।
কারও কাছে যে মনটা একটু হাফা করব—এমন কাকেও আজ পর্যন্ত পেলাম না।
ভেবে এলাম, আপনি সংসার-ত্যাগী সাধক মাহুষ, আপনি বুঝবেন আমার দুঃখ।
তা আপনি হৃদ্ধ ভ্যাঙ্কুচাতে লাগলেন।”

বেশ কয়েক মিনিট কাটল নিঃশব্দে। নিঃশব্দেই তিনি কমলার কোয়া চিবুতে
লাগলেন। তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একথানা পর্দা উঠে গেল আদ্যর.

চোখের সামনে থেকে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, বাড়ি-গাড়ি, উচ্চ বিলাতী ডিগ্রী, প্রচুর বেতন, সুসজ্জিত বাড়লো, বিদ্যুৎ ভাণ্ডা এ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও এই লোকটির কিছু নেই, কেউ নেই। সম্পূর্ণ নিঃস্বল সঙ্গ-বিবজিত একক একটি ব্যোবুদ্ধ শিল্প ইনি—সব কিছু পেয়েও একটি অভাব আজও পূরণ হয়নি তাঁর। জীবনে কোনও দিন জননার বৃকের তলার তপ্ত স্থানটুকু পাননি বলেই একখানি বৃকের কাছে একান্ত নিরাপদ আশ্রয়ের জন্তে এর প্রাণ আঁকু-পাঁকু করছে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অপরের হাতে সঁপে দিয়ে, সেই পরকে আপন করে পাবার তৃষ্ণায়, তাঁর ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

বললাম, “ভ্যাঙ্কাতে যাব কেন আপনাকে? নিজের দিকটাই লুপ্ত দেখছেন। আমার কথাটা একবার ভাবুন তো। কে আছে আমার জিজ্ঞাসতে? আপনার দুঃখ-সুখের ভাগ নেবার জন্তে তবুও তো রয়েছেন একজন। তিনি হয়ত—”

দাবাড়ি দিয়ে আমাকে খামিয়ে দিলেন সাহেব।

“খামুন খামুন! ঢের হয়েছে! কি জানেন আপনি? কতটুকু জানেন তাঁর সম্বন্ধে? খাট, আলমারি, টেবিল, চেয়ার এই সব চারপেয়ে আসবাব কতকগুলোয় তো ঘর ভর্তি রয়েছে আমার। উনিও তেমনি একটি দু’পেয়ে আসবাব ভিন্ন আর কিছু নন।”

অতএব খামলাম। বলবারই বা আমার আছে কি? নিজের কথাই বলতে এসেছেন উনি। স্তনতে আসেননি কিছু। কাজেই চূপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমার মনিব আবার মুখ খুললেন। তখন বেকলো তাঁর মুখ দিয়ে তাঁরই ঘরের আর মনের কথা। সেদিনই প্রথম জানতে পারলাম যে শ্রীমতী শর্মা বলে যাকে জানি, তিনি আমারই মত সাহেবের কাছ থেকে মাইনে নেন মাসে মাসে। তবে তাঁর পদটি বড়, পদবাটিও বড়, মাইনেও অনেক বেশী পান আমার চেয়ে। তা ভিন্ন তাঁর চাকরিও অনেক দিনের। দশ বছরেরও বেশী তিনি চাকরি করেছেন। সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে তাঁর সঙ্গে বার-দুই সারা ছুনিয়া ঘুরে এসেছেন। মাসে মাসে টাকা জমছে তাঁর। জমে জমে সেই টাকার অঙ্ক বোধ হয় দশ বারো হাজারেরও ওপর উঠেছে। যেদিন খুশি যেদিকে খুশি তিনি চলে যেতে পারেন—তাঁর জমানো টাকা নিয়ে। গিয়ে বিয়ে-থা করে সংসারী হবেন। কোনও অজুহাতেই তখন তাঁকে বাধা দেবার উপায় নেই।

মনিব সাহেব দু’হাত নেড়ে বললেন—“তা ভিন্ন ঠিক যে কি জাত আর ঠিক বাপ-মায়ের পরিচয়ই বা কি—তা তিনি নিজেই জানেন না। আমার মত খুঁটান

মিশনারিদের কাছে তিনি মানুষ হয়েছেন। আমার মা-বাপের পরিচয়টুকু ছিল—
 ঠিক তাও নেই। ফাদার উইলসন যখন ঠেকে আমার কাছে দেন, তখন বলেছিলেন
 —‘শর্মা, এই মেয়েটির মা হ’ল ধরিজী আর বাপ স্বয়ং পরমপিতা ঈশ্বর। এর বেশী
 কোনও পরিচয় আমার জানা নেই। মনে রেখো, এমনভাবে একে আমি গড়ে
 তুলেছি যে, এ মেয়ে ধরিজীর মত সবই সহ্য করবে—শুধু এর আত্মার অপমান
 ছাড়া। তোমার কাছে একে দিচ্ছি, কারণ তোমাকে আমি মানুষ করেছি। এ
 বিশ্বাস আমার আছে যে, তুমি এর আত্মার অবমাননা করবে না।’ সেই থেকে
 এই এতগুলো বছর উনি কাটালেন আমার সঙ্গে। সর্বদাই আমি তটস্থ, পাছে ঠিক
 আত্মার গায়ে চোট লাগে। এই সব আত্ম-টাত্মা মশাই আমি বুঝিও না, আর ও
 আপদ বোধ হয় আমার নেইও। থাকলেও কবে শুকিয়ে একেবারে রসকষ-শূন্য
 ছিবড়ে হয়ে গেছে।”

শঙ্করাপ্রসাদ বলতে লাগলেন, “অমন এ+গুয়ে জেদী লোক দুনিয়ায় দু’টি
 আছে কিনা সন্দেহ। একবার টায়ফয়েড হয় আমার। এক মাস পরে পথ্য করে,
 চাকর-বাকরদের কাছে জানতে পারলাম যে, মেমসাহেব এক মাস সকালে বিকালে
 দু’ কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খাননি। চাকিশ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টাও আমার
 মাথার কাছ থেকে ওঠেননি। তার ফলও ভোগ করতে হ’ল তাঁকে। আমি সেরে
 উঠলাম, তিনি বিছানা নিলেন। তার জ্বর চলল সমানে ছ’মাস। কোথায়
 মুসৌবা, কোথায় ওয়ালটেরার করে করে তবে খাড়া করি তাঁকে।”

এতক্ষণ পরে সাহেব বেশ চাঞ্চা হয়ে উঠলেন। বলেও ফেললেন বেশ গর্বের
 সঙ্গে—“টাকা দিনেই কি ভাল লোক পাওয়া যায় মশায়? ভাল লোক পাওয়া
 ভাগ্যের কথা। টাকা দাঁড়ি বা খাওয়াচ্ছি-পরাচ্ছি, সেটা কিছু বড় কথা নয়। জী
 থাকলে তাঁর নামেও টাকা জমত। আজ এঁর হাতে মাস গেলে একখানা চেক
 দিচ্ছি, বিয়ে করলে বউকে তো আমার লাহফ ইনসিওরগুলোর নমিনি করতাম।
 ও একই কথা। এখন এঁর নামে টাকা জমছে তখন তাঁর নামে জমত। কিন্তু
 এত বিশ্বাসী লোক কোন-কিছুর বদলেই মিলবে না। আমার ভাল-মন্দ সুনাম-
 দুর্নাম সব কিছু চেকেটুকে সামলে-সমলে চলেছেন উনি এই দশ বছর। কারও জী
 বোধ হয় এতটা করেন না।”

ডক্টর সাহেব দু-একটা ছোট-খাটো কাহিনী বলে বোঝালেন আমায় যে, খাস-
 বিলেতেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সেখানে খুব বিশ্বাসী সেক্রেটারী কেউ কেউ
 নিজের জান-প্রাণ বিপন্ন করেও মনিবের জান-প্রাণ রক্ষা করে।

তবুও—তবুও একটা জায়গায় থেকে যাচ্ছে একটা মস্ত বড় ই—মানে ছিট।

সেই ছিন্ন দিয়ে তাঁর বুকের মধ্যে ঢুকছে তীব্র হিমেল হাওয়া। ঢুকে ছুঁচ ফোটাচ্ছে তাঁর হাড়ে-পাঁজরায়। মিশনারি হোমের মেয়ের আর যে ক্ষমতাই থাক, সেই ফাঁকটুকু জুড়ে দেবার সামর্থ্য নেই। সে না-হয় বড় জোর তাঁর জন্তে জীবনটাই দিতে পারে।

শঙ্করীপ্রসাদ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “তাই তো ছুটে এলাম আপনার কাছে। সব কথা তো আর সবাইকে বলা যায় না।”

“কিন্তু বলছেন কই আপনার নিজের কথা? এতক্ষণ তো বাজে কথাতেই কাটল।”

আরও একটু কাছে সরে এলেন তিনি। সামনের দিকে ঝুঁকে একরকম ফিস্‌ফিসিয়ে আরম্ভ করলেন—“তাই তো বলছি—এঁসব বণীকরণ সম্বোহন ব্যাপার-গুলো সম্বন্ধেই তো জানতে চাচ্ছি। এসব কি সত্যিই সম্ভব?”

সাবধান হলাম। কৈচো খুঁড়তে খুঁড়তে এবার সাপ বেরুচ্ছে। বললাম, “সম্ভব কিনা পরীক্ষা করেই দেখুন। হাতে হাতে কল পেলেই বুঝবেন। এখনই গিয়ে শ্রীমতী অরুণাকে ধরে নিয়ে এসে আপনার সামনে বসিয়ে এমন বণীকরণ করে দেব যে তখন—”

সাহেব মাঝখো হয়ে উঠলেন, “আবার আদম্ভ হ’ল তো ভ্যাঙ্কানো?”

চমকে উঠলাম। সত্যিই আমার গোড়াষ গলদ রয়ে যাচ্ছে। সেক্রেটারী অরুণার কথা বলতে আসেননি উনি এত কষ্ট করে দুপুর রোদে। এটুকু আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এ হচ্ছে আর একজনের কথা। আঠারো বছর বয়সে দেহাঙ্গন থেকে কানীতে ফিরে এসে যার কাছে শঙ্করীপ্রসাদ আশ্রয় পান, যিনি তাঁকে নিজের ছেলের মত দেখতেন, যিনি তাঁকে বিলেত পাঠান উপযুক্ত হয়ে আসা জন্তে, যিনি আশা করেছিলেন যে, বিলেত থেকে ফিরে এসে শঙ্করীপ্রসাদ তাঁর ছেলের স্থানটুকু পূরণ করবেন, এ হচ্ছে সেই এলাহাবাদের বিখ্যাত আইনজীবী মিস্টার চৌধুরীর কথা। না, শুধু তাঁর কথা নয়—সঙ্গে তাঁর একমাত্র কন্যার কথাও জড়ানো রয়েছে।

মিস্টার চৌধুরী ছিলেন, শঙ্করীপ্রসাদের দাদামশায়ের শিষ্য। আপনার বলতে এ জগতে ডক্টর শর্মার কেউ ছিল না যখন, তখন চৌধুরী সাহেব তাঁকে বুক দিয়ে আগলে রাখেন। তিনিই আশা দেন যে, মামলা করে মঠ আর কালী উদ্ধার করা যাবে। শৈব-বিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ, শৈব-বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানই যে সম্পত্তির আইন-সম্মত মালিক, এ-কথা তিনিই প্রথম বলেন।

বছর দুই এলাহাবাদে তাঁর কাছে ছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। তারপর চলে গেলেন বিলেতে। তাঁর মায়ের দেওয়া প্রচুর টাকা ছিল তাঁর নামে। মিস্টার চৌধুরী বিশ বছরের শঙ্করীপ্রসাদকে বিলেতে পাঠালেন উপযুক্ত হয়ে ফিরে আসবার জন্তে। তাঁর একমাত্র কন্টার উপযুক্ত স্বামী হয়ে আসতে হবে বিলেত থেকে।

বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়ছে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশ বছরের ছেলে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে বাপ আব পাশে তাঁর মেয়ে। ছেলেটি ঠোট কামড়ে ধরেছে, শক্ত করে চেপে ধবেছে হুঁহাতে জাহাজের রেলিং, হুঁচোথের সবটুকু শক্তি দিয়ে চেয়ে আছে বাপ আর মেয়ের দিকে। চোখের পলক পড়ছে না, বোধ হয় নিঃশ্বাসও পড়ছে না। জাহাজ পিছু হটে সরে যাচ্ছে।

ছাপ পড়ে গেল। বুকের মধ্যে একটি ছবি ফুটে উঠল ছেলেটিব। একটি মেয়ের ছবি, মেয়েটি এক হাতে তার দামী শাড়ির আঁচল মোড়ডাচ্ছে, আর এক হাতে বাপের একথানা হাত আঁকড়ে ধবে আছে, নাকেব ডগা লাল হয়ে উঠেছে তার, চোখের পলক পড়ছে না, দম বন্ধ করে চেয়ে আছে মেয়েটি জাহাজের ওপর দাঁড়ানো ছেলেটির দিকে। শঙ্করীপ্রসাদের বুকের নিভৃত্তম প্রকোষ্ঠে সেই ছবি আজও অগ্নান, আজও সজীব, আজও জ্বল জ্বল কবে জ্বলছে।

সাগর-পারের দেশে চার-চারটে বছরের সব বটা দিন আব বাতগুলো শঙ্করী-প্রসাদ কাটিয়েছেন নিজেকে সর্ববকমের আমোদ-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত রেখে। রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছেন পুঁথি পড়ে, দিনের পর দিন লাইব্রেরীগুলোর মধ্যে বইয়ের পোকার মত ঘুরে ঘুরে। তাঁকে যে উপযুক্ত হতেই হবে, দেশে ফিরে একজনের ববমাল্য পাবার জন্তে।

সবট হ'ল। ঠিক সময় দেশে ফিরলেন শঙ্করীপ্রসাদ। কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। মিস্টার চৌধুরী মাগা গেছেন। তাঁর এক দজ্জাল বোন ছিল কানীতে। তিনি মেয়েকে নিয়ে এসে এক জমিদারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। পিসীর সঙ্গে দেখা হতে তিনি দশ কথা মুখের ওপর শুনিয়ে দিলেন। শঙ্করী-প্রসাদের জাত-জন্মেরই ঠিক-ঠিকানা নেই, কোন্ সাহসে সে আসে তার ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করতে ?

এই পর্যন্ত বলে একটু চুপ করে, শেষে এই ক'টি কথা উচ্চারণ করলেন আমার মনিব, “মেই থেকে আজ পর্যন্ত একবার তাকে চোখের দেখাও দেখতে পাইনি।” কথা ক'টি যেন তাঁর বুক খালি করে বেরিয়ে এল।

ইতিমধ্যে আমি চোখ বুজে ফেলেছি। সেই অবস্থাতেই বললাম, “এখন বলুন তো সেই মেয়ের নাম কল্যাণী কিনা ?”

খণ করে আমার হুঁহাত চেপে ধরলেন ডক্টর। ধরথর করে তাঁর হাত কাঁপছে। মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরলো না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে।

আবার যখন কথা ফুটল তাঁর মুখে, তখন বললেন বাকিটুকু নিজেই। কল্যাণী এখন কানীতেই রয়েছে। বিধবা হয়েছে বিয়ের এক বছরের মধ্যেই। তাঁর সেক্রেটারী অরুণাকে তিনি লাগিয়েছিলেন, কোনও ফল হয়নি। কে এক মালদহের রানী হচ্ছে কল্যাণীর নন্দ। তিনিও বিধবা! তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে অরুণার! সেই রানীর কাছ থেকে শুনে এসেছে অরুণা যে, কল্যাণীর ঘাড়ে মৌরাবাঈয়ের ভূত ভর করেছে। এখন সে ‘হা মেরে নন্দদুলাল’ করছে। দিনরাত ঠাকুর নিয়েই আছে। সেই কালো পাথরের পুতুলকে নাওয়া-খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, আর গান শোনানো এই নিয়েই আছে সব সময়। ছুনিয়ার কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হবে না।

“আবে আস্থন আস্থন। আপনাব কথাই হচ্ছেল। বাঁচবেন বহুদিন আপনি।”

ঘরের মধ্যে এক পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সাহেবের সেক্রেটারী তাঁর মনিবের দিকে চেয়ে।

বললাম, “কি দেখছেন অমন করে?”

“বাঃ, একেবারে চেনাই যায় না! বেশ মানিয়েছে কিন্তু।”

“ঠিক, আপনি তো শক্‌হ হয়ে ভিরমি গেলেন না?”

“ভিরমি যাব কোন দুঃখে? বরং ইচ্ছে করছে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করি ওঁর হুঁপায়ে।”

হেঁকে উঠলেন সাহেব, “তাহলে আমিই ভিরমি যাব যে। সবাই মিলে ও-রকম করে আমায় ক্ষেপালে—”

“ক্ষেপাতে আর বাকি আছে কতটুকু? আমাকে একটা খবর না দিয়েই পালিয়ে এলে যে বড়?”

ভাবলাম, এবার উঠল বৃষ্টি ঝড়। না, ঠিক তার উল্টোটি হ’ল। সাহেব তাড়াতাড়ি ছুটলেন পাশের ঘরে রক্তবস্ত্র পাল্টে আসতে। বলতে বলতে গেলেন—“আবে না না, পালিয়ে আসব কেন? এমনই মনটা ভাল লাগল না, তাই—বুঝলে কিনা, তুমি হয়ত তখন ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই তোমাকে বিরক্ত না করেই—”

বললাম, “বস্থন।”

অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। আধ মিনিট মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি আন্দাজ করলেন। বোধ হয় সারা দুপুর তাঁর মনিবের সঙ্গে কি আলাপ হয়েছে তার কিছুটা ঠাণ্ডরালেন মনে মনে। শেষে এক ফালি স্নান হাসি হেসে বললেন, “দেখলেন তো ব্যাপারটা! কলেজ থেকে লোক এলো ডাকতে। আকাশ থেকে পড়লাম। সে কি! কলেজে নেই? তবে গেলেন কোথায়? কি দুর্ভাবনায় যে পড়ে গেলাম। তারপর ছুটে এলাম আপনার কাছে।”

“কি করে সন্দেহ করলেন যে এখানেই এসেছেন?”

দু’মিনিট চুপচাপ। মাটির দিকে চেয়ে আবার কি চিন্তা করলেন তিনি। তারপর একান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, “আমি তো আপনার অনেক ছোট, আমাকে দয়া করে তুমি বলতে পারেন না?”

বললাম, “বয়সে ছোট হলে কি হবে? মাইনে বেশী পান, চাকরিও আপনার আমার চেয়ে অনেক দিনের পুর্বনো, তা ছাড়া আমার চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বাসী আপনি মনিবের।”

মাটির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি মিশে গেল। শুধু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো দু’টি কথা—“তাই বটে।”

বললাম, “দুঃখ করছেন নাকি? আমাদের আলাদা সুখ-দুঃখ থাকতে নেই যে, মনিবের মান-অপমান সুখ-দুঃখই আমাদের সব।”

আবার দু’চোখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। চক্ষু দু’টি জলে টলমল করছে।

বললাম, “ওটাও সামলে রাখুন। পরে অনেক কাজে লাগতে পারে। কিন্তু আমাদের আজকের এই আলাপের বিন্দু-বিসগুণ যেন সাহেব জানতে না পানেন।” তিনি মাথা নাড়লেন। ডক্টর ঘরে ঢুকলেন নেকটাই বাধতে বাধতে, “তাহলে এবার চলি। আজ আপনার দুপুরের বিশ্রামটাই মাটি হয়ে গেল। জানলে অরুণা, একরাশ শাস্ত্রচর্চা করা গেল সারা দুপুর। বই-টাই পড়ে ছাই বুঝি আমরা, তাঁদের মত নাড়াচাড়া না করলে ও-সব তত্ত্ব-মন্ত্রের কোনও মানেই বোঝা যায় না। বাপস্ লোকটি সাক্ষাৎ অস্তর্ধামী। এখানে বসেই সব দেখতে শুনতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, আসি তাহলে আজ, নমস্কার।”

সাহেবের সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারীও বেরিয়ে গেলেন। আর যাবার আগে, আজ পর্যন্ত যা কোনও দিন করেননি, তাই করে গেলেন, হঠাৎ টিপ করে আমার পায়ের ওপর মাথা ঠুঁকে এক প্রণাম।

সন্ধ্যারতির পর মনোহরকে দেখতে পেলাম না সেদিন। নিত্য হাজির থাকে, আরতির পর পঞ্চপ্রদীপের শিখায় ছ'হাত তাকিয়ে মুখে মাথায় বুলায়। আজ সে নেই। ভাবলাম, যাক বাঁচা গেল। রাশি রাশি মিথ্যে কথা আজ আর শুনতে হবে না। তাড়া-শাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম।

ভোররাত্তেই ঘুম ভেঙে গেল। বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে! সারা বাড়িটায় যে যেখানে ছিল সবাই চেঁচাচ্ছে। তখনও অন্ধকার, কালীময় মঙ্গল-আরতির ঘণ্টাটা তখনও বেজে চলেছে ঢং ঢং করে থেমে থেমে। পথ দিয়ে স্নানার্থীরা চলেছে স্র করে স্রব পাঠ করতে করতে। গোলমাগটা এগিয়ে এসে আমার ঘরের দরজার সামনে উপস্থিত হ'ল। তারপর দরজায় ধাক্কা।

এত ভোরে আবার হ'ল কি। চুরি-ফুরি হ'ল নাকি বাড়িতে!

দরজা খুলে দেখি বাড়িহুদ সবাই উপস্থিত।

একদিকে সকলে কথা বলছেন। কিছুই মাথায় ঢুকল না। মিন্তুর মা একটি বউকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

“দেখুন বাবা, দেখুন—সশনেশেটা কি করে গেছে, দেখুন একবার!”

দেখলাম। সামনে দাঁড়িয়ে মনোহরের বউ। শাড়িখানা রক্তে রাঙা। নাক-মুখ ফুলে উঠেছে। ডান দিকের ভুরু ওপর থেকে এক খাব্লা মাংস উঠে গেছে।

শুনলাম। কাল সন্ধ্যার পর মনোহর ঘরের টাকা-পয়সা গয়নাগাটি সমস্ত নিয়ে যখন রওনা হচ্ছে সেই সময় বউ বাধা দিতে যায়। ফলে বউ-এর এই অবস্থা। বাবাজী সব শুছিয়ে নিয়ে সেই যে বেরিয়েছেন এখনও দেখা নেই। সারা রাত কোনও রকমে কাটিয়ে অন্ধকার থাকতেই বউটা ছুটে এসেছে আমার কাছে।

সে কাহিনী শুনছি, এমন সময় যেন আগুন লাগল নিচে।

“ওগো আমার কি সর্বনাশ হল গো! ঠাকডাতে ঠাকডাতে কে উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে।

গাঙ্গুলী গিন্নী!

কাল সন্ধ্যার পর থেকে তাঁর ভাইঝিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

তুই আর তুই যোগ কংলে কি হয়?

নিমেষের মধ্যে ঠিক করে ফেললাম যোগ-ফল। তৎক্ষণাৎ ওঁদের সকলকে ছ'হাতে ঠেলে সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে নিচে নেমে গেলাম। এখনই একটা লোক পাঠাতে হবে শঙ্করীপ্রসাদের কাছে।

রাস্তার ধারের ঘরটায় চাকর ঘুমোচ্ছে। তাকে ডেকে তোলবার অস্ত্রে তার

দরজায় যা দিচ্ছি—নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে এক জাগরার ।

গাড়ির সামনের দরজা খুলে নেমে পড়ল পাগড়ি-পর্য্য তকমা-আটা একজন ।
নেমে পেছনের দরজা খুলে ধরে একপাশে সরে দাঁড়াল ।

লাফিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, “নেমে কাজ নেই আর
এখানে দয়া করে এখনই আমায় নিয়ে চলুন হিন্দু ইউনিভারসিটি । গাড়িতে সব
বলছি আপনাকে ।”

সম্মতির অপেক্ষা না করেই তার পাশে উঠে বসলাম । নিজেই বললাম চালককে,
“চালাও, হিন্দু ইউনিভারসিটি ।”

তিনি শুধু বললেন, “তাই চল ।” গাড়ি ছুটল নিঃশব্দে ।

চাপা গলায় তখন বললাম তাঁকে, “কাল সন্ধ্যার পর থেকে আপনার ভাইয়ের
বউ কল্যাণীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ।”

‘আপাদ-মন্তক চাদর মুড়ি দেওয়া’—তিনি আঁতকে উঠলেন, “এ্যা—”

“হ্যাঁ—আরও একটু সন্সবাদ আছে । মনোহর কাল সন্ধ্যায় তার বউকে মেরে-
ধরে গয়না-গাঁটি সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে ।”

আর কোনও আওয়াজ বেরলো না তাঁর গলা দিয়ে । ঘোমটা খুলে হুঁচোখ
মেলে বোকার মত চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে ।

“আপনার কাছে একটি কথা জানতে চাই । শেষবার কখন আপনার সঙ্গে
দেখা হয়েছে মনোহরের ? সে সময় সে কি বলে গেছে আপনাকে ?”

একটি ঢোক গিলে তিনি বললেন, “তবে যে সে কাল সকালে নিয়ে গেল
টাকা—দেনা-টেনা শোধ দেবে বলে । মানে আজ রাতের গাড়িতেই তো
আমাদের মালদহ যাবার কথা ।” আর কিছু তাঁর গলা দিয়ে বার হ’ল না ।

“কত টাকা দিয়েছেন তাঁকে ?”

বানী চুপ করে রইলেন—সন্ধ্য-ওঠা রক্তবর্ণ সূর্যের দিকে চেয়ে । দৃঢ়স্বরে বললাম,
“মনোহর আর মালদা যাবে না আপনার সঙ্গে । কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন
আপনার ভাই-এর বউকে বাঁচানো । চরম সর্বনাশ হয়ে যাবার আগে তাদের
ধরতে হবে ।”

বানী সোজা হয়ে বসলেন এবং আবার আমার মুখের দিকে চাইলেন ।
দেখলাম তাঁর চোখ জলছে । বললেন—“ঠিক তাই । হয়ত এখনও তাদের ধরা
যাবে । বুদ্ধাবন ভিন্ন অস্ত্র কোথাও তারা যায়নি । ‘বুদ্ধাবনে নিয়ে যাবে’—এ-কথা
না বললে কল্যাণীকে এক পা-ও নড়ানো যাবে না । প্রথমেই বুদ্ধাবনে না নিয়ে
গেলে সে এমন গোলমাল শুরু করবে যে, তখন তাকে সামলাতেই পারবে না ।

কোনও লোভেই কল্যাণীকে কেউ সহজে ভোলাতে পারবে না। আমি তাকে ভাল করে চিনি। তার সর্বনাশ করা এত সহজ নয়। একবার যদি ধরতে পারি সেই ছোঁড়াকে, তবে—”

দাঁতে দাঁত ঘষবার শব্দ পেলাম পাশ থেকে। রানী নিজেকে সামলে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, “কিছু আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?”

“এই যে এসে গেছি। দাঁড করাও গাড়ি, সামনের ঐ বা-দিকের বাড়লোর সামনে।”

রানীকে বললাম, “নাম আপনি জানেন—শঙ্করীপ্রসাদ শর্মা। যার সেক্রেটারীর সঙ্গে আপনি আমার কাছে গিয়েছিলেন। শঙ্করীপ্রসাদ আর আপনি—আপনারা দু’জন ছাড়া কল্যাণীর একান্ত আপনার জন আর কেউ নেই। তাই এঁর কাছে ছুটে এসেছি। কল্যাণীকে খুঁজে পাবার জন্তে ইনি নরকেও ধাওয়া করবেন এখনই। চলুন নামি!”

শঙ্করীপ্রসাদ শর্মা নিচেকার চৌঁচি কামড়ে ধরলেন। তারপর ছুটলেন তাঁর গাড়ি নিয়ে তাঁর এক বন্ধুর কাছে। সেই ভদ্রলোক একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার। বলে গেলেন যে, ঘটনাক্ষণেকের মধ্যে ফিরে আসবেন তিনি। তখন বোধহয় আমরা স্নান পাব—কোন পথে কখন কাশী ছেড়ে গেছে ওরা। আর যদি এখনও কাশীতেই থাকে তবে—

যাবার সময় সাহেব একখানা উচ্চশ্রেণীর চাবুক নিয়ে গেলেন।

রানী আমার মঠে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। তাকে বললাম—তৈরী থাকবার জন্তে। হয়ত আজ রাতেই আমাদের বৃন্দাবন রওনা হতে হবে। কাশীতে এখনও তারা আছে এ বিশ্বাস করা কঠিন। রানী সংক্ষেপে জানালেন যে, এখনই গাড়ি রিজার্ভ করবার ব্যবস্থা করছেন তিনি। যদি বৃন্দাবনে না-ও যেতে হয় তবু ব্যবস্থা করে রাখা ভাল।

বেলা দশটার মধ্যে শঙ্করীপ্রসাদ সংবাদ নিয়ে ফিরলেন—সেই পুলিশ অফিসারের সাহায্যে। কাল সন্ধ্যার পর আগ্রার প্রথম শ্রেণীর দু’খানা টিকিট পাওয়ার জন্তে কে একজন হাডহন্দ চেঁচা করে স্টেশনে। শেষে চাওয়া হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর। দ্বিতীয় শ্রেণীর সব কটা বার্থ রিজার্ভ থাকায় তাও তারা পায়নি। লোকটি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে পীড়াপীড়ি করে দু’খানা টিকিটের জন্তে। স্টেশন মাস্টার তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেননি। অত তাঁর খেয়াল নেই। তবে তার বয়স যে বেশী নয় এটুকু তাঁর মনে আছে।

রানী বৃন্দাবনে তাঁর পাণ্ডার কাছে টেলিগ্রাম করলেন যে সেইদিন রাতের

গাড়িতেই তিনি কানী থেকে রওনা হচ্ছেন। টাকায় কিনা হয়। রানীর কর্ম-চারীরা অসাধ্য সাধন করতে পারেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেল।

শঙ্করীপ্রসাদকে বললাম, শ্রীমতী অরুণাও সঙ্গে যাবেন। তিনি প্রবল আপত্তি তুললেন, “না-না, সে আবার সেখানে গিয়ে করবে কি?”

বললাম, “তাহলে আমাবই বা গিয়ে কাজ কি সেখানে? আপনি একলাই চলে যান। নান্দ্যই তাদের খুঁজে পাবেন বৃন্দাবনে। তখন খপ করে কল্যাণীকে ধরে নিয়ে ফিরে আসবেন। আমি আর অরুণা আমরা দু’জনেই আপনার কর্মচারী। বরং এক্ষেত্রে তাঁরই আপনার সঙ্গে থাকা বেশী দরকার। তিনি হচ্ছেন সেক্রেটারী আপনার—আমি তো শুধু মাহনে-করা পুরুত।”

আমার দিকে একবার রক্ত-চক্ষুতে চেয়ে আর কথা বাডালেন না সাহেব।

গাড়িতে উঠলাম আমরা দু’জন। বানী, তাঁর একজন দাসী আর তাঁর ম্যানেজার—আর আমরাও তিনজন, সাহেব, তাঁর সেক্রেটারী আর আমি। আমরা সবাই সেই ‘বৃন্দাবন-পথযাত্রী’।

বৃন্দাবনে পৌঁছে সবাই একসঙ্গে উঠলাম এক ধর্মশালায়। বানীর পাণ্ডারা তৈরী হয়েই ছিল। এবার রানী তাঁর প্রভাব আর প্রতাপিত্তি দেখালেন। মথুরায় আর বৃন্দাবনে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হোক—কোথাও এই রকমের দু’জনকে পাওয়া যায় কিনা। দুই গুটি পাণ্ডা নামল কোমর বেঁধে। রানীর স্বস্তর কুল আর বাপের কুল—দুই বংশের দুই পাণ্ডা-বংশ হস্তে হয়ে লেগে গেল।

শঙ্করীপ্রসাদ এনেছিলেন এখানকার পুলিশের কর্মকর্তাদেব নামে চিঠি। রানী হাত জোড় করে তাঁকে নিবারণ করলেন। তাঁর ভাইয়ের বউ কল্যাণী, তার পিতৃবংশের মাথা কাটা যাবে যদি কথাটা পাচ-কান হয়। অন্ততঃ একটা দিন তিনি সময় চান। তার মধ্যে যদি কল্যাণীকে না পাওয়া যায়, তখন যা হচ্ছে করতে পারেন শঙ্করীপ্রসাদ।

স্বস্তর সাহেব শুধু ঘর-বার করতে লাগলেন ঘণ্টা দুয়েক। তারপর সংবাদ এলো।

বৃন্দাবনেই এক ধর্মশালায় দরজা বন্ধ করে বসে আছে একটি বউ। কিছুতেই দরজা খুলছে না সে। যে লোকটি তাকে সঙ্গে করে এনেছিল, প্রথম দিন সন্ধ্যার পরই জোর করে তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই যে দরজা বন্ধ করেছে বউটি, এখনও পর্বন্ত সে দরজা কেউ খোলাতে পারেনি। বাইরে থেকে যত রকমের চেষ্টা করা হয়েছে—তার কোনটাই ফল দেয়নি। ঘরের ভেতর থেকে একই উদ্ভ্র

আসছে—“না, তোমায় আমি কিছুতেই দরজা খুলে দেব না। তুমি আমার সে শ্রাম নও। আমার কৃষ্ণ কিশোরকে এনে দাও, তবেই দরজা খুলব।”

ঘরের ভেতর কখনও শোনা যাচ্ছে ভজন, কখনও হাসি, কখনও কান্না। ধর্মশালার কর্মচারীরা ভেবে পাচ্ছে না—কি করা উচিত। এটুকু তাগা বুঝে যে, মাথা খারাপ হোক আর যাই হোক, ঘরের মধ্যে যিনি দরজা বন্ধ করে রয়েছেন, তিনি ঘরোয়ানা ঘরের বউ। কিন্তু উপোস করে কতক্ষণ বাঁচবে বউটি?

যমুনা নদীর ধারে নির্জন জায়গায় ধর্মশালাটি। আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন বিস্তর লোক জমা হয়েছে সেখানে। চোখ রাঙিয়ে পাণ্ডারা সকলকে সরিয়ে দিলে। দোতলার একথানা দরজা-বন্ধ ঘরের সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। ঘরের ভেতর কে কঁাদছে স্বর করে। কান্না নয়—ভজন গাইছে। গাইছে কঁাদতে কঁাদতে—“ওগো নিষ্ঠুর, এতেও তোমার দয়া হ’ল না। দাসীর দুঃখ তুমি বুঝলে না। তোমায় পাবার উপযুক্ত প্রেম যে আমার বুকে নেই। তাই শুধু একবিন্দু প্রেম ভিক্ষা চাচ্ছি আমি তোমার কাছে। ওগো পামাণ—লোকে যে তোমায় প্রেমায় বলে। দাসীকে একাবিন্দু প্রেমও কি তুমি ভিক্ষা দিতে পাবো না?”

আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন শঙ্কবীপ্রসাদ। আছড়ে গিয়ে পড়লেন তিনি বন্ধ দরজার গায়ে, দু’হাত চাপডাতে লাগলেন দরজার ওপর—“কল্যাণী, কল্যাণী, দরজা খোল, দরজা খোল আগে। আমি, আমি এসেছি কলী।” আর কথা বেরুলো না তাঁর মুখ দিয়ে, শুধু হুমদাম ঘা দিতে লাগলেন দরজার গায়ে।

গান বন্ধ হ’ল। দরজাব ঠিক পেছন থেকে প্রস্থ হ’ল প্রায় চুপি চুপি—

“তুমি কে—কে তুমি?”

শঙ্কবীপ্রসাদ নিজেব দেহ মুখ-মাথা সর্বান্ন দরজাব গায়ে চেপে ধরেছেন। আমরা যে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি, এ জ্ঞানটুকুও তাঁর নেই। তিনি চুপি চুপি বলতে লাগলেন দরজার গায়ে মুখ চেপে—“আমি, আমি কলী, আমি তোমার ভুলুদা। আগে দরজা খোল কলী—নয়ত মাথা খুঁড়ব এই দরজার গায়ে। খোল, খোল বলছি দরজা—এই আমি মাথা খুঁড়ছি।” সত্যিই মাথা খুঁড়তে আরম্ভ করলেন দরজার গায়ে ডক্কির সাহেব।

ভেতর থেকে ধমকের স্বর শোনা গেল—“আঃ, কি করছ ভুলুদা! বাব্বা বাব্বা—কি মাহুষ বাপু তুমি। এতদিন পরে মনে পড়ল। এই খুলছি, খুলছি আমি দরজা, কিন্তু তুমি ঠেলে থাকলে খুলব কেমন করে।”

ভেতরের খিল আছড়ে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। টাল সামলাতে পারলেন না

শঙ্করীপ্রসাদ। গিয়ে পড়লেন কল্যাণীর গায়ের ওপর। দু'জনে দু'জনকে ঝাঁকড়ে ধরলেন। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত—

রানী গিয়ে ধরলেন কল্যাণীর কাঁধ চেপে। “বউ, ও বউ”—বলতে বলতে দুই ঝাঁকানি দিলেন তার কাঁধ ধরে। চমকে উঠে কল্যাণী ছেড়ে দিলে শঙ্করীপ্রসাদকে। যেন সত্ত্ব ঘুম ভাঙল তার। তাড়াতাড়ি মাথার ঝাঁচল তুলে দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললে। তৎক্ষণাৎ নিজের গায়ের চাদর ধুলে তার আপাদ-মস্তক ঢেকে দিলেন রানী। চোখ দিয়ে কি ইশারা করলেন তাঁর ম্যানেজারকে। ম্যানেজার নিচু গলায় কি বললেন পাণ্ডাদের। পাণ্ডারা ওঁদের ঘিরে নিয়ে নিচে নেমে গেল।

আমরাও নেমে এলাম। কিন্তু আমরা ধর্মশালা থেকে বার হয়ে আর তাঁদের ধবতে পারলাম না। পাণ্ডাদের একথানা মোটর গাড়িতে করে উধাও হয়ে গেলেন তাঁরা। আস্তানায় ফিরে এসে আমরা দেখলাম যে রানী, কল্যাণী বা ম্যানেজার কেউ ফেব্রুয়ারি। আবার ঘর-বার করতে লাগলেন ভক্তির সাহেব। গেলেন কোথায় তাঁরা? অবশেষে তাও জানা গেল। এক ঘণ্টা পরে রানীর চিঠি নিয়ে ম্যানেজার উপস্থিত হলেন। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

রানী একসঙ্গে আমাদের তিনজনকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন যে, আপাতত তাঁরা বৃন্দাবনে থাকবেন ঠিক করেছেন। এখন আমাদের সঙ্গে দেখা কবতে পাবলেন না বলে দুঃখ জানিয়েছেন। এটুকুও দয়া কবে লিখেছেন যে, আবার যখন কাশীতে যাবেন তখন নিশ্চয়ই আমাদের স্মরণ করবেন তিনি। আমাদের কাশী ফিরে যাঁবার গাড়িভাড়া ভিনশ' টাকাও পাঠিয়েছেন তাঁর ম্যানেজারের হাতে।

লাল হয়ে উঠল সাহেবের মুখ। অপমানের এতবড় ধাক্কা সত্যিই তাঁর পক্ষে সামলানো শক্ত। ম্যানেজারবাবুকে বললাম—টিকিট ইতিমধ্যেই আমাদের কাটা হয়ে গেছে। সুতরাং টাকা নিতে পারলাম না বলে আমরা দুঃখিত।

তৎক্ষণাৎ স্টেশন।

আগ্রায় পৌঁছে হোটেলে শঙ্করীপ্রসাদ মুখ খুললেন—“চলুন, আজ বেধে আসি। আজ আর ফেরবার গাড়ি নেই।”

তাজের কাছে পৌঁছোতে সন্ধ্যা হ'ল। মাত্র এক-দুই-আন্দাজ-কয়ে-যাওয়া-মস্ত একথানা টাঁদ তাজের মাথার ওপর এসে দাঁড়াল সেই সময়। আমাদের তাজ-প্রদক্ষিণ শুরু হ'ল। তিনজনেই নির্বাক। চরম অপমান মানুষকে মুক করে কেলে।

লতিয়ে তো রানী তাঁর ভাইয়ের বউকে সামলাবেন—এ তো একান্ত স্বাভাবিক !
 ঐ 'তিনশ' টাকা দিতে আসাটাও এমন কিছু নয় । সামর্থ্য থাকতে কেন তিনি
 দেবেন না আমাদের ফেরবার গাড়িভাড়া ! আমরা নিছক পর বই তো নয় । না-
 হয় এসেছি তাঁর সঙ্গে তাঁর একটু বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল বলে । তাও তাঁর টাকায়
 রিজার্ভ-করা গাড়িতে এসেছি । তাহলে ফিরে যাবার ভাড়াটা যদি তিনি না দেন
 —তবে সেটা যে তাঁর সম্মানে লাগে । সুতরাং—

সুতরাং কিছুমাত্র অগ্রায় তিনি করেননি । তবু তাঁর এই একান্ত গ্রাম্য কর্মটি
 এমন এক নিরীহ জাতের খাপ্পড় লাগিয়েছে আমাদের মুখের ওপর যে, তার
 জ্বালাটুকু সহজে ভোলা যাচ্ছে না কিছুতেই । কথা কইতে গেলে পাছে সেই
 জ্বলুরি কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়ে—এজ্ঞে তিনজনই মৌনব্রত অবলম্বন করেছি ।

তাজ থেকে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ একটি প্রহর করলাম আমার
 মনিবকে ।

“আচ্ছা বলুন তো—জীব কাছ থেকে কি পেলে তবে পাওয়াটা সার্থক হ’ল
 বলে বিবেচনা করা যায় ?”

আসমক এই প্রশ্নে ঠোঁট দু’জনেই চাইলেন আমার দিকে । তখন আবার
 আরম্ভ করলাম—“একটানা দশ বছর ধরে সেবা দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে, এমন কি
 নিজের প্রাণের মায়া পর্যন্ত ভুলে গিয়ে, যে নারী ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে মুখ টিপে
 ঘুরে যাচ্ছে—সে হ’ল মাইনে-নেওয়া চাকরানী । হায়রে, আলোর পেছনে ছুটে
 মরা আর কাকে বলে ।”

আমার আর স্বরূপার মাঝখানে ইটছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ । গেটের দিকে
 আমরা এগিয়ে চলেছি । রূপালী আলোয় তাজের পাষাণে হরত জংজও প্রাণ
 আছে । কিন্তু আমাদের মনের যে দগদগে অবস্থা তাতে প্রলেপ দিতে পারলে না
 প্রাণময়ী পাষাণী তাজ । তাই আমরা পালাচ্ছি তাজের কাছ থেকে ।

শঙ্করীপ্রসাদ ঘুরে দাডালেন । জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর সেক্রেটারীকে—“অরুণা,
 আজ কত তারিখ ?”

“উনিশ, উনশে ফেব্রুয়ারী ।”

“ঠিক, এতক্ষণ খেয়াল করতে পাচ্ছিলাম না । আচ্ছা মনে পড়ে তোমার
 অরুণা সেদিনটার তারিখ, যেদিন ফাদার উইলসন তোমাকে আমার হাতে ভুলে
 দেন ?”

অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর হ’ল—“তেসরা মার্চ বোধ হয় ।”

বহুব্রু থেকে যেন বলছেন শঙ্করীপ্রসাদ—“তেসরা মার্চই রুটে । সেটা হচ্ছে

ছাব্বিশ সাল। আজ হচ্ছে উনিশ শ' সাইক্লিশ—

বেশ কয়েক পা আমরা এগিয়ে গেলাম নিঃশব্দে। যেন নিজেকে নিজে বলতে লাগলেন ডক্টর সাহেব—“যে ভুল করেছি তা আর কিছুতেই শোধরাবার নয়। এগারটা বছর অনর্থক গড়িয়ে চলে গেছে। এবতব লোকমান অরুণা ভুলতে পারবে না কিছুতেই।”

ঝপ করে বলে ফেললাম, “খুব পারবেন।”

“কিন্তু কেন ? বিসের জন্তে সব জেনে শুনে আমার মত একটা অপদার্থকে স্বামী বলে মানতে যাবে অরুণা ?”

আমিই উত্তর দিলাম, “কেন বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন আপনি ? আজ পর্যন্ত কটা ব্যাপারে আপনি তাঁর সম্মতির জন্তে অপেক্ষা করেছেন ? মুখ বুজে নির্বিচারে আপনার ছায়-ঘন্টার ভাল মন্দ সব আদেশ সব আদ্যব যদি দশ বছর ধরে মজ্জ কংতে পেয়ে থাকেন, তাহলে আজও পারবেন। আপনি আপনার দাবীটা করুন না চোখ কান বুজে। তারপর আমি আছি কি করতে ? একটা শক্ত গোছের বশীকরণ করে দোব।”

একান্ত সংকোচের সঙ্গে মন্তপ্ণে তাঁর সেক্রেটারী একখানি হাত তুলে নিলেন শঙ্করীপ্রসাদ। সেক্রেটারীর মুখখানি তখন প্রায় বৃক্কেব বাছে এসে ঠেকেছে। সাক্ষী রইল দু’জন—তাজমহলেব প্রাণ যে নারী সেই নারী, আর মাথার ওপরে প্রায় ষোল আনা-পূর্ণ একখানা চাঁদ। আর আমি—সাহেবের মাইনে কবা পুস্তক বিবাহের মন্তটা আগে শিখিনি। শেখা থাকলে দু-একটা আওড়ে কিছু বালতু দক্ষিণাও পাওয়া যেত বোধ হয়।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখা গেল, একখানি মাত্র টাঙ্গা দাড়িয়ে আছে। দৌড়ে গিয়ে আগে চড়ে বসলাম তার পিছন দিকে। গাড়োয়ানকে বললাম, “জলদি হাঁকাও শেখ সাহেব, বহুত জলদি। ট্রেন পাকডানে হোগা।”

ওরা দু’জনেই ভয়ঙ্কর চমকে উঠলেন। অরুণা মানে শ্রীমতী শর্মা টেঁচিয়ে উঠলেন, “সে কি, আমরা যাব না ?”

“আপনার পরে আসুন। আরও গাড়ি পাবেন, এই তো সব সন্ধ্যা। আমার তাড়া আছে। আধঘণ্টা পরে একখানা ট্রেন আছে। সেটা ধরতে পারলে কাল সকালেই দিল্লী পৌঁছতে পারব।”

ডক্টর আতকে উঠলেন—“দিল্লী। দিল্লী কেন ?”

শ্রীমতী শর্মা প্রায় ডুকের কঁধে উঠলেন, “তার মানে, আপনি কাশী যাবেন না আমাদের সঙ্গে ?”

গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে। টেচিরে উত্তর দিলাম—“কি করে ফিরি বলুন কাশী? হতভাগা মনোহরটাকে নিয়ে না ফিরলে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব সেই একরক্মি বউটার সামনে? আপনি দৃষ্টি করে তাকে রক্ষা করবেন, তার আর কেউ নেই।”

আকুল হয়ে বলে উঠলেন আমার মনিব সাহেব—“আমাদের যে আর আপনার এলতে কেউ রইল না এ জগতে—” শেষটুকু কান্নার মত শোনালো।

তার কথার শেষ উত্তর দেবার আর অবকাশ পেলাম না।

টাকার ঘোড়াটি আদত পক্ষীরাজ জাতের। রানীকৃত ধূলো উড়িয়ে ওঁদেদে ছ’জনকে আডাল করে ফেললে।

৪

ফকড়—লকড়—টিকড়।

লকড় হচ্ছে চেলা কাঠ। তিনখানা জুটলেই যথেষ্ট। আরও জোটাতে হবে পোয়া-দেডেক আটা। কৌপীনের ওপর যে ত্রাকড়ার ফালিটুকু কোমরে জড়ানো থাকে, সেখানি বোমর থেকে খুলে নিয়ে মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর জল দিয়ে মাখতে হবে আটাতুকু, বানাতে হবে দুটো খ্যাবড়া খ্যাবড়া চাকার মত জিনিস। এইবার লকড় তিনখানিতে আগুন জ্বলে তাতে সৈঁকে নাও সেই আটার চাকতি দুটো। হয়ে গেল টিকড় বানানো। গ্রামরস সহযোগে সেই টিকড় চির্বিয়ে ফকড় বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার দায়ে দিনান্তে দেড় পোয়া আটা আর তিনখানি চেলা কাঠ মাত্র দাবী করে ফকড়। তার বেশি সে চায় না, পায়ও না।

ফকড়-তত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুশাসন—ফকড় কখনও বগ্লড বাঁধবে না। বগ্লড বেঁধে তার তলায় মাথা গুজে বসলে তার ফকড়ত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। ফকড় আমৃত্যু অনিকেত। ‘চলত পানি রমতা ফকির’। জলের স্রোতের মত ফকিরও গড়িয়ে চলবে। যে পাথর অনবরত গড়ায় তার গায়ে শেওলা ধরাই ভয় নেই।

শেওলা ধরা দুয়ে থাক, মশা মাছি পিপড়েও বসে না ফকড়ের শরীরে। রসকম-শূন্য পোড়া কাঠের ওপর কিলের লোভে বসবে তারা? এক ফালি ত্রাকড়া জড়ানো কোমরে, বড় জোর আর এক ফালি আছে কাঁধের ওপর, সর্বাঙ্গে ছাইভস্ম মাখা, লাল সাদা হলদে নানারঙের তিলক ফোঁটা আঁকা কপালে, এক মাথা রুক্ষ জট-পাকানো চুল, এই রকমের মূর্তির ওপর মশা মাছি বসে না, রোগ ব্যাধি দুয়ে সরে থাকে, সাপ-বিছেরাও ভয় পায় এদের কাছে ঘেঁষতে।

এই হতচ্ছাড়া বীভৎস জীবেরা নিজেরা নিজেদের বলে ফকড়। এদের দিকে

তাকিয়ে বৈরাগ্যের বিপুল মহিমা লজ্জায় অধোবদন হয়। আত্মবঞ্চনার আত্মপ্রসাদে মশগুল হয়ে ভাগ ও তিতিকার জয়জ্ঞা কাঁধে নিয়ে এই সর্বহারার দল ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করে।

যোগে-যোগে-মেলায়-তীর্থস্থানে হামেশা নজরে পড়ে ফকড়। তীর্থময় এই দেশের যেখান দিয়ে যে ট্রেনখানিই ছুটুক, তাতে অন্ততঃ সিকিভাগ যাত্রী যে তীর্থ দর্শনে চলেছেন—এ কথা চোখ বুজে বলা যায়। তেমনি অন্ততঃ কুড়ি দুয়েক ফকড়ও যে লুকিয়ে চলেছে সেই গাড়িতে, এও একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। রেলের লোক টিকিট দেখতে গাড়িতে ঢুকে প্রথমেই পায়খানার দরজা খুলে ভেতরে উকি মেয়ে দেখবে, কোনও ফকড় সেখানে বসে আছে কিনা। তারপর সব ক'টা বেকির নিচে পা চালাবে। যদি কিছু ঠেকে তখন পায়, তাহলে বুট-হুঙ্কা পা দিয়ে গুঁতিয়ে দেখবে কিছু নড়ল কি না। নিঃশব্দে নিবিচার চিতে একজনের পর আর একজন বেড়িয়ে আসবে তখন লোকচক্ষুর সামনে।

সামনের স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালে ধাক্কা গুঁতো দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হবে তাদের। হয়ত তখন অর্ধেক রাত্রি, ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে, সেই স্টেশনের দশ ক্রোশের মধ্যে লোকালয় নেই। কিংবা স্টেশনটি মরুভূমির মাঝখানে, তেঁতায় ছাতি ফেটে মরে গেলে একবিন্দু জল মিলবে না। হয়ত বিশাল জঙ্গল আর পাহাড়ের ভেতর স্টেশন, স্টেশন থেকে বার হলেই পড়তে হবে বাঘের কবলে। তা হোক, তাতে কিছুই যায় আসে না ফকড়ের।

ফকড় কখনও টিকিট কাটে না। যে-বস্তুর বদলে টিকিট মেলে সে বস্তু সভয়ে ফকড়কে এড়িয়ে চলে। টিকিট না কেটে চার ধাম আর চৌষটি আড্ডা ঘুরছে ফকড়। একবার দু'বার তিনবার—যতবার খুশি ঘুরছে—মাসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ। যে যতবার ঘুরেছে চার ধাম আর চৌষটি আড্ডা, ফকড়-সমাজে তার সম্মান তত বেশি।

বড় বড় ধর্মমেলায় ফকড়েরা গিয়ে না জুটলে মেলাই জমবে না। তীর্থস্থানে গিয়ে ফকড় না দেখতে পেলে লোকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সাধু-সন্ন্যাসীরা তেমন আসেনি বলে সকলে মুখ বাকায়। পাপক্ষয়ের জন্তে তীর্থে যাওয়া, আবার কিছু পুণ্যার্জনের জন্তে তীর্থে দান-ধ্যান করা। ঘরে বসে রাস্তার ভিথিরীকে কিছু দিলে যেটুকু পুণ্য ক্রয় করা যায়—তার চেয়ে ঢের বেশি মুনাফা হয় তীর্থে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর দিকে পরশা ছুঁড়লে। কিন্তু সেই সাধু-সন্ন্যাসীদেরই দর্শন যদি না মেলে তীর্থস্থানে বা কুস্তস্থানে গিয়ে—তাহলে লোকে দান-ধ্যান করবে কাকে। কাজেই মেলায় ভিড় জমাবার জন্তে রেলের কর্তারা ফকড়ের ছবিওয়াল বিজ্ঞাপন লটকান।

প্রকাণ্ড মেলার মাঝখানে সকলের চোখের সামনে রাশীকৃত বেল-কাটার ওপর শুয়ে যিনি তপস্বী করছেন, চাকা লাগানো একথানা কাঠে ছুঁচোলো মাথা একশ' গুণা লোহা পুঁতে তার ওপর মহা আরামে শুয়ে যিনি ধ্যান লাগিয়েছেন, যে রাস্তায় জনতা সব চেয়ে বেশি, সেই রাস্তার পাশে গাছের ডালে পা বেঁধে হেঁটে মুণ্ডে ঝুলে যিনি শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করছেন কিংবা সারা শরীর মাটির তলায় পুঁতে মাত্র একখানি হাত বার করে যিনি অন্যায়সে বেঁচে রয়েছেন সেই সব মহাপুরুষদের চাম্ফ দর্শন-লাভের জন্তেই তীর্থে যাওয়া, যোগে-যোগে মেলায় ভিড় করা। কাজেই ফকড় না জুটলে মেলাব মেলাবই মাঠে মাথা যায় যে !

কিন্তু কোনও মেলায় এদের জন্তে স্টেট মাথা ঘামায় না। হিসেবের মধ্যে ধরা হয় না ফকড়দের। ধর্মশালায় এদের প্রবেশ নিষেধ। গৃহস্থের সুখ-সুবিধা আরামের জন্তে গৃহস্থ ধর্মশালা বানায়, ফকড় কোথাও ধর্মশালা বসায়নি। ফকড় থাকবে কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব—ধর্মের বাঁডেরা তীর্থস্থানে বা ধর্মমেলার কোথায় থাকে? ফকড় থাকবে গাছতলায়, তাও যদি না জোটে, থাকবে খোলা আকাশের তলায়। আর যাত্রীব ভিড়ে যদি কোথাও এতটুকু স্থান না থাকে, তখন এদের মেলাব বাতবে বাত করে দেওয়া হবে।

এই ভাবে ফকড়ের দিন বাটে, রাত কাবার হয়, পেট ভরে, তৃষ্ণা মেটে। তার পূর্ব একদিন ফকড় মিলিয়ে যায়, যেমালুম 'হাওয়া' হয়ে যায়। কারণ ফকড় মরে না কখনও, শুকমটি সম্পাদন করবার জন্তে আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে শয়নের স্থান আবশ্যক। অতবড় বিলাসিণী ফকড়ের কপালে আকাশ-কুহুম তুলা। ফকড়ের বসন্তে মরাও ঘটে ওঠে না। ওরা একদিন গ্রাম পেয়ে যায়। ওদের ভাষায় "গ্রাম মিল গিয়া।" ব্যাস আব কিচ্ছু না!

এই হচ্ছে পেশাদার ফকড়ের স্বরূপ।

অ-পেশাদার ফকড় চাকরি না হওয়া পর্যন্ত বা বিয়ে না করা পর্যন্ত পাড়ার রকে বসে, সভায় গিয়ে, খেলার মাঠে জুটে বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ফাঁদ পেতে ঘরের খেয়ে ঘরের পরে ফকুড়ি চালিয়ে যান। তারপর যখন সংসারে ঢুকে ফকুড়ি পরি-ত্যাগ করেন তখন তাঁদের অসুব্যবহারকে দেখে ব্যাজার হন। চোখ পাকিয়ে বলে বসেন—“ফকুড়ি করবার আর জায়গা পাওনি না হ্যা ছোকরা!”

ফকড়-তত্ত্বের আর একটি নিয়ম হ'ল, যে-ছোকরাটি সবোচ্চ এই পথে পা ধিলে, তাকে হাতে ধরে সব কিছু শেখাবেন ঝাহ ফকড়। নিজের দু'খানা টিকড়ের এক-খানা অগ্নান বদনে নবদীক্ষিতের মুখে তুলে দেন পাকা ফকড়। অনেক সময় নতুন

ফকড়ের অর্জিত লাহুনা গালাগালি বা প্রহারটুকু পৰ্বন্ত পিঠ পেতে নিয়ে তিনি তাকে রেহাই দেন। এই সমস্ত দেখে সন্দেহ হয় যে, ফকড়েরও হৃদয় বলে একটা কিছু বলাই আছে। কে জানে। কিন্তু হৃদয় থাকুক না থাকুক, ফকড়ের জীবনেও যে অনেক সময় অনেক রকমের মজা জোটে, তার একজন জলজ্যাস্ত সাক্ষী আমি। কাবণ বেশ কিছুদিন আমি পেশাদার ফকড় ছিলাম।

কেন ফকড় হতে গিয়েছিলাম, কি লোভে ফকড় হয়ে কি লাভ হয়েছে আমার—এসব প্রশ্নের সন্তুতব দিয়ে সন্তুষ্ট কবতে পাবব না কিছুতেই। লাভ কিছু না হোক, লোকসান যে কিছুই হয়নি আমার, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। ঘূবেছি দেখেছি আর দেখেছি ঘূবেছি। সে বড় মজার দেখা দেখেছি এত দুনিয়াটাকে, ফকড়ের চোখ দিয়ে। তবে যাবাব পর মবা-চোখের দৃষ্টি দিয়ে এ দিনের চেনা-জানা এই দুনিয়াটাকে কেন্দ্র দেখতে লাগবে, মানুষের গড়া সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা আর সংস্কৃতি তখন কোন্‌ বড় রঙিন দেখব তা জ্যাস্ত অবস্থাতে ফকড় হয়ে দেখা হয়ে গেছে আমার। বাবা জানী আর হিসেবা মানুষ কাব বপলেন—“এ কাব মাথাটি কিনেছ বাপু তুমি? মূল্যবান সময়টুকু ওভাবে গ্রন্থা গ্রন্থ্য না কবেছ? পয়সা উপরি উপার্জন আছে এমন একটি চাকরি জুটিয়ে কিছু কামিয়ে বাথলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পাবে।” মূল্যবান হক কথা, তাকে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কবাব মত কিছু না জোটা ব দরুনই যে ফকড় হতে গিয়েছিলাম। কাব ফকড় হয়ে কপালে যা জুটল তাতে এমনই মজে গেলাম যে, তখন ভবিষ্যতের চিন্তাটি একবারও মনেব কোণে উদয় হ'ল না। ফকড় জীবনের মজাই হচ্ছে এটুকু। মানুষ যখন ফকড় হয় তখন আর তার ভবিষ্যৎ থাকে না। দৈহিক আয়াস আমোদের কথা বাদ দিলে সেইটুকুই হচ্ছে ফকড়ের আসল শাস্ত্র। বেঁচে থাকার আনন্দ সজ্ঞানে যোল আনা উপভোগ কবতে হলে ভবিষ্যৎ ভোলা চাই। ভবিষ্যৎ ভুতের ভয় বৃকে নিয়ে মজা লোটা অসম্ভব।

সকলেই খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, বোজগাবের চিন্তা করছে, কিংবা অপরে কেন তার মনের মত হয়ে চলছে না, এই নিয়ে হা হতাশ কবছে। কিন্তু নিজে যে বেঁচে আছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে, এই সামান্য কথাটি দিনে-রাত্রে ক'বাব মনে পড়ছে কাব। গৃহিণী যখন উছন ধরাতে গিয়ে ঘুটের ধোঁয়ার ঘর বোকাই করে দেন তখন একবার বেঁচে থাকার কথাটা স্মরণ হয়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় বলে চিৎকার কবে উঠি—‘দম আটকে মাবা গেলাম যে!’ নয়ত বস্তি এসে নাড়ী ধরে ঘাড় না নাড়া পৰ্বন্ত বেঁচে যে ছিলাম বা সমানে অনবরত নিঃশ্বাস যে নিচ্ছিলাম, এ কথাটি মনের কোণেও একবার উদয় হয় না।

কিন্তু আমার ফকড়-জীবনে প্রতি মুহূর্তে হাড়ে হাড়ে মালুম হয়েছে যে শশরীরে বেঁচে আছি। বেঁচে থেকে মৃত্যুকে চাখা বা মরে গিয়ে জীবনকে উপভোগ করাই ফকড়দের আসল লাভ। এই লাভটুকু কি সত্যি তুচ্ছ করবার মত বস্তু!

এখন আর আমি ফকড় নই। একদা যাত্রা আমার পরমাস্বীয় ছিলেন সেই সারা ভারতের অসংখ্য ফকড়রা এখন আর আমার চিনতেও পারেন না। সামান্য-সামনি পড়ে গেলে পাশ কাটান। আমার আর তাঁদের মাঝে সন্দেহ অবিশ্বাসের উঁচু পাঁচিলটা মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। ফকড়-তন্ত্রের সর্বপ্রধান অন্তশাসনটি অমাত্র কবে বঙ্গভব বৈধে তার তলায় মাথা গুঁজেছি যে এখন। ভাল কবেছি না মন্দ করেছি, এ প্রশ্ন না তুলে এ কথা মানতে বাধ্য যে, বঙ্গভবের সঙ্গে বঙ্গভাষা জুটেছে তার তুলনায় সেই কোপীন-সময় ফকড়ের জীবনে 'আনন্দ' ছিল। স্বথ না থাকুক স্বস্তি ছিল তখন। এখন স্নেহের মুখ তো দেখতেই পাই না, ঝামেলার উৎপাতে প্রাণ যাবার দাঁখিল হয়েছে। পদে পদে বাইরে ও ভেতরে বেধডক ঝুঁকণ খাচ্ছি। কিন্তু আর একবার সেই ফকড়-জীবনে ফিরে যাওয়ার কথাও ভাবা যায় না যে।

যায় না, তার কারণ আমি বাঙালী। ফকড় হবার জন্তে সর্বাগ্রে যে কর্মটি কব' প্রয়োজন তা শুধু বঙ্গভব ছাড়া নয়, একেবারে বাঙলা দেশ জন্মের মত 'প্রাণ কব' বাড়না ভাবা হলেও না মুখে আনা, বাঙালীর বাস্তব ভাষা নতুন ভোলাদ দুলাশ' মন থেকে মুছে ফেল। অসংখ্য মঠ খাখড়া অশ্রম আছে বাঙলার, সেই সব আস্তানায় সাধু সন্ন্যাসী-মোহন্ত বাবাজীরা দ্বন্দ্ব শাস্তিতে ভাও বাঁধছেন, ভোগ লাগাচ্ছেন 'ভাত রান্ন' করতে স্থান চাই, গোড়জোড় চাই। টিকড পুঁড়িয়ে থেয়ে ব' ছাত্ত মেখে গিলে বাঙালী বাঁচে না। সেই জন্তেই ঘর হেঁ'ড বাঙালী আশ্রমে খাখড়া বানায়। আর যাদের ভাতের পবোয় নেই গরুর ঘর ছেড়ে খোলা আকাশের তলায় আশ্রয় নেয়। গরু ফকড় কথাটির সঙ্গে টিকড আব লকড় বেশ খাপ খায়। ওব একটাকে ত্যাগ করলে অপর দুটির কোনও মানেই হয় না। তা অবাঙালী ঝড় করে ফকড় হতে পারে, কিন্তু বাঙালী তা পারে না।

যদিও কেউ পারে তার প্রাণ কাঁদে বাঙলার জন্তে। পুঁইশাক আর মজনে-ভাঁটার জন্তে জ্বিত জল না এলেও বাঙলার জন্তে বাঙালীর প্রাণ কাঁদবেই, বাঙলা ভাষায় দুটো কথা বলার জন্তে মনটা ছটফট করবেই। তাও বোধ হয় আসল কথা নয়, আসলে যে বস্তুর জন্তে বাঙলার ছেলের প্রাণ কাঁদে তা হচ্ছে এক জাতের গন্ধ, যা শুধু বাঙলা দেশের বাতাসেই মেলে। বর্ধমান না পৌছলে সে গন্ধ পাওয়া যায়

না, আর ওধারে সিলেট ছাড়িয়ে শিলং পাহাড়ে পা দিলেই সে গন্ধ হারিয়ে যায়।
 ঐ গন্ধটুকুই বাড়ালীর জীবন। থাকুক সেই গন্ধের সঙ্গে মিশিয়ে সব রকমের
 মারাত্মক বোগের বীজাণু, তবু সেই গন্ধের লোভেই বার বার ছুটে এসেছি বাড়লায়।
 ভাত্র মাসের পনেরো বিশ দিন পাব হলে কেমন যেন একটা আকুলি-বিকুলি উঠত
 প্রাণের ভেতর। স্বদূর কাঞ্চিওঘাড়ে বা কত্য়াকুমাঝীতে বসে থাকলেও মন ছুটে
 আসত বাড়লা দেশে। আর কাছাকাছি গয়া কাশীতে থাকলে তো আব কোনও
 কথাই নেই। ফকুড-তন্ত্রমতে অদৃশ্যভাবে ট্রেনের কামবায় আশ্রয় গ্রহণ। তাবপর
 নামতে উঠতে আব উঠতে নামতে যেটুকু সময় ব্যয় হ'ত, একদিন হঠাৎ দেখতাম
 বর্ধমানের এখানে পৌঁছে গেছি। তখন পা দু'খানা আছে কিসেব জন্তে ?

আব একটি পথ ছিল বাড়লায় টোপাব। এপাহাবাদ থেকে ছোট রেল চেপে
 লালমান, লালমনি থেকে সেই গাড়িতেই আমিনগাঁও। তাবপর কামাখ্যা দর্শন
 কবে গোহাটিতে গাড়িতে উঠে ভায়া লামাডং বদবপুব—সোজা চন্দ্রনাথ। তখন
 ছিল আসাম বেঙ্গল রেল। মাত্র পাঁচ টাকার একখানি টিকিট কেটে একবার
 গাড়িতে উঠে কোথাও যাত্রাবিবর্তি না করে ওই লাইনের এক প্রান্ত থেকে অপর
 প্রান্তে পৌঁছনো যেত।

পাণ্ডুঘাটের স্টেশন-মাস্টারমশাই দু'টাকা উপাঞ্জন করতেন। তিনি কিনে
 দিলেন একখানি পাঁচ টাকার টিকিট। ঝাড়া ষাটচল্লিশ ঘণ্টাব ওপব একটানা
 গাড়িতে বসে থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে নামলাম।

আকাশে বাতাসে বাজছে মাষেব বোধনের হুর। রক্ত নেচে উঠল ফকুডের
 পোড়া-কাঠ দেহেব মধ্যে, বাড়লাব দুগাপূজা যে মিশে রয়েছে প্রক্বেব সঙ্গে। প্রায়
 দশ বছর তখন কেটে গেছে বাড়লাব বাইরে। ঠিক করলাম, যেভাবে হোক এবার
 থাকবই বাড়লা দেশে বিজয়া দশমী পর্যন্ত।

মারা শহর চষে বেডালাম জুতসহ একটি আস্তানার খোঁজে। মঠ মন্দির
 আশ্রম সঙ্ঘ কত যে রয়েছে শহবময়, তা গুনে শেষ করা যায় না। ফকুড দেখে
 দূর থেকেই হুঁশিয়ার হয় সকলে। মুখে হিন্দী ছোট্টে—“যাও, যাও, চলা যাও
 হিঁয়ালে, কুছ নেই মিলেগা।” আবার বিশেষ দয়াল কেউ একটি পরসা ছুঁড়ে দেন।
 অর্থাৎ শহর-সুদু ইতর-ভদ্র সকলের ধারণা হয়েছে যে আমি একটি উড়ে বা
 মেডো। বহুদিন পরে এক পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের
 মূর্তিখানি দর্শন করলাম। বুঝলাম, কাউকে দোব দেওয়াও যায় না। চুল, দাড়ি,
 পোড়া কাঠের মত রঙ, চোয়াদের মত হকু-উচু মুখ, তার ওপর যে চমৎকার

বেশভূষা ধারণ করে আছি শ্রীঅঙ্গে—তা দেখে আমার বাঙালী সম্ভান ধারণা করার
সাধ্য বোধহয় স্বয়ং বাবা চন্দ্রনাথেরও হবে না।

তখন হঠাৎ একটি উচ্চশ্রেণীর ফন্দি উদয় হ'ল চিন্তে। মা দুর্গা ছেলেপুলে
নিষে বাঙলা দেশে এসে তিন চাব দিন কাটিয়ে যান প্রতি বছর। খাওয়া-দাওয়া
করেন, কাপড়-চোপড় বাববার বদলান, পুৰোহিত মন্ত্র পাঠ করে স্নানচানও করান
দেখেছি, কিন্তু কেউ একটি বাপের জন্তে একটিও কথা কন না তো। কেন?

কাবণ এ দেশে মুখে ফড়ফড় কণাশব্দই ফাজলামি কবা বলে। ফাজলামি যে
কবে তার নাম ফক্কড। মুখ চালানো বন্ধ করলে ফক্কড আর কখন ফক্কড থাকে
না, ভবিষ্যুক পাষেক বলে গণ্য হয়। মা দুর্গা ছেলেমেয়ে-ক'টিকে শাসিয়ে নিয়ে
আসেন—“খববদার কেউ মুখ খুলিসনি আমার বাপের বাড়িল দেশে, গাছলে নিন্দে
হবে সেখানে। নোকে ফক্কড বলবে।” কাছের ছেলেমেয়েও থাকে মুখ বুজে,
সেই সঙ্গে মা ও চপ করে থাকেন।

বাঙলায় এসে কথা বলান ফাঁকও পান না তাঁরা। মূল সভাপতি, প্রধান
অধি, ট্রেনিং সম্পাদক, সাধারণ সভাপতি ও অসাধারণ সভাপতি—তাব সঙ্গে ঢাক
ঢোল মানাহ খাব “সবাব উপবে যে মাহক সভা” সেই মাহক—এই সমস্ত মিলিয়ে
এত বসমত এং কথা আওড়ানো হয় এক একটি সাবজনীন পূজায় যে মা'ব বা
তাঁর ছেলেমেয়ে ক'টির আব ফিছু বলবাব দলকাই কবে না।

ঠিক কললাম মুখ বন্ধ কবে থাকব। নিশ্চিন্তে পূজাব ক'টি দিন বাঙলায়
কাচাবাব সর্বশ্রেষ্ঠ পস্থা হচ্ছে মা দুর্গা শাব তাঁর ছেলেমেয়েদের মং মৌনত্রং ধারণ
করে থাকা। মৌনীবাব দেদার স্থিতি। বৈচে পাকা আন কথা বলা এ দু'টি
কর্ম এমনভাবে এং সঙ্গে ঘট পাফিয়ে গেছে যে, বৈচে বৈচে থেকেই মুখ চালাচ্ছে
না, এই বসমত ব্যাপাব দেখলে সকলে শঙ্কব বনে যায়। অতি সহজে সকলের
দৃষ্টি আকর্ষণ কবার শ্রেষ্ঠ পস্থা হল মৌনত্রং নেওয়া। মৌন বাবা কং দবেব
সাধু তা কেউ যাচাই করতে আসে না। স্নেহ ফাঁকি দিয়ে চূপ করে ভগবান
বস্তুটিকে হাতেব মুঠোয় পোশাল উপস্থ কি, সে প্রশ্ন কবাব পথ নেই মৌনীবাবার
কাছে। যাব মুখ বন্ধ তাব কাছে পটাকা বা বেসে ঢাকা জেবাব মন্ত্র জানতে
চাওয়াও নিরর্থক। ভবিষ্যৎ বাস্তবাব আদ্যাব কবে তার নাকেব ভগায় হাতেব
চেটো মেলে ধবাও নেহাত বিভ্রম।

সকলের মাঝে থেকেও মৌনী সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এ যেন নিজেকে সিঁদুক পুবে
ফেলার স্যামিল। নির্জন স্থান খুঁজতে গভীর জঙ্গলে ঢুকে বাঘ সাপ মশার খপ্পরে
পড়বার দরকার কি, ঘরে বসে মৌনত্রং নিলেই হাজারো ঢুকে যায়। দেখবার মত

চোখ আর শোনবার মত কান যদি থাকে, তাহলে চারিদিকের হালচাল দেখে শুনে হাজার রকমের মজা পাওয়া যায়। অচেনা অজানা জায়গায় মৌনব্রতীর আর একটি বিশেষ সুবিধেও আছে। গায়ে তো আর কারও লেখা থাকে না যে সে কোন মুন্স্কের মানুষ। মুখ দিয়ে কোনও ভাষা না বার হলে কারও ধরার সাধ্য নেই যে, মানুষটা বাঙালী মাত্রাজী না উড়িষ্যাবাসী। উড়ে মেডো পাগল বা ভিখারী এই ধরনের কিছু একটা ধারণা হলে বাঙালী তখন অবাধে তার সামনে প্রাণের কথা আলোচনা করে। এই সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করে বাঙলা ভাষায় কথ্য কইবার লোভ সংবরণ করলাম।

চট্টগ্রাম তিনতলা শহর। ছোট ছোট টিলাব ওপর কাঠ টিন আর ছেঁচাবীশেব তৈরী ছবির মত সুন্দর নানা বড়ের বাঙলোগুলি হচ্ছে ওপবতলা। ওসব উঁচু জায়গায় দেশী বিলেতী সাহেব মেমসাহেব লোক উঁচুদরের আভিজাত্য বজায় রাখেন। ধারে-কাছে ঘেঁষতে গেলে দামী কুকুরে তাড়া করবে ফক্কড়কে।

তার পরের তলায় বাস করেন বাবুরা, খাঁরা নিজেদের কালচাবড্ অর্থাৎ কৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান করেন। সেই সব পাডাতেই পুজার ধুমধাম। কিন্তু ফক্কড় দেখলে ওঁরা ঘুণায় নাসিকা কুঞ্জন করেন। ওসব পাডায় যাওয়া-আসা কবেন সিন্ধের গেরুয়া লুটিয়ে শ্রীশ্রীঃ০৮শ্রী শ্রীমৎ স্বামী তৎপুরুষানন্দ পরমহংস মহারাজারা। নজব উঁচু বাবপাড়ার, কানও উঁচু পর্দায় বাঁধা। বাণী শুনতে না পেলে মন ওঠে না কারও। মৌনব্রত ফক্কড়ের কোনও আশা নেই সেখানে।

মগপাড়া বুদ্ধপাড়া মুসলমানপাড়া হচ্ছে সব নিচের তলা। পচা পাকের দুর্গন্ধ অগ্রাহ্য করে সেসব পাডায় গিয়েও কোনও লাভ নেই। নিজেদের জান বাঁচাতেই তাদের জানাস্ত, পরের দিকে নজর দেবাব ফুরসৎ কোথায় ?

বাকী থাকে বাজার। কয়েক ঘর কাঁইয়া অর্থাৎ মাডোয়ারী মহাজন যদি থাকেন বাজারে তাহলে দু'দশটা ফক্কড়ের টিক্কড় লক্কড় অনায়াসে জুটবে কিছুদিন। মৌনীবাবার কদর আছে সেখানে, না মাঙ্লেও সব কিছু মিলবে। স্তবরাং বাজারের দিকেই পা বাড়লাম। যথেষ্ট মাডোয়ারী রয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে রণছোড়জীর মন্দিরের পাশে হতুমানজীর মন্দিরের সামনে এক পাট-গুদামেব ছায়ায় কাঁধ থেকে ছেঁড়া কব্বলের টুকরাখানি নামালাম। পাট-গুদামের ওপাশে নদী, নদীর নাম কর্ণফুলী।

বেশ গিন্নী-বান্নী গোছের চেহারা কর্ণফুলীর, নিজের ঘর-গৃহস্থালী নিয়ে মহাবাস্ত। বড বড জাহাজ আসছে যাচ্ছে, ঠাসাঠাসি করে রয়েছে অসংখ্য সান্পান। সেই সব সান্পানে জন্ম মৃত্যু বিবাহ সব কিছু সমাপন করছে চীনা

বর্মী আরাকানী আর চট্টগ্রামী মগ। দিবারাত্র ভোঁ ভোঁ, সোঁ সোঁ, হৈ-হুয়া চলছেই কর্ণফুলীব সংসারে।

বহু বড় বড় পাট-গুদাম নদীর পাড়ে। বিনা আড়খরে দারোয়ানজীরা টিকড বানাবার আটা, রামরস আর লকড় জুগিয়ে মৌনীবাবার সেবা শুরু করে দিলে। কমিটি বানাতে না, প্রস্তাব পাশ করলে না, চাঁদা তুললে না বা একজন লোককে খেতে দিচ্ছি এই সংবাদটি ছাপবার জন্তে সংবাদপত্রের দারস্থ হ'ল না। বাবু-পাডায় আশ্রয় মিললে এতক্ষণে চুলোচুলি লেগে যেত সেখানে। যে সাধু পুলিশ-সাহেবের বাড়ি এসেছেন, তিনি ডেপুটি বাবুর স্বস্তর মহাশয়ের আমদানী সাধুর চেয়ে নামে ৭ দামে ডাঁটো না খাটো—এই নিয়ে গণ্ডা-কতক বিচার-সভা বসে যেও। যে বাবুর বাড়িতে আশ্রয় মিলত, তিনি সাধুর অলৌকিক মতিমা প্রচার করতে এমন ভাবে কোমর বেঁধে লেগে যেতেন যে, তাঁর মুখরক্ষার জন্তে দিনে ছত্রিশবার চোখ উল্টে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে সমাধিময় হ'তে হ'ত সাধুকে।

পাট-গুদামের ছায়ায় বসে সে সব ভিটুকিলিমির কোনও প্রয়োজনই হ'ল না। দারোয়ানজীরা সহজ মাগুং, তাদের মোজা কারবার। যে কেউ একবার অংশ সেব আটা আব খানকয়েক লকড়ি নামিয়ে দিয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে ফুরসৎ মিললে এসে সামনে বসে ছিলিম টানে। বাড়াবাড়ির ধার ধারে না তারা। নিশ্চিন্তে বসে রইলাম গ্যাট হয়ে।

মহালয়া।

ভোরের আলোয় আগমনী সুর। বাতাসে পূজো-পূজো গন্ধ। নতুন শিশিরে গায়ে-দেওয়া স্নাকডাখানি ভিজে গেছে। আকাশ বাতাস আলো নিঃশব্দ যেন ব্যঙ্গ করছে আমার সঙ্গে। ফকড় এখানে বড় অসহায়, বড় বেমানান।

খাশাশের আলো মনে করিয়ে দেয় বহুকাল আগের পূজার দিনগুলি। তখনকার মহালয়ার প্রভাতে যে হাসি খেলা করত আকাশের চোখে, আজও সেহ হাসি খেলা করছে। কিন্তু বদলে গেছি আমি, সে আমি কবে মরে গেছি। কেন 'আবাব ফিবে এলাম এই লক্ষ্মীছাড়া' বিত্নিকিচ্ছি চেহাৰা নিয়ে বাঙলার পূজার আকাশ বাতাস ঘুলিয়ে তুলতে। ফকড় এখানে আপদের সামিল ব্যাপার। যে মন নিয়ে বাঙালী যাযের পূজা করে—সে মনের সুর কেটে যাবে ফকড়ের উপস্থিতিতে। কেন মরতে এলাম এই হাড়হাভাতে মৃত্তি নিয়ে বাঙলার শিশির-ভেজা মন-আকাশে কালি লেপে দিতে!

দূরে আছি দূরেই থাকব। শুফাং থেকে পরের মত আয় একটিবার শুধু হু'

চোখ মেলে দেখে যাব বাঙলার মাড়-আরাধনা। তার বেশি আর কিছু আশা করার স্পর্শ নেই ফক্কডের, থাকিও অহুচিৎ।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহর ঘুরছি। কোথায় ক'খানি প্রতিমায় রঙ দেওয়া হচ্ছে তাই দেখে বেড়াচ্ছি। চারিদিকে হৈ-হৈ লেগে গেছে, শহর-স্থল মানুষ বেচা-কেনায় ব্যস্ত। বড় বড় প্যাণ্ডেল সাজানো হচ্ছে। লাল সালুর ওপর তুলো দিয়ে বা সোনালী রূপালী ফিতে দিয়ে লেখা সার্বজনীন দুর্গোৎসব। একেখানি ঠাকুর-দালানের প্রতিমাও সাজানো হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর-দালানের পূজা যেন বড় প্রাণ-হীন ফ্যাকাশে গোছের ব্যাপার। প্যাণ্ডেলের পূজার ঐক্যীয় সমারোহের আঘাতে ঠাকুর-দালানের পূজা বড়ই ঝিমিয়ে পড়েছে।

দূর থেকে চেয়ে থাকি আর লোভ হয়। আমায় যদি ওরা ডাকত। কাজ-কর্ম করবার জন্তে কত লোকেরই তো দরকার। যে কোনও কাজে আমায় লাগিয়ে দিলে ঝাচতাম। ওদেরই একজন হয়ে যেতাম। বহুকাল পরে আবার মেতে উঠতাম পূজার কাজে। মা কি মুখ তুলে চাইবেন আমার দিকে?

শেষ পর্যন্ত মা চাইলেন মুখ তুলে।

পঞ্চমীর সন্ধ্যা। এক পূজামণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মণ্ডপে বাতি জ্বালাবার তোডজোড চলেছে। একটি পরে উদ্বোধক, প্রধান অতিথি ইত্যাদি মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণের স্তভাগমন হবে। সকলেই ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কারণ বাতি জ্বলছে না। সমস্ত বাতি একবার জ্বলেই আবার দপ করে নিভে যাচ্ছে। বার পাঁচ-ছয় এর কম হ'ল। হৈ-হট্টগোল বেধে গেল চারিদিকে। অস্বস্তি হাজার ত্রয়েক স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত মণ্ডপের মধ্যে। উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এলেন বলে। এধারে আলো তো জ্বলে না কিছুতেই। একি কম আপসোসের কথা!

দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছি। যখন সাধু ছিলাম না, তখন ইলেকট্রিকের কাজে হাত পাকিয়েছিলাম। সেই অ-সাধু জ্ঞানটি এতদিন পরে কাজে লেগে গেল। কোথায় গোলমাল হচ্ছে দূর থেকেই তা বেশ বুঝতে পারছি, আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, এতগুলি মানুষের মধ্যে কারও মাথায় ঐ সামান্য ব্যাপারটুকু ঢুকছে না কেন। শেপে আর চুপচাপ না থাকতে পেয়ে এগিয়ে গেলাম। খড়াকি ঘাড়ে করে যারা হিমসিম খাচ্ছিলেন তাঁদের কাছে গিয়ে জোড়হাতে ইশারা করলাম—আমায় একবার ঘড়িটা দেওয়া হোক। খতমত থেয়ে গেলেন সকলে। এ ব্যাটা ভিখিরী না পাগল এল এই সময় জ্বালাতে! একে ঢুকতেই বা দিলে কে প্যাণ্ডেলে! দু'জন তেড়ে এলেন—দাঁও ব্যাটাকে প্যাণ্ডেল থেকে বার করে।

আমিও নাছোড়বান্দা, বার বার ওদের জোড়হাতে বোঝাবার চেষ্টা করছি,

আমাকে একবার ঘড়াকিটা দাও, এখনই ঠিক করে দিচ্ছি আলো।

শেষে এক ভদ্রলোক ভেঙে উঠলেন—“দাও না হে লোকটাকে একবার ঘড়াকি-খানা। দেখাই যাক নাও কি করে। তোমাদের কেরামতি তো সেই বেলা চারটে থেকে চলছে, এধারে রাত তো অর্ধেক কাঁবাব হতে চলল।”

চারিদিকে নানাব্যয় টিপ্পনী কাটা শুরু হ'ল।

•বেই হয়েছে, ও ব্যাটা মানবে নাটন। গাজ্ঞ আন উপোধন হচ্ছে না হে। না-হয় আনাও তাড়াতাড়ি গোচাকতক ছাড়াগ। আরে লোকটা সত্যিই যে উঠল ঘড়াকিতে। পড়ে না মনে, তাহলেই নৈলেকাপি। কোন্ দেশেই হ্যা লোকটা? নিশ্চয়ই মাদ্রাজী। না হে না, লোকটা খাটি উড়ে। বোব হয় হলেকটিংয়ের মিস্ত্রী ছিল আগে, এখন ভেগ নিয়ে ভিক্ষে করছে।

শুনতে শুনতে যেটুকু কবলাপ কলে ফেললাম। দুটো শব্দ জ্বালাদা করে দিলাম। যেখানে গোলমাল হচ্ছিল, সেখানটা পেটে বাদ দিয়ে অগ্রা তাব জুড়ে দিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ হ'ল, আলো জ্বলতে লাগল নিম্নে।

সম্পাদক মশাহা এখন এগিয়ে এসে তিনপেতে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর কথা কবে পান্ডি কিনা। ডান হা মন তজ্ঞাব মাথায় বৃন্দে খাঙ্গুলটি ঢেকিয়ে তাঁব সামনে ধরে না। বাস তবে বাসবাব খাড নাডতে নাগলাম। অর্থাৎ একটু একটু বুঝতে পারছি।

কথা বলছ না কেন?

মাথাটা পিছন দিগে হেলিয়ে সম্পাদকে মুখ তুলে শা কবলাম। সেই মুখে তজ্ঞাটি মুখেব মধ্যে ঢুকিয়ে মাথা নাডলাম কয়েকবার। অর্থাৎ বোবা, কথা বলাব শক্তি নেই।

কোথাকার লোক তুমি?

ডান হাত মাথার ওপর ঘুরিয়ে দিলাম। মানে, যা খুঁশি বুঝে নাও।

তখন তাঁদের ভেতর পদ্যমর্শ শুরু হ'ল। পূজোব কদিন লোকটাকে আটকে রাখলে কেমন হয়। দুটো খেতে দিলে এটা সেটা শব্দেও নেওয়া যাবে। আবার যদি ইলেকট্রিক বেগডায় এখন লোকটা কাজে লাগবে। পূজোব বাজাবে একজন মিস্ত্রী ভাকতে গেলে লাগবে অস্তুতঃ নগদ আড়াইটি টাকা। আব সময়মত মিস্ত্রী খুঁজে পাওয়াও সহজ নয়। সুতবাং আমাকে আদিকে রাখাই বাবাস্ত হয়ে গেল। তবে সকলেই খাস চট্টগ্রামী ভাষায় বলাবলি করলেন যে, কড়া নজর রাখা উচিত লোকটার ওপর। বলা তো যায় না, যদি সটকায় কিছু নিয়ে। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার সামনে এসে তাঁর নিজস্ব হিন্দীতে চিৎকার করে বলতে লাগলেন

—“এই ব্যাটা জংলী ভূত, কেন ভিক্ষে ক’রে মরবি পুজোর ক’দিন। থাক আমাদের এখানে, জলটল তুলবি, এটা-সেটা করবি, খেতে পাবি। তবে কিছু নিয়ে যেন গা ঢাকা দিসনি। আমাদের পাভার ছেলেরা ধরতে পারলে পিঠের ছাল তুলে ছাড়বে।”

উদ্বোধন হয়ে গেল।

প্রতিমার সামনের পর্দা টানতে যে মহামাত্র ব্যক্তিটিকে সম্মানে আনা হয়েছিল, কি জানি কেন, তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে ফৌস ফৌস করে কান্দতে লাগলেন আর ক্রমালে চোখ মুছতে লাগলেন। বক্তৃতাটি শোনাই গেল না। তা হোক, সকলেই কিন্তু মনে প্রাণে বুঝলেন যে, উদ্বোধন-ক্রিয়াটি সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। মায়েব নামে ঝাঁর চোখে জল আসে তাঁকে ধরে এনে উদ্বোধন করানো গেল, এজন্তে প্রত্যেকেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলেন। উদ্বোধনের জয়গান গাইতে গাইতে সকলে খুশী হয়ে ঘরে ফিরলেন।

তখন বসল তাঁদের ঘরোয়া সভা, দুর্গোৎসব কমিটির নিজস্ব বৈঠক। মহানবমীর দিন যে কান্ধালী-ভোজন করানো হবে, তাই নিয়ে আলোচনা চলল। এক পাশে বাঁশে ঠেসান দিয়ে মাটিতে বসে সব সুনলাম। ওঁরা কেউ নজর দিলেন না আমাদের দিকে। বাঙলা ভাষা যখন বুঝতে পারবে না তখন থাকুক বসে।

বৈঠকের আলোচনা শুনে জানলাম, এই পূজা কমিটির প্রাণ হচ্ছেন ওঁদেব সুযোগ্য সম্পাদক স্বরেশ্বরবাবু, চট্টগ্রাম কলেজের তরুণ অধ্যাপক। তিনি সম্পাদক হবার পর থেকে এই সার্বজনীন পূজার সুনাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখানে আজকাল যেভাবে কান্ধালী-ভোজন করানো হয় তা আর অল্প কোথাও হয় না। শুধু দু’হাতা খিচুড়ি দিয়ে বিদেয় করা হয় না কাউকে, বসিয়ে পাতা-গেলাস দিয়ে ভাল-ভাত-তরকারি-চাটনি আর বোঁদে খাওয়ানো হয়। আগে যে খরচ হ’ত, তার চেয়ে এমন কিছু বেশি খরচ হয় না এখন। তৃপ্ত করে কান্ধালীদের খাওয়ান সম্পাদক মশাই। তিনি বলেন—“কেন ওরা কি মানুষ নয় নাকি—তোমাদের মত ওরাও খেতে জানে। গরীব ছোটলোক বলে তারা যেন মানুষ নয়।” হক কথা শুনে সকলে চুপ করে থাকে।

আগে কান্ধালী-ভোজনের জিনিসপত্রে টান পড়ত। যত লোকের আয়োজন করা হ’ত তার অর্ধেক লোক খেতে বসলেই খাবার জিনিস যেত ফুরিয়ে। কান্ধালী জাতটাই হাড় নছার কিনা। খেতে না পারলেও চেয়ে চেয়ে নেবে, তারপর পাত জুড় আঁচলে বেঁধে নিয়ে উঠে চলে যাবে। এখন আর সেসব হবার উপায় নেই। অর্থবিভার অধ্যাপক স্বরেশ্বরবাবু একা একশ’ জন হয়ে স্বয়ং পরিবেশন করেন। যে

যতটুকু খেতে পারবে তার বেশি ছিটেকোটা গুঁর হাত হতে গলে পড়বে না। কাঙ্গালীরা জঙ্গ থাকে গুঁর কাছে। শহরের গণ্যমান্য সকলে দাঁড়িয়ে দেখেন কাঙ্গালী-ভোজন করানো। আর এক বাক্যে স্মৃতি রাখেন সম্পাদক মশায়ের।

চাল-ভালের হিসেব শেষ কবতে অনেকটা রাত হয়ে গেল। বৈঠক শেষ হ'ল কখন তা বলতে পারব না। ওরা কেউই কিছু যখন বলছেন না 'আমায়, তখন আব কি করব। ফিবে চললাম নিজের আস্তানায়। দিনান্তে একবার টিকড ন' পোডালে পোডা পেট যে প্রবোধ মানে না।

যে মাঠে প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে, সেখান থেকে বড় শহর পর্যন্ত একটি সোজা চওড়া বাস্তাও বানানো হয়েছে মাটি ফেলে। দু'টি তোরণ বাঁধা হয়েছে সেই পথটির দু-মুখে। 'অন্যদিকে আব একটি সরু গলি আছে, যা দিয়ে গেলে বাজারে পৌঁছানো যায়—অনেক কম সময়ে। বাস্তা কমাবার জন্তে সেই গলিও মধ্যেটি ঢুকলাম। গলিও ভেতর বেশ অন্ধকার। তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। অন্ধকারে ফকডেন চোখ জ্বলে। হনহন করে পা চালালাম।

একটা বাক ঘুবেওহ কানে এল—“ও যে আসছে।”

নজর কবে দেখলাম, ডান ধারে একটা বারান্দার ওপর দু'টি প্রাণী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

“আ মরণ—আবার এগিয়ে চলল যে লো।”

একজন নেমে এল বাবান্দা থেকে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল আমার পিছনে।

“বলি বাগ কবে চললে কোথায় নাগব?”

একবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন, গায়ে হাত দেয় আব কি আঁক উঠল—“ওমা, এ কে লো। এ একটা ভিথিবী—এ মড়া এখন মনে এল কেন এখানে?”

হুম হুম কবে ছুটে গেল। হাসিও আওয়াজ শুনলাম পিছনে। মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে জোবে পা চালালাম। ভাবনাও কি আব কুল-বিনারা আছে।

ফকড। ফকডেব মাংস শকুনেও ছোঁষ না।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালাম—তাবাগুলোও আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। ৩য়ানক রাগ হ'ল—বোধ করি নিজেরই ওপর।

অহেতুক সেই রাগের জ্বালায় তখন ছুটতে লাগলাম নির্জন গলিটা পার হবার জন্তে।

ষষ্ঠী—

ভাববেলা স্নানটান শেষ করে তাড়াতাড়ি চললাম সেই পূজা-মণ্ডপে। ভাগ্য
সুপ্রসন্ন, তাই পৌছতেই পড়ে গেলাম স্বয়ং সম্পাদক মশায়ের নজরে। চিনতে
পারলেন, হাত নেড়ে কাছে ডেকে হিন্দীতে হুকুম করলেন—“যাও, কাজে লেগে
যাও। সাধুগিরি ফলিয়ে চুপ করে বসে থাকলে কিছুই মিলবে না এখানে। জলের
ড্রামগুলো ভর্তি করে ফেল।”

নিজেই সঙ্গে ববে নিয়ে গেলেন আমায়—সামনের বাড়ির ছাদের ওপর।
কাঙ্গালী-ভোজনের রান্না সেই ছাদের ওপরই হবে—বড় বড় তিনটে ড্রাম বসানো
রয়েছে সেখানে। আমাব হাতে একটা মস্ত পেতলের কলসী দিয়ে নিচের উঠানে
একটা টিউব-ওয়েল দেখিয়ে দিলেন। শ্রমেব মর্যাদা সম্বন্ধে সামান্য একটু বক্তৃতা
দিয়ে অল্প কাজে চলে গেলেন তিনি। তবে যাবাব সময় সেই বাড়ির কর্তাকে
বলে যেতে তুললেন না একটি কথা। কথাটি হচ্ছে—লোকটার ওপর নজর
রাখবেন, কলসী নিয়ে যেন গা-ঢাকা না দেয়।

স্মরণ্য শ্রমেব মর্যাদা বক্ষা কবাব জন্তে বেলা ন’টা পর্যন্ত সমানে নিচে থেকে
ওপরে জল তুললাম। আবণ চু’জন লাগল জল তুলতে। ওবা আমাব মত শুধু
শুধু শ্রমেব মর্যাদা বক্ষা কবতে আসেনি। দস্তুরমত মজুরি নেবে।

জল তোলা শেষ হতে দেখি ঘাড়ে আব তাতে বাধা হয়ে গেছে। ভাবলাম
—দুব ছাই, এবাব চলে যাই। কিন্তু চলে যাওয়া সত্যিই হ’ল না। একটা হ্যাংলা
বেহায়াপনা পেয়ে বসেছে কখন আমাকে। নিজেকে নিজে বোঝালাম—না,
পালালে চলবে না, আবার কবে বাড়লায় আসা ঘটে উঠবে তার ঠিক কি? এ
জীবনে দুর্গাপূজাব সময় বাড়লায় আসা আর না-ও ঘটতে পাবে। এই রকম
পূজাব কাজকর্ম কবাব সুযোগ আব কখনও ফকড়ের ভাগ্যে না-ও জুটতে পারে।

আবাব ফিব গেলাম প্যাণ্ডেলে। সেখানে সকলেই মহাবাস্ত, কাবণ কোনও
দিকে নজর দেবার অবকাশ নেই। সকলে সকলকে হুকুম করছেন। প্যাণ্ডেল
সাজানো, মাইক ফিট করা, বিনেলে যে ফাংশন হবে তার ব্যবস্থা করা—এই সমস্ত
নিয়ে সকলে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যেই কয়েকবাব সম্পাদক মশায়ের
চোখে পড়ে গেলাম। তিনি হুকুম কবলেন সামনের বাড়ি থেকে শতরঞ্জি বয়ে
আনতে। সে কাজটি শেষ করতেই আবার হুকুম হ’ল চেয়ার সাজাতে। বেলা
দেড়টা-দুটো নাগাদ যে যার বাড়ি চলে গেলেন নেয়ে খেয়ে আসতে। গরু ছাগল
প্যাণ্ডেলে না চোকে—এজন্তে একজন লোক থাকা প্রয়োজন। স্মরণ্য আমার
কাজেই সে কাজের ভার পড়ল।

আমারও কোনও আপত্তি নেই তাতে। সন্ধ্যার পর আস্তানায় ফিরে টিকড পোড়াব, এখন এতটা পথ গিয়ে ফিরে আসা পোষাবে না। এঁদের কাংশনটি না দেখে ফিরছি না আজ। কিন্তু তেঁটা পেয়ে গেছে তখন, জল তুলে আর শতরঞ্জি বয়ে বেশ ক্লান্তও হয়ে পড়েছি। আমার সামনেই কর্মকর্তারা বার বার চা-টা খেলেন, সে সবের ব্যবস্থাও রয়েছে তাঁদের জন্তে। কিন্তু এত ব্যস্ত ওঁরা যে, আমার কথাটা কারও বোধ হয় মনে পড়ল না। কি আর বলি—সেই টিউব-ওয়েল থেকে এক পেট জল খেয়ে এসে বসে রইলাম গেটের পাশে গরু ছাগল তাড়াতে।

কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হৈ-চৈ করে খেলা করছে মণ্ডপের ভেতর। গেটের বাইরে রাস্তার পাশে একটি বড়ো লোক, সামনে একটা তোবড়ানো টিনের বাটি পেতে, সেই সকাল থেকে বসে আছে। মাথা নিচু করে বসে একঘেয়ে স্বরে সে চোঁচাচ্ছে। তার বক্তব্য হচ্ছে—সে অন্ধ নাচাব, কোনও কিছু করে খাবার উপায় নেই তার, তাকে এক পয়সা দান করলে দাতা রাজা হবেন এবং অক্ষয় স্বর্গ লাভ করবেন। এই ক’টি কথাই ঘনবসন্ত ঘুনিয়ে ফিরিয়ে বলছে সে ধ্যানঘ্যান করে। যেন একটা কথা-বলা কল, দম দিয়ে কে বসিয়ে বেখে গেছে, দম না ফুরোলে কিছুতেই থামবে না। কি যে বলছে সেদিকে ওব বন্দুখাজ খেয়াল নেই। বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গেছে, নিববজির কারাগার মণ্ডপ হাট্টেই সেই স্বব স্বব ভেতর থেকে। একমাথা-পাকা-চুল মুদ মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বসে আছে লোকটি, ওব মুখ দেখা যাচ্ছে না। কথাগুলো যেন দর মাথা দিয়ে বসে সর্বাক্ষ দিয়ে বার হচ্ছে, মুখ দিয়ে নয়।

উঠে গেলাম লোকটির সামনে। কেউ তো নেই এখন, এ সময় একটু ধামুক না। অনর্থক এখন চোঁচিয়ে মরছে কেন?

ওর সামনের টিনের বাটিতে পড়ে আছে মাত্র তিনটি পয়সা। ভুলে এলাম যে, বোবা মানুষ আমি। নিচু হয়ে ওর কানেক কাছে মুখ নিয়ে বললাম—“তুনছ কর্তা—এখন আর চোঁচিও না। এখন সবাই চলে গেছে এখান থেকে। কে তুনছে তোমার কথা।”

ও মাথা তুললে চোখ পিটপিট করছে—যেন শনিই অন্ধ। জিজ্ঞাসা করলে, “কোথায় গেল সব?”

বললাম, “এখন খাওয়া-দাওয়া করতে বাড়ি গেছেন সকলে।”

ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল বড়ো। আঁকু-পাঁকু করে টিনের বাটি থেকে পয়সা তিনটে তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজে ফেললে। সেই সঙ্গে গজ গজ করে কি সব বলতে লাগল, যার একবর্ণও আমি বুঝলাম না।

হাউসার্ট করে উঠল কে আমার পেছনে। একটি জীলোক আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বুড়োর বাটির ওপর। পরমুহূর্তেই একটি কানফটা চিংকাব। খাটি চাটগাইয়া ভাবায় চোঁচাচ্ছে আর খেই খেই কবে নাচছে জীলোকটি। কি যে হ'ল, বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ছুটে এসে লোকজন, ভিড জমে গেল আমাদের চারিদিকে। জীলোকটি চোঁচাচ্ছে, নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে আর আমাকে দেখিয়ে কি সব বলে যাচ্ছে, যার কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়। কিন্তু আমি না বুঝলে কি হবে, যাবা বোঝাবার তারা সবই বুঝলে। ফলে তৎক্ষণাৎ সবাই মাঝমুখো হয়ে উঠল আমাব ওপর। একটি তরুণ এগিয়ে এসে আমাব একটা হাত চেপে ধরলে।

“শালা চোণ বাব কব্ব কি নিয়েছিল বুড়োব বাটি থেকে।”

ভিড ঠেলে সামনে এলেন এক ভদ্রলোক। তাঁকে চিনতে পারলাম, সামনের বাড়ির কর্তা। সকালে জল তোলবার সময় কলসী নিয়ে না পালাই আমি, সেজ্ঞে আমাব উপর সজব রাখবার ভাব দেখা হয়েছিল যাকে। যে ছোকরা আমাব হাত ধবে ধাক্কাচ্ছে বুড়োব পয়সা কেবত পাবার জ্ঞে সে বোধ হয় এঁব ছেলে। ভদ্রলোক কণেক মুহূর্ত আমাব মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বইলেন—“শাপের ধমক দিলেন—“ছেড়ে দে—ছেড়ে দে শীগগির হাত।”

তখন অনেকে হাত নিশপিশ কবছে। যার যা মুখে আসছে বলছে—“দে ছ'য়া শাগগিবে ব্যাটাকে, খুঁজে দেখ ওর কাছে কি আছে, হাবাগজাদা পাকা বদমাইশ, চুল দাড়ি গজিয়ে ভস্ম মেখে সাধু সেজে মাতৃধেন গলায় চাকু ঢালায়।”

যিনি আমাব হাত ছাড়ালেন তিনি প্রচণ্ড ধমক দিলেন সকলকে। গোপমাণ কমল একটু গখন তিনি এগিয়ে গেলেন চোখ-পিটপিট অন্ধ বুড়োব দিকে।

“তোমাব বাটি থেকে পয়সা নিয়েছে কেউ?”

জীলোকটি কি বলতে গিয়ে এক দাবড়ি খেলো। বুড়ো গৌ গৌ করে কি জবাব দিলে। তখন তার কাছে যা আছে, সব বার করতে হ'ল। গোনা হ'ল—বার আনা তিন পয়সা।

আমার কোমরে-জডানো ত্রাকডাব টুকরোটা খুলে ঝেড়ে দেখা হ'ল, ইঁ করিয়ে মুখে ভেতর দেখা হ'ল, কোপীনও খুলতে হ'ল আমাকে, মাথার চুলের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল। না, একটি কানাকড়িও নেই কোথাও।

তখন আর একচোঁট সকলে মার মার কবে উঠল জীলোকটির ওপর। সে মুখ নিচু করে বুড়োর হাত ধরে চলে গেল।

এমন সময় স্বয়ং সম্পাদক মশাই পান চিবোতে চিবোতে উপস্থিত হলেন।

সামনের বাড়ির কর্তামশাই পড়লেন তাঁকে নিয়ে ।

“বলি ব্যাপার কি হে স্বরেশ্বর, এই লোকটা যে সকাল থেকে খাটছে, এর খাবার ব্যবস্থা কোথাও করেছে ?”

আর যাবে কোথা । বিরাট হৈ-ঠৈ লেগে গেল । সম্পাদক মশায় চম্বিতসি জুড়ে দিলেন সহ সম্পাদকের ওপৰ । তিনি গঞ্জন করে ডাকতে লাগলেন স্বৈচ্ছামেবকদেব কাপ্তানকে । তাঁকে খুঁজি না পেয়ে কোষাধ্যক্ষকেই ধরে আনলে কারা । ননি এসে রুখে উঠলেন—“আমার কি দায় পড়েছে, কে থেলে না থেলে তান । হসেব রাখবার ? পূজাব পর আমাব কাচ থেকে ঢাকার হিসেব বুঝে নিও এল পয়সা এবার ”ধাব খদি হয় নো দশ ঘা ছুতো মেবো আমায় ।”

গোপমানেব মানাখান থেকে আমি টপ কবে সবে পড়লাম ।

• • তপুবেল, শস্য লোকজন কম • • নচন করে হাটচি আর মনে মান হাসি হাসি ফকড়েব নপাতের কথা ভেবে • • কড়েব কপালখানি নো সজেহ এসেছে বাঙলায় । সেহ কপাল-হুদ্র এখানকার পূজা উৎসব ফাশন হত্যা • • নাক গলাফে নেনে অনর্থক গুণগোল দাবিয়ে তুলব । দুনে থাকাই ভান • • ন এখনও কাচ এগোনো নয় । সে নোভাস বসব বলে তফাত থেকে বাঙলায় • • হা বনা দেখে সবে পড়ি । • • প্রগোজন স্বপ্ন শুবু জন বোশ কমে

• • কান ন পায় সবে গোলায় আপন চিন্তা ভো হয়ে হত্যা মান হন কে যন না ক মারি ডাব দছে পছন লোকে । পিছন ফিবে দেখে মেহ স্বনে টি — • • নএম দৌডছে সে এখন হাত নেড়ে আমায় দাঁড়াবাব ফেহে হশান ববো

• • আবান পিছনে কেন ? আবান জোবে পা ঢালালাম । এলা সতিই সে ছুঁত লাগল, আব ক যেন বসতে লাগল ব্যাকুল হয়ে দাড়াতে হ'ল । কি চায় • • আমাব কাছে ?

কাছে এসে হাপাতে হাপাতে জিজ্ঞাসা সবলে — “কোথায় যাচ্ছ এখন গোঁসাই ?”

হা করে মুখেব নেতর আঁকুল দিয়ে দেখিয়ে খাড নাড়লাম । যেন জলে উঠল জ্বালোকটি—“মিথ্যে কথা, তখন তো বেশ কথা বলছিলে বুড়োব সঙ্গে” বলে চোখ পাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাপাতে লাগল ।

ভাল করে দেখলাম তাকে । বয়স বত তা বোঝা শক্ত । ছাব্বিশও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে । শুকনো শরীর । চোখেব কোলে বড় বেশি কাল জমেছে, উঁচু হয়ে আছে গলার কর্ণা, তিন ফেব তুলসীর মালা জড়ানো রয়েছে

গলায়। একটা শেমিজ আর একখানা শত-জায়গায় সেলাই-করা শাড়ি পরে আছে। জামা-কাপড়ের আদি বর্ণ যে কি ছিল, তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু ওর নিজের রঙ খুব ময়লা বলা চলে না। অত্যধিক তেল মেখে, কপালে একটা মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে, নাকের ওপর সাদা তিলক একে, পান চিবিয়ে চিবিয়ে দাঁতগুলোকে বিনী কালো করে ফেলে এমন অবস্থা করে তুলেছে নিজের যে, ওর দিকে চেয়ে থাকলে গা ঘিনঘিন করে। ওই সমস্ত বাদ দিয়ে একখানা ফরসা শাড়ি পরলে অতটা বিদঘুটে দেখাত না বোধ হয় ওকে। হয়ত তখন ওর কোটরে-বসা চক্ষু দু'টির দিকে চেয়ে মন এতটা চড়ে যেত না আমার।

মুখ বুজে ওর আপাদ-মস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি বলে সে আরও চটে গেল। “আহা-চণ্ড দেখ না মিন্‌সেব! আমার সঙ্গে কথা কইলে ওঁব কারবাবটি মাটি হয়ে যাবে! আমি লোককে বলে বেড়াতে যাচ্ছি যে উনি বোবা নন! এখন যাচ্ছ কোন্‌ চুলোয়, তাই বলো না।”

ওর নির্ভেজাল নিজস্ব ভাষাব সবটুকু না বুঝলেও ওব চোখের দিকে চেয়ে মনের ভাবটুকু বেশ পড়ে নেওয়া যায়। কোটবে-বসা চক্ষু দু'টিতে যথেষ্ট আগুন বয়েছে, ঠোট দু'খানির তেরছা ভঙ্গিমায় রয়েছে বিস্তর ইঙ্গিত। অথাৎ নারী তখনও বেশ বঁচে রয়েছে তার হাড় ক'খানিব অন্তর্ভালে। কিন্তু নিয়তির নিষ্করণ নিপীড়নে একেবারে তেতো হয়ে গেছে সেই নারী।

কিন্তু ওর মতলব যে কি, তা ঠিক ঠাহর করতে না পেরে আবার পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। সেও ছুটেতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে—“আ মরণ, থা শোনে না যে গো, দেখ শুনছ—তোমায় সঙ্গে নিয়ে না গেলে খোয়াবে চূড়ান্ত হবে আমার, যেহে আমার হাড় গুঁড়িয়ে দেবে বুড়োটা।” তার গলা ভেঙে পড়ল।

আর কান দিলাম না ওর কথায়। আরও জোরে পা চালিলাম। সেও প্যান প্যান করতে করতে পিছনে ছুটল। একটু পরেই খেয়াল হ'ল, এভাবে ওকে সঙ্গে নিয়ে আস্তানায় পৌঁছলে সেখানকার তারাই বা ভাববে কি! এদিকে তখন রাস্তার লোকজন থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের দিকে। দেখবার কথাই, কিন্তু ত-কিমাকার একটা পুরুষের পেছনে লক্ষীছাড়া একটা মেয়েমানুষ ছুটছে কেন?

আবার ভিড় জমবার ভয়ে মরিয়া হয়ে দাঁড়িলাম। বেশ জোরে ধমক দিলাম তাকে—“কি চাও আমার কাছে!”

ধতমত খেয়ে সেও দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে অস্বতভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে। বোবা পণ্ডর নিরুপায় চাহনি তার চোখ দু'টিতে, আর অনেকটা জলও টলটল করছে।

আস্কারা খাঁ দীঘির পশ্চিম পাড় ঘুরে, বাবুপাড়া অনেক পিছনে ফেলে রেখে, মণিপুরীদের গৌরান্দ-মন্দিরের পেছন দিকে, প্রাণ হাতে করে এক বাঁশের সীকো পার হলাম। তারপর মাঠ, মাঠের মধ্যে একটা ছোট পল্লীতে গিয়ে পৌঁছলাম তার সঙ্গে। যেতেই হ'ল, আমাকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরলে নাকি বুড়ো আব বুড়োর ছেলে ওব হাড গুঁড়িয়ে ফেলবে। বুড়োর ধারণা হয়েছে, আমি একটি মহাপুরুষ। পাপীতাপীদের উদ্ধার করার জন্যে শ্রীধাম থেকে নোজা উপস্থিত হয়েছি চাটগাঁ শহরে। মহাপুরুষের নিয়মমাফিক—ছদ্মবেশ ধরে বুড়োর সামনে আবিস্কৃত হয়ে ঠিক যখন তাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছিলাম, সেই সময় এত হতভাগী বাধা দিয়েছে। কাজেই বুড়োব উদ্ধার না হবার হেতু হচ্ছে এত পাপপট্টা। অতএব বুড়ো ছকুম দিয়েছে, যেখান থেকেই হোক আমায় খঁজে বাব কবে ধরে নিয়ে যেনেই হবে। এতক্ষণ বাড়ি কিনে বুড়ো তাব বেচায়ে ও বংশে সব কথা। আমি যদি সঙ্গে না যাই, তাহলে আজ ওব বক্ষে থাকবে না। দু'জনে গায়ের চামড়া তুণে নেবে।

আরও অনেক কথা জানতে পারলাম একসঙ্গে পথ চলতে চলতে। গ্রাম্যকার মানুষ নয় ওরা। নে'যাখালি থেকে আকালের বছর পার্লিমে এসেছে। কে ন এব বাবাজী সম্প্রদায়ের লোক ওরা। যখন ওব এস ছিল কাঁচা তখন ওর ১১ ত্রিশ টাকার বদলে মেয়েকে দিয়ে দেয় এক বাবাজী'র হাতে। কেয়েক বছর পবে সেই বাবাজীও এ'র মূর্খবন উত্তর দেশে নেয় আর একজনের কাছ থেকে। এ'র ভাবে বাব পাঁচেক ও হাতবদল হয়েছে। পর বর্তমান মালিক বুড়োর ছেলে ঘরে বসে গামছা পোনে তাঁতে। বুড়াকে পথের ধারে কোথাও বসিয়ে দিয়ে সে মার, শ'হর ভিক্ষা করে বেড়ায় কিন্তু এখন এ'র দৈর্ঘ্য দেখে কেউ ভিক্ষাও দেয় না। সে এস নেই, সে এসও নেই। কাজেই কিছুতেই কিছু হয় না। শুধু-হাতে ঘরে ফিরে রোজ মায় খেতে হয়।

হাসি পেল ঘর কথাটি শুনে। হঠাৎ বলে ফেললাম, “কাব বব? যাও কেন ওদের ঘরে? পালাতে পাবো না ওদের কাছ থেকে?”

কোনও উত্তর দিলে না। আবার সেই বোবা পুত্র বোবা চাহনি দেখা দিল ওর চোখে। সেই দৃষ্টি বলতে চায়, কোথায় পালাব? কার কাছে পালাব? যেখানেই যাব ঐ বুড়োর ছেলে গিয়ে ঠিক ধরে আনবে। এক কুড়ি নগদ টাকা দিয়ে কিনেছে ওরা, সেই টাকা ক'টা দিয়ে অল্প কেউ যদি কিনে নিত তাকে। কিন্তু সেদিন কি আর ওর আছে?

পৌছলাম ওদের বাড়িতে। বাড়ি নয়, আখড়া। পল্লীর সব ক'খানি বাড়িই

আখড়া। মালা-চন্দনের বেড়াঝালে আটক পড়েছে কতকগুলি মানব-মানবী। জাল ছিঁড়ে পালাবার না আছে সাহস, না আছে সামর্থ্য। পচা ঝোলা জলে পচে মরছে। না মরা পর্যন্ত রেহাই পাবে না কেউ।

ছিটে বেড়ার একখানি মাত্র ঘর আর ছোট একটি উঠান। উঠানের এক কোণে তুলসী-মঞ্চ। উঠানখানি নিকোনো। ঘরের দাওয়াও নিখুঁতভাবে নিকোনো। দাওয়ায় বসে সেই বুড়ো খল-ছড়িতে কি মাডছে। ঘরের মধ্যে খটাখট শব্দ হচ্ছে তাঁতের। আমাদের সাড়া পেয়ে তাঁত বন্ধ হ'ল। মিশকালো একটি লোক ঘর থেকে বেরিয়ে সটান হয়ে পড়ল আমার পায়ের ওপর। দণ্ডবৎ সম্পন্ন করে উঠে বসতে বুঝলাম, লোকটি ভক্ত বটে। ভক্ত যে কত পাকা তা ওব সর্বাঙ্গে লেখা রয়েছে। কপালে নাকে বুক পিঠে অষ্টাঙ্গে আঠেপৃষ্ঠে তিলক কেটেছে। মাথাটি নেড়া, চৈতনের গোছাটি এতই সুপুষ্ট যে ওর খেংরা কাঠির মত মূর্তির সঙ্গে একদম বেমানান দেখাচ্ছে। রক্তজবার মত লাল চোখ দু'টি শুধু নামামৃত পানে অতটা লাল হয়নি নিশ্চয়ই। অল্প কোনও পার্থিব বস্তু পেটে পড়েছে। হাঁটু মুড়ে জোড় হাতে বসে বইল আমার সামনে, মুখটা যতদূর সম্ভব কাঁচুমাচু করে।

লাঠি ধবে বুড়ো নেমে এল দাওয়া থেকে। এসে সেও উপুড় হয়ে পড়ল পায়ের ওপর। ততক্ষণে আরও কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ জমা হয়ে গেল—চেহারা, তিলক, মালা, চৈতন্য সকলেরই এক রকম। ভক্তি যথেষ্ট সকলের। জানতে পারলাম, বিখ্যাত সোনাতাঁদ বাবাজীর দলভুক্ত বোষ্টম ওরা। বাবাজী বছকাল আগে গোলোকে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর দল আর মত বেঁচে রয়েছে। সেই সঙ্গে আব যা জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে, তা স্পষ্ট লেখা রয়েছে এই মেয়ে পুরুষ ক'টির সর্বাঙ্গে।

অর্থাৎ কিছুই ওদের আটকায় না। সহজভাবে ভজন কিনা ওদেব, কাজেই ওদের কাছে সবই সোজা। ভজনের সময় বাছবিচার নেই কিছু। মন যাকে চায় তাকে নিয়েই ভজন করা চলে।

বুড়ো আর তার ছেলে দু'জনে আমার কাছে দু'টি বর চাইলে। বুড়ো বললে—হারামজাদীর জন্তে সে মহাপুরুষের কৃপা হতে বঞ্চিত হতে বসেছিল। “আহা, সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর মত গলা আর নিতায়ের মত দেখতে! জয় প্রভু নিত্যানন্দ, এবার কৃপা করে এই অন্ধের চোখে আলো দান করো বাবা।”

পুত্ররত্নটির কামনা আরও সহজ ও সরল। এই পাপ পৃথিবী থেকে তাকে শুধু উদ্ধার করে দিতে হবে।

সকলেরই ঐ এক প্রার্থনা—উদ্ধার করে দাও। উদ্ধার না হয়ে কেউ ছাড়বে

না আমার। অন্ততঃ একটা রাত ধরে রাখবে। বয়স-কম ছুটি মেয়ে এল তেলের বাটি নিয়ে অঙ্গ-সেবা করতে। সহজভাবে অঙ্গ-সেবা, অঙ্গ-সেবাই প্রধান সেবা।

কিন্তু আমার তো থাকবার উপায় নেই। প্রত্নপাদ গুরু রূপায় আমাকে যে তখন অল্প একপ্রকার ভজন করতে হচ্ছে। সে বড় উঁচু রসের ব্যাপার। তাতে অঙ্গ-সেবা নিষিদ্ধ আর নির্জনে থাকা প্রয়োজন। তাঁর আদেশে মৌনব্রত নিয়ে আছি। শুধু বুড়ো একজন উঁচুদেবের ভক্ত বলেই তাব সঙ্গে কথা না বলে পারিনি।

স্বতরাং এগাব মনে বুড়োকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলে। আমাকে কথা দিতে হ'ল যে, ব্রজরাণীর ইচ্ছা হ'লে আবার দেখা হবে তাদের সঙ্গে। বাসমণির রূপায় বুড়ো ফিবে পাবে দৃষ্টিশক্তি, শুধু দৃষ্টিশক্তি কেন, অন্তর্দৃষ্টি পাবে সে এবার। আর উদ্ধাব? উদ্ধাব তো চেষ্টা গেছে সবাই। হাঃ, এত ভক্তি যাদের, তাদের আর উদ্ধাব হতে আটকাচ্ছে কোথায়।

সেবার ক্ষেত্রে কিছু দিতে এল ওরা। কিন্তু কিছুই ছুঁই না যে, বাল্য আছে গুরু। গুরু হে, তুমিই সত্য। চোখ বুজে কপালে জোড় হাত মেকলাম আব এনবাব ওদের ভক্তি দেখানো শেষ হলে বিদায় নিলাম। সাক্ষ্যে পঞ্চম এল সকলে সঙ্গে সঙ্গে। সাক্ষ্যে পূর্ব উঠে হাত নেড়ে ওদের আর এগোতে মানা করে একলা এখানে নেমে এলাম। আবও দেবি ইলেক্ট চেষ্টা ছিল আব কি। অঙ্ককালে সাক্ষ্যে পান হতে না পেরে ত্রি নরকে পড়ে মদ্যম সান্য শব্দ এগার সন্ধ্যাই এলটি ধন্তবাদ দিলাম আমার বণ্ডনে।

দিয়েই চমকে উঠলাম। এ আবার কে লাড়িয়ে আছে ওখানে। আবচ্ আলোয় চিনতে কষ্ট হ'ল না। আবার কি চায় ও?

সবে এল কাছে ভাঙা গলায় বলা, “চলুন গোঁসাঁঠ এগিয়ে দিহ আপনাকে। সভয়ে বললাম, “তার দৃষ্টি নেই। তুমি ফিরে যাও যত ভাববে ‘স ওবা।’ ফৌস করে উঠল, “ভাবুক যাব যা খুশি। আব পারি না আমি, আমার মরণও নেই। সাবাদিন পথে পথে ঘুরে কিছুই পাইনি আজ। ওদের নেশার যোগাড় না নিয়ে গেলে সাবাবাত দুই বাপ-বেটায় ছিঁড়ে খাবে আমায়। নেশা করিয়ে ওদের ফেলে রাখতে পারলে তবে মে বাতটা বক্ষা পাই আমি। ঐ বুড়ো মডার বেশি ছাংলামো। বুড়োর কথায় বাজী না হলে ওর ছেলে বৃকে চেপে বসবে আমার, আব বাপটা রক্ত চুষে খাবে। নেশার লোভে পাডার কুস্তা-কুস্তীগুলোকেও ভেকে আনে, তখন খোল-খতাল বাজিয়ে আরক্ত হৃৎ চাটাচাটির মচ্ছব। শাখি মারি ওদের ভজনের মুখে।”

হঠাৎ লাড়িয়ে মারলে এক লাখি রাস্তার ওপরেই। শরৎ-আকাশের যষ্টির চাঁদ

ওর মুখের ওপর আলো ফেলেছে। চোখ দুটো যেন জলছে ওর। খারালো লম্বা একথানা ইম্পাতের মত দেখাচ্ছে ওকে। সন্ধ্যা ঘুম ভেঙেছে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর, এবার চিবিয়ে খাবে সব, অপমান-নিপীড়ন-প্রবঞ্চনা সব গ্রাস করে ফেলবে।

বললাম, “আমার সঙ্গে গিয়ে কি ওদের নেশার যোগাড় করতে পারবে?”

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, “যতক্ষণ পারি থাকি বাইরে। হয়ত আট আনা চার আনা পেয়েও যেতে পারি।”

অনাবশ্যকবোধে পাবার উপায় সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করলাম না, শুধু বলে ফেললাম, “পালাও না কেন ওদের কাছ থেকে?”

নাবী আব জবাব দিলে না আমার কথার। মাথা হেঁট করে চলতে লাগল পাশে পাশে, কিছুক্ষণ পরে স্পষ্ট শুনলাম—ও কান্না চাপবাব চেঁচা করছে।

আরও অনেকটা পথ পার হলাম এক সঙ্গে পা ফেলে। ডান দিকে নদীর ধারে যাবাব বাস্তা। আর ওকে নিয়ে এগোনো যায না। একটা কিছু বলে তখন বিদেয় করতে পারলে বাঁচি। বললাম—“চট্টেশবার বাড়িব দরজাব পাশে কাল ছপুববেলা দাঁড়িয়ে থেকো। আমি যাবে”, দেখা যাক—কি করতে পারি!”

বাস্তাব ওপরেই ও আমার পায়ে মুখ ঝুঁজে পড়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে আব কোনও কথা না বলে চলে গেল বাঁ হাতি বাস্তায়।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। সারা শহর ঢাক-ঢোলের শব্দে কাঁপছে। দলে দলে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ মাজগোজ করে পথে বেবিষে পড়েছে। সেই হানন্দ উচ্ছ্বাসের মাঝে একান্ত অশোভন, ফকড়, বিশ্রী বেথাপ্লা বেমক্লা, ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বাড়লাব আকাশের তলায় ফকড়ের উপস্থিতি। নিজেকে নিয়ে কোথায় লুকোব তাই ভেবে অস্থির হয়ে উঠলাম।

কিন্তু এই ধবনের মানসিক অবস্থা কখনও হয় না বাড়লার বাইরে কোথাও। বাড়ালী যেখানে নেই সেখানে মানুষ ভাল জামা-কাপড় পরে উৎসব করতে বার হয় পথে। কই, তাদের সামনে ফকড়ের ঘোরাফেরা করতে বাধে না তো কখনও! এত তুচ্ছ ব্যাপারে কখনও মাথা ঘামাতে হয় না, লজ্জা-সঙ্কোচের ধার ধারতে হয় না। এ আমার হ’ল কি! কেন মরতে এলাম এ সময়ে বাড়লা দেশে?

পথের মানুষের চোখ এড়াবার জন্তে—পথ ছেড়ে বিপথ ধরে লোজা চললাম নদীর কিনারায়। আগে জলে নামব, স্নান করে তবে গিয়ে উঠব ফকড়ের আসনে।

যেখান থেকে ঘুরে আসছি সেখানকার দুর্গন্ধ ভাল করে ঘুরে ফেলতে হবে কর্ণফুলীতে ফুঁব দিয়ে।

কিন্তু কর্ণফুলী পারলে না ফকড়ের অঙ্গ থেকে ছুঁগছ দূর করতে। সে জিনিস ভেতরে বাসা বেঁধেছে তখন ভাল করে। যগীর সন্ধ্যায় এক হতভাগী কি আশা বুকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে মরতে লাগল। কোথায় কতটুকু প্রভেদ আছে তার আর আমার মধ্যে? ছ'জনেই পথের কুকুব, বেঁচে থাকার নির্লজ্জ লালসায় ছ'জনেই পথের ধুলায় গড়িয়ে মরছি। কোথায় এমন কি বস্তু আমাব আছে যা তার নেই, অথবা তার যা আছে আমার তা নেই—এখন কিছুর নাম মনে আনবার জন্ত মনের অঙ্কিসন্ধি খুঁজতে লাগলাম।

নিজের ওপর নির্দাকণ বিতৃষ্ণা দম বন্ধ হয়ে এল। এই মুহূর্তে যদি এই খোলসটা বদলে ফেলতে পারতাম। চুল-দাড়িসুদ্ধ এই শব্দা বিদীর্ণ চামড়া ঢাকা 'আমি'টিকে ছেঁড়া জুতোর মত টান মেবে ফেলে দিয়ে যদি কোথাও পালাতে পারতাম। নাঃ, এও ঘৃণা এত বিদ্বেষ আর কখনও জন্মায়নি নিজের ওপর।

ফকড়—কখনও কখনও ছিটেফোটা উপকারে লাগে না ফকড়। বেঁচে থেকে ও মরে ভূত হয়ে গিয়ে, লকড় জেলে টিকড় পুড়িয়ে থেয়ে, খোলসটাকে বজায় রাখার অবিরাম চেষ্টা কবাব কি সাংক ৭। হাংলা কুত্রার মত ছুনিয়াটার দিকে চেয়ে দ্রুত দৃষ্টি জল গড়াচ্ছে যার নিজেকে নিজে সাহস দিচ্ছি—এভাবে দিন গুজরান করবার অর্থ কি?

অর্থ খুঁজতে খুঁজতে, অগমনীয় হয়ে নদী থেকে উঠে, কখন আস্তানাব দিকে চলতে আস্ত কবেছি। কানে এল খচ খচ খচ থং তক্তা ঢোল আর কবতাল নিয়ে খচ খং জুড়ে দিয়েছে। খচ থং আবার ফকড়ের বক্তে দোলা লাগিয়ে দিলে। জোরে পা চালানলাম।

ওদেব সামনে গিয়ে দাড়াতে আরও উদ্ভ্রাম হয়ে উঠল খচ-থং খচ-থং। একে একে উঠে এসে গোড় পাকড়ালে সকলে। মাব বানবে উঁচু আসনটি আমার জন্তে। সামনে এক গোছা বগ জলছে। একথানা থালায় সাজিয়েছে পেঁডো আর ফল। পাশে আব একথানা থালায় সাজানো রয়েছে পুর কচুরি-মিঠাই। মনে পড়ে গেল, আজ ভাবে যখন যাই তখন এরা বলেছিল বটে যে, কোন শেঠজী আজ ভোজন দেবেন আমায়। একটু বেলাবেলি ফিরতে অন্তরোধ করেছিল এরা। সবই ভুলে মেরে দিয়েছি।

এও এক জাতের মদ। এদের ভক্তি, সাধু হিসাবে ভিন্ন রকম মযাদ দেওয়া, বেশ কড়া জ্ঞানের উগ্র মদ একরকম। নিজেকে নিজে ফিবে পেলাম এতক্ষণে।

স্বপ্ন হ'ল জাত ফকড়ের বাণী একটি।

“আরে, ছুনিয়া যার পায়ের তলায় লোটায় সে ফকড়, সে রাজার রাজা।”

শিরদাঁড়া খাড়া করে উঁচু আসনে চোখ বুজে বসে রইলাম। পাঁচ গুণ জোরা লো হয়ে উঠল ওদের উৎসাহ।

“শ্রীরামভক্ত শ্রীবজ্রজবালী মহারাজকে জয়।”

শাঁখ বাজছে।

একসঙ্গে অসংখ্য শাঁখ বাজছে। তাব সঙ্গে উঠছে সহস্র কণ্ঠের উলুধ্বনি। শব্দ আর উলুধ্বনি স্তনতে স্তনতে ঘুম ভাঙল যুদ্ধের।

উলুধ্বনি—এই ধ্বনি শোনা যায় শুধু বাঙলায় আর যেখানে বাঙলায় মেয়েবাঁ যায সেখানে। বাঙলার মেয়েবাঁ কণ্ঠেব এই বিচিত্র ধ্বনির বিশেষ তাৎপৰ্য্য ব— তা বলতে পারব না। কিন্তু এই ধ্বনি কানে গেলে মনটা যেন কেমন হয়ে যায়— মনের তন্ত্রীগুলো বেজে ওঠে কনকন করে। একটু বেশী বকম ছুটোছুটি করে শরীরেব রক্ত। বাঙলাব ছেলেবই এই সব উপসর্গ দেখা যায় উলুধ্বনি কানে গেলে—আতুড ঘরে নাভীকাটার আগেই এই ধ্বনি কানে যায় কিনা বাঙালী

তারপৰ বেজে উঠল ঢাক ঢোল কঁাসি চাবিদিকে।

মহাসপ্তমী।

জেকে উঠেছে বাঙলা দেশ। ডবাব আবির্ভাবের আগে বাঙলা আবাহন জানাচ্ছে মহাসপ্তমী তিথিকে। জগৎজননীব আবির্ভাবের তিথিকে বরণ করছে বাঙলা। এই মাহেন্দ্রক্ষণে যে বাঙালী তার মনে প্রাণে সমগ্র সন্তায় ঘুম ভাঙানি গান স্তনতে পায না, সে যেন নিজেকে বাঙলাব সন্তান বলে পৰিচয় না দেয

সেদিন সূর্যোদয়ের অনেক আগে, বর্ণফুলীব তীব পোট-গুদামেব আড়ালে বগছোডজীর মন্দিবেব পাশে হুম্মানজীব মন্দিরের সামনে, ছেঁড়া বস্ত্রেরেব অপৰ শোয়া ফক্কডও উঠে বসল।

আকাশেব দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ধীব ধীরে স্বচ্ছ আকাশেয গাযে ফুটে উঠল একখানি মৃথ। স্পষ্ট চিনতে পারলাম মুখখানি। তীব্র একটা মোচড দিল বকের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেললাম।

এ সেই মুখখানি আর সেই আঁখি দু’টি। মাযের বকের মূৰ অভিমান মুখব হয়ে উঠেছে আঁখি দু’টিতে, উথলে উঠেছে মাতৃ-হৃদযের অমৃতের উৎস। ঘর-পালানো হতভাগা সন্তানের জন্তে নিরুদ্বেবেদনায় কাঁপছে মাযেব ঠোট দু’খানি মৃদ্ধ মৃদ্ধ। বহুকাল পরে স্তনতে পেলাম মাযের আকুল আহ্বান।

“ফিরে এলি বাবা—ফিরে এলি নিজের ঘরে। মিছিমিছি কেন এত কান্না কাঁদালি আমায়। মাকে আর জালা দিস নে বাবা—আর পালাস নে ঘর ছেড়ে।

এবার ঘরের ছেলে ঘরে থাক ।”

কর্ণফুলীর অপর তীরে আকাশের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে । আগোর হাসি—
আমার জননীর মুখের মধুর হাসি ঝলমল করছে পূর্ব আকাশে ।

বসে বসে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম ।

বহুকাল আগে, মনে হয় যেন এ জন্মের আগের জন্মে একে একে অনেকগুলি
মহাসপ্তমীর প্রভাত উদয় হয়েছিল । ঠিক এই সময়েই মায়ের সঙ্গে গঙ্গা স্নান করে
ফিরে আসতাম । গ্রামপরে থাবান যেতাম গঙ্গায় লাল চেনা পরে কলাবৌ স্নান
করাতেন । দুধে-গবদেব জোড় পবে ছুঁহাতে বুকেব কাছে মস্ত তামাব ঘট ধরে
বাবা যেতেন পুরুত মশায়েব পাশে পাশে । পুরুত মশাই নিতেন কলাবৌ । উঁদের
সামনে থাক নাম আমি বৃত্তি তাতে, বুনা গুগগুল চন্দনকাঠেন গুঁড়ে পোডাতে
পোডাতে যেতে হত আমায় । তিনখানা ঢাক, পাঁচখানা চোপ, কঁসি, মানাহ
থাকত আমার সামনে । বাজনাব তালে তালে বক্তে লাগত প্রচণ্ড দোপ ।

সেদিন প্রভাতে এ টুকবো ছোড়া ছাব ডা-জডানো বন্ধুডেন বক্তে সেই জাতেন
দোলা লাগল । সামলাবার জন্তে ছুঁহাতে বুনা চেপে ধরলাম, জ্বলন্তেও পাবলাম
না, পেশাদাব ফরুডেব চিবন্তুক দুই চোখ দিয়ে কখন অবিবল ধারায় জল গডাতে
শুক কবেছে ।

দব থেকে কথাই আসযাদ কানে এল । এত ভোরে কাবা আসছে এদিকে ?
এ সময় আবাব কার কোন প্রযোজন হ'ল আমাব কাছে আসবাব ? নাঃ, এতটুকু
শাস্তি নেই কোনও চুলোয়, একান্তে বসে নিজস্ব কবে এতটুকু সময় পাবার উপায়
নেই । সদা সন্তুষ্ট বন্ধুডেব জীবন সবজীবের সামনে সদা সবদা উলঙ্গ উন্মত্ত
বে-আবরু । বাকি হুত যাব নেই, তা'ব আবাব ব্যক্তিগত গোপনীয়—এসব বলাই
থাকবে কেন ?

যাবা আসছিলেন তাঁবা এসে পড়লেন কাছে । সস্ত্রীক এক শেঠজী আব তাঁর
দরোয়ান । দরোয়ানজীকে চেনলাম, সন্ত্রীয়ার সময় আমাব কাছে বসে ছিলিম
টানেন । কিন্তু এই সাত-সকালে মনিব সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হব'ব হেতুটি কি ?

শেঠ-পত্নী চাল-ঘি-ভাল-লবণ দিবে মাজানো একখানি পালি নামিয়ে দিলেন
আমার সামনে । এক জোড়া সাদা ধুতি চাদর আব একখানি গামছা রাখলেন
শেঠজী আমাব কবলের উপর । কয়েকটি চকচকে ঢাকা পাযের গুপব রেখে ছুঁজনে
প্রণাম করলেন ।

কাঠ হয়ে বসে রইলাম । জোড়হাতে আমাব মুখের দিকে চেয়ে ভীষা বসে
রইলেন । কিছুক্ষণ পরে চাপা-গলাষ শেঠজী মস্তব্য করলেন—“বহুৎ প্রেমী হাস

মোনীবাৰা, যোতা হয় ।” তাঁর পত্নী মন্ত নথ নেড়ে স্বামীর কথায় সায় দিয়ে ফিসফিস করে বোধ হয় নিজের মনস্কামনা জানাতে লাগলেন ।

ওধারে পূর্ব আকাশ আরও লাল হয়ে উঠল । দূব থেকে প্রভাতী হাওয়ায় ভেসে আসতে লাগল ঢাক-ঢোল-কাঁসির শব্দ—তার সঙ্গে “মুখু” আর উলুধ্বনি । সামনে পড়ে রইল কাপড় চাদর ঢাকা চাল ডাল ঘি । জল সমানে গড়াতেই লাগল পোড়া-কাঠ ফক্কাডেব পোড়া চোখ থেকে ।

মহাসপ্তমীর ভোবে কার হাত দিয়ে তুই এ সমস্ত পাঠালি মা ? এখনও তুই সত্যিই ভুলিসনি তোর এই দুট্ট বজ্জা ৭ ঘব-পালানো ছেলেকে । তোর ভাঁড়ারে এখনও তাহলে আমাব জন্তে সব কিছু সাজানো থাকে ।

পূজা দেখতে বাঙলায় বাঙালীর কাছে ফাংলাব মত ছুটে এসেছি । তাবা ভুলে গেল সাবাদিনে এক মুঠো খেতে দিতে । আব হাজ্জার মাইল দূবেব শেঠ শেঠানীর হাত দিয়ে কিছুই যে দিতে বাকী বাখলিনি মা আমাষ ।

চোখ বুজে প্রণাম কবতে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল ছুঁখানি পা । যে পা ছুঁখানিৰ ওপব মাথা রেখে এ জীবনের বহু জালা জুড়িয়েছে, বহু আশাস মিলেছে জীবনে যে চরণ ছুঁখানি স্রবণ করে ।

ওরা উঠে গেলেন ।

তার পবক্ষণেই পাট-গুদামের ওপাশ থেকে সামনে এসে দাঁড়াল শতভিন্ন কাপড়-পরা এক কাঙালিনী । স্তব্ধ হয়ে চেয়ে এহল কিছুক্ষণ আমার দিকে, আচমকা ওর অকল্পনীয় আবির্ভাবে আমাব যেন বাকুবোধ হয়ে গেল । ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম মুখেব দিনে ।

একটা কাল-নাপিনী হিসহিস করে উঠল—“পালিয়ে এসেছি গোমাঁহ, পালিয়ে এলাম তাদেব কাছ থেকে ।”

এ কি রকম গলাব আওয়াজ ওব । পাট-গুদামেব পাশ থেকে ভোবের লাল আলো তেবছা হয়ে পড়েচে ওর মুখের ওপর । চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, সজ্জ রক্ত-স্নান করে এল নাকি ?

“এবার বাঁচাও গোমাঁই, লুকিয়ে ফেল আমাকে । কিছুক্ষণ পরেই ওরা আমায় ধরতে বার হবে । ধরতে পারলে কেটে ফেলবে আমায় । বলো গোমাঁই, বলো কোথায় লুকোব আমি ?”

কে যেন ওর গলা চেপে ধরলে, ধরথর করে কাঁপছে ওর সারা দেহ, সবটুকু প্রাণ এসে ভরা হয়েছে দুই চোখে ।

স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলাম ওর দিকে । এ কি ফ্যাসাদ । কি করে ও

জানলে আমার আন্তানা? কি দুর্ভাগ্য করে এল ও? কোথায় ওকে লুকিয়ে রাখব আমি?

একান্ত অসহায় ভাবে ওকেই জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, “কোথায় যাবে এখন?”

আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল ও—“আমি তা কি করে জানব গোঁসাঁই? কাল তো ভূমি বললে ওদের কাছ থেকে পালাতে, তাই তো পালিয়ে এলাম তোমার কাছে।”

উন্নাদের মত হয়ে উঠল ওর মুখ-চোখের ভাব। হাড়িকাঠে ফেলবার পর কোপ দেবার পূর্ব-মুহূর্তে যে দৃষ্টি দেখা যায় পশুর চোখে, সেট জাতের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে ওর দুই চোখে। ওর বকের মধ্যে যে টিপটিপ শব্দ হচ্ছে, তাও যেন আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

টপ কবে কাপড় চাদর আর ঢাকা কটা তুলে নিলাম সামনে থেকে। নিয়ে জোব করে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। বললাম, “নাও, পালাও এই নিষে। যদি পাবো কিছুদিন লুকিয়ে থাকো গিয়ে চন্দ্রনাথে। কিংবা চলে যাও অন্ত কোথাও। গতর খাটিয়ে খাওগে। ঝি-রাঁধুনী, যে কোন কাজ পাও, তাই নিয়ে বেঁচে থাক স্বাধীনভাবে।

চূপ কবে চেয়ে বইল আমার মুখেব দিকে। চোখের পাতা, ঠোঁট দু'খানি, কাপড় চাদর ধরা হাত দু'খানিও থবথব করে কাঁপছে। কি যেন বলতে গিয়েও পারলে না বলতে। হঠাৎ ডুকরে কঁদে উঠল, সেই সঙ্গে কাপড় চাদরসহ দু'হাত বকে চেপে ধবে পিছন দিবে ছুটে চলে গেল।

এব যাবার পথেব দিকে চেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক—শীচুক ও নরক-যন্ত্রণার হাত থেকে। ওর বকের মধ্যে নারীত্ব বলতে কোনও কিছু যদি এখনও বেঁচে থাকে, তবে সে জেগে উঠুক আজ এই মহাসমুদ্রের মহালগ্নে। তিলে তিলে দগ্ধে মবাব হাত থেকে মুক্তি পাক ও—নবজন্ম লাভ করুক নতুন জগতের মাঝে।

নতুন প্রভাত। কর্ণফুলী'ব জলে টলটল করছে নতুন জীবন। উৎকট দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাবার জন্তে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কর্ণফুলী'ব জলে। বহুকণ ডুব দিলাম, ডুব দিয়ে দিয়ে নিঃশেষে সুয়ে ফেলতে চাই অমঙ্গল'এ ছায়া মন থেকে। না, কিছুতেই কিছু হ'ল না। কোনও উপায়েই তাড়াতে পাবলাম না তাকে বিশ্বস্তির অত্মরালে। একটা অতি তুচ্ছ প্রশ্ন খচখচ কবতে লাগল বকের ভেতর।

কি যেন বলবার ছিল তার। কি যেন শোনানো বাকী রয়ে গেল তার আমাকে! শেষ কথাটা বলবার জন্তে কাঁপছিল তার ঠোঁট দু'খানি। হয়ত

শোনার মত কথাই শোনাতে সে, হয়ত বলার মত বলাই বলত আমার কিছু। অত তাড়াহুড়ো করে বিদেয় না করলেও চলত। অত ভয় যদি না পেতাম আমি। কিসের পুরোয়া আমার? কার ভয়ে ব্যাকুল হয়ে বেহারার মত বিদেয় করে দিলাম আমি তাকে? এমন কি সর্বনাশ হয়ে যেত আমার, যদি সে আরও কিছুক্ষণ থাকত আমার কাছে? শোনা হ'ল না—তার শেষ কথাগুলি শোনা হ'ল না যে আমার। কি সেই কথা?

স্নান সেরে ফিবে এসে বসলাম আবার নিজের আসনে।

“গোড লাগি বাবা, গোড লাগি বাবা” একে একে পাণ্ডে চোবে মিশিরজীরা এসে চারিদিক ঘিবে বসতে লাগল। আগুন চড়ল ছিলিমে। সব ক'জনের মুখের ওপর খুঁজে দেখতে লাগলাম। কই—কাবও মুখে তো হুশিঙ্গাব কানো ছায়া খুঁজে পাওয়া যায় না। সবাই সুখী, সকলেই মশগুল আপন আপন তানন্দে। শুধু আমি জলে-পুড়ে মরছি—তুচ্ছ নোংরা একটা মেঘেমানুষের কথা ভেবে ভেবে। জাত-জন্মের ঠিক-ঠিকানা নেই, নামগোত্রহীনা একটা আন্তাকুডেব আবর্জনা। খাত-খাদক সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু যাব মাথায় চোকেনি সারা জীবনে, তাব আব'র কি বলবার থাকতে পাবে আমাকে? সেই সব ছাট-ভস্ম শোনা হ'ল না বলে এত খুঁত খুঁত করছে কেন আমার বোবাটা মন? কেন?

তেলে বেগুনে জলে উঠলাম নিজের ওপর। আমি ফকড, পাকা পাণ্ড-খাওয়া পেশাদার ফকড আমি। এই মাত্র শেঠ-শেঠানীর শিব লুটিয়ে পড়ল আমার চরণে। সেই আমি নোংরা বিশ্রী একটা যা-তা ব্যাপার নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামিয়ে মরছি। ছিঃ।

বেশি কবে ভস্ম লেপে দিলাম কপালে আর সর্বাঙ্গে তারপব যত্ন করে লাগলাম এক মস্ত বড় সিঁহুরের ফোটা কপালে। কোঁপীন এঁটে ছাকডাখানি মেলে দিলাম রোদে। দু-মিনিট পরেই শুকিয়ে যাবে। তখন ওখানি জড়িয়ে পূজো দেখতে বার হবো শহরে।

শ্রীবজ্রঙ্গ মহারাজের স্নান আরম্ভ হ'ল তেল-সিঁহুর মাথিয়ে। দূরে শহবময় ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। সেই সঙ্গে শুনতে পেলাম বহুবার শোনা মন্ত্রধ্বনি—অনেন গন্ধেন—অনয়া হরিত্রয়া—অনেন দয়া। নিশ্চয়ই এতক্ষণে মহাস্নান আরম্ভ হয়েছে মায়ের। তন্ত্রধারক আর পুরোহিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে মহাস্নানের মন্ত্র। গম গম করছে সব পূজা-মণ্ডপ। কিন্তু এদের ছেড়ে এখন উঠে যাওয়া যায় কি করে?

ওধারে ফকডের বৃকের মধ্যে যে যন্ত্রটা অবিরাম টিক টিক করে চলে, সেটা যেন

বড় বেচালে বেতালে চলতে লাগল মহাসপ্তমীর মাহেন্দ্রক্ষণে। সেই আন্তাকুন্ডের আবর্জনার মুখ থেকে যা শোনা হ'ল না, তার জন্তে ধুইয়ে ধুইয়ে জ্বলতে লাগল মনের মধ্যে। অসন্ত রাগ হ'ল নিজের ওপর। কি বিশি কোঁতুহল। যাই এবার বেরিয়ে পড়ি, তুচ্ছ আপনাদেব কথা নিয়ে বসে বসে মাথা ঘামিয়ে এমন দিনটি মাটি করে কি লাভ ?

কোন লাভই নেই। অথবা লাভ যাও হয়, তেমনি একটি কারবার হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল সামনে। ইনি সেই দরোয়ানজী—যিনি সকালে শেঠ-শেঠানদের সঙ্গে এসেছিলেন। সেই মুহূর্তেই আমাকে যেতে হবে শেঠজীর বাড়ি দরোয়ানজী'র সঙ্গে। শেঠজীর বাড়ি ঢু' বদম তদান্বে। কৃপা কবে যেতেই হবে তৎক্ষণাৎ যেতেই হবে—দরোয়ানজী গোড় পাকডাতে তেড়ে এলেন।

কেন যেতে হবে ? 'কি এমন ঘটল যে তৎক্ষণাৎ যেতে হবে ?

নুখ বন্ধ মৌনীবাবার, কাজেই প্রশ্ন করার উপায় নেই। অ'এব উল্ল'এ এবং বগ্যানা হলাম। আ' এখনই প্রথম খেয়াল হ'ল দরোয়ানজী'র—এক সেই বৃত্তি চাদব গেল কোথায় ?

কপালে ছাত ঠেকিয়ে মাথা নাড়লাম।

“কেয়া। চোরি হো গিয়া।”

মাটির দিকে চেয়ে একান্ত বিষণ্ণ মুখে দ্যাডয়ে বইলাম। এক সঙ্গে সকলে হৈ হৈ কবে উঠল। এত বড় স্পর্শ চোর ব্যাটা'ব ? এখন থেকে, সাক্ষাৎ বজবজ লালেন সামনে থেকে মৌনীবাবার কাপড় চাদব নিয়ে চম্পট দিলে। কখন হ'ল চুরি ? 'নশ্বয়ই যখন আমি নদীতে স্নান করতে গেছি সেই ফাঁকে নিয়েছে চোবে পাড়ে মিশিবজ'বা ক্ষেপে উঠলেন। শালা ডাকু'বো পাকডাতে পাল্লে এক দম 'জানসে খতম' কবে দেওয়া হবে। আক্ষালন চরমে পৌছল। আমি আর কি কবব—দরোয়ানজী'র পিছু পিছু শেঠজী'র বাড়ির দিকে বগ্যানা হলাম।

শেঠ বজ্রকষণলাল হবসুখরাম দাসের গদিতে পৌছতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। শেঠজী স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন বাস্তাব ওপব। আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এগিয়ে এলেন। বাস্তাব ওপবেই আমার দু'পায়ে তাঁব দু'হাও ঠেকালেন। দরজা'ব সামনে চাকব দরোয়ান, অস্ত্র সব কর্মচারীরা তটস্থ হয়ে আছেন। চাপা উরেজন, থমথম করছে সকলের চোখে মুখে। ব্যাপাব কি ?

শেঠজী হাত জোড কবেই আছেন, জোডহাত কবেই সকলের মাঝখান দিয়ে নিয়ে চললেন আমাকে। গদি-বরের মধ্যে পদার্পণ করলাম, সাজসজ্জা দেখে মালুম হ'ল মালিকের ধন-দৌলতের বহর। বিশ হাত লম্বা আর হাত পনেরো চওড়া

ঘরখানার চার দেওয়ালের মাথা জুড়ে পাশাপাশি টাঙানো হয়েছে বড় বড় ছবি। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনও ঘটনা বাদ নেই। তার সঙ্গে কিষণ ভগবানের রাসলীলা কয়েকখানি। ঘর জুড়ে এক হাত উঁচু গদি পাতা, যার ওপর বসে এঁরা ধর্ম আশ্বাদন করতে করতে ব্যবসা করেন বা ব্যবসা করতে করতে ধর্ম আশ্বাদন করেন। সেই গদির মাঝখানে কার্পেটের আসন বিছানো হয়েছে। আমার কাদা-মাথা আটকাটা শ্রীচরণ দু'খানি নিয়ে দুধের মত সাদা গদি মাড়িয়ে গিয়ে এসতে হবে সেই কার্পেটের আসনে।

ফকড়োচিত বেপরোয়া ভাবটুকু বজায় রেখে তাই কবলাম, বসলাম গিয়ে কার্পেটেব আসনে। অনেক দূবে গদির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সকলে প্রণাম কবতে লাগল। এক ধারে দাঁড়িয়ে শ্রেষ্ঠজা চাপা গলায় একে ওকে কাকে হুকুম দিচ্ছেন। বেশ বড় গোছেব একটা কিছু আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু কি সেটি?

নির্বিকার ভাবটি বোল আনা বজায় বেখে, চোখ বন্ধ করে, মোজা হয়ে বসে রইলাম গদির মাঝখানে। জানবাব জন্তে য'হ মন ছটফট করুক, বাইরে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলেই সব মাটি। নির্লিপ্ত অনাসক্ত নিকাম মূল্যপুরুষ হচ্ছে জাত-ফকড়, সেহ গুণগুলি বজায় রাখতেই হবে। নয়ত এত ভক্তি শ্রদ্ধা ভয় এসবের কোনও মূল্যই থাকে না যে। সময় যখন হবে তখন সবই জানা যাবে, এই বলে মনকে দাব'ড দিলাম।

এহ বকমত হয়। এইভাবে অসংখ্যবার ফকড়ের ভাগ্য ফকু'ড কবে। আচমকা বানায় রাজাব-রাজা, স্বাবার চক্ষু না পালটাতেই আছাড় মারে পথের ধূলয়। ভাগ্যের এহ ফাজলামিটুকু যতদিন না ঠিক মুগস্থ আব ধাতস্থ হয়ে যায়—ততদিন মানুষ কুলান ফকড় হ'ল পারে না।

একখানি দু'খানি করে অনেকগুলি গাড়ি এসে জমা হ'ল বাড়ির সামনে। শ্রেষ্ঠজারা নেমে এসে আমার চার পাশে আসন গ্রহণ করলেন। মস্ত ঘোমটা টেনে শেঠান'রা চলে গেলেন বাড়ির ভেতর। গুজগুজ ফুসফুসে বাতাস ভাবী হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করবার উপায় নেহ মৌনীবাবার।

অবশেষে কমলা রঙের কাপড় হাতে ব্রজকিষণবাবু উপস্থিত হলেন। আমার বস্ত্র পরিবর্তন করতে হবে। হাতে নিয়ে দেখি সিন্ধের তৈরী মহামূল্যবান বামিজ লুঙ্গি দু'খানি। ওই জাতের কাপড়ের মূল্য জানা ছিল। অন্ততঃ দশ টাকা দাম হবে সেই হাত-ছয়েক করে লম্বা দু'খানি কাপড়ের। তা হোক, তাতেও ঘাবড়ালে চলবে না।

একান্ত তাচ্ছিল্য-ভরে অত জোড়া চোখের সামনে কাপড় চান্দর অঙ্গে ধারণ

করে ফেললাম। অস্বর্ধান করল ফকডের ছেঁড়া শ্যাকড।

তখন এল স্বগন্ধি তেল আর আতর। ছ'জন চাকর আমার ফাটা চট্টা ছুঁখানিতে তেল মাখাতে বসল। কক্ষ জটপাকানো চুলে অনেকটা আতর ঢেলে দিলেন স্বয়ং শেঠজী। হলুদ রঙের চন্দন খাবডানো হ'ল কপালে। নিবিষ্কার ভাবে সজ্জ কবতে হ'ল সমস্ত আদব—মহাপুরুষ যে।

তখন শেঠজীরা একে একে উঠে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলেন এক গাদা নোট টাকা জমে উঠল সামনে। কিছ্র সেদিকেও ফকড নজর দেবে না।

শেষে আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল বাড়ির ভেতর। এবার শেঠানীরা ভক্তি দেখাবেন। স্বতরাং ছুঁচোখ বন্ধ করে বসে বইলাম। আর এতবাম মাথায় আতব ঢালা হ'ল, কপালে হলুদ রঙের চন্দন দেখুয়া হ'ল, পায়ের ওপর প্রণামী রেখে সকলের প্রণাম করা হ'ল।

দম প্রায় ফাটবার উপক্রম তখন। এদের এত হিমালয়ে মত ভক্তির চেউটা হঠাৎ ঠেলে গুঁথবার হেতুটি কি। হাড়ডুখু খেয়ে মাংস যাব যে ভকত অতল সাগরে? কি এমন হ'ল যার দরুন এঁরা পাগল হয়ে উঠবেন?

ওধারে তখন স্বয়ং শেঠজী আবার উগড় হুয়েছেন একখানি রূপার থালা হাতে নিয়ে। থালাখানি সামনে নামাতে দেখে, তার ওপর এক ছড়া সোনার হার। ব্রজবিষণ-পত্নী এগিয়ে এসে হারটি আমার পায়েল ওপর বাহুলেন শেঠজী তুলে নিয়ে গলায় পরিয়ে দিলেন আমাব। পাপের এল প্রণাম এক মিল সন্দেশ। একখানি সন্দেশের কোণ ভেঙে মুখে ফেললাম। শেঠ-পত্নী থালাখানি মাথায় তুলে নিয়ে চলে গেলেন প্রসাদ বিবরণ কবণে।

তখন ফাঁকা হয়ে গেল ঘর। দরজা বন্ধ কবে শেঠজী এসে বসলেন আমাব সামনে। তার মুখ দেখে বুঝলাম, বিশেষ একছু জিজ্ঞাসা আ।

একবার ওপর দিকে তাকিয়ে, একবার ঘাড় চুলকে নিয়ে, তাবপব ডান হাতের হীরে-বমানো আংটিটি নিরাস্তর কবণে কবতে বিনীতভাবে বললেন শেঠজী—“মহারাজ, ছুঁএকটি কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাব কি?”

তাকে একদম স্তম্ভিত করে আমি পাল্টা একটি প্রশ্ন কবে বসলাম—“আমাকে নিয়ে এত সমারোহ লাগিয়েছ কেন শেঠ?”

মোনীবাবা এত স্পষ্ট করে হঠাৎ কথা বলে ফেলবেন, তা শেঠজীব ধারণায় ছিল না। আমতা-আমতা করে বললেন—“সবই তো আপনি জানেন মহারাজ। আজ ভোরে আমার স্ত্রী মনে মনে আপনার কাছে মানত করে এসেছিলেন, যদি আমরা আমাদের হারানো ছেলের সংবাদ পাই, তাহলে আপনাকে পূজা করব।

এক ঘণ্টার মধ্যে দেশ থেকে ‘তার’ পেলাম যে, ছেলে বাড়ি ফিরেছে। পাঁচ বছর তার কোন পাত্তা ছিল না। হাজার হাজার রূপেয়া খরচ হয়ে গেল কিন্তু এতটুকু সংবাদ পৰ্যন্ত আমরা পাইনি তার। আপনি রূপা করলেন, আমার গুদামের সামনে ধুনি লাগালেন, কি খেয়াল হ’ল শেঠানীর, সে গিয়ে আপনার কাছে মানত করে এল আর আমার হারানো ছেলে ফিরে পেলাম। এ সবই আপনার রূপা, সাক্ষাৎ অবতার আপনি। রূপা ক’রে যখন অধমের ঘরে পদার্পণ করেছেন তখন হু’একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে সেবককে কৃতার্থ করুন।”

হাত তুলে তাঁকে থামলাম। বললাম—“শেঠ, তুমি ভক্ত, তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। তোমার প্রশ্ন যে কি তাও আমার মালুম আছে। আজ উত্তর পাও না, যা জানতে চাও তিন দিন পরে জানতে পারবে। আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বললাম, তোমায় রূপা করলাম, এ তুমি কাউকে বলো না—সাবধান!”

হাত জোড় করে বললেন শেঠজী—“নিশ্চয়ই, কেউ কোনও কথা জানতে পারবে না মহারাজ। কিন্তু আমার এক ভিক্ষা আছে—আপনি আব পায়ে হেঁটে শহরে ঘুরতে পারবেন না। আমাকে যখন রূপা করেছেন তখন আমার এ আশ্বাস-টুকু আপনাকে রাখতেই হবে। একখানা গাড়ি আপনার জন্তে রাতদিন হাজির থাকবে। যখন সেখানে যাবেন সেই গাড়িতেই যাবেন। আমার চাকর দরওয়ান সঙ্গে যাবে আপনার। যে ক’দিন এই শহরে দয়া করে থাকবেন, সে ক’দিন সেবকের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করতেই হবে।”

মনে মনে হাসলাম। আমার ওপর পাহারা বসাতে চায় বেনিয়া। ফুডুৎ করে উড়ে না যায় পাখী—তাই এত সাবধনতা। কিছু ক্ষতি নেই, প্রয়োজন হলে বেমালুম হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাবে ফক্কড।

আধ ঘণ্টা পরে সোনার হার গলায় দিয়ে, কমলা রঙের বামিজ কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে, শেঠ ব্রজকিষণলালের চক্চকে মোটরে গিয়ে উঠলাম। ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল সকালের সেই দরওয়ানজী, হাতে একটা লাল থেরোর থলি নিয়ে। গুটার মধ্যে নোট-টাকা বোঝাই, দরাজ হাতে প্রণামী দিয়েছেন শেঠ-শেঠানীরা। ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন শেঠজী—শহরের সব ক’খানি ঠাকুর দেখিয়ে আনতে হবে। গাড়ি ছুটল।

স্বপ্ন!

যে পথের ওপর দিয়ে তিন মিনিটে এক মাইল পার হয়ে চলেছি, কাল সন্ধ্যার পরে এই পথে যখন ফিরছিলাম ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে, তখন কি মনের কোণেও একবার উদয় হয়েছিল যে, রাত পোহালে এই পথের ওপর দিয়ে ঘণ্টায়

বিশ মাইল বেগে ছুটে যেতে পারব! কাল এই পথ ফুরোতে চাচ্ছিল না কিছুতেই—আর আজ চক্ষের নিমিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঐ যে কোণের বটগাছতলায় বসে বুড়িটা শাক-পাতা বেচছে, ঐ সেই চায়ের দোকানটা, যার সামনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দু’দিন আমি চা কিনে খেয়েছিলাম আর ঐ সেই গুঁটাকি মাছের দোকানটা। দোকানটার সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পেটেব নাড়িভূঁড়ি উঠে আসবার যোগাড় হত। হুস হুস করে উল্টো দিকে ছুটে যাচ্ছে সব। স্বপ্ন, একেই বলা চলে নির্জলা স্বপ্ন—যা অল্প কাবও বরাতে কখনও সত্য হয়ে ওঠে না, একমাত্র ফকডের বরাত ছাড়া।

প্যাণ্ডেলের সামনে থামল গাড়ি। দৌড়ে এল কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক। ‘ভড় সারিয়ে খাতির করে এগিয়ে নিয়ে চলল প্রতিমার সামনে। কৰ্ত্তা ব্যক্তির সামনে পিছন ধিবে ফিবেয়ে দিয়ে গেলেন মোটাবে। খাতিরের চূড়ান্ত।

প্রতিমা সামনে পৌঁছে হাট গেড়ে প্রণাম করলাম। দরোয়ানজী বোলাটি, সামনে ধবলে। তাব ভেতর হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো টাকা বার করে ছুঁড়ে দিলাম দেবীর সামনে। বনবান করে উঠল চারিদিক। ফিস্‌ফিস করে কখন দরোয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করছেন সকলে—“কে ইনি? কে এই মহাপুরুষ?”

“শের ব্রহ্মবিশাল হবস্থ রামদাসবাবুর গুরুজী মহাবাজ?” চোখে মুখে ভক্তি নয়, একটা যেন আতঙ্ক ফুটে উঠল সকলের। আর কিছু জিজ্ঞাসা সরবার সাহসই হ’ল না কাবও। বাপ্‌সু—কত বড় মানুষের গুরু। গুরু সম্বন্ধে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করাও হয়ত অমার্জনীয় অপবাদ হয়ে দাঁড়াবে!

একে একে তিনটি প্রতিমা দর্শন করে শেষে গাড়ি এসে দাঁড়াল সেই প্যাণ্ডেলের সামনে—কাল অনেক ঘড়া জল তুলে বেখে গেছি যেখানে, সেই বাড়ির দরজায়। ছুটে এলেন স্বয়ং স্বরেশ্বরবাবু সম্পাদক মশাই। না জানি কোন্ মহামাত্রা অতিথি এলেন দয়া করে দেবী দর্শন করতে চক্‌চকে গাড়ি চেপে! ড্রাইভারের পাশ থেকে নেমে দরোয়ানজী পেছনের দরজাখুলে ধরলে। মাথা নিচু করে আমি নামলাম।

সামনেই স্বরেশ্বরবাবু, হাসি-হাসি মুখ করে দু’হাত কচলাচ্ছেন। আমি মুখ তুলতেই ঝপ্ করে তাঁর মুখের হাসি উবে গেল! গোল গোল চোখ দু’টি কপালে উঠে গেল একেবারে! নিচেকার ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল, হাঁ করে এক পায়ে সরে দাঁড়ালেন তিনি। যে ছোকরাটি কাল আমার হাত চেপে ধরেছিল, সেও ছুটে এল হস্তদস্ত হয়ে। সামনা-সামনি পড়েই একটি উৎকট বিষম খেল গলায়—আর সেই সঙ্গে এক বেসামাল হোঁচট পায়ে। কোনও বকমে হাসি চেপে ধীর পদক্ষেপে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়লাম।

পূজা আরম্ভ হয়েছে। পুরোহিত তন্ত্রধারক আপন আপন কর্মে ব্যস্ত। জান পাশে বাঁশের ওধারে বসে আছেন কয়েকজন ভদ্রমহিলা। তাঁদের কাপড়ের খসখস শব্দ আর গহনাব আওয়াজ কানে এল। আমার অন্ধ-বন্ধের শব্দও কিছু কম হচ্ছে না। গলায়-ঝোলানো সোনার হারটাও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে সকলে। বহুমূল্য আতরের গন্ধে তো প্যাণ্ডেল ভরে গেছে। হাঁটু গেড়ে, অত্যন্ত ভক্তিভাবে বেশ অনেকটা সময় নিয়ে, প্রণাম করলাম। দরওয়ান খলিটা সামনে এগিয়ে ধবলে।

হুঁহাত পুরে এক আজলা টাকা তুলে নিলাম। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বুকের কাছে ধরে বইলাম হুঁহাত ভর্তি টাকা। তারপর যেন পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি, এইভাবে জোড়-হাত মাথাব ওপর তুলে ফেলে দিলাম টাকাগুলো বাঁশের ওধারে। এইভাবে বাব বাব তিনবার। টাকা পড়ার বনবন শব্দে যে যেখানে ছিঁপ ছুটে এল। ভয়ানক হাসি পাচ্ছিল—না জানি মা দুর্গা কি ভাবছেন এখন মনে মনে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, মাও হাসছেন মুখ টিপে—আমাব কাণ্ড দেখে। আবাব নত হয়ে এন্ট প্রণাম কবে উঠে ফিবে চললাম কোনও দিকে না চেয়ে। পিছনে চলল এক বিরাট ভাঁড়। বহুবার এক কথা বলতে হচ্ছে দরওয়ানজীকে—শেঠ ব্রজকিষণলালের গুরুজী মহারাজ।

গাড়িতে ওঠবার আগে স্ববেশ্বর তাড়াতাড়ি পায়ে ধুলো নিলেন। ছডোড়ি লেগে গেল পায়ে ধলোর জগ্গে। ক্রক্ষেপ না ববে মোটরে গিয়ে উঠলাম। মোটর চলতে আরম্ভ করল। হাসিতে ওখন আমার পেট ফুংছে। ওঁগা এখন যা বলাবলি কবছেন, তা যদি শুনে পেলাম। জ্ঞান তুণিয়ে, শতবাক্তি বহয়ে, যে মহাপ্রবাহ করে ফেলেছেন স্বরেশ্বর, তার জগ্গে হযত এখন নিজের চুল ছিঁড়ছেন। নিশ্চয়ই সম্পাদক মশায়ের গোঁড়া ভক্তরা এতক্ষণে মারমুখো হয়ে উঠেছে তাঁর ওপর। হায়—সম্পাদক হবার কি চরম বিভ্রম্না!

হঠাৎ গাড়ি থামল। সঙ্গেসঙ্গে এক ঝাঁকানি খেলাম। চোখ তুলে দেখি, গাড়ির সামনে পড়েছে একটা মেয়েমানুষ। রাস্তার দুঁধার থেকে অনেক লোক মার মার করে তেড়ে আসছে তার দিকে। নজর পড়ল স্ত্রীলোকটির মুখের ওপর। আঁতকে উঠলাম একেবারে।

হুঁজুন পুলিশ তার দুঁহাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে সামনের রাস্তা সাফ করে দিলে। বুক-ফাটা আর্ডনাদ করছে সে। গাড়ির পাশ থেকে কে বলে উঠল, “খুনী মেয়েমানুষ, খুন করে পালাচ্ছে! পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা নয়। এইবার বাছা টের পাবে খুন করার মজা।”

গাড়ির ভেতর এক কোণে মুখ লুকিয়ে বসে রইলাম। আমার বুকের মধ্যে যা মারতে লাগল সেই অসহায় আত্মনাদ। আমার দেওয়া নতুন কাপড়-চাদর পরে আছে সে। একবার মাত্র দেখতে পেলাম তার চোখের দৃষ্টি। কি ভীষণ, কি নিদারুণ অসহায় সেই দৃষ্টি, যেন দিশাহারা হয়ে কাকে খুঁজছে।

ভয়ে কুঁকড়িমুঁকড়ি মেরে বসে রইলাম গাড়ির কোণে। কি সর্বনাশ—এ নতুন কাপড়-চাদর কেন মরতে দিতে গেলাম ওকে? কাপড়-চাদরের খোঁজ নিয়ে নিশ্চয়ই পুলিশ সব জানতে পারবে। আমার সঙ্গে ওর কি সম্বন্ধ, তা জানবার জন্তে তখন পুলিশ আসবে আমার কাছে। আমার নামে পুলিশের কাছে যে কি বলবে নচ্ছার মেয়েমানুষটা তাই বা কে জানে। পুলিশ আমাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করবেই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, খামকা ক একটা জঘন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম।

কিন্তু কাকে ও খুন করে পালাচ্ছে? খুন সে কবেছে নিশ্চয়ই। তার চেহারার অবস্থা দেখে আমারও সন্দেহ হয়েছিল যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে এলো সে। ও-রকম মেয়েমানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। খুন, জখম, গলাকাটা, কিছুই ওই জাতের স্ত্রীলোকের পক্ষে আটকায় না। চুলোয় যাক গে, যা খুশি কবে মকক, কিন্তু এখন আমিও যে জড়িয়ে পড়ব সেই কাপড়-চাদরের জন্তে। কলেঙ্কারি হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি?

সব চেয়ে মুখস্থ আছে যে উপায়টি, সেইটিই সর্বপ্রথম মগজে উদয় হ'ল। পাটগুদামে যাবার রাস্তার মোড়ে গাড়ি থামতে ইশারা করলাম দরোয়ানের পিঠে ঠেলা দিয়ে। এখন যত শীঘ্র পারা যায় মহাপুরুষকে মহাপ্রস্থান কবতে হবে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে।

যেখানে পাতা ছিল আমার ছেঁড়া কব্বলের টুকরো, সেখানে পৌছে আর চিনতেই পারলাম না জায়গাটাকে। ইতিমধ্যে আগাগোড়া ভোল ফিরে গেছে। মস্ত একটা রঙিন চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে সেখানে। ধূনিব জন্তে বড় বড় কাঠের কুঁদো এনে জমা করা হয়েছে। একখানা বেঁটে তক্তাপোশ পেতে তার ওপর নতুন কব্বল আর কার্পেটের আসন বিছানো হয়েছে। আশপাশ সাফ করে ফেলবার জন্তে ঝাড়ু কোদাল হাতে লেগে গেছে কয়েকজন। ব্রজকিষণবাবুর গুরুজী মহারাজ বেশ কিছুদিনের জন্তে ধুনি। জেলে তিষ্ঠোবেন এখানে, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই সব তোড়জোড় চলেছে।

চলুক—আমার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই তাতে। কিন্তু আমাকে এখন খুঁজে বার করতে হবে ফক্কড়ের আদি ও অকৃত্রিম সহৃদয়, সেই ছেঁড়া ছাকড়া দু'খানিকে।

এই মহামূল্য চাদর-কাপড় জড়িয়ে সরে পড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। বাস্তায় নামলে এই পোশাক অজ্ঞেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গলার হার-ছড়াটার হাত থেকেও গলাটা বাঁচানো প্রয়োজন, নয়ত এটার জন্তেই পড়তে হবে পুলিশের থল্লরে।

সোজা গিয়ে ঢুকলাম শ্রীহৃন্মানজীর বেঁটে মন্দিরে। কাছা দিয়ে, খাটো গামছা সঁটে পরে, আড়াইমিনি পুকত মশাই একথুরি তেল-সিঁদুর গোলা নিয়ে প্রভুর অঙ্গ-সেবা করছিলেন তখন। সসন্ত্রমে সরে দাঁড়ালেন এক পাশে। গলা থেকে সোনার হারছড়া খুলে নিয়ে বজ্রবজ্র মহারাজের গলায় পরিয়ে দিলাম। তারপর খুব ভক্তি-ভরে একটা প্রণাম করলাম মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে।

“জয় ভগবান রামচন্দ্র-ভকত বজ্রবজ্র মহারাজ !”

আকাশ-ফাটা চিংকার উঠল। পুরুতেরও চক্ষু তখন চড়ক গাছে উঠেছে। সোনার হারছড়া ঠাকুরের গলায় চাপিয়ে দেব, এতটা ভয়বহ ভক্তি তিনি মাশা করেননি। তেল-সিঁদুরে খুবি ফেলে সেই হাতেই তিনি আমার গোড় পাকড়ালেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকেও কৃপা কবে বসলাম। গা থেকে চাদরখানি খুলে তাঁর উর্ধ্বাঙ্গে জড়িয়ে দিলাম। মৌনীবাবা না হলে এই বলে তাঁকে আশীর্বাদ করতাম যে, নিম্নাঙ্গে খাটো গামছা সঁটে ঠাকুর-সেবা করবার প্ররুতি থেকে যেন তিনি মুক্ত হন। কারণ যত বড়ই বজ্রবজ্র-ভক্ত হোক তবু মানুষ মানুষই। স্তববাং সব কিছু শালীনতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

হঠাৎ আর একটি মতলব খেলে গেল মাথায়। এই পুকত-পুঙ্খবই তো আমার মুক্তি দিতে পারেন—আমার নিম্নাঙ্গের বার্মিজ লুঙ্গির বেটন থেকে। শালীনতা গোপন্য পাঠিয়ে, এতটুকু দ্বিধা না করে, কোমর থেকে খুলে সেখানি পুরুতের কোমরে জড়িয়ে দিলাম। দিয়ে শুধু নেংটি-পবা অবস্থায় বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। বিরাট হৈ-টৈ লেগে গেল। কেউ কি কখনও দেখেছে নাকি এতবড় ত্যাগী মহাপুরুষ! তৎক্ষণাৎ শেঠজীর কাছে সংবাদ জানাতে লোক ছুটল—সর্বস্ব দান করে গুরুজী মহাবাজ আবার যে কে সে-ই হয়ে বসে আছেন। এক দরওয়ানজীর কাঁধে ছিল একখানা গামছা, সেখানি টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে আসনে গিয়ে বসলাম। তাড়াতাড়ি ভক্তরা কলকেয় আগুন চাপাতে লেগে গেল।

কিন্তু তারপর ?

কপালে হাত দিয়ে বসে উপায় ঠাওরাতে লাগলাম। সহজ নয়, এত জোড়া চোখের সামনে থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। এতক্ষণে পুলিশ নিশ্চয়ই খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই মানুষটিকে, যার কাছ থেকে খুনে মেয়েমানুষটা নতুন কাপড়-চাদর পেয়েছে। যে জামা-কাপড় পরে রাত্রে সে ঘন করেছে,

সেগুলো ভোরবেলাই পালটে ফেলবার জন্তে নতুন কাপড়-চাদর পেল কোথা থেকে সে? খুনের প্রমাণ রক্ত-মাখা কাপড়-জামা লোপাট ক'রে ফেলতে কে ওকে সাহায্য করলে? সেট লোকটির সঙ্গে খুনার সম্বন্ধট বা কি? তারপর যখন জানতে পারবে, কাল আমি ওদের বাসায় গিয়েছিলাম আব আমিই ওকে পালিয়ে আসতে প্ররোচনা দিয়েছিলাম, তখন আমাকে খুনের সঙ্গে জড়াতে পুলিশের এতটুকু দ্বিধা হবে না।

হয়ত এখন পুলিশ ব্রজকিষণবাবুর কাছে বসে নানা কথা দ্বিজ্ঞাসা করছে আমার সম্বন্ধে। তাবপর তাঁকে সঙ্গে নিয়েই এখানে আসবে আমায় গ্রেপ্তার করতে। তখন কি বুৎসিত পাণ্ডট না হবে এখানে! এতগুলি সাদাসিধে মানুষের মনে কি আঘাতট না লাগবে। এক বেটা ভগ্নকে নিয়ে গুরা মাতামাতি করেছে, একটা খুনে মেয়েমানুষের সঙ্গে যার যোগাযোগ তার পায়ে গুরা মাথা লুটিয়ে দিয়েছে, সাধু সেজে একটা ঝালু বদমাশ ওদের ঠকাচ্ছিল এতদিন, এই সব বৃত্ততে পেরে রাগে ক্ষোভে অপমানে মেহ লোকগুলির চোখ-মুখের অবস্থা যে কত-
 ১. ফল হয়ে উঠেছে তখন, তা কল্পনা করে শিউরে উঠলাম।

বাটবে নিবিকার ভাবটি বজায় রেখে কলকে হাতে নিয়ে প্রসাদ করে দিলাম। এক লোটা ভাঙ-ঘোটা এনে নামল সামনে। লোটাটা উঁচু করে তার ভেতরের পদার্থ খানিকটা গলায় ঢেলে ওদের ফিলিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ একটা এসপার-ওসপার কববার জন্তে তৈরী হলাম। এক পাশে বসানো ছিল জল-ভর্তি আমাব গোব্দানো পেতলের লোটাটি, সেটি হাতে নিয়ে চললাম নদীর দিকে। একবার যদি নামতে পাবি নদীতে, তারপর দেখা যাবে এবা আমার পাস্তা পায় কেমন করে। যতক্ষণ পাবব সীতরাবে, তারপর যা হ'ছে কপালে। শাম্পান-নৌকো-জাহাজ যে কোন একটায় আশ্রয় পাবই, তারপর আরাকান, বর্মা বা আরও দূরে কোথাও গিয়ে পৌছব। নয়ত সোজা যমের বাড়ি গিয়ে উঠব। তবু এদের সামনে ধরা পড়ে এদের মনে আঘাত দেব না কিছুতেই। আমার মত একটি আস্ত ঈশ্বরের অবতারকে হাতের মুঠোয় পেয়েও হারাতে হ'ল বলে সবাই চিরকাল হায় হায় করতে থাকুক। এদের ভক্তি দেখানো সার্থক হ'ক।

গুরুজীকে লোটা হাতে নদী বা জঙ্গলের দিকে যেতে দেখলে ভক্তরা পিছু নেয় না। ভাগ্যে এই নিয়মটি এখনও চালু আছে জগতে! স্বন্দর্য ভক্তরা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাঙের লোটা আর কলকেতে ম'গুল হয়ে রইল, আমি মহাপুরুষ-জনোচিত গুরু-গম্ভীর চালে লোটা হাতে সরে পড়লাম। পাটগুদাম ঘুরে নদীর পাড়ে পৌছতে হ'মিনিট লাগল না। একবার পিছনে ফিরে দেখে নিলাম, কেউ আসছে কিনা

পিছু পিছু। কেউ না। তরতর করে নেমে গেলাম জলের ধারে। এইবার দুর্গা নাম নিয়ে একটি ঝাম্প-প্রদান—বাস!

সামনে থেকে কি একটা আওয়াজ আসছে না? ভট্ ভট্ ফট্ ফট্ করে একখানা মোটর-বোট এসে থামল সামনে। এ-সময়ে এখানে এ আপাদ আবাস জুটল কোথা থেকে? আর কি জায়গা ছিল না কোথাও বোট ভিড়োবার? জনা তিনেক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা নামলেন। এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। ওদের একজন বললেন, “এই ঘাটেই নামতে হবে, ভাল করে জেনে এসেছ তো?” আর একজন জবাব দিলেন, “হ্যাঁ-হ্যাঁ—এই তো সামনেই ব্রজকিষণবাবুর গুদাম। গুদামের ওপাশে সেই ছোট্ট হুম্মানজীর মন্দিরের সামনে তাঁর আসন পড়েছে। সেই কথাই তো বলে দিলেন সুরেশ্বরবাবু।”

ভদ্রমহিলাটি বললেন—“বোটে না এসে গাড়িতে এলেই হত। শেঠজীর গদিতে খোঁজ নিয়ে আসা যেত।”

“আবার কে যায় অত ঘুরতে, সপ্তমী পূজোর দিন, এতক্ষণে লোকের ভিড়ে গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে রাস্তায়। এই ভাল হ’ল, চট করে পৌঁছে গেলাম।”

মহাপুরুষ দর্শন করতে ওঁরা ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন আমার পাশ দিয়ে। চট্টগ্রাম বন্দরের নাম খোদাই-করা পেতলের তকমা-আঁটা একটি চাপরাসী বসে রইল বোটের সামনে। বন্দরের হোমরা-চোমরা কর্মচারীরা চলেছেন শেঠজীর গুরু দর্শন করতে। যান—ততক্ষণে এখানে গুরুজী অন্তর্ধান করুক কর্ণফুলীর জলে।

কিন্তু বোটের পাশে জলে নামা গেল না। আরও এগিয়ে চললাম ডান দিকে, চাপরাসীর নজর এড়িয়ে জলে নামতে হবে।

এগিয়ে যাচ্ছি আর পিছনে ফিরে দেখছি। বোটের ওপর বসে লোকটি চেয়ে আছে আমার দিকে। কাজেই আরও অনেকটা এগিয়ে যেতে হ’ল। সেইখানে সামান্য ঘুরে গেছে নদী। ভালই হ’ল, বাকটা ঘুরে গিয়ে চাপরাসীর নজরের আড়াল হয়ে জলে নামব। জোরে পা চাললাম।

বাক ঘুরতেই চোখে পড়ল, জলের ধারে নামানো হচ্ছে একখানা দুর্গা-প্রতিমা।

এ কি কাণ্ড! মহাসপ্তমীর দিন দুপুরবেলা দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দিচ্ছে কেন?

ভুলে গেলাম নিজের বিপদের কথা, ভুলে গেলাম যে আমাকে তখনই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জান-মান বাঁচাতে হবে, ভুলে গেলাম যে আমি একটি মৌনীবাবা। দৌড়ে গেলাম প্রতিমার কাছে। দশ-পনেরো জন, ভদ্রলোক

এসেছেন প্রতিমার সঙ্গে । জনা-আঠেক মুটে প্রতিমা নামিয়ে হাঁপাচ্ছে । সামনে থাকে পেলাম, তাঁরই হাত চেপে ধরে টেচিয়ে উঠলাম, “এ কি সর্বনাশ করছেন আপনারা ? আজ বিসর্জন দিচ্ছেন কেন মাকে ?”

এক ঝটকায় তিনি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রুখে উঠলেন, “দিচ্ছি বেশ করছি—তাতে তোমার কি ?”

ঠাঁকে ছেড়ে দিয়ে আব একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, “দয়া করে বলুন না মশাই, আজ মহাসপ্তমীর দিন কেন প্রতিমা ভাসিয়ে দিতে এসেছেন ?”

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—“সে কথা শুনে কি লাভ হবে তোমার ? আমাদের দ্বারা মাঘের পূজা হ’ল না, তাই ভাসিয়ে দিচ্ছি ।”

ওধার থেকে কে ভারী গলায় হুহুম দিলেন—“লেও, আভি উঠাও ঠাকুর ।”

দৌড়ে গিয়ে প্রতিমার কাঠামো আঁকড়ে ধরলাম—“না, কিছুতেই দেব না প্রতিমা তুলতে, আগে আপনাদের বলতেই হবে কেন বিসর্জন দিচ্ছেন আজ মাকে ?”

তেড়ে এসে একজন আমার ঘাড় চেপে ধরলেন, আর দু’জনে ধরলেন দুই হাত । টানাটানি হেঁচড়াইঁচড়ি শুরু হয়ে গেল । দু-এক খা পড়লও আমার পিঠে । দূর থেকে কে হুহুম দিলেন—“মাব বেটা পাগ্লাকে, আচ্ছা করে বেটাকে শিক্ষা দিয়ে দে, পাগলামি ছেড়ে যাক ।” সবাই ‘মার মার’ করে চেঁচাতে লাগলেন । এই সময়ে সকলের গলা ছাপিয়ে বাজরাই গলায় কে হুহুম দিয়ে উঠল—“আবে ক্যা হুয়া, ক্যা চল্ রহা উধার ?”

কোনও রকমে মুখ তুললাম । সঙ্গে সঙ্গে আবাব এক গর্জন—“আরে গুরুজী মহারাজকো—” আর কিছু আমার কানে গেল না । কিল চড় ঘূষির শব্দে, পরিভ্রাণি চিংকারে নিমেষেব মধ্যে নদীতীর কাঁপতে লাগল । বৈ বৈ শব্দ উঠল পাট-গুদামের দিক থেকে, লম্বা লম্বা লাঠি হাতে হুহুম-জ্বর চেলারা ওড়মুড় করে নেমে এলেন । বিসর্জন দিতে এসেছিলেন যারা, তাঁরা অন্তর্ধান করলেন, এক পাশে দাঁড়িয়ে মুটেরা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে তখন । আব বজ্রবল্লীর সাক্ষাৎ বংশধরেরা আমাকে আর প্রতিমাকে ঘিরে প্রচণ্ড বিক্রমে গর্জন করছে—“জয় দুর্গামাইঁকী জয় ।”

ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন শেঠ ব্রজকিষণলাল, তাঁর পিছনে পিল পিল করে নামতে লাগল মানুষ । মাডোয়ারী-গুটির যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় এসে গেলেন । চাকর-দরওয়ান-কর্মচারীদের মধ্যে কেউ বাকি রইল না আসতে । ওপরে দাঁড়িয়ে ঘোমটা ফাঁক করে মহিলারাও দেখতে লাগলেন ব্যাপারটা ।

থাকী-পর্য। বিশাল এক পুলিশ সাহেবও তাঁর অস্থচরদের নিয়ে নামতে লাগলেন। বৃকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। হায়, কেন মরতে প্রতিমা ধরতে গেলাম। এখন উপায় কি? ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, হাজারখানেক মানুষ ঘিরে রয়েছে। এতটুকু সম্ভাবনা নেই আর কোন চালাকি করবার। দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিমার কাঠামো ধবে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম মাটির দিকে চেয়ে।

চিৎকার করে গোলমাল থামালেন ব্রজকিষণবাবু। আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাও বেশি চোট লেগেছে কিনা? মাথা নাড়লাম।

তখন খোঁজ পড়ল, প্রতিমাখানি কাদের, কারা এনেছে প্রতিমা বিসর্জন দিতে। মুটেবা বললে, শহরের কোন বাবোয়ারি পূজার প্রতিমা এখানি। বাবুদেব মধ্য ঝগড়াবাঁটি হওয়ায় সকালবেলা পূজা শুরু হয়নি। যখন কিছুতেই ঝগড়াব নিষ্পত্তি হ'ল না, তখন একদল বাবু ক্ষেপে গিয়ে প্রতিমা তুলে আনলে নদীতে ডুবিয়ে দিতে, পূজার লেঠা চুকিয়ে দিতে একেবারে।

শুনে হাসব, না কাঁদব, ঠিক কবতে না পেবে ই। কবে চেয়ে বইলাম মাথের মুখের দিকে।

পুলিশ সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, “ঐ বাবোয়ারির ব্যাপারই ঐ বকম। প্রতিবারই কেলঙ্কারি হয় ওখানে। এবার একেবারে চবমে দাঁড়িয়েছে।”

ব্রজকিষণবাবু সাহেবের পরিচয় দিলেন আমায়। সাহেব হচ্ছেন ডি. এস. পি., ব্রজকিষণবাবুর বিশেষ বন্ধুলোক। বড় ভক্ত মানুষ, মহাপুরুষ দর্শন কবতে এসেছেন। সাহেবের বাড়ি বেহাবে। নাম তেওয়ারী সাহেব।

তখন তেওয়ারী সাহেব মাথার টুপি খুলে, পাশের লোকের হাতে দিয়ে, কোনও রকমে নিচু হয়ে আমার পায়ে হাত ঠেকালেন। যাবা মোটর-শেট থেকে নেমে ওপরে গিয়েছিলেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তেওয়ারী সাহেবের পেছনে। তাঁরা বললেন, “বোট থেকে নেমেই মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি আমরা। ওঁকে চিনতাম না, আর তখন বুঝতেও পাবিনি, কেন উনি সে-সময় নদী ধরে একলা দাঁড়িয়ে ছিলেন।”

মহিলাটি বললেন, “অন্তর্ধামী না হলে কি কবে উনি জানতে পারলেন যে, এ-সময় ওখানে কেউ প্রতিমা নিয়ে আসছে?” পুলিশ সাহেবকে পাশ কাটিয়ে, সামনে এসে তিনি আমার পায়ে মাথা ঠেকালেন।

তখন আর এক চোট রৈ-রৈ উঠল, “জয় গুরুজী মহারাজকো জয়।”

শেঠ ব্রজকিষণলাল হুকুম দিলেন—“নিয়ে চল প্রতিমা, আমরা পূজা করব।

সাক্ষাৎ গুরুজী প্রতিমা কেড়ে নিয়েছেন। কাজেই পূজা করতেই হবে। দুর্গা মাই রূপা ক'রে শেষে এসেছেন আমাদের কাছে।”

বার বার আকাশ বাতাস কাঁপতে লাগল জয়ধ্বনিতে। দুর্গামাইকী জয়। তুলে আনা হ'ল প্রতিমা, এনে বসানো হ'ল সেই চাঁদোয়ার তলায়। পণ্ডিত পুরোহিত খুঁজে আনতে ছুটল গাড়ি নিয়ে কয়েকজন। যিনি এখনও উপবাস করে আছেন, তাঁকে আনতে হবে যে-কোনও উপায়ে। পু'লশ লাইনে পূজা হচ্ছেল। তেওয়ারী সাহেব বললেন—“এতক্ষণে বোধ হয় সেখানকার পূজা শেষ হয়েছে। মশুমী আছে রাত ন'টা পর্যন্ত। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি সেখানকার পণ্ডিত দু'জনকে। তারা গাজ এখানেও পূজা করুন। কাল অত্র ব্রাহ্মণ ঠিক করা যাবে।

মোটের ওপর যে কোন উপায়ে পূজা হওয়া চাই, এই হচ্ছে সকলের মন।

পরমাণ কি না হয়। ঢাক-টোল-কাঁদ-মানাই আধঘণ্টার ভেতর পৌছে গেল। বহু লোক নেগে গেল বাঁশ পু'তে। পাটগুদামের বড় বড় ত্রিপুর ঢাকা দিয়ে মস্ত বড় প্যাণ্ডেল খাড়া হয়ে গেল। নৃপাকার হ'ল পূজার উপচার। তিনজন উপবাসী ব্রাহ্মণ এসে, বারবেলা বাদ দিয়ে, মন্দির আগেই পূজা আরম্ভ করলেন। কেড়ে-নেওয়া দুর্গার পূজা দেখতে শহর স্বল্প মানুষ ভেঙে পড়ল। মস্ত বড় মেট বৈধে তার মাথায় নতবত বাজতে লাগল।

এলেন স্ববেশ্বরবাবু, এলেন শাঁদের পূজা মণ্ডলের সবাই। বাঁশ পু'তে মোটা কাছি দিয়ে ঘিলে গেলা হয়েছে আমার আসন। কাছির বাইরে দাঁড়িয়ে সকলে মহাপুরুষ দর্শন করে গেলেন। সহজ মহাপুরুষ নয়, সাক্ষাৎ মায়ের আদেশ পেয়ে প্রাণীমা বেড়ে এনেছেন। কিছু মহাপুরুষের কাছে যাবার অধিকার নেই কারও। এক ডজন পুলিশ আর এক কুড়ি দরোয়ান ঘিরে রয়েছে মহাপুরুষকে। নয়ত লোকের চাপে পিষে মারা যাবেন যে।

শীগেলেও বরং ছিল ভাল। নি ভয়ানক াদে পড়ে গেলাম। আজ হোক কাল হোক পুলিশ আসবেই, ধবে নিয়ে যাবেই আমাকে। কি ভয়ানক কাণ্ডই যে হবে এখন। হয়ত এরা মায়ের পূজাই দেবে বন্ধ করবে। একটা ঠক-জোচোরে যে প্রতিমা বিসর্জন দিতে না দিয়ে তুলে এনেছে—সে প্রতিমার পূজা করে অনর্থক পরমা নষ্ট করবে কেন এরা? ভাববে সকলে, প্রতিমা কেড়ে আনার মধ্যেও কিছু বদ মতলব ছিল আমার।

কিছু কোনও ক্রমেই আর একলা এক পা নড়বার উপায় নেই। লোটা খাতে নদীতে যাবার সময়ও চারজন দরোয়ান লাঠি ঘাড়ে করে সঙ্গে চলেছে। শেঠজীর জুম্ম—খবরদার যেন গুরুজী একলা কোথাও না যান। বলা তো যায়

না, মার খেয়ে যারা প্রতিমা ফেলে পালিয়েছে, তারা কোথাও ওৎ পেতে বসে থাকে।

নিরুপায় পল্লুর মত বসে রইলাম চুপ করে। ছিলিমের পর ছিলিম এল, এল লোটোর পর লোটো ভাঙ। ক্রমে ভিড় কমে এল। ব্রজকিষণবাবু আর কয়েকজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তখন এসে আমার সামনে আসন গ্রহণ করলেন। মাথের আরতি শেষ হ'ল। ব্রাহ্মণবা জল খেতে চলে গেলেন। এমন সময় দূরে দেখা গেল সেই পুলিশ সাহেবকে, আরও দু'জন থাকী-পরা অফিসার সঙ্গে করে গেট পার হয়ে এগিয়ে আসছেন। গেটের ওপর নহবত তখন মল্লার ধরেছে।

ডি. এস. পি. সাহেব সোজা এগিয়ে আসছেন। কেন আসছেন ঠাঁবা, তা আমার চেয়ে ভাল কবে কেউ জানে না। একবার মা-দুর্গার মুখেব দিকে চেয়ে দেখলাম। তাবপব চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। না, কোন উপায় আর নেই। এতগুলি লোকের মাঝ থেকে ছুটে পালাবার কথা চিন্তা করাও পাগলামি। এক মাত্র উপায় উবে যাওয়া। কিন্তু ফক্কড কপূর্ব নয। স্তববাং চোখ বুজে নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাঠ হয়ে বসে বইলাম।

ব্রজকিষণবাবু খাতির কবে আহ্বান করলেন তেওয়ারী সাহেবকে। জিজ্ঞাসা কবলেন—“এত দেরি হবার কাবণ কি?”

আসন গ্রহণ করে তেওয়ারী সাহেব বললেন—“পুলিশের চাকরি কবি জানেন তো শেঠজী? খুন খারাপি নোংরা ব্যাপার নিয়ে দিন কাটে। লেগেই আছে একটা না একটা হুজুং-হাক্কামা। বাল বাতে একটা লোক ভয়ানক জখম হয়েছে। সে এক জঘন্য ব্যাপার। তাই নিয়েই এতক্ষণ কাটল।”

অনেকেই এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা কবলেন—“কে লোকটা? সে জখম করলে তাকে?”

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, “মহাত্মাজী কি এখন ধ্যান লাগিয়েছেন?”

শেঠজী জবাব দিলেন, “প্রায়ই তো ঐভাবে থাকেন। বাবা এখন সমাধিতে আছেন।”

তখন চাপা গলায় বললেন তেওয়ারী সাহেব—“শহরের পশ্চিম দিকের বাবাজী পাড়ায় একটা বিশিষ্ট ব্যাপার ঘটে গেছে কাল রাত্রে। একটা মেয়েমানুষ এক বাবাজীকে কামুড়ে জখম করেছে। মেয়েমানুষটাকে আমরা আজ সকালে ধরে ফেলেছি। তার কাছ থেকে সেই সব বাবাজীদের কীর্তিকলাপ আমবা জানতে পেরোছি। সেই পাডাসুহু হারামজাদাদেব বেঁধে আনা হয়েছে। সব ব্যাটা নচ্চারের বেহুদ। একজনকেও সহজে ছাড়া হবে না। শুধু স্ত্রীলোকটাকে ছেড়ে

দেবার হুকুম হয়েছে। বড় সাহেব তাকে মোটা রকম বকশিশ করবেন। সেই জানোয়ারটা এখন হাসপাতালে আছে, যদি প্রাণে বাঁচে তাকে আমরা জেল খাটিয়ে ছাড়ব।”

তারপর আরও নিচু গলায় পুলিশ সাহেব শেঠজীদের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। কেন জখম করেছে, কি করে জখম করেছে, শরীরের কোন্‌খানে জখম করেছে। তাঁর জবাব আর আমার কানে গেল না।

চোখ খুললাম, চেয়ে রইলাম মা-দুর্গার মুখের দিকে। জল জল করছে মায়ের মুখ। একটা নরপুত্র পশুদের বলি হয়েছে জেনেই কি মায়ের মুখ অত উজ্জল? হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রাণ ভরে মাকে একটি প্রণাম করলাম।

মহাতিথি মহাষ্টমী।

প্রভাতের আলোয় ধরণীর বুকে জন্মগ্রহণ করেছে একটি দিন। কে জানে, কি আছে নবজাতকের ভাগ্যে? কি সঙ্গে নিয়ে এসে এঁট নতুন অতিথিটি, আজব আশঙ্কা না আশ্বাসের আলো? মাত্র অষ্টপ্রহর এর পরমাণু, এই সামান্য সময়-টুকুর মধ্যে কত একমের বল বিক্রম জাতির করবে এই ক্ষণজন্মা, তাৎপর্য আর একটি আগন্তকের জন্ত স্থান ছেড়ে দিয়ে অন্তর্ধান করবে বিশ্বস্তির অন্তরালে।

ফকুড কখনও স্বাগত জানায় না এদের, বিদায়ও দেয় না সমারোহ করে। কারণ এদের একটির সঙ্গে অপরটির কোথাও কোনও মিল নেই, জাত-কুল, মন-মেজাজ সবই বিভিন্ন ধরনের। এইটুকু ভাল কবে জানে বলেই ফকুডের অভিধানে চমক বলে কোনও কথা নেই। সহসা-অকস্মাৎ-হঠাৎ এই সব শৌখিন শব্দগুলি ভদ্র মাণ্ডবদের নিজস্ব সম্পদ। ফকুড জানে, তার জীবনের এই স্বল্পায়ু অতিথিদের কাছ থেকে তার ভিক্ষে করবার কিছু নেই। যা দেবার এবা দিয়ে যায়, আর যা নেবার তা নিয়ে বিদেয় হয়। এই দেওয়া-নেওয়ার ৮৭ পায় ফকুডেব কিছুমাত্র লাভ-লোকসান নেই।

রামকেলী ধরেছে সানাই।

বাঙলার মায়েদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ মহাষ্টমী তিথি। এই তিথিতে বাঙালী মা জগৎ-জননীর কাছে সন্তানের জন্তে কল্যাণ ভিক্ষা করেন—আয়ু দাও, যশ দাও, ভাগ্যা দাও আমার সন্তানকে, তাকে জয়দান করো মা—শ্রী দান করো। মহাতিথি মহাষ্টমীতে বাঙলার আকাশ-বাতাস শোধিত হয় মাতৃ-হৃদয়ের অমৃত-সিঞ্চে। তাই বাঙালী মরলেও বাঙলার প্রাণ কিছুতেই মরে না, বাঙালীর ক্ষয়যাত্রা কিছুতেই ব্যাহত হয় না।

সানাইয়ের স্বরে কেমন যেন নেশার আমেজ আছে। উঠি উঠি করেও উঠতে পারছিলাম না। শুয়ে শুয়েই হিসেব করে ফেললাম। আজ যেতে হবে ডি. এস পি. সাহেবের বাড়িতে। তাঁর বৃদ্ধা মা মাধু দর্শন করবেন। দুপুরবেলা স্বয়ং তেওয়ারী সাহেব এসে সঙ্গে নিয়ে যাবেন আমায়। তার আগে একবার বার হবে অল্প পূজা-মণ্ডলি ঘুরে আসতে। কিন্তু এরা কি ভাবে তাহলে? এখন অল্প কোথাও পূজা দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন কি আমার? সেধে এসেছেন মা আমায় কৃপা করতে, চোখের সামনে দশ দিক আলো করে বসে আছেন জগৎ-জননী, ঐকে ফেলে রেখে কেন আমি ছুটছি অল্প সব পূজা-মণ্ডপে?

যা খুশি ভাবুক এরা, তবু একবার আজ সকালে বার হতেই হবে। দেখে আসতেই হবে সেই দৃশ্যটা, যা এখানে দেখা ঘটবে না কপালে। দেখে আসব লালপাড় মটকা বা গরদের শাড়ি পরে ছেলে-মেয়ে সঙ্গে নিয়ে মায়েরা এসেছেন মহাষ্টমীর পূজা দিতে। গলায় আঁচল দিয়ে অঞ্জলি ৩৩৩ ফুল-বেলপাতা চন্দন-সিঁদুর নিয়ে আকুণ্ণ নয়নে চেয়ে আছেন দুর্গতি-নাশিনী দশপ্রহরণ-ধারিণী দশভূজা দিকে। এক অহুচ্চারিত অব্যক্ত মহামন্ত্র সাকার রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছে মহামায়ার সামনে। জননীর বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকে সেই মহামন্ত্র কোনও শাস্ত্রে, কোনও পণ্ডিতের পাজি-পুঁথিতে যা লেখা থাকে না।

শেষ পর্যন্ত উঠে বসতেই হ'ল। সানাইয়ের স্বরে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে শুয়ে মানসিক রোমন্থন করা আর চলল না। গান গাইতে গাইতে শেঠজী-বাড়ির মহিলারা উপস্থিত হলেন সেই ভোরবেলায়। তাঁদের সমবেত কণ্ঠে স্বমধুর স্বর মস্ত মস্ত ঘোমটার ভেতর থেকে বার হয়ে বামকেলীকে দেশছাড়া করে ছাড়লে।

আমার স্নানের দ্রব্যগুলি খালায় সাজিয়ে এনেছেন ওঁরা। স্তবরাং স্থির হয়ে বসে রইলাম আসনের ওপর। আবার আমার মাথায় ঢালা হ'ল সুগন্ধি তেল, আর মহামূল্য আতর। সকলেই ঢাললেন একটু করে। ফলে সেই সকাল বেলাতেই তেলে আর আতরে চুল-দাড়ি, নাক-মুখের এমন অবস্থা হ'ল যে নদীতে না গিয়ে আর উপায় রইল না। ওঁদের কর্ম শেষ হবে ওঁরা বিদায় হলেন। তখন আধ উজ্জন দরোয়ান সঙ্গে নিয়ে চললাম নদীতে। স্নান সেদে এসে দেখলাম, নতুন গরদের জোড় আর একবাটি হলুদ রঙের চন্দন-বাটা এসে গেছে। কাপড় চাদর পরে আসনে বসার পর দরোয়ানজীরা সেই চন্দনটা সব লেপে দিলে কপালময়। প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিলে গলায়। তাতেও মন উঠল না কারও, আরও খানিক আতর আনিয়ে গায়ে ঢেলে দিলে। তখন জ্যাস্ত ঠাকুর সঙ্গে

পুরোহিতদের পিছনে একথানা জলচৌকির ওপর বসে রইলাম।

কোনও দিকে এতটুকু অস্থিরতার ক্রটি নেই। ঘড়ি ধরে পূজা হচ্ছে। শহর-বিখ্যাত দু'জন পণ্ডিত এসেছেন পূজা করতে। তাঁদের আত্মীয়স্বজনরাই পূজার আয়োজন করে দিচ্ছেন। ওখানে নানা রঙের কাপড় দিয়ে সাজানো হয়েছে তোরণটি। তোরণের ওপর নতুনতরকারি সাজসজ্জাই হয়েছে সবচেয়ে অপকণ, সেখানে বসে সবচেয়ে নামজাদা বাজনাধারী প্রহরে প্রহরে রাগরাগিণী পালটাচ্ছে। এই নতুনতরকারি ব্যবস্থা আর একটিই পূজা-মণ্ডপে নেই। এই বাজনা হচ্ছে শেঠজীদের জাতীয় সম্পদ। পূজা-পার্বণ, বিশেষ মাদি সমস্ত উৎসবে নতুনতরকারি বাজা চাই। উৎসবের মান-মর্যাদার মূল্য নিকপণ হয় নতুনতরকারি সাজসজ্জার ওপর, আর তোরণের সামনে যে ক'জন বাজন্তানী বীর কোমবে তলোয়ার কুণ্ডলিগে গোফে তা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের পাগড়ি, মোনাল কবির কাজ-করা বিচিত্র পেশাক আর ঝুড়-তোলা নাগবার মস মস শব্দের ওপর। দু'জন পহেলা নতুনতরকারি পালোয়ান যাত্রাদলের প্রধান সেনাপতি মেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে নামাদের তোরণের সামনে, তাদেরই এমন একটা আত্মজ্ঞানক আবৃত্তির সৃষ্টি হয়েছে যে, কম কবে কেউ গেট পার হতে সাহস করছে না। প্রতিমবেষ্ট বাঙালি ছেনেমেয়েদের একটি ছোটখাটো দল জমে গেছে ওখানে। শ্রাবছে ঘণ্টা, গেট পার হতে গেলে তলোয়ার খুলে তেড়ে আসবে না তো।

দেখছি আর ভাবছি। ভাবছি এ পূজা ঠিক বাঙালি পূজা নয়। নানা বড়ো পোশাক পরে যারা হৈ-চৈ করছে চারিদিকে, তারা বাংলা দেশের ছেনেমেয়ে নয়। এরা জানেও না দুর্গা পূজা কি। ওরা এসেছে তামাশা দেখতে। পূজা তো পূজা, বাঙালীরা করে এ পূজা, এ পূজার সঙ্গে ওদের এতটুকু পরিচয় নেই, যোগাযোগ নেই। হঠাৎ একটা বড়গোছের তামাশা জুটে গেছে, ওদের বাপ-দাদার পরমায় হচ্ছে তামাশাটা। কাজেই ওরা আরো ক্ষুধিত ক'বে বৈকি।

আর ঐ দূবে গেটের বাইরে এদের চেয়ে অনেক হাল বেশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মনের ভাবও ভাই। ওরাও জানে, এ পূজার সঙ্গে ওদের কোনও সংঘর্ষ নেই। মাঝেমাঝারি পরমায় জোরে বাহা-বাতি ছলছল পাখিয়েছে, এ হ'ল বডলোকের ব্যাপার। এ সব সঙ্গে বাঙালী কি সম্পর্ক থাকতে পারে? মায়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। মনে হ'ল, কোথায় যেন কি অভাব রয়ে গেছে। প্রতিমার চোখের দৃষ্টিতে যেন সেই ভাবটি নেই—যা ফুটে উঠেছে অল্প নব পূজামণ্ডপের প্রতিমাগুলির চোখে। যেন ঠিক তেমনিভাবে জলজল করছে না মায়ের মুখ, মহাষ্টমীর দিন প্রতিটি প্রতিমার মুখ যেমন জলজল করা উচিত! যেন

—যেন মা বড় বিষন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

আরও কত কি যে মনে হ'ল। ভয়ানক রাগ হ'ল নিজের ওপর। এ সমস্ত ছাই-পাশ কেন চিন্তা করছি আমি? অহেতুক অযথা রূপা করেছেন রূপাময়ী আমাকে, রাস্তার কুকুরকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছেন রাতারাতি। তবু কেন সন্তুষ্ট হতে পারছি না আমি? যারা আমার মুখের দিকে চেয়ে আমায় তুষ্ট করবার জন্তে এতবড় একটা কাণ্ড-কারখানা করে যাচ্ছে, তাদের আপনার জন বলে মনে করতে পারছি না কেন আমি? কি হ'ল মন আমার! কি বিশ্রী আত্মাভিমান! ছি!

সামনে দু'জন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রজকিষণলালের বাঙ্গালী ম্যানেজার রূপনারায়ণবাবু। তিনি সঙ্গে এনেছেন এঁদের, সুতরাং এঁরা সহজ লোক নন।

প্রণাম সেরে উঠে বসতে চিনতে পারলাম। স্ববেশ্বরবাবু এবং একজন মহিলা। বড় আপনাব জন মনে হ'ল স্ববেশ্বরকে। গায়ে হাত দিয়ে ইশারা করলাম বসবার জন্তে। রুতার্থ হয়ে ওঁরা মাটির উপরেই বসে পড়লেন।

নিচু গলায় স্ববেশ্বর রূপনারায়ণবাবুর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। স্ববেশ্বর এসেছেন আমাকে তাঁদের পূজামণ্ডপে নিয়ে যাবার জন্তে। মহাপুরুষ যখন সেধে গিয়েছিলেন তাঁদেব কাছে, তখন তাঁরা কেউ চিনতে পাবেন নি। অসংখ্য অপরাধ করে ফেলেছেন সকলে। কিন্তু মহাপুরুষ তো অপমান অবহেলা গায়ে মাথেন না। সেই বিশ্বাসেই স্ববেশ্বর সাহস করে এসেছেন। একবার আমায় নিষে গিয়ে চুটিয়ে দেখাবেন, ভক্তি-করা কাকে বলে আর কতবড় উচুদেব ভক্ত তাঁরা। এখন রূপনারায়ণবাবু যদি দয়া করে একটু বলে দেন শেঠজীকে, কারণ শেঠজীব হুকুম ভিন্ন তো আর মহাপুরুষকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

রূপনারায়ণবাবু ছুটে গিয়ে আগে মুখ থেকে পানের পিক্‌টা ফেলে এলেন মণ্ডপের বাইবে। তারপর বেশ মুকব্বিয়ানা চালে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন— “শেঠজীর সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে জানাব আপনাদের কথা। বহু জায়গা থেকেই লোক এসে ধরেছে শেঠজীকে, ওঁকে নিষে যাবার জন্তে। হাকিম, পুলিশ সাহেব, সরকারী উকিল সেন সাহেব, তারপর ওধারে শহরের অনেকগুলো বারোয়ারী-পূজার পাণ্ডারা। এখন কোথায় কবে ওঁকে পাঠানো হবে, তা ঠিক করবেন শেঠজী নিজে। আপনাদের কথাও তাঁকে জানানো সময়মত। দেখি কতদূর কি করতে পারি!”

শুনে হাত কচলাতে লাগলেন স্ববেশ্বর, তাঁর সঙ্গিনীর মুখ লাল হয়ে উঠল।

আর আমি একেবারে ভাজ্বব বনে গেলাম। এ কি রকম কথা? আমি কি বন্দী নাকি এঁদের কাছে? আমার যখন ইচ্ছে, যেখানে খুশি যাবো এঁরা বাধা দেবার কে? আচ্ছা দেখি, কি করে এঁরা বাধা দেন।

উঠে দাঁড়ালাম। স্বরেশ্বরও তখন উঠেছেন। তৎক্ষণাৎ সকলকে চতুভয় করে দিয়ে স্বরেশ্বরের হাত ধরে সোজা এগিয়ে চললাম গেটের দিকে। রূপনারায়ণবাবু চিৎকার করতে লাগলেন দরোয়ানদের নাম ধরে। কয়েকজন চাকর-দরোয়ান ছুটে এল। আমার পিছনে তারা দল বেঁধে চলতে শুরু করে দিলে। রূপনারায়ণ ছুটলেন শেঠজীর গদিতে। অয়ং স্বরেশ্বর এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছেন যে, আমার হাতের মধ্যে ধরা তাঁর হাতখানা থরথর করে কাঁপছে। পিছন ফিরে দেখে নিলাম, মহিলাটিও আসছেন কিনা। আসছেন ঠিকই, তবে চাকর-দরোয়ানদের পিছনে পড়ে গেছেন।

গেট পার হবার আগেই দু'থানা গাড়ি এসে থামল গেটের সামনে। একথানা থেকে নামলেন ব্রজকিষণলাল। নেমে পরিষ্কার বাতুলায় স্বরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন—“নিয়ে তো চলেছেন গুরুজী মহারাজকে, কিন্তু সামলাবেন কি করে? শত্রুহস্তে মাল্য ভেঙে পড়বে, এমন তাড়ামা হবে যে, গুঁর শরীরে ও চোট লাগতে পারে। এ সমস্ত ভেবে দেখেছেন তো?” ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন স্বরেশ্বর। কোনও রকমে বললেন, “আমি তো এখনই এঁকে নিতে আসিনি হঠাৎ যে উনি এখনই যাবেন আমার সঙ্গে, তাও জানতাম না।”

হাসলেন শেঠজী। বললেন—“উনি তো যাবেনই ঐভাবে হুঁ ক পয়োয়! আছে কিছুতে, কিন্তু আমাদের সব দিক বিবেচনা কবা দরকার।”

পিছন ফিরে তাঁর ম্যানেজারের সঙ্গে খাটো গলায় কি পরামর্শ করলেন। ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ একথানা গাড়িতে উঠে কোথায় গেল গেলেন। এখন ধীরে-স্বস্থ আর একথানা গাড়িতে আমাদের তুলে দিলেন শেঠজী। পিছনের আসনে আমি বসলাম। দু'জন দরোয়ান দু'পাশের দরজায় উঠে দাঁড়াল। স্বরেশ্বর আর তাঁর সঙ্গিনী বসলেন ড্রাইভারের পাশে। ধীরে ধীরে গাড়ি গিয়ে বড় রাস্তায় উঠল।

কিছু পরে পিছন ফিরে দেখি, একথানা পুলিশের লরি আসছে সঙ্গে সঙ্গে। অন্ততঃ এককুড়ি পুলিশ ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে লরির ওপর, আর ড্রাইভারের পাশে বসে রূপনারায়ণবাবু দাঁতের ফাঁকে দেশলাইয়ের কাঠি চালাচ্ছেন।

ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে ব্যাপারটা! ওরা আবার কেন চলেছে সঙ্গে? ও কিছুই নয়, শেঠজী একটু জাঁকজমক দেখাতে চান। তেওয়ারী

সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার দরুন এক লরি পুলিশ পাঠাতে পেরেছেন আমার পিছনে। তার মানে, লোকে এবার বুঝুক যে কত বড় শেঠের পোষা-সাপু আমি। নয়ত কি-এমন কাণ্ড ঘটতে পারে সেখানে, যার জন্তে এত সাবধানতার প্রয়োজন ?

ভয়ানক কাণ্ড না হলেও যেটুকু ঘটে বসল সুরেশ্বরবাবু পূজামণ্ডপে, তাতে পুলিশ না থাকলে আমার উদ্ধার পাওয়া কঠিন হত বৈকি।

গাড়ির ভেতর বসেই দেখতে পেলাম, টুপি-মাথায় দু'জন অফিসার তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গেটের সামনে। লরি থামল আমাদের গাড়ির পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে কনস্টেবলরা লাফিয়ে নেমে সার বেঁধে দাঁড়ালো দু'পাশে। সুরেশ্বর নামলেন, মহিলাটি নামলেন, তারপর আমি নামলাম। তৎক্ষণাৎ ঠেলাঠেলি ছড়োছড়ি চরমে গিয়ে পৌঁছল। পুলিশ কেন এল, তাই দেখাবার জন্তে যে যেখানে ছিল ছুটে এল। সুরেশ্বর যে একেবারে মহাপুরুষ সঙ্গে নিয়ে ফিববেন, তা নিশ্চয়ই কেউ জানত না। কিন্তু যে মহাপুরুষকে পাহারা দেবার জন্তে এক লরি পুলিশ প্রয়োজন হয়—তার মর্যাদার উপযুক্ত ভিড না হলে চলবে কেন ? হুতবাং ছুটে আসতে লাগল পাড়াহুদ্দ মানুষ। দাবানলের মত সংবাদটি ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কয়েক হাজার মেয়ে-পুরুষ ছেলে-ছোকরা জমা হয়ে গেল। সুরেশ্বর তখন আমায় নিয়ে মণ্ডপের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। দবজা কথ্যে পুলিশ খাড়া, আব একটি প্রাণীকেও ভেতরে আসতে দেওয়া হবে না। তাতে বড় বয়েই গেল। অল্প দিক দিয়ে তখন এত লোক ঢুকে পড়েছে মণ্ডপের মধ্যে যে আব তিল ধারণের স্থান নেই।

আমার কপালে মা-দুর্গার সামনে পৌঁছনো ঘটে উঠল না। এবার দরকাবও নেই। নিজেই মা-দুর্গার চেয়ে অনেক বেশি খাতির পাচ্ছি। আমাকে দর্শন করতে এত লোক পাগল হয়ে উঠেছে, আমার আবাব দুর্গা দর্শন করার প্রয়োজন কি ? হাজারখানেক মা-দুর্গার সাক্ষাৎ অন্তরীরা ঘিবে ধরেছেন তখন। পায়ের ধুলোর জন্তে তারা ঠেলাঠেলি চুলোচুলি লাগিয়েছেন। ভাগ্যে এদেব দশটি করে হাত নেই, থাকলে আর রক্ষে ছিল নাকি।

একখানা উঁচু টেবিল এনে তার ওপর বসিয়ে দেওয়া হ'ল আমাকে। সুরেশ্বর-বাবু গর্জন করতে লাগলেন। সত্যিই যে তিনি একজন সার্থক সম্পাদক তা দেখিয়ে দিলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা মারমুখো হয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমার চারিদিকে। ঘন-ঘন অসংখ্য শাখ বাজতে লাগল। গোলমালটা একটু ঠাণ্ডা হ'ল। আমার গরদের কাপড়-চাদরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে তখন। গোলায় যাক কাপড়-

চাদর, দম আটকে যে মায়া পড়িনি এই যথেষ্ট। টেবিলের ওপর বসে নিশ্বাস নিয়ে বীচলাম।

তখন আরম্ভ হ'ল প্রণামী দেওয়া আর পায়ের ধূলো নেওয়া। টাকা-নোট এমন কি ছোটখাটো সোনার অলঙ্কারও স্তূপাকার হয়ে উঠল পায়ের কাছে। বাঙালীও যে ভক্তি দেখাতে জানে তার বোল-আনা প্রমাণ হয়ে গেল।

প্রণাম মারতে নেগে গেল ঘন্টাখানেকের ওপর। ওধারে বাইরে তখন আরও কয়েক হাজার মানুষ জমা হয়েছে। তাদের চিংকারে কানের পর্দা ফাটবার উপক্রম। এখন ঐ ব্যাচ ভেদ করে বার হতে হবে। তাবতেই বৃকের ভেতর হিম হয়ে এল।

আবার দেখা দিলেন সম্পাদক মশাই। স্বেচ্ছাসেবকদের আদেশ দিলেন ভিড সরিয়ে পথ করতে। তারপর আমার পিছনে কাকে লক্ষ্য করে বললেন—“এবার তুলে নিয়ে চল একে।”

এতক্ষণ পরে আমার পিছন ফিরে তাকাবার অবকাশ হল। দেখলাম সুরেশ্বরই সেই সজ্জিনীকে। তাঁর চোখ-মুখ, মাথার চুল, জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম, আমার পরীক্ষা করতে কি ধকল সহ করতে হয়েছে তাঁকে।

হাত জোড় করে বাঙলা ভাষায় নিবেদন করলেন সুরেশ্বর—“দয়া করে একবার অধর্মের বাড়িতে পায়ের ধূলো দিতে হবে যে!”

সভয়ে ঘাড় নাড়লাম। আর না, আর এতটুকু ভক্তি সহ্য হবে না। এবার রেহাই দাও, যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরে যাই।

মুখ শুকিয়ে গেল সুরেশ্বরের, তিনি অসহায় ভাবে চাইলেন মহিলার দিকে। তখন সেই মহিলা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে এমন ভাবে চেয়ে রইলেন আমার চোখের দিকে যে, আমাকে চোখ নাগাতে হ'ল। অনেক কিছু ছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, সবচেয়ে মারাত্মক যা ছিল তা; হচ্ছে—যদি না যাও তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব।

ভেবে দেখলাম—যাওয়াই উচিত। না গেলে নেহাত নিমকহারামি করা হয়। সম্পাদক মশায়ের একটা মর্খাদা আছে। যদি উনি মহাপুরুষকে একবার নিজের বাড়িতে না নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে লোকের কাছে নুখ দেখাবেন কেমন করে! তাছাড়া ঐ মহিলাটি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে এত কষ্ট সহ্য করেছেন, তারও একটা মূল্য আছে তো!

নেমে দাঁড়লাম টেবিল থেকে। যে চাদরখানা পাতা ছিল টেবিলে, টাকা-কড়িসম্বন্ধ সেখানা গুটিয়ে নিয়ে রূপনারায়ণবাবুর হাতে দিলেন সুরেশ্বর।

খেঁচাসেবকের। দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়াল। সামনে সেই মহিলা আর শিচ্ছে
স্বরেশ্বরকে নিয়ে এগিয়ে চললাম প্রতিমার সামনে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে
মাকে প্রণাম করলাম। কিন্তু আজ আর প্রণামী দেবার নেই কিছু হাতের
কাছে। তারপর প্রতিমার বাঁ পাশের বেড়ার গায়ে একটি ছোট ফাঁক দিয়ে আমাকে
বার করে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সে-ধারে কেউ নেই। খোলা আকাশের তলায়
এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

একটি বড় পুকুরের পাড় দিয়ে চললাম ওঁদের সঙ্গে। স্বরেশ্বর বললেন, “কাছেই
আমার বাসা। সামনের পথ দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবার উপায় নেই। এই পথে
যেতে আপনার কষ্ট হচ্ছে!”

ভদ্রমহিলা শব্দ করে হেসে উঠলেন। বললেন, “হবেই তো, তবে ছাদের ওপর
জল তুলতে যেটুকু কষ্ট হয়েছিল ততটা হবে না নিশ্চয়ই।”

থতমত খেয়ে স্বরেশ্বর নির্বাক হয়ে গেলেন।

পুকুর-পাড় ছেড়ে ছোট একটু বাগানের মধ্যে ঢুকলাম আমরা। বাগানটুকু
পার হয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম বন্ধ দরজার সামনে। টিনের চাল টিনের দেওয়াল দেওয়া
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একখানি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি।

যিনি দরজা খুলে দিলেন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমরা বাড়িতে প্রবেশ
করলাম। তিনি স্বহস্তে দরজায় খিল দিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন।
তারপর আমার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তাঁর হাবভাব
দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল আমার। এভাবে কি দেখছেন উনি?
আমার দু'পাশে দাঁড়িয়ে স্বরেশ্বর আর মহিলাটি বুকের রায় শোনবার জন্যে অপেক্ষা
করছেন।

পরীক্ষা শেষ করে বৃদ্ধ আমার সামনে হাত নেড়ে বেশ চিৎকার করে
বললেন, “আমি পিতু, কানীর পিতু মুখ্যে আমি, আমার চিনতে পাবছ
বন্ধুচারী?”

সত্যিই একটু চমকে উঠলাম। সাদা চুল সাদা দাড়ির মধ্যে দেখা যাচ্ছে শুধু
ঘোলাটে চক্ষু দু'টি, আর ধনুকের মত বাকা নাকটি। তাহলে পিতু মুখ্যে এখনও
বেঁচে আছেন! আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গেলাম। সেই মুহূর্তে পিতুবাবু
আবার বলতে লাগলেন, “এই স্বরেশ্বর হচ্ছে আমার জামাই, এখানকার কলেজে
প্রফেশারি করে। আর ঐ আমার মেয়ে গৌরী। এবার মনে পড়ছে
আমাদের?”

আর একবার ভাল করে দেখলাম মহিলাটিকে। গৌরী অর্থাৎ পিতু মুখ্যের

মেয়ে এবং প্রফেসার সুরেশ্বরবাবুর স্ত্রী রুদ্ধ-নিশ্বাসে চেয়ে আছেন আমার দিকে । এ সেই দৃষ্টি, যা দেখে প্যাংগোল থেকে এসেছি আমি ঠুর সঙ্গে । এর দৃষ্টি বলতে চায়—বলো—চিনতে পারছ, না বললে এখনই আমি গলায় দড়ি দেব ।

হো হো করে হেসে উঠলাম । বললাম, “কি করে চিনি বলুন ? গৌরী যে এমন একজন গিন্নীবারী হয়ে পড়েছে, এ কি ধারণা করা সহজ ?”

আমার হাসিতে ঠুরা কেউ যোগ দিলেন না । বেশ শব্দ করে গৌরী একটি নিশ্বাস ফেললে । যেন এতক্ষণে তার বুকের ওপর থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল । পিতুবাবু ছ’হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন । সুরেশ্বর বললেন—
“আমি প্রথম দিনই বুঝেছিলাম উনি বাঙালী ।”

গৌরী এবার হেসে ফেললে । বললে—“তা তো নিশ্চয়ই, তা না বুঝলে কি ঠুকে দিয়ে অত জল তোলাতে পারতে ?”

পিতুবাবু তখনও জড়িয়ে ধরে আছেন আমাকে । বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তিনি । কম্পিত গলায় বলতে লাগলেন বুদ্ধ—“সকলকে ঠাকি দিয়ে যখন পালালে কানী থেকে, তখন পিতু বুড়োর জন্তেও কি একবার তোমার মন খারাপ হ’ল না ব্রহ্মচারী ? একবার মনেও হ’ল না তোমার যে, বুড়োটা হয়ত পাগল হয়ে যাবে বা মরে যাবে ?”

ততক্ষণে গৌরী চলে গেছে ঘরের মধ্যে । সেখান থেকেই সে বললে, “এবার ছেড়ে দাও বাবা তোমার ব্রহ্মচারীকে । ঘরের ভেতর এনে বসানো । এবার একটু মুখে জল-টল দিতে হবে তো ঠুকে ।”

পিতুবাবু ছেড়ে দিলেন আমাকে । বললেন—“হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই তো, ঠিকই তো । আগে একটু সরবৎ দে গৌরী । ভিড়ের চাপে নিশ্চয়ই ভয়ানক তেষ্ঠা পেয়েছে ব্রহ্মচারীর ।”

তখনও সুরেশ্বর মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে । তাঁর কাঁধের ওপর হাত রেখে বললাম, “একটুও মন খারাপ করবেন না আপনি আমাকে দিয়ে জল তোলাবার জন্তে । আপনার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ, তাতে ও-রকম একটু-আধটু ঠাট্টা করা চলে ।”

হা হা করে হেসে উঠলেন পিতুবাবু । কানীর সেই পিতুবাবু—এই হাসির জন্তেই বাঙালীটোলায় বিখ্যাত ছিলেন পিতু বুড়ো । আরও অনেকটা বুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর হাসিটি এখনও ঠিক তেমনিই আছে । হাসি তো নয় যেন একটা জলপ্রপাত । হাসিয়ে নিয়ে যায় যা-কিছু সামনে পড়ে । মারাত্মক সংক্রামক জিনিস হচ্ছে পিতুবাবুর ঐ প্রাণ-খোলা হাসি । ঐ হাসির তোড়ে কানীতে কয়েকটা

বছর কেমন অনায়াসে কেটে গেছে আমার। ঐ হাসি দিয়ে পিতুবাবু আমার মনের কালি ধুয়ে দিয়েছিলেন। যতবার মাথা তুলতে গেছি, ততবার পিতুবাবুর হাসি আমার মাথার ওপর হুডহুড করে ঝরে পড়েছে আর একেবারে শীতল হয়ে গেছি আমি। ভালই হয়েছে, কোথায় কালী, কোথায় চট্টগ্রাম। পিতুবাবু এখন জামায়ের বাড়িতে বাস করছেন। প্রফেসর জামায়ের শস্তুর এখন কালীর পিতু বুড়ো। আমারও বেশ উন্নতি হয়েছে। ছিলাম কালীবাড়ির পুঙ্কত, এখন হয়েছি ফকুড। বস্ত্র জন্তব মত স্বাধীন প্রাণী ফকুড। দরোয়ান, পুলিশ, গরদের কাপড়-চাদর, টাকা, নোট, সোনার অলঙ্কার এই সব দিয়ে বাঁধা যায় না ফকুডকে, কিছুতেই ফকুডকে বশীভূত করা যায় না। কিন্তু যায়ও তো আবার ফকুডকে বশীভূত করা। এই তো গৌরী অনায়াসে তার চোখেব দৃষ্টি দিয়ে বশীভূত কবে বাড়িতে নিয়ে এল ফকুডকে। নামকরা প্রফেসরপত্নী গৌরীর চোখেব দৃষ্টি এখনও বদলায়নি তাহলে।

বাবান্দায় শতরঞ্জি বিছিয়েছে গৌরী। আমরা তিনজনে উঠলাম বারান্দায়। একথানা আসন হাতে ছুটে এল সে। আসনখানা হাত থেকে টেনে নিয়ে ফেলে দিলাম ওপাশের চেয়ারের ওপর। বসে পড়লাম শতরঞ্জিতে। চোখ পাকিয়ে বললাম, “দেখ ক্ষেপিও না বলছি বাডাবাড়ি কবে। সম্পাদক মশাই আমার মত একজন মহাপুরুষকে সম্মানে নিয়ে এসেছেন। তুমি অপমান করছ কেন? নালিশ করলে মজা টের পাবে।”

এতক্ষণে সুরেশ্বরের মুখের কালো মেঘ কাটল। বললেন—“তা করবেন পরে। এখন একটু সেজেগুজে বসুন আসনের ওপর। আমি ম্যানেজারবাবুকে ডেকে আনি এখানে। আপনাব সামনে তাঁকে বলে দি এবেলা যাবেন না আপনি।”

এবেলা যাব না আমি। বলে কি?

পিতুবাবুর টনটনে আঁকল আছে। তিনিই বাধা দিলেন জামাইকে।

“সেটা ভাল দেখায় না সুরেশ্বর। তাতে গোলমাল আরও বাড়বে, লোক ভেঙে পড়বে এ বাড়িতে। এখন জলটল খাইয়ে ব্রহ্মচারীকে পৌঁছে দাও মারোয়াড়ীদের হাতে। পুজার হাঙ্গামা চুকলে আমবা আবার নিয়ে আসব। ততদিনে মাহুয়ের উৎসাহেও একটু ভাঁটা পড়বে।”

ধরের ভেতর থেকে গৌরী বললে, “সে যা হয় হবে’খন খানিক পরে। এখন না শ্বরে এক পা নড়তে পারবে না কেউ বাড়ি থেকে।”

চেপে বসলাম। সুরেশ্বরের হাত ধরে টেনে বসলাম পাশে। যার যা খুশি ভাবুক। কে কি ভাববে, তার জন্তে খোড়াই কেয়ার করে ফকুড। শুধু ফকুড

কেন, মহাপুরুষ ফকড়। মহাপুরুষের ইচ্ছায় বাধা দেওয়া পাপ, কার এত সাহস হবে শেঠজীর গুরুজীকে বিরক্ত করবার? অতএব থাকুক ওরা রাস্তায় পাড়িয়ে।

মস্ত একটা সাদা পাথরের বাটি সামনে ধরলেন গৌরী। হাত থেকে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খালি করে দিলাম বাটিটা। হুন চিনি দই লেবুর রস দিয়ে চমৎকার বানানো হয়েছে সরবৎটা, বেশ যত্ন করেই বানিয়েছেন গৌরী। বহুদিন আগেই এই রকম এক বাটি সরবৎ আমার প্রাণ্য ছিল গৌরীর কাছে। অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে মাঝখানে। তখন হয়ত এত যত্ন করে এই রকম চমৎকার সরবৎ বানাতে পারত না গৌরী। তা না পাকক তবু অস্তুতঃ একটি দিন আমাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতে পারতেন পিতুবাবু। না-হয় মেয়ের হাতের সরবৎ না খাইয়ে শুধু মুখেই আমায় বিদায় দিতেন সেদিন, না-হয় আজকের এই প্রফেসরবাবুর জ্বর মত তখনকার সেই গৌরী এত অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারত না। তবুও তখনকার সেই হতদবিত্র কালীবাড়ির পুরুতের অতি-তুচ্ছ মর্যাদার কিছুমাত্র হানি হত না। এতবড় একটা মহাপুরুষকে বাড়িতে ধরে এনে এত উচ্ছ্বাস এত আদব-আপ্যায়ন দেখানোব চেয়ে তখনকার সেই হতভাগা কালীবাড়ির বামুনকে একবার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলে পিতাপুত্রীর উদার প্রাণের পরিচয় পেয়ে আরও বেশী মুগ্ধ হতাম আমি। আর তাহলে হয়ত—

“হয়ত তুমি ভাবছ ব্রহ্মচারী, তোমায় আমি চিনলাম কি করে? আমি তোমায় চিনতে পারিনি। গৌরী তোমায় চিনতে পেরেছিল। তোমায় জল তুলতে দেখে এসে গৌরী আমায় বললে তোমার কথা। আমার বিশ্বাস হয়নি। আমার ধারণা ছিল, তুমি এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছ। হয়ত এতদিনে আবার সংসারী হয়ে বিয়ে-থা করে শাস্তিতে—”

হেসে উঠলাম পিতুবাবুর কথা শুনে। বললাম ‘শাস্তিতেই তো আছি পিতুবাবু, এত ভক্ত, এত মান-মর্যাদা, এত ধন-দৌলত আমার পায়ে আছড়ে পড়ছে তবু বলেন সংসারী হলেই শাস্তি পেতাম।’

বৃদ্ধ আর একটি কথা বললেন না। দূর আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। বাটি নিয়ে গৌরী আবার ঘরের মধ্যে চলে গেছে। স্বরেশ্বরও উঠে গেছেন। ঘরের ভেতর থেকে ওদের স্বামী-স্ত্রীর কথার আওয়াজ আসছে। মহাপুরুষকে জল খাওয়াবার আয়োজন হচ্ছে ওখানে।

সজোরে একটি ধাক্কা দিয়ে জাগালাম ফকড়কে। সাবধান—এলিয়ে পড়া সাজে না তোমার। তুমি একটি পোড়-খাওয়া পেশাদার ফকড়। রক্ত-মাংসে গড়া একটি

আন্ত উপগ্রহ তুমি। - ঘুরতে ঘুরতে এমন জায়গায় এসে পড়েছ, যখন আলোর আলো হয়ে গেছে তোমার ওপর-ভেতরে। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্তে? আবার তোমায় ছুটতে হবে তোমার আপন পথে, ঘুরতে হবে অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে। এই তোমার বিধিলিপি, কার সাধ্য থগুন করে?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিতুবাবু বললেন—“তুমি যে বেঁচে আছ, এ কথা তখন কেউ বিশ্বাস করেনি। শুধু এই পিতু বুড়ো তিন বছর ধরে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে মরেছে। আমি শুধু গলা ফাটিয়ে বলেছিলাম তখন—ব্রহ্মচারী মরেনি, মরতে পারে না সে হীন অবস্থায়। লোকে হেসেছে, পাগল বলেছে আমাকে, আমি বাবা বটুকনাথের কাছে মাথা খুঁড়েছি। এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন বটুকনাথ, তোমায় ফিরে পেলাম তাঁর দয়ায়। কাল সকালে যখন তুমি রাজ-রাজেশ্বর সেজে প্রতিমা দর্শন করতে এসেছিলে, তখন দূর থেকে দেখে তোমায় চিনে ফেললাম। তাই তো পাঠালাম আজ গৌরী আর হরেশ্বরকে তোমাব কাছে। একবার আমার সঙ্গে তুমি কাশীতে চল ব্রহ্মচারী, সেই হতভাগা-হতভাগীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাব যে, পিতু বুড়ো পাগল নয়। মিথ্যে কথা বলে পিতুকে ভোলানো অত সহজ নয়।”

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “আমি মবে গেছি এ কথা রটল কি কবে?”

“কি কবে যে কি রটে কাশীতে, তা বাবা বিশ্বনাথই জানেন।” পিতুবাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ঘরের ভেতর থেকে গৌরী বললে, “আবার সে-সব কথা আজ তুলছ কেন বাবা? তাঁরা সব ব্রহ্মচারী মশায়ের একান্ত আপনার লোক ছিলেন। পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরা ছাড়া আর তো কাউকে চিনতেন না ব্রহ্মচারী মশায়। তাঁরা যা করেছিলেন, গুঁর ভালর জন্তই করেছিলেন।”

পিতুবাবু বললেন, “সেই কথাটাই ব্রহ্মচারীর জানা দবকার। একেবারে জল-জ্যাস্ত মিথ্যে কথা রটাতে লাগল। গঙ্গোত্তরীর পথে উত্তরকাশীতে তোমার বলেরা হয়েছিল। চিনতে পেরে অনেক সেবা শুক্রাণ্য করে তারা। তারপর সব শেষ হয়ে গেলে, শেষ কাজটুকু করে, তাঁরা কঁদতে কঁদতে গঙ্গোত্তরী চলে যায়। সবাই বিশ্বাস করলে তাদের গল্প। আমি বললাম—না, তা কখনও হতে পারে না। এ মিথ্যে, অমন ইতরের মত মরতে পারে না ব্রহ্মচারী। জগৎজননী রাজ-রাজেশ্বরীর সন্তান, না হয় ঘুরছেই পথে পথে, তা বলে—”

আবার জিজ্ঞাসা করলাম—“সে তারা কারা? কারা রটালে এ সমস্ত কথা?”

আড়াল থেকে ঝাঁজিয়ে উঠল গৌরী, “অন্ত কে রটাতে যাবে অমন অলঙ্কণে কথা? রটালেন শঙ্করীপ্রসাদ আর তাঁর মেম সাহেব। যারা এখন স্বামী

শঙ্করানন্দ আর করুণাময়ী ভৈরবী সঙ্গে কালীবাড়িতে জাঁকিয়ে বসে ব্যবসা চালাচ্ছেন।”

পিতুবাবু বললেন, “রক্তের দোষ, বিযাক্ত রক্তে জন্ম। লেখাপড়া শিখে দেশ-বিদেশ ঘুরে এলে হবে কি, ওর রক্তে মিশে আছে ব্যাভিচার। আসল কাল-কেউটার পেটে জন্ম, ঠিক সময় সব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। সেই সর্বনাশী কালীর দোহাই দিয়ে চুটিয়ে ক্ষুতি চালাচ্ছে। তারানন্দ পরমহংসের মেয়ের পেটে জন্মে যা করা উচিত তাই করেছে। বড় বড় লোক তার চেলা হয়েছে। বড় বড় ঘরের সর্বনাশ করেছে। যে কালীবাড়িতে সঙ্কো-দাঁপ জলত না, এখন তার জাঁকজমক দেখে কে। এখন তুমিই আর চিনতে পাববে না সেই কালীবাড়িকে।”

সুরেশ্বর এসে বললেন, “এবার উঠুন। হাতে-মুখে জল দিন। মহাষ্টমবা প্রসাদ মুখে দিন একটু।”

বাস্তব হয়ে উঠলেন পিতুবাবু, “হ্যা-হ্যা—উঠে পড় ব্রহ্মচারী। আর দেহি করে কাজ নেই। ওরা হয়ত এখানেই এসে পড়বে।”

এবার সুরেশ্বর বাধা দিলেন স্বত্তরকে—“অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি। তাঁরা ভবে ঠাল করে চেনেন। উনি নিজের ইচ্ছা কবে না গেলে কেউ ডাকতে আসতে সাহস করবে না। পুলিশ গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এক প্রাণীকে ভেতরে আসতে দেবে না। ইতিমধ্যে ডি. এস. পি. সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মকিষণবাবু নিজে সব ব্যবস্থা কবে গেছেন।”

বেশ ধোঁকায় পড়ে গেলাম। আমাকে বিদেয় দেবার জন্তে এত ব্যাকুল কেন পিতুবাবু? এখনও কি আমায় ভয় করেন নাকি তিনি?

গোঁরী চোঁচিয়ে উঠল ওধাব থেকে, “জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি যে আমি।”

সুরেশ্বরের সঙ্গে নেমে গেলাম উঠানে। আপন হু ত পা ধুয়ে দেবে গোঁরী। ঘটিটা কেড়ে নিয়ে বললাম, “বক্ষে কর, অত ভক্তি সহ হবে না আমার। শেষ পর্যন্ত কিছু না খেয়েই তোমার ঐ নিচু পাঁচিল টপকে উধাও হয়ে যাব।”

গজগজ করতে করতে গোঁরী ফিরে গেল—“গুণের মধ্যে শুধু ঐটুকুই তো আছে, উধাও হয়ে যাব। শুনলেও গা জ্বালা করে আমার।”

সুরেশ্বর হেসে ফেললেন। বললেন, “তা যে যাবেনই সে তো আমরা সবাই জানি। এখন দয়া করে মুখ-হাত ধুয়ে চলুন ঘরে। নয়ত গোঁরী আরও চটে যাবে।”

বললাম, “দেখুন, আপনিই বিচার করুন। এতবড় একটা মহাপুরুষকে যে নিয়ে এলেন, তা গোঁরী কি মানতে চাচ্ছে! ও এখনও আমাকে সেই কালীবাড়ির

পুরুতই মনে করে।”

হাত-মুখ ধুয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়ে যা দেখলাম, তা চক্ষুস্থির হবার মত ব্যবস্থা! প্রায় এক বিঘত উঁচু আসন পাতা হয়েছে। প্রথমে খান দু’য়েক কঞ্চল পাট করে পেতে তার ওপর কার্পেটের আসন দেওয়া হয়েছে। স্বেত পাথরের প্রকাণ্ড খালায় সাজানো হয়েছে ফলমূল সন্দেশ। তার পাশে কয়েকটা পাথর-বাটিতে বোধ হয় দই-দুধ-ক্ষীর। গৌরী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, আমি বসলে খালাখানি সামনে ধরে দেবে।

আবার হো হো করে হেসে উঠলাম। স্বরেশ্বরের দিকে ফিরে এসলাম, “তাহলে এবার চলুন আমায় পৌঁছে দেবেন পুলিশেব কাছে।”

আতকে উঠল গৌরী, “তাব মানে?”

“মানে অভ্যস্ত সরল। পরম তৃপ্ত হলাম তোমার ভক্তির বহর দেখে। এভাবে তো কেউ কাউকে খেতে দেয় না। এই রকম ব্যবস্থা কবার অর্থ হচ্ছে, কিছু খেও না যেন, শুধু প্রসাদ করে দিও।”

চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল গৌরীব। পিতৃবাবু এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের পিছনে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, “এ সমস্ত কাণ্ড কেন করতে গেলি তুই ব্রহ্মচারীর জন্তে। ঐ কঞ্চলখানা তুলে নাও তো স্ববেশ্বর, শুধু আসনেই যথেষ্ট হবে।”

বললাম, “আর দু’খানা আসনও চাই যে। আপনাবা দু’জনও বসবেন আমার সঙ্গে। গৌরী সামনে বসে সব ভাগ কবে দেবে আমাদের আব আমবা ভাল মানুষের মত গল্প করতে করতে পেট পুরে খাব।”

ছুটে বেরিয়ে গেল গৌরী, তার দু’খানা আসন এনে পেতে দিলে। তখন আমরা তিন জনে খেতে বসলাম।

নারকেলের চিঁড়ে, নারকেলের সন্দেশ বহুকাল চোখে দেখিনি। আগেই এক মুঠো নারকেলের চিঁড়ে মুখে ফেলে চর্বণ শুরু করলাম। সামনে বসে গৌরী বকে যেতে লাগল, “মহাষ্টমীর দিনটাও হয়ত এই খেয়েই কাটবে। দুটো রেঁধে খাওয়াবো তার সময় কই। বেলা বারোটা বেজে গেছে। ভক্তবা এতকণে হস্তে হয়ে উঠেছে। আর দেরি কবলে শেষে বাড়ি চড়াও করবে।”

শুনতে পেলাম একটি নিঃশ্বাসের শব্দ। যা মুখে পুরেছিলাম তা গলা দিয়ে নামিয়ে বললাম, “হঁ, এই খেয়েই দিন কাটবে বৈকি! চল আমার সঙ্গে, গুরুজী মহারাজের ভোগের আয়োজন দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে।”

স্বরেশ্বর বললেন, “সে কথা আমরা জেনে এসেছি। ওঁরা যত আয়োজন

করেন, সব আপনি প্রসাদ করে দেন। ওঁরা আশ্চর্য হয়ে ভাবেন কিছু না খেয়ে আপনি বেঁচে আছেন কি করে ?”

“এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি, কেমন করে বেঁচে আছি।” বলে এক মনে ফলমূল খেয়ে যেতে লাগলাম।

পিতৃবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, “আরও কিছুদিন আছ নাকি এখানে ?”

সংক্ষেপে জবাব দিলাম, “তা জানি না তো।”

“কিছুই উনি জানেন না, কবে যে সরে পড়বেন এখান থেকে, তাও ওঁর ঠিক করা নেই। সে কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করবারও অধিকার নেই কারও। যখন যেদিকে খুশি চলে যাবেন। আর পাপীতাপী যারা, তাবা পড়ে থাকবে, মাথা খুঁড়বে, তাহে ওঁর কি। একেবারে ষোল আনা মহাপুরুষ না হলে মানুষ এরকম পাষণ হতে পারে কখনও ?” বলে আরও খানিকটা ক্ষীর বাটিতে ঢেলে দিতে এল গৌরা। ছ’হাতে বাটি চাপা দিয়ে বললাম, “মাপ কর, আরও খেতে হলে এ বাড়ি থেকেই বার হতে পারব না, অন্য কোথাও সরে পড়ব কেমন করে ?”

স্বরেশ্বর বললেন, “ধীরে স্বস্তে থান আপনি। স্বৈচ্ছাসেবকরা একটি প্রাণীকে পুষতে আসতে দেবে না। বাড়ির সামনে গলির মুখে পুলিশের লরি দাঁড়িয়ে আছে। ওধারে প্যাণ্ডলের সামনে আপনার গাড়ি ঘিরে আছে মানুষ। তারা জানতেও পারবে না, আপনি পুলিশের লরিতে উঠে সোজা চলে যাবেন ব্রজকিষণ-বাবুর গুখানে।”

দরজায় কারা ধাক্কা দিচ্ছে। পিতৃবাবু শুধু একটু সরবৎ খেয়ে বসেছিলেন। তিনি উঠে গেলেন দেখতে। গৌরী বলল, “এবাব ওরা এসেছে। আর তো ধরে রাখা যাবে না আপনাকে। বলে যান, আবার কখন দেখা হবে ?”

স্বরেশ্বর বললেন, “আমি এখানকার পূজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি। কাল কাঙালী-ভোজন হবে এখানে। আমার আর এতদূর সময় হবে না আপনার কাছে যাবার। গৌরী যাবে আপনার কাছে বিকেলে। মারোয়াড়ী মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ করে আসবে। সম্ভব হলে আশ রাত্রেই তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে এখানকার আরতি দর্শন করিয়ে দেবে। ভালই হ’ল, আপনার জন্তে এখানকার কাঙালী-সমাজের সঙ্গে মারোয়াড়ীদের ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। আমরাও হিন্দু ওঁরাও তাই। অর্থাৎ আমরা কেউ কারও পূজা-উৎসবে যোগ দিই না। ওঁদের হাতে টাকা আছে, ওঁরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছু ভাল করতে পারেন মাহুঘের। কিন্তু আমরা কেউ কাউকে চিনি না, বাড়ি-মাড়োয়াড়ী একে অন্যরকে এড়িয়ে চলে। সেই ভাবটা যদি আপনার এখানে আসার দরুন ষোচে তো মহা উপকার হবে।”

পিতুবাবু ফিরে এসে জানালেন, “ম্যানেজারবাবু আর পুলিশ অফিসাররা উপস্থিত হয়েছেন। ভিডি আরও বাড়ছে, এখন তোমাকে বার করে না নিয়ে যেতে পারলে শেষে বিপদ ঘটবে।”

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। তৈরী হয়ে দাঁড়ালাম আর একবার ভক্তির ঠেলা সামলাবার জন্তে। স্বরেশ্বর গেলেন পুলিশের সঙ্গে পরামর্শ করতে। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম কবলে গৌরী। আমার একথানা হাত ধরে আছেন পিতুবাবু। তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বললাম, “অনেক কথা বলবার আছে আমার। অনেক কথা জানতে হবে আপনার কাছে।”

ধরা গলায় জবাব দিলেন বৃদ্ধ, “আব কেন সে-সব কথা নিয়ে শুধু শুধু মাথা ঝামানো। ভুলে যাও সে-সব কথা।”

গৌরী প্রায় চুপি চুপি বললে, “ভুলতে দেব হবে না মোটেই।”

বার হলাম স্বরেশ্বরবাবুর বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে। ছোট গলি, গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে লরি। ড্রাইভারের পাশে উঠে বসলাম। পিছনে উঠলেন রূপনারায়ণবাবু আর কয়েকটি কনস্টবল। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম গৌরী স্বরেশ্বর পিতুবাবুকে। মনে হ’ল, গৌরীর দুই চোখ যেন টলটল করছে।

মোড় ফিরল লরি। মনে মনে হাসলাম। ফক্কডেব জন্তেও চোখের জল পড়ে তাহলে। শুকনো ভস্ম-লেপা ফক্কডের কপালে চোখের জল পড়লে যে ভস্ম ধুয়ে যাবে। এই যে দু’টি মুক্তার মত বিন্দু টলটল করছে গৌরীর চোখে ও নিশ্চয়ই ফক্কডের জন্তে নয়। বেনাবনে কেউ মুক্তা ছড়ায় না। ফক্কডের কপালে আছে তাজিল্যা, ঝুণা, কুকুরের মত দূর দূর করে খেদানো—নয়ত পাহাড় পর্বত ভেসে যায়, এমন ঠাঁচও ভক্তির বস্তা। এ ছাড়া অগ্নি কিছু ফক্কডের কপালে জুটতেই পারে না।

লরি এসে থামল ডি. এস পি সাহেবের বাঙলোয়। আধ ঘণ্টা পরে আবার সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। এবার ডি. এস পি. সাহেবের গাড়িতে। প্রায় দুটোর সময় পৌঁছে গেলাম যথাস্থানে। মহাসমারোহে আমাকে নামানো হ’ল। শেঠজীরা নিজেদের সম্পত্তি ফিরে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। ইতিমধ্যে প্যাণ্ডেলের মাঝখানে অনেকটা জায়গা শক্ত করে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। তার মাঝখানে তক্তাপোশ পেতে তার ওপর ওঠানো হয়েছে আমার জলচৌকি। জলচৌকিখানি কিংখাব দিয়ে মুড়ে তার ওপর দেওয়া হয়েছে বহুমূল্য কার্পেটের আসন। আসনের সামনে একটা ফুলের তোড়া আর একথানা মস্ত রূপার পরাভ

রাখা হয়েছে। পরাতের ওপর বসানো রয়েছে সেই লাল থেবোর থলিটি। থলিটি বেশ বোকাই। বুঝলাম, সুরেশ্বরের ওখানে যা প্রণামী পড়েছে সে সমস্ত বোকাই আছে থলিতে!

বসলাম গিয়ে আসনের ওপর। জলন্ত কলকে নিয়ে ছুটে এল একজন। মায়ের সামনে তখন হোমায়ি জ্বলছে, আহুতি দিচ্ছেন পুরোহিত।

“ও বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবচ লোহিতাক্ষ, সর্বকর্মণি স্বাধয় স্বাহা।”

নহবতে ভৌমপলশ্রী চলছে। দলে দলে মানুষ ঢুকছে প্যাণ্ডেলে। প্রতিমা দর্শন করে এসে দাঁড়াচ্ছে বেড়ার চারধারে। জোড়হাতে মহাপুরুষ দর্শন করছে সকলে। কেউ কেউ আবার চোখ বুজে বিড় বিড় করে কি বলছে। জানাচ্ছে নিজেদের মনস্কামনা। বৈশ্বকর্ণ কারও দাঁড়বার উপায় নেই। এক দলকে সরিয়ে আর এক দলের স্থান করে দিচ্ছে দরোয়ানরা। অজস্র আনি দোয়ানি সিকি ছুঁড়ে লোকে, একজন সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে থালায় জমা করছে। মাঝে মাঝে কলকে আসছে, ফিরিয়ে দিচ্ছি প্রমাদ করে। ব্রহ্মকিষণবাবুর বাড়ি থেকে রূপার গেলাসে সরবৎও এসে গেল একবার।

হোম সমাপ্ত করে পুরোহিত মশায় এসে ফোঁটা দিয়ে গেলেন কপালে। সানাইয়ে পিলু ধরেছে তখন। হঠাৎ নানা রঙের অজস্র আলো জ্বলে উঠল প্যাণ্ডেলের মধ্যে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সহ হচ্ছে না আর গোলমাল, লোকের ভিড়, সানাইয়ের বাজনা। একটু কোথাও নিরিবিলিতে যদি শুয়ে থাকতে পারতাম।

একদা সে সুরযোগ ছিল আমার। সারা জীবনই নিরালাষ কাটিয়ে দিতে পারতাম আমি তারানন্দ পরমহংসের মঠে দশ টাকা ঠিকায় মা কালীর সেবা পূজা করে। মাথা গুঁজে থাকবার স্থানটুকু অঙ্ক ১০ মিলেছিল সেখানে। সেই আনন্দে মশগুল হয়ে পড়ে থাকতাম সিঁড়ির নিচের অন্ধকার ঘরে। দম ফাটবার উপক্রম হলেও কারও সঙ্গে একটি বাক্যালাপ কবতাম না। এই পিতৃ বৃদ্ধো সর্বপ্রথম টেনে বার করেন আমাকে সেই অন্ধকার ঘর থেকে। পরমাশ্রমের বেশে একদিন উদয় হন তিনি আমার সমাধি-গহবরে, অথও নির্জনতার মৃত্যুর মত শাস্তি নষ্ট করার জন্তে। সেদিন সন্ধ্যারতিব ৭ মন্দিব থেকে বেরিয়ে দারুণ চমকে উঠেছিলাম। সাদা চুল সাদা দাড়ি শুদ্ধ আমাব চেয়ে অন্ততঃ এক হাত উচু এক মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে অন্ধকার কোণায়। কে ও!

শুনছিলাম, তারানন্দের রহস্যম্ মঠে কত কি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদেরই কেউ হবেন মনে করে আর একটু হলে আতকে উঠেছিলাম আর কি! সেই মুহূর্তে

কানে গেল ধীর গভীর কণ্ঠস্বর !

“ব্রহ্মচারী, আমি কেদারঘাটের পিতৃ বুড়ো, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম বাবা।”

মাহুঘের গলা শুনে খড়ে প্রাণ ফিরে এল। তবু সেই মূর্তির দিকে চেয়ে স্থাপুং দাঁড়িয়েছিলাম।

আরও এগিয়ে এলেন তিনি। মন্দিরের আলো পড়ল তাঁর ওপর। ভাল করে দেখতে পেলাম তখন তাঁকে। হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে সাদা খান, মোটা স্ত্র এক গোছা পৈতা-গলায় এক শাস্ত্র শোম্য বুদ্ধ। আগেও কয়েকবার নজরে পড়েছে এই মূর্তি পথে-ঘাটে। কম্পিতকণ্ঠে প্রায় চুপি চুপি বললেন—“আমার ছেলেটা যদি বেঁচে থাকত, তার বয়স তোমার চেয়ে ঢের বেশি হত এখন। বুড়োমাহুঘ বিরক্ত করতে এসেছি বলে রাগ করছ না তো বাবা?”

এমন কিছু ছিল সে কণ্ঠস্বরে যে, আমাব বড মাধের দুর্ভেগু খোলসটা খসে পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কি উত্তর দিয়োছিলাম তাঁকে, তাও বেশ মনে আছে এখনও। বলেছিলাম—“বুড়ো বাপ সেধে দেখা করতে এলে ছেলে কি রাগ করতে পারে কখনও?”

উত্তর শুনে হু’হাতে আমায় বৃকে জাপটে ধরেছিলেন বুদ্ধ। আর একটি কথাও সেদিন তাঁর মুখ দিয়ে বাব হয়নি। তাঁর বৃকে কান পেতে আমি সেদিন শুনেতে পেয়েছিলাম এক অল্প জাতের ভাষা। সে ভাষা বৃকের ভাষা, তাতে কোনও ভেজাল ছিল না, কারণ তা মুখের ভাষা নয়।

দিনের পর দিন উন্নতি হতে লাগল কালীবাড়ি। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষের খাড়া মই বেয়ে ক্রমেই ওপর দিকে উঠে যেতে লাগলাম আমি। আর তফাতে দাঁড়িয়ে পিতৃ বুড়ো পরম ভূস্থিতে হাসতে লাগলেন আমার উন্নতি দেখে। ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ এই ধরনের একটা রহস্যময় জাল দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখলেন। সমঝদার ব্রহ্মার ভূমিকায় আগাগোড়া সার্থক অভিনয় করে গেলেন। কালীবাড়ির ঘূর্ণি হাওয়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারলে না।

অথচ কালীবাড়ির হাড়হুদ সর্বই ছিল তাঁর নখাগ্রে। পরমহংস তারানন্দের সাক্ষাৎ মন্ত-শিষ্য তিনি। গুরুর জীবদ্দশায় প্রবল প্রতাপ ছিল তাঁর কালীবাড়িতে। তাঁর মুখেই আমি শুনেছিলাম কালীবাড়ির অনেক গুপ্তাতিগুহ্য কাহিনী। কিন্তু কেন ঐ পিতৃবাবু অমন নিলিপ্ত হয়ে দূরে সরে রইলেন তাঁর গুরুর মঠের ছোয়াচ এড়িয়ে, শত চেষ্টা করেও তা জানতে পারিন কোনও দিন। আশ্রাণ চেষ্টা করেছি, তাঁকে কালীবাড়ির উৎসবাদিতে নামাতে—অভূত কায়দায় বিন্দুমাত্র

আঘাত না দিয়ে তিনি এড়িয়ে গেছেন।

কিন্তু আমার ওপর ছিল তাঁর কড়া নজর। মানুষের খোশামোদিত্তে আর সন্তুলক সিদ্ধপুরুষ পদের গরমে আমার মাথাটা ঘুলিয়ে না ওঠে, সেজন্তে তিনি চেষ্টার ক্রটি করেননি। উপদেশ না দিয়ে, শাসন না করে বা কারও নিন্দে না করে শুধু নিজের সাহায্য দিয়ে, তিনি আমায় রক্ষা করেছেন। একবার আমার বেশ শক্ত জাতের জ্বর হয়। তখন মাথার কাছে বসে রাত কাটিয়েছিলেন পিতুবাবু। সবই তিনি করেছিলেন, বাপের যা করা উচিত সাবালক ছেলের জন্তে। কিন্তু সামান্য একটা ব্যাপার, নির্জলা মিথ্যা একটা খ্যাতি আমার, পিতুবাবুর মত লোকের মাথা খারাপ করে দিলে। অতি সাধারণ লোকের মত তিনি বিশ্বাস করে ফেললেন যে, আমি একটি মহাগুণী সাধক মানুষ, বিশ্ব-সংসারস্থিত মানুষকে শুধু আমার এই পোড়া চোখের দৃষ্টি দিয়েই বশীভূত করে ফেলতে পারি। নিজেই অনেকের কাছে বলে বেড়াতে লাগলেন যে, তারানন্দের গদির উপযুক্ত মানুষ আমি। আর কোনও শক্তি থাকুক, না থাকুক, তাগানন্দে মত সর্বনেশে চক্ষু দু'টি আছে আমার। স্তত্রাং সকলের সাবধান হওয়া একান্ত উচিত।

আর কেউ সাবধান হোক না হোক, নিজে তিনি যথেষ্ট সাবধান হলেন। একটি দিনের জন্তেও তিনি আমাকে তাঁর বাড়ির দরজা পার হতে দিলেন না। বরং সুবিধা পেলেই উপদেশ দিতেন ব্রহ্মচারী মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে। তাঁর মতে। বিস্ময় ব্রহ্মচারীর কোনও গৃহস্থ-বাড়িতে না যাওয়াই একান্ত উচিত। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, কোনও দিন পিতুবাবুর বাড়ি থেকে কেউ এল না মা কালী দর্শন করতে। লোকের মুখে স্তনতাম, ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকে তাঁর স্ত্রী শয্যাশায়িনী হয়ে আছেন। আর থাকবার মধ্যে ছিল এক মেয়ে। সে মেয়ের মুখও ত্রিভুবনে কেউ কোনও দিন দেখতে পেত না।

রোজ ব্রাহ্মমুহুর্তে আসতেন পিতুবাবু। পাথর-বাধানো গালতে উঠত তাঁর লাঠির ঠকঠক শব্দ। বিছানায় শুয়েই স্তনতে পেতাম তাঁর স্তোত্রপাঠ :

কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ।

ত্রিলোচনোজ্জ্বলম্ৰেত্র স্ত্রী শিখা চ ত্রিলোকপাং ।

মন্দিরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে জপ করতেন পিতুবাবু। কখনও বসতেন না। মঙ্গলারাত শেষ হলে মাকে প্রণাম করে লাঠি ঠক ঠক করে ফিরে যেতেন। এই ছিল তাঁর নিত্যকর্ম, মঙ্গলারাতের সময় একটি দিনও ভ্রূপস্থিত হননি তিনি। কিন্তু অল্প কোনও সময় কালীবাড়ি চুকতেন না। বিশেষ পূজা-উৎসবের দিনে একবার আসবার জন্তে বিশেষভাবে অনুৰোধ করেছি, অন্ততঃ মায়ের প্রসাদ একটু

বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্তে মিনতি করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। একটু হেসে তিনি এড়িয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হলে বিকেলবেলা কেদারবাটে যেতে হত আমার। বাটে বসে তাঁর কাছ থেকে শুনতাম তাঁর গুরু তারানন্দের অমাহুযিক সব কীর্তিকাহিনী। শুনতাম, কি রকম জাঁকজমক ছিল তখন কালীবাড়িতে। কিন্তু মঠ ধ্বংস হয়ে গেল, মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি অভিচার-ক্রিয়া আর উদ্ধাম পঞ্চ-মকারের শ্রোতে তলিয়ে গেল তাঁর গুরুর স্মনাম ও মানমর্হাদা। বলতে বলতে পিতুবাবু আকুল হয়ে উঠতেন। জড়িয়ে ধরতেন আমার হুঁহাত। বলতেন, “সাবধান ব্রহ্মচারী, খুব সাবধান। এ বড় ভয়ঙ্কর পবীক্ষা। যেটুকু শক্তি পেয়েছে তা সামলে রাখাই সবচেয়ে বড় কথা। নথত নিজেও মরবে, অপরকেও মাঝবে।”

আপ্রাণ চেষ্টা করতাম তাঁকে বিশ্বাস করাতে যে, বিন্দুমাত্র কোনও শক্তি পাইনি আমি। সে জিনিস যে কি তা আমি জানিও না, বিশ্বাসও করি না। হুজুগে মেতে যাব যা খুশি বলছে। কিন্তু পিতুবাবুর মত মানুষ কি করে বিশ্বাস করেন তাদের কথা?

ফল হত একদম বিপরীত। পিতুবাবু ভাবতেন, আমি তাঁর চোখেও ধুলো দেবার চেষ্টা করছি। তাঁকেও ঠকাবাব চেষ্টা করছি বলে তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠত। বলতেন, “আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা কবে কোনও লাভ হবে না বাবা। তুমি যে কি পারো আর কি পাবে না, আমি তা ভাল কবে জানি। তোমার চক্ষু দু’টি দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমার ভয় হয়, নিজে তুমি কোনও দিন কারও ফাঁদে না পা দাও।”

কেটে গেল গোটা তিনেক বছর। এত উচুতে পৌঁছে গেলাম আমি যে, পিতুবাবুর কথা ভেবে তখন আর মন খারাপ হত না। একান্ত আপনার লোক হয়েও পিতুবাবু একটি দিনের জন্তে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন না তাঁর বাড়িতে, এজন্ত তাঁর ওপর রাগ অভিমান করবারও আমার ফুরলুং রইল না। তখন নাম-করা মানুষেরা সাধ্য-সাধনা করছেন আমাকে একবার তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্তে। উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, যারা ডক্টর শঙ্করীপ্রসাদের সমান দরের মানুষ তাঁরা আমার কৃপা লাভের জন্তে ধর্না দিচ্ছেন তখন। কাজেই একান্ত কাছের মানুষ হয়েও দিন দিন দূরে সরে গেলেন পিতুবাবু।

ইন্টিমধ্যে এমন একটি ব্যাপার ঘটে বসল যার ফলে পিতুবাবুর সব সতর্কতা ভুল হয়ে গেল। একান্ত যত্নে আমার সর্বনেশে চক্ষু দু’টির নাগালের বাইরে রেখেছিলেন তাঁর একমাত্র কন্যাকে। বাবা কেদারনাথের যোগসাজসে সেই

মেয়েই পড়ে গেল একেবারে আমার হাতের মুঠোয়। দু'ঘটনাটি ঘটে গেল কেদারেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে শিবরাত্রির দিন বেলা তিনটের সময়। অনেক বিচার বিবেচনা করে সেই অসময়ে পিতুবাবু মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন কেদারনাথের মাথায় জল ঢালাতে। কালীবাড়ির ভক্তদের ছেড়ে সেই সময় আমিও যে যাবো শিব-পূজা করতে, এ তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

যথারীতি কেদারনাথের একটিমাত্র দরজায় তুমুল সংগ্রাম চলেছে। এক দল মানুষকে মন্দিরে ঢুকিয়ে দরজা আটকানো হচ্ছে। তারা বার হতে না হতে এক-দল ময়িরা হয়ে বাঁপিথে পড়ছে দরজার ওপর। এক হাতে ফুলের সাজি আর এক হাতে দুধ-গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে, মানুষের চাপে এগিয়ে যাচ্ছি দরজার দিকে। নজরে পড়ল পিতু বুড়োকে। মাতৃশ্বের ধাক্কায় তিনি ছিটকে বোঁরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। সেই মুহূর্তে পিছন থেকে প্রচণ্ড চাপ পড়ল। আমরা অনেকগুলি লোক সেই চাপের চোটে দরজা পার হয়ে মন্দিরে ঢুকে পড়লাম।

তখন ফুলের সাজি আর জলের ঘটি হৃদ্ধ দু'হাত মাথার ওপর তুলে ধরেছি। মন্দিরের মধ্যে অন্ধকার, কোনও দিকে মুখ ফেরাবার উপায় নেই। এক সময়ে পৌঁছবই শিবের সামনে। তখন দুধ-গঙ্গাজল ফুল-বেলপাতা তাল ওপব ফেলে দিয়ে আবার মানুষের চাপেই বেরিয়ে যাবো মন্দির থেকে। এই হচ্ছে চিরকালের ব্যবস্থা, এইভাবেই শিবরাত্রির দিন আমাদের সব ক'টি প্রসিদ্ধ শিববাড়িতে বাবাদের মাথায় জল ঢালে লোকে। গুঁতোগুঁতি ঠেলাঠেলি আর হৃদয়-বিদারক চিৎকার, এইগুলি হচ্ছে আমাদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলির সবচেয়ে মারাত্মক মহিমা।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল, পেছন থেকে টান পড়ছে আমার কোমরের কাপড়ে। বেশ বুঝতে পারলাম মুঠো ক'রে কে ধরে আছে আমার কোমরের কাপড়। মুখ ফেরাবার উপায় নেই। কিন্তু বেশ মালুম হ'ল, যে ধরে আছে আমার কোমর, সে পুরুষ নয়। কবে ধরে আছে সে আমার কোমরে? কাপড় যাতে ধাক্কার চোটে ছিটকে না যায় অস্ত্র দিকে।

কোনও রকমে মানুষ গুঁতিয়ে এক কোণে গিয়ে দাঁড়ানো। সেও ঠিক পৌঁছে গেল আমার সঙ্গে। দু'জনে দেওয়ালের গায়ে চেপটে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন তার মুখ আমার কানের কাছে। কানে গেল দু'টি কথা, "আমি পিতু মুখ্যের মেয়ে, আমাকে বার করে নিয়ে চলুন মন্দির থেকে।"

বলেছিলাম, "যেমন ধরে আছে তেমন ধরে থাক, খবরদার যেন হাত না কসকায়।"

হাত কসকায়নি পিতুবাবুর মেয়ের। যথানিয়মে মানুষের চাপে আবার

বেয়িয়েও এসেছিলাম মন্দির থেকে ।

বাইরে পদার্পণ করেই আমার কোমর ছেড়ে দিয়েছিল সে । দূর থেকে দেখলাম, পিতুবাবু পাগলের মত খুঁজছেন মেয়েকে । একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে মেয়ে ছুটে চলে গেল বাপের কাছে । আমিও আবার মাহুকের ঠেলায় মন্দিরে ঢুকলাম । পূজাটা যে আমার সারা হয়নি তখনও !

শিবরাত্রির দিন কেদারেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে ঘটেছিল সেই তুচ্ছ ঘটনাটি । একমাত্র বাবা কেদারনাথ ছাড়া আর কেউ সাক্ষী ছিল না তার । প্রয়োজনও ছিল না অস্ত্র সাক্ষীর । অতি তুচ্ছ সাধারণ ঘটনা, হয়ত মনেও থাকত না আমার । কিন্তু পিতুবাবুই খোঁচাখুঁচি করে সেই সাধারণ ঘটনাকে অসাধারণ করে ছাড়লেন ।

তিন দিন পরে কেদারঘাটে বসে পিতুবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি কি হয়েছিল সেদিন মন্দিরের মধ্যে, কি আমি বলেছিলাম তাঁর মেয়েকে, তাঁর মেয়েই বা কি বলেছিল আমাকে । কোনও কথাই হয়নি আমাদের মধ্যে, সেই ভিড়ে আর গোলমালে আলাপ-আলোচনা সম্ভবই নয়, আর অত অল্প সময়ের মধ্যে কতটুকু আলাপ হওয়া সম্ভব ! নানা রকম প্রশ্নের জবাব দিলাম প্রাণপণে, কিন্তু পিতুবাবুকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না । তারপর পিতুবাবু বেমালুম ভুলে গেলেন সেদিনের ঘটনাটা । আর একটি দিনের জন্তেও একটি কথা উত্থাপন করলেন না সে সম্বন্ধে ।

তিনি ভুলে যান, কিন্তু মেয়েটিও যে অনায়াসে ভুলে যাবে সেদিনের ঘটনাটা, তা আমি ধারণা করতে পারিনি । আশা করে রইলাম যে, একবার অন্ততঃ পিতুবাবুর মেয়ে আসবে মঠে কালীদর্শন করতে বা পিতুবাবু নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন আমার তাঁর বাড়িতে । আশা করতে অবশ্য কেউ আমার পরামর্শ দেয়নি । নিজের গরজে আশা করলাম, আত্মীয়তার কাঙাল হয়ে উঠেছিলাম তখন, তাই অনর্থক আশা করে রইলাম । তারপর নিরাশ হলাম । ফলে রাগ, দুঃখ, অভিমান জন্মে উঠল মনের মধ্যে । বুঝলাম, ওঁবা নিজেদের আমার চেয়ে এত উচ্চস্তরের জীব বলে জ্ঞান করেন যে, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না আমাকে । সত্যিই তো, কালীবাড়ির পুরুতকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাবার কি এমন গরজ পড়েছে পিতুবাবুর, আর তাঁর কন্ডাই বা সেধে ভক্ততা দেখাতে আসবেন কেন সামান্ত পুরুতের কাছে ?

আট-আটটি বছর গড়িয়ে গেল আর একবার পিতুবাবুর কন্ডার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করতে । শুধু আটটি বছরই নয়, অনেকটা স্থানও পার হতে হ'ল আমার ।

কোথায় কান্না, কোথায় চট্টগ্রাম। এতটা পথ পার হয়ে দেখা হ'ল আমার সঙ্গে পিছুবাবুর মেয়ের। না, তা ঠিক নয়, আজ যার সঙ্গে পরিচয় হল তিনি অধ্যাপক স্বরেশ্বরবাবুর স্ত্রী। আর আমিও সেই কালীবাড়ির দশ টাকা দামের পুরুত নই, শহরের সবচেয়ে বড়লোক শেঠ ব্রজকিশোরলালের গুরুজী মহারাজ।

সুতরাং এবার ভদ্রতা দেখিয়েছে গৌরী। শুধু সাধারণ ভদ্রতা নয়, অসাধারণ আত্মীয়তাও দেখিয়েছে, মায় ছ' বিন্দু চোখের জল। আর কি চাই আমি? আর তো আক্ষেপ করবার মত কিছুই রইল না, স্বদে-আসলে আজ সব মিটিয়ে দিয়েছে গৌরী।

মনে মনে ঠিক করলাম, এখান থেকে যাবার সময় অধ্যাপকের স্ত্রীকে একখানি দামী বেনারসী কিনে দিয়ে যাব। টাকা, নোট, গয়না-গাঁটিতে বোঝাই লাল খেয়ের থলেটা রয়েছে সামনের থালার উপর। ফক্কডের সম্পত্তি, কিন্তু কোন্ চুলোয় নিয়ে যাবে ফক্কড গুলো বয়ে? কার কাছে গচ্ছিত রাখবে ঐ সম্পদ? ফক্কডের কি উপকারে লাগবে ঐ থলে-বোঝাই জঞ্জাল?

আপদ—আপদ জুটেছে এক গাদা। ইচ্ছে হ'ল, এক লাখি মেরে ফেলে দি খালা থলে সব কিছু সামনে থেকে।

কে কলকে বাড়িয়ে ধরলে সামনে। কলকে নিয়ে চোখ বুজে দিলাম একটা মোক্ষম টান। ওধারে তখন পিলু শেষ কবে গৌরীতে পৌঁছেছে সানাই।

চোখ চাইতে হ'ল আবার। দামী বেনারসী পবে কে একজন গলায় আঁচল দিয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করছে। পাশে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ব্রজকিশোরের পত্নী। প্রণাম সেরে সোজা হয়ে উঠে এসতে চিনতে পারলাম। সাজে-পোশাকে-অলঙ্কারে অপকণ মানিয়েছে অধ্যাপক মহাশয়ের স্ত্রীকে।

সানাই তখন গৌরী ছেড়ে পুরবীতে পৌঁছল।

মাহুষের নজর বেশি করে আকর্ষণ করার সং বাসনায় যে সব মহিলা ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা দেন, তাঁরা এক বিশেষ ধরনের অঙ্গুলিবিজ্ঞান জানেন। ছ'হাতের অঙ্গুলি-কটির সাহায্যে মুখের ওপরের ওড়না অল্প একটু তুলে ধরবার কায়দাটুকু সত্যিই দেখবার মত জিনিস। সেই সময় অঙ্গুলিগুলির যে চমৎকার ভঙ্গিমা দেখান তাঁরা, তার নাম হওয়া উচিত ওড়না-মুদ্রা। অবগুষ্ঠন-মুদ্রা তো শাস্ত্রেই আছে। পুরাণ শাস্ত্রকাররা ওড়না-মুদ্রার চিন্তা করা প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ আমাদের একটি দেবীর মুখও ওড়না-ঢাকা নয়। ভবিষ্যৎ শাস্ত্রকারদের ওড়না-মুদ্রার কথাটি চিন্তা করা উচিত। হয়ত কোনও প্রগতিবাদী শিল্পী ওড়না-ঢাকা

দেবীমূর্তিও বানিয়ে ফেলাতে পারেন।

শেঠজীর ঘরগী—গুড়না-মুজায় অল্প অবগুষ্ঠন সরিয়ে অনেক রকমের দামী পাখর-বসানো নখটি দেখিয়ে ফিসফিস করে নিবেদন করলেন যে, স্বরেশ্বরবাবুর জী এসেছেন নিমন্ত্রণ করতে। আরতি দেখার জন্তে মাড়োয়ারী মহিলাদের সমন্বানে নিয়ে যাবেন তাঁদের পূজামণ্ডপে। শেঠজীদেব আপত্তি নেই, এখন আমার অল্পমতি পেলেই হয়।

আমার অল্পমতির জন্তে ঠাঁদের যাওয়া আটকাচ্ছে! অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে।

চোস্ত হিন্দীতে গৌরী তখন তার আরজি পেশ করলে।

“নিজ্জেনের পূজা ছেড়ে অল্প পূজা দেখতে গেলে যদি কোনও অপরাধ হয় এই ভয় করছেন এঁরা। এখানের আরতি হয়ে গেলে আমি এঁদের নিয়ে যাব। এখানে আরতি তো একটু পরেই আরম্ভ হবে। আমাদের ওখানে আরতি হয় রাত ন’টার পর। কৃপা করে যদি আপনি আদেশ দেন—”

চোখ-মুখের ভাব, গলার স্বর, মায় হাতজোড় করে থাকা, সব মিলিয়ে একেবারে নিখুঁত অভিনয়। ভনিতা করা কাকে বলে তা জানে বটে গৌরী। ওর হাবভাব দেখে গান্ধী বজায় রাখা সহজ নয়! শিবনেত্র হয়ে রইলাম কিছুক্ষণেব জন্তে। তারপর শেঠপত্নীর দিকে চেয়ে হাসিমুখে ঘাড় নাড়লাম।

ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ হাতে প্রতিমার সামনে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বাঁশ দিয়ে ঘিরে মহিলাদের জন্তে আলাদা স্থান বানানো হয়েছে প্রতিমার ডান পাশে। শেঠানী গৌরীকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইলেন। গৌরী তখনতই পৈলে না, তখন সে জোড়হাতে ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছে। স্তবরাং তার ধ্যানভঙ্গ না করে শেঠানী একাই চলে গেলেন—তাঁর আপনজনদের কাজে। চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে যারা সাধু দর্শন করছিল, তারাও আরতি দেখতে দাঁড়াল গিয়ে প্রতিমার সামনে। সকলের দৃষ্টি প্রতিমার দিকে। অনেকক্ষণ পরে মাহুঘের দৃষ্টির আড়াল হতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আরতির সময় দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ম। আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। বাজনার তালে তালে পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি শিখা ওঠা-নামা করছে। সেইদিকে চেয়ে আছি। মাত্র দু’হাতের মধ্যে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে, মনে হ’ল যেন কি বলছে। ওহু দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। জোড়হাতে প্রতিমার দিকে চেয়ে আছে কিন্তু ঠোঁট নাড়ছে। কান পেতে রইলাম। ঢাক-ঢোলের তুমুল আগুয়াজের মধ্যেও কানে গেজ—“কাল একবার আমাদের ওখানে যাওয়া চাই কিন্তু।” আবার চাইতে হ’ল।

ওর দিকে। চোখে চোখে মিলল। মিনতি উথলে উঠেছে ওর চক্ষু দু'টিতে।

পঞ্চপ্রদীপ নামিয়ে অর্ঘ্যপাত্র হাতে তুলে নিলেন পুরোহিত। অপরাপ ভঙ্গিমায় অন্ন অন্ন কাঁপিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগলেন জলপূর্ণ শঙ্খটি প্রতিমার সামনে। একটি স্নিগ্ধ জ্যোতি ঘিরে রয়েছে মা-দুর্গার মুখখানি আরতির, বাজনাতেও উন্মাদনা নেই। প্যাণ্ডেল-ভর্তি মানুষ এতটুকু নড়াচড়া করছে না। সকলের একাগ্র দৃষ্টি মায়ের মুখের ওপর।

ঢাক-ঢোলের শব্দ ছাপিয়ে চিংকার উঠল কোথা থেকে—“আগুন! আগুন!” চমকে উঠে চারিদিকে দেখতে লাগলাম। “কৈ আগুন? কোথায় আগুন?”

ত্রিপল আর পাট পোড়ার গন্ধে দম আটকে এল। নজর গিয়ে পড়ল প্রতিমার পিছন দিকে। কুণ্ডলী পাকিয়ে বার হচ্ছে কালো ধোঁয়া। যেন অসংখ্য অজগর সাপ ফুঁসিয়ে উঠে তেড়ে আসছে মায়ের চারিদিক ঘিরে।

পুরোহিতের হাত থেকে খসে পড়ল শঙ্খটি। বন্ধ হয়ে গেল ঢাক ঢোল-কাসির বাজনা। আকুল আর্তনাদ উঠল—“আগুন। আগুন।” যে যেখানে ছিল সেইখানেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল চারিদিকে। বড় বড় ত্রিপল দিয়ে আটপেঠ মোড়া মণ্ডপটির মধ্যে নানা জায়গায় বাঁশ বেঁধে বেড়া দেওয়া হয়েছে মেয়ে-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা বানাবার জন্তে। বার হবার পথ মাত্র একটি, যার ওপর নহবতের ঘর ঠোরা হয়েছে সেই মূল তোরণটি। সমস্ত লোক একসঙ্গে আছড়ে গিয়ে পড়ল তোরণটির ওপর। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল তোরণটি। বাজনারাদরা তাদের বাগ্ময়সহ ছড়মুড় করে পড়ল মাহুঘের ঘাড়ের ওপর। ইলেকট্রিকের তার আনা হয়েছিল তোরণের ভিতর দিয়ে। সেই তার গেল ছিঁড়ে, ফলে সমস্ত আলো একসঙ্গে ঝপ করে নিভে গেল।

মণ্ডপের ভেতর তখন ধোঁয়ায় বোঝাই হয়ে গেছে। নিবিড় অন্ধকারে দম-আটকানো ধোঁয়ার মধ্যে উঠছে মেয়ে-পুরুষের করুণ আর্তনাদ। হঠাৎ তখন মনে পড়ল গৌরীর কথা। সেই মুহূর্তে থেয়াল হ'ল আমার একখানা হাত কে আঁকড়ে ধরে আছে। বুঝতে পারলাম, যে ধরে আছে সে ঠকঠক করে কাঁপছে।

কড় কড় কড়াৎ।

বজ্রাঘাতের মত শব্দ উঠল কোথা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘেন গোঁটাকতক বোমা ফাটল কোথায়। তারপর সব রকমের আগুয়াজ ছাপিয়ে উঠল দরোয়ানদের সমবেত কঠোর হুঁকার।

“ভাগো—ভাগো, টিনা ছুটতাই হায়।”

ঠিক সেই সময় আবার স্ট্রাইট দেখতে পেলাম প্রতিমাখানি। মা তখন অগ্নিবর্ষ খারণ করেছেন। আগুন ধরেছে চালচিহ্নে। লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ-অম্বর-সিংহ সব কটির মুখ আগুনের আভায় অজুত দেখাচ্ছে। বোল আনা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন সকলে। সবার উপরে মায়ের মুখখানির দিকে চাওয়া যায় না। জননী জেগেছেন, এ হচ্ছে সেই রূপ—

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুক্তকম্ ।

পপৌ পুনঃ পুনঃ পুনঃ জহাসাকর্ণলোচনা ॥

সেইদিকে চেয়ে ক্ষণিকের জন্তে সব ভুলে গেলাম।

হাঁ ফিরে এল একটা ভীতিবিহ্বল চাপা কণ্ঠস্বর শুনে। বুকের খুব কাছ থেকে সে বললে—“চল পালাই, পালাই চল এখান থেকে।”

মনে পড়ে গেল, বজ্রঙ্গবালীর মন্দিরের গায়ে ত্রিপল আলগা করে বাঁধা আছে আমার বাইরে যাওয়া-আসার জন্তে। গৌরীকে একরকম তুলে নিয়ে আন্দাজ করে ছুটলাম সেইদিকে। অন্ধকারে জায়গাটার ঠাহর পেতে দু’একবার ভুল হ’ল। তারপর নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলাম প্যাগুেল থেকে। পিছন ফিরে দেখলাম, পাট-গুদামটি লালে লাল হয়ে উঠেছে। লম্বা গুদামটির সর্বাঙ্গ দিয়ে সহস্রমুখ বৈশ্বানরের সহস্র লেলিহান জিহ্বা বার হচ্ছে। মনে পড়ে গেল কয়েক ঘণ্টা আগে শোনা পুরোহিতের আহুতি-মন্ত্র—“ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মানি স্বাধয় স্বাহা।”

দু’চোখ ফেটে জল এল। সর্বকর্মই স্থলরভাবে সাধন করলেন বৈশ্বানর। করবার আর কিছুই বাকি রাখলেন না। বাঁশের ওপর অজস্র ত্রিপল ঢাকা প্রকাণ্ড প্যাগুেলটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সভয়ে আমায় জাপটে ধরলে গৌরী। আগুনের আঁচে গা ঝলসে যাচ্ছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—“চল, পালাই এখন এখান থেকে।”

চারিদিক থেকে মানুষ ছুটে আসছে তখন। মানুষের সামনে পড়বার ভয়ে পাটগুদামের সামনে দাঁড়-করানো মালগাড়িগুলির আডাল দিয়ে ছুটে লাগলাম হুঁজনে। বড় বড় খোয়ায় হৌচট খেয়ে গৌরী দু’একবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলে আমাকে ধরে। তখন তার একখানা হাত চেপে ধরলাম শক্ত করে। তারপর কোন্ পথে কোথা দিয়ে ঘুরে কোথায় যে গিয়ে পৌঁছলাম, সে সম্বন্ধে হুঁজনের একজনেরও কিছুমাত্র খেয়াল ছিল না।

প্রথমে গৌরীর মুখেই কথা ফুটল। হঠাৎ সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর চারিদিকে চেয়ে সভয়ে বলে উঠল—“এ আমরা কোথায় এলাম?”

চমকে উঠলাম ! হু'পাশে অন্ধকার মাঠ, মাঝে মাঝে নিবিড় কালো বড় বড় টিলা, ঘর-বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই কোথাও । তবে ভাগ্য ভাল আমাদের যে পাকা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছি ।

বললাম—“তাই তো, কোথায় এসে পৌঁছলাম আমরা ? যাচ্ছিই বা এখন কোন্‌দিকে ?

ডানদিকে বহুদূরে অনেকগুলি আলো জ্বলছে । সেই দিকে দেখিয়ে গৌরী বললে—“ঐ যে আলো জ্বলছে, ওখানে গেলেই একটা উপায় হবে । চল, ঐ ধারেই যাওয়া যাক ।”

বললাম—“তাই চল, কিন্তু ও তো অনেক দূর—অতদূর হাটতে পারবে তুমি ?”

গৌরী তখন হাটতে শুরু করেছে, উত্তর দিলে না ।

রাস্তার মাঝখানে দিয়ে হাঁটছি হু'জনে । রাস্তায় বড় বড় গর্ত-খানা-খন্দ । ফকড়ের চোখ অন্ধকারে জ্বলে । ও বেচারী ঘরের বৌ, ও পারবে কেন অন্ধকারে চলতে । মুখ খুঁড়ে পড়তে পড়তে বৈচে গেল হু'একবার আমাদের ধরে । শেষে হাৎ বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—“আমার হাত ধরে চল গৌরী, নয়ত পড়ে দাঁত মুখ ভাঙবে ।”

হাত ধরলে গৌরী । কিছুক্ষণ পরে যেন নিজেই নিজেকে বলতে লাগল—“এইবার নিয়ে হু'বার হ'ল । তয়ানক একটা কাণ্ড না ঘটলে কিছুতেই আমাদের হু'জনের কাছাকাছি হবার উপায় নেই ।”

কিছুক্ষণ চুপচাপ । তারপর স্তনতে পেলাম আবার গৌরীর কণ্ঠস্বর । প্রায় চুপিচুপি বললে সে—“মনে পড়ে সেই শিবরাত্রির কথা ?”

বললাম, “পড়লেও কারও কিছুমাত্র শান্ত-ক্ষতি নেই হু'লে যা'র যে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তোমার, তার রূপায় এই মহাষ্টমীর রাতের কথাও বাড়ি গিয়ে বেমালুম মন থেকে মুছে যাবে তোমার ! এখন একবার যে কোনও উপায়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে হয় !”

বিলম্বী শব্দ করে বিদ্যুটে হাসি হেসে উঠল গৌরী । বললে—“না ভুললে চলবে ' কি করে আমার ? ভুলতে না পারলে হয় গলায় দড়ি দিতে হয়, নয়ত খোলা আকাশের তলায় রাস্তায় নেমে আলেয়ার পিছনে ছুটে মরতে হয় । মানুষের কাছ থেকেই মানুষের ব্যবহার আশা করা যেতে পারে । কিন্তু গিনি মানুষ নন, যার শরীরে দয়া-ময়া কিছুই নেই, সেই ' মের কড়া সাধক মহাপুরুষের কথা মনে রাখলে কপালে জোটে শুধু লাজনা যন্ত্রণা আর অপমান । যা হচ্ছে মরার বাড়ী,

শুধু শুধু দৃষ্টে মরে লাভ কি ?”

চুপ করে রইলাম। বলুক ওরা যা খুশি, যা বলে ওর তৃপ্তি হয় বলুক। বলে শান্তি পাক ও। ভাল করে জানি ওর কথার মূল্য কি। কালীবাড়ির দশ টাকা মাইনের পুরুতকে একবার দেখা দিতে তখন ওদের বাপ-বেটির সম্মানে বেধেছিল। সেই শিবরাত্রির পরে অনর্থক বুধা আশায় আমি দিন গুনেছিলাম। ঘুণাক্ষরে কেউ টের পায়নি আমার মনের অবস্থা। একটা নির্লজ্জ কাঙালপানা তখন পেয়ে বসেছিল আমাকে। মুখ বুজে তার ফলও ভোগ করেছিলাম। এই গৌরীর জন্তে অনেকগুলো রাতের ঘুম আমায় বিসর্জন দিতে হয়েছে সে সময়। সে ভুল আর একবার করব না। কিছুতেই স্বপ্নের বাবুর জ্বর নাকি কান্না শুনে। এখন আমি অনেক পোড খেয়েছি। এখন আমি একটি ঝামু ফকড়। ফকড়ের জন্তে আকাশ অরুণ হস্তে জল-বাতাস-আলো ঢেলে দেয়। তার চেয়ে বেশি আর কিছুই ওপর দাবিও নেই আমার, লোভও নেই।

গৌরী অবার আরম্ভ করলে—“কি লোভে আমার মাথাটা চিবিয়ে খেতে গেলে তুমি, তা তখন বুঝতে পারিনি। জানতাম না যে, ওটা তোমার একটা খেলা। সবাই বলত যে, শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে তুমি মানুষকে পাগল করে দাও। আমি তা বিশ্বাস করিনি। কেন বাবা আপ্রাণ চেষ্টায় আমাকে তোমার চোখের নাগালের বাইরে রেখেছিলেন, তা বোঝবার মত বয়সও নয় তখন আমার। তার-পর যেদিন ভাল করে বুঝতে পারলাম তোমাব খেলা, সেদিন কোথায় যে পোড়ার মুখ লুকাব তা ভেবে পেলাম না। যতগুলি চিঠি লুকিয়ে আমি পাঠিয়েছিলাম তোমায়, সবগুলি যেদিন আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বাবা মাথা-কপাল চাপড়ে-কাঁদতে লাগলেন, সেদিন—”

হাঁটা আমার বন্ধ হয়ে গেল। যে হাতটা ওর ধরেছিলাম, সেটাতে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে ওকেও থামালাম। কোনও রকমে মুখ দিয়ে বার হ’ল—“কি ? কি বললে তুমি গৌরী ?”

হাতটা ছাড়াব জন্তে মোচড়াতে লাগল গৌরী। দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগল—“ধাক, আর ঝাঁক সেজে কাজ নেই। যা বললাম তার প্রতিটি অক্ষর যে সত্যি, তা আমরা দু’জনেই ভাল করে জানি। আজ আমায় ভোলাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না তোমার। সে বয়স আমি পার হয়ে এসেছি। এখন আর ঐ চোখ দিয়ে তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না। ও চোখের দৃষ্টিতে আর এতটুকু বশীকরণের শক্তি নেই। তুমি এখন একটি বিষহীন চোঁড়া। আজ আর তুমি কোন সর্বনাশই করতে পারবে না আমার।”

আরও জোরে চেপে ধরেছিলাম ওর হাত। বোধ হয় প্রাণপণে চেষ্টা করে উঠেছিলাম—“ভুল, আগাগোড়া মিথ্যে। কাকে তুমি চিঠি লিখেছিলে? কে পেয়েছে তোমার চিঠি? কার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলে চিঠি? বল—বলতেই হবে তোমাকে।”

কে যেন আমার গলা চেপে ধরলে। আর একটি কথাও মুখ দিয়ে বার হ’ল না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন গৌরী আমার সামনে। অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি খুঁজতে লাগল আমার ছুই চোখে। স্পষ্ট দেখলাম, তার চক্ষু ছুঁটিতে যেন কিসের আলো ফুটে উঠেছে।

কয়েকটি মুহূর্ত নিঃশব্দে গাড়িয়ে গেল। কানে বাজতে লাগল একটানা ঝিঁঝিঁ পোকাকার ডাক। তারপর বেশ লম্বা একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল গৌরীর বুক খালি করে। কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করলে সে—“ভুল! কার ভুল? কোথায় ভুল হ’ল?”

ওর হাত ছেড়ে দিলাম। বললাম, “ভুল আমার ভাগ্যের। কালীবাড়ির তুচ্ছ পুরুতের দোষ সব। নয়ত কোন ছুতোয় অসম্ভবতঃ একবার তুমি দেবী-দর্শন করতে আসতে। কিংবা তোমার বাবা একটবার আমায় ভেঁকে নিয়ে যেতেন তোমাদের বাড়িতে। শবরাত্রির তিন দিন পরে কেদারঘাটে বসে তোমার বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাটলেন, মন্দিরের মধ্যে কি কি আলাপ হয়েছিল তোমার সঙ্গে আমার। সেদিন কিছুতেই তাঁকে সম্বুত করতে পারিনি জবাব দিয়ে। অত অল্প সময়ের মধ্যে সেই ভিড়ে যে কোনও আলাপই সম্ভব নয়, তা তিনি বিশ্বাস করেননি। বিশ্বাস তিনি না করুন, কিন্তু আমি ভাল করে বুঝেছিলাম যে, তুমি বলেছ তোমার বাবাকে, যে তোমায় মন্দির থেকে বার করে নিয়ে আসে। তারপর দিনের পর দিন আশা কবে রইলাম, হয় তুমি এক আসবে কালীবাড়িতে, নয় তোমার বাবা একবার ভেঁকে নিয়ে যাবেন আমায় তোমাদের বাড়িতে। কেউ আমায় আশা করতে পরামর্শ দেয়নি। কালীবাড়ির তুচ্ছ পুরুতকে তোমরা কি চোখে দেখতে, তা ঠিক বুঝতে না পেয়ে মহা ভুল করেছিলাম আমি। তার ফলও ভোগ করেছি। একটি প্রাণীও জানতে পারেনি, জালায় জলে মরেছি রাতের পর রাত—”

গৌরীর গলার স্বরে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। যেন একটা ক্রুদ্ধা ফণিনী হিসহিস করে উঠল—“তার মানে, একথানা চিঠিও পাওনি তুমি?”

“তোমার মাথা খাটাপ হয়ে গেছে গৌরী? কার চিঠি পাব আমি? কে আমায় চিঠি দেবে?”

“কালীবাড়িতে যে অঙ্ক বুড়ীটা থাকত, যাকে তুমি খাওয়াতে পরাতে, সেই বুড়ীটা আমার কোনও চিঠি দেয়নি তোমার হাতে ?”

উত্তরও দিলাম না আর । শুধু নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম ওর চোখের দিকে ; স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও । ঘন ঘন পড়ছে ওর নিঃশ্বাস, বুকেটা ওঠা-নামা করছে অস্বাভাবিকভাবে । তারপর ওর গলার স্বর একেবারে ভেঙে পড়ল—“উঃ, কত বড় শয়তানী সেই অঙ্ক বুড়ী ! আর কি ভয়ঙ্কর সব্ভয় করছে আমার বাবা ! নয়ত, নয়ত আজ আমাকে—”

কে যেন ওর গলা চেপে ধরলে । তারপর স্তনতে পেলাম অক্ষুট কান্নার শব্দ, যেন অঙ্ককারটাই কান্না চাপার চেষ্টা করছে ।

অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম দু’জনে । অনেকক্ষণ ধরে সেই কান্না চাপবার শব্দ স্তনতে পেলাম । অনেকদিন আগে কেদারেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে আমার পিঠের সঙ্গে লেপটে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, তার গায়ের উত্তাপ যেন স্পষ্ট টের পেলাম । তার চুলের মিষ্টি গন্ধ আবার আমার নাকে গেল বহুদিন পরে । সেই ভীকু চোখ দুটির অসহায় ব্যাকুল দৃষ্টি স্পষ্ট চিনতে পেরে দারুণ মোচড় খেলাম নিজের বুকের মধ্যে ।

সে দিনটি ছিল শিবচতুর্দশী—আর আজ মহাষ্টমী । আট বছর পরে আবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি দু’জনে, খোলা আকাশের তলায় জনমানবহীন মাঠের মধ্যে । রাত কত হবে এখন !

আকাশের দিকে চোখ ভুলে চেয়ে দেখলাম । শুক্লাষ্টমীর চাঁদ পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে ।

সেদিনকার সেই কুমারী মেয়েটির সঙ্গে আজকের এই অধ্যাপকের স্ত্রীর কত প্রভেদ ! আহা, এতক্ষণে হয়ত স্ত্রীর খোঁজে পাগল হয়ে উঠেছেন অধ্যাপক মশাই, আর তাঁর বৃদ্ধ শ্বশুর মেয়ের শোকে মাথা খুঁড়ে মরছেন । না, আর দেয়ি করা কিছুতেই উচিত হবে না । বললাম—“এবার চল তোমায় পৌঁছে দিই । হয়ত এতক্ষণে তাঁরা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, হয়ত এখন—”

বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করলে গৌরী—“কোথায় যাবো ? কেন যাবো ?”

অকুত প্রশ্ন, কি জবাব দেব ! চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম ।

একটু সামলে নিয়ে গৌরী বলে যেতে লাগল, “দুখ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলে তুমি । তোমার খেয়ে তোমার পরে সেই বুড়ীটা বেঁচেছিল । তুমি চলে যাবার পর তাকে ঘাটে বসে ভিক্ষে করতে হয় । যখন মরল তখন দেহটা তুলে নিয়ে গেল ভোমোহা । কত দিন তাকে আমি লুকিয়ে থাইয়েছি, চুরি করে টাকা-পয়সা দিয়েছি,

তাকে। আর শয়তানী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আগাগোড়া। হঠাৎ তুমি চলে গেলে কাশী ছেড়ে, আমি পড়লাম রোগে। রোগে পড়েও কত খোশামোদ করেছি বুড়ীকে, যা-হোক একটু তোমার কাছ থেকে লিখিয়ে আনবার জন্তে। আমার চিঠির উত্তর তার মুখে পাঠাতে তুমি। কি বিক্রী জ্বাকামি সে সব! তখনই আমার সন্দেহ হত, তোমার মত লোক অতটা বে-ছাঁশ হয়ে ওসব কথা বলতে পারে না বুড়ীকে। তবুও তোমার হাতের একটু লেখা পাবার জন্তে বুড়ীকে পীড়াপীড়ি করতাম আর ঘুষ দিতাম। আর বুড়ী আমায় বলত যে, লিখে উত্তর দিতে তুমি ভয়ানক ভয় পাও। তারপর সেই অস্থির সময়ই এল তোমার প্রথম চিঠি।”

সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে শুনে প্রায় দম বন্ধ হয়ে এসেছে আমার তখন।

কোনও ক্রমে মুখ দিয়ে বার হ’ল, “কোথা থেকে পাঠিয়েছি সে চিঠি আমি? কি লেখা ছিল সেই চিঠিতে?”

যেন মরা মানুষে কথা বলছে, এমনভাবে বলে গেল গোরী :

“যা লেখা ছিল তোমার চিঠিতে, তা পড়ে আমার মনে হয়েছিল কোনও উপায়ে উঠে দাঁড়াবার শক্তি থাকলে আমি গলায় দড়ি দিতাম। আমার বাবাকে তুমি লিখেছিলে চিঠিখানা দিল্লী না হরিদ্বার থেকে, আর তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলে বাণ্ডুল বেঁধে আমাব সব ক’খানি চিঠি। লিখেছিলে তুমি—আপনার কঙ্কার গুণরাশি আপনাকে জানাবার জন্তে তার সব চিঠিগুলি এই সঙ্গে পাঠালাম। আমি ব্রহ্মচারী মানুষ, আমার কোনও ক্ষতি সে করতে পারেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি সাবধান হবেন।”

অতি কষ্টে উচ্চারণ করলাম, “তারপর গোরী—তা:পর?”

বোধ হয় আমার সেই মর্মভেদ কণ্ঠস্বর শুনেই সে চমকে উঠল। এবার আমার একখানা হাত ধবে ফেললে সে। বললে, “থাক, আর দরকার নেই শুনে তোমার। চল ফিরি এবার। তারপর আব কিছুই নেই। তারপর একবার কাশীতে বটে গেল, কলকাতায় তুমি মরে গেছ উত্তরকাশীতে। তারপর গোরীও মরে গেল একদিন।”

চূপচাপ ছ’জনে হাঁটতে লাগলাম। বহুবার ছ’জনের গায়ে গা ঠেকল। বহুকণ ছ’জনে হাঁটলাম পাশাপাশি। দূরের আলো কাছাকাছি এসে গেল। চিনতে পারলাম, রেল স্টেশনের দিকেই এগি’স চলছি আমরা।

আবার গোরীই প্রথমে কথা বললে—“মতি কথা বলবে ব্রহ্মচারী, একটি খাঁটি জবাব দেবে আমায়?”

বললাম, “মিথ্যে কথা আমি সহজে বলি না গৌরী, গুরুতর প্রয়োজন হলে মৌনব্রত ধারণ করি। বল, তুমি কি জানতে চাও আমার কাছে ?”

“লজ্জাও করে সে-কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতে। তবু বড় জানতে ইচ্ছে করে একবার মাত্র আমার মন্দিরের মধ্যে দেখে কি লোভে তুমি বশীকরণ করতে গেলো ? কি এমন দেখেছিলে আমার মধ্যে যে, তৎক্ষণাৎ একেবারে মাথাটা খেয়ে দিলে আমার ? আর করলেই যদি সর্বনাশটা, তাহলে অন্ততঃ একবার আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলে না কেন ? তুমি তো ভাল করেই জানতে তোমার নিজের বিস্তার গুণ, তোমার ঐ চোখ দু’টি দিয়ে যখন যার সর্বনাশ করবার ইচ্ছে হয়, অনায়াসে করতে পারো তুমি। আমার মাথাটা খেয়ে আমাকে দৃষ্টে মারবার জন্তে ফেলে রেখে গেলে কেন ? ও ভাবে একটা নিরপরাধ মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়ে কি সুখ পেলে তুমি ?”

আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে ওর দুই কাঁধ ধরে চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “কি হলে তুমি বিশ্বাস করবে গৌরী, বশীকরণ কি ব্যাপার তাও আমি জানি না। যদি এখনই ঐ চোখ দুটো নষ্ট করে ফেলি, তাহলে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে ?”

সভয়ে গৌরী দু’হাত দিয়ে আমার চোখ-মুখ চেপে ধরলে। সেই মুহূর্তে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে একটা কালপৈচা উড়ে গেল কি একটা শিকার মুখে নিয়ে। শিকারটা চিঁ চিঁ করে টেঁচাচ্ছে তখনও।

ভয়ানক চমকে উঠল গৌরী ওপর দিকে চেয়ে। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—“চল স্নানচারী, চল পালাই এখান থেকে।”

শব্দ করে ওর একথানা হাত ধরে বললাম, “চল।”

হঠাৎ এক সময় নজর পড়ল নিজের কাপড়-চাদরের দিকে। পবে আছি শেঠ ব্রহ্মকিষণের দেওয়া মহামূল্য সেই গরদের কাপড়-চাদর। একটি দাঁর্বখাস বেরিয়ে এল বুক খালি করে। হায় এখন আমি ফক্কড়ও নই। আর একবার আমার জাত নষ্ট হ’ল।

কাল সপ্তমীর দিন গজার-ঘাটে-পাওয়া প্রতিমাথানির কথা মনে পড়ে গেল। যারা বিসর্জন দিতে এনেছিল, তাদের কাছ থেকে বড় স্পর্ধা করে কেড়ে নিয়েছিলাম মাকে। আমার মত ফক্কড়ের পূজা মা গ্রহণ করবেন কেন ? মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় দাউ দাউ করে জলে গেল আমার চোখের সামনে প্রতিমাথানি। পুণ্ডে ছাই হয়ে গেল ফক্কড়ের স্পর্ধা। ফক্কড়ের হঠাৎ—নবাবী ছাই হয়ে উড়ে গেল আকাশে। চক্ষের নিম্নে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ভাগ্যদেবতা যে, খোলস,

পালটালেই সব কিছু পালটানো যায় না। হাংলার মত কোনও কিছুর জন্তে হাত বাড়িয়েছে কি হাতে ফোঁকা পড়বে। আগুনের আঁচে হাত আর মুখ দুই-ই পুড়ে কালো হয়ে যাবে।

তাঁই হয়েছে। এই মুখ নিয়ে দিনের আলোয় আর চট্টগ্রাম শহরে টেকা যাবে না এক দণ্ড। কি করে এখন গিয়ে দাঁড়াব আমি মারোয়াড়ীদের সামনে? সর্বনাশ হয়ে গেল ওদের, হয়ে গেল আমার জন্তেই। এই সর্বনাশী দুর্গাকে তুলে নিয়ে গিয়ে না বসালে হয়ত এত বড় সর্বনাশটা হত না ওদের। এতটুকু কারও উপকারে লাগে না ফকড়। ফকড়ের পোড়া কপালের ওপর আতর ঢাললে বা চোখের জল ফেললে নিজের কপালেও আগুন লাগে।

নিজের চিন্তায় ডুবে পথ চলছিলাম। হাতে টান পড়ল। গৌরী বললে—“এঁ যে দেখা যাচ্ছে স্টেশন। একথানা গাড়ি ভাড়া কর। অনেক রাত হয়েছে, ভাড়া-ভাড়া পৌঁছতে হবে বাসায়।”

হাত ছেড়ে দিলাম। অত রাতে গাড়ি পাওয়া সহজ নয়। পাঁচটা টাকা দিতে রাজী আছি বলাতে একজন ঘোড়া খুঁজতে বাদ চ’ল। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়া ধরে এনে গাড়িতে জোতা হল যখন, তখন স্টেশনের বাড়িতে একটা বাজল। মনে মনে ঠিক করলাম, গৌরীকে নামিয়ে দিয়ে সেট গাড়িতেই আবার স্টেশনে ফিরে আসব, তারপর সামনে যে ট্রেন মেলে—কাল দিনের আলোয় এ মুখ কেউ যেন না দেখতে পায় এ দেশে।

ঝড় ঝড় ছড় ছড় শব্দে চলল গাড়ি। চাটগাঁব নিজস্ব ভাষায় ঘোড়া দুটিকে আপ্যায়িত কবে অনর্গল বকছে গাড়োয়ান—তাব সঙ্গে উঠছে চাবকের সাঁই সাঁই আওয়াজ। সামনাসামনি দু’জনে বসে আছি আগর। কাবও মুখে কোনও কথা নেই।

হঠাৎ গৌরী বললে—“এঁ নাও ধরো।”

“কি। কি ওটা?”

“তোমার সেট লাল থলেটা, যার মধ্যে টাকা-কড়ি বোঝাই ছিল।”

“ওটাকে তুমি পেলে কোথায়?”

“আগুন-আগুন শুনেই আমি ওটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম। এতক্ষণ আমার জামার ভেতরে ছিল। এখন মনে পড়ল।”

হাঁ করে চেয়ে রইলাম থলেটার দিকে। তারপর নইলাম গৌরীর দিকে। চিরন্তনী নারী—শুভ্রাকালেও পোঁটলার কথা ভুলতে পারে না।

গৌরী বললে—“থলেটা এবার বেশ করে বেঁধে রাখ কোমরে। এখান থেকে

পালাতে হলে টাকার দরকার। এখন আর কিছুতেই এখানে থাকা চলে না তোমার, যার যা মুখে আসবে বলবে। তোমার মহিমাও মা-দুর্গার সঙ্গে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শেঠজীরা আবার উল্টে কোনও ফাসাদ না বাধালে বাঁচি। এতক্ষণে তোমার ভক্তরা হয়ত তোমার রক্ত পান করার জন্তে হন্তে হয়ে উঠেছে।”

মনে মনে মানলাম গৌরীর কথাটা। থলেটা নিয়ে কোমরের কাপড়ের সঙ্গে কবে বেঁধে ফেললাম। বেশ উঁচু হয়ে উঠল উদরটি। উঁচু জাতের বিলাতী কুকুরের মত ফকড়ের উদর পিঠের সঙ্গে লেগে থাকা নিয়ম। পেটে হাত বুলিয়ে বুঝলাম, নেহাত বেমানান হয়ে উঠেছে সেখানটা।

বেশ কিছু রসদ বাঁধা রয়েছে পেটে। তার অনিবার্য ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল মাথার মধ্যে। নিরালস্য নিঃশ্বের আর যত দুঃখই থাকুক, থাকে না ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথার মধ্যে প্যাচ কষবার যন্ত্রণা-ভোগ। এই জন্তেই ফকড় স্থখী ফকড় শুধু নকড় বলেই রাজার রাজা। পেটে-বাঁধা থলেটার টাকা-পয়সাগুলো দারুণ গোলমাল বাধালে মাথার মধ্যে।

ফকড়ের নিজস্ব চলন চলতে হবে না এখন কিছু দিন। সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, অদৃশ্যভাবে নেমে উঠে আর উঠে নেমে, বেকির তলায় শুয়ে আর বাথরুমের মধ্যে বসে ট্রেন-জমণ নয়। হিসেব করা সময়ের মধ্যে যেখানে খুশি গিয়ে পৌঁছে যাব।

কিন্তু গিয়ে পৌঁছবার সেই স্থানটির নাম কি ?

কে বলে দেবে কোথায় গিয়ে নামতে হবে ফকড়কে ?

গৌরী বলে উঠল, “থামাও, থামাও। থামাতে বল গাড়ি এখানে। বাঁ দিকের ঐ গলির ভেতর দিয়ে যেতে হবে আমাদের।”

মুখ বাড়িয়ে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে বললাম।

তারপর ?

গাড়ি থেকে নেমে মাটির ওপর পা দেবার পর-মুহূর্তেই মাটি ফুঁড়ে সামনে আবির্ভূত হ’ল একটি মূর্তিমান ‘তারপর’। দুই চোখ লাল করে দু’হাত মেলে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “তারপর কি করতে চাও তুমি ?”

ভয়ানক ঘাবড়ে গেলাম। সত্যিই তো কি করতে যাচ্ছি আমি গৌরীর সঙ্গে ? কেন যাচ্ছি আর ? আর একবার ওর সঙ্গে ওর বাড়িতে গিয়ে কি লাভ হবে আমার ? পিতৃ বুড়ো আর এক প্রাঙ্গ কাঁছনি গাইবেন, স্বদেশর আর একবার চুটিয়ে আদর-আপ্যায়ন করবে। তার গৃহিণীকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনেছি বলে

একটু বেশি করে কৃতজ্ঞতা জানাবে। আর গৌরী সাজাতে বসবে জলখাবারের থালা।

কিন্তু তারপর ? তারপর কি ?

পা ছুটো যেন গেড়ে বসে গেল মাটিতে। এক হাতে গাড়ির দরজা ধরে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গলির ভেতর কয়েক পা এগিয়ে গেল গৌরী। এগিয়ে যেতে যেতে বললে—
“গাড়োয়ানকে সঙ্গে নিয়ে এস। বাড়ি গিয়ে ভাড়া দিয়ে দোব।”

কথাটা বলে সাড়া-শব্দ না পেয়ে পিছন ফিরে দেখলে। পিছনে কাউকে আসতে না দেখে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর আবার ফিরে এল গাড়ির কাছে।

“কি হ’ল ? দাঁড়িয়ে রইলে যে ?”

আমার গলা দিয়ে শুধু বার হ’ল—“আর কেন ?”

আরও আশ্চর্য হয়ে গেল গৌরী—“তার মানে ? আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে এখান থেকেই তুমি চলে যাবে নাকি ? তাহলে কি বলব আমি তাদের ? কোথায় এতক্ষণ কাটিয়ে এলাম, তার জবাব কি দোব আমি ?”

বিশ্ময়-ব্যাকুলতা-ত্রাস এক সঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠেছে গৌরীর কর্ণধরে। গাড়ির মিটমিটে আলো পড়েছে ওর মুখের ওপর। ওর অসহায় চক্ষু দু’টির দিকে চেয়ে যেন চাবুক খেলাম পিঠে।

তাই তো ! এতক্ষণ কোথায় কাটালাম আমরা ? কি করে কাটল এতটা সময় ? কেন এত দেরি হ’ল ফিরতে ? এই রকমের শত শত প্রশ্নের সমুদ্রের দিতে হবে যে এখনই। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে গেলে কোন্ দিকে কতটুকু সুরাহা হবে, তা ঠিক বুঝতে না পেরে ওর চোখ দু’টির দিকে চেয়ে রইলাম।

দপ করে জ্বলে উঠল গৌরীর চোখ।

“তুমি কি সত্যিই মাছুষ নও ? এভাবে আমাকে এখানে ফেলে পালালে কি অবস্থা দাঁড়াবে আমার, তাও কি চুকে না তোমার মাথায় ? কোন্ মুখে এখন আমি দাঁড়াব তাদের সামনে গিয়ে ?”

কান্নায় না উৎকণ্ঠায়, ঠিক বলতে পারব না, ওর কর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেল।

খুব জোরে একটা ঝাঁকানি দিলাম নিজের মাথায়। গাড়োয়ানকে বললাম—
“মিঞা সাহেব, এখানে একটু থাকো গাড়ি নিয়ে। এই গাড়িতেই আমি ফিরে যাবো স্টেশনে। আবার পাঁচ টাকা পাবে তুমি।” বলে কান্নায় থেকে ধলে বার করে তার হাতে পাঁচটি টাকা দিলাম।

গৌরীকে বললাম—“চল এবার, কিন্তু আমার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে যে তোমার

কতটুকু উপকার হবে, তা বুঝতে পারছি না।”

গলিটা পার হতে ছ’ মিনিটও লাগল না। দরজার গায়ে হাত দিয়ে গৌরী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পিছনে আমাকেও দাঁড়াতে হ’ল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে কার গলার স্বর—কে কথা বলছে।

একটু সময় লাগল কথাগুলি স্পষ্ট বুঝতে। পিতুবাবুর গলা, আন্তে আন্তে থেমে থেমে কথাগুলি বলছেন তিনি, বেশ কষ্ট হচ্ছে তাঁর কথা বলতে।

“তোমার কোন দোষ নেই বাবা, সব দোষ আমার এই পোড়া কপালের। তাকে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, তোমাদের পাঠালাম তার কাছে। এখনও যে তার মনে আমার সর্বনাশ করার ইচ্ছে লুকিয়ে আছে, তা সন্দেহ করতে পারিনি। মৃত্যুকালে চরম ভুল করলাম। বুক দিয়ে মেয়েটাকে ঝাচিয়েছিলাম তার সেই সর্বনেশে চোখ দুটোর নাগাল থেকে। নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম তোমার হাতে তাকে তুলে দিয়ে। যাতে ওদের ছ’জনের চোখে চোখ না মেলে, তার জন্তে বহু ছল-চাতুরী করতে হয়েছে আমাকে। সব শেষ হয়ে গেল। এত দিনেব এত চেষ্টা, এত সাবধান হওয়া, সব নিজে পণ্ড করে দিলাম।”

শেষটুকু বলতে যেন বুক ভেঙে গেল পিতুবাবুর। গৌরীর দিকে চেয়ে দেখলাম। দরজার গায়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। আবার সেই মর্মান্তিক হাহাকার ভেসে আসতে লাগল বাড়ির ভেতর থেকে।

“আজ আর তোমার কাছে কোনও কথা লুকোবো না স্বরেশ্বর, আর তোমায় ঠকাবো না আমি। তোমায় মানুষ করে দাঁড় করিয়ে দোব, তোমার হাতে তোমার বাক্য সম্পত্তি বুঝিয়ে দোব, এই প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম আমি তোমার বাবার মৃত্যুকালে। আজ তুমি মানুষের মত মানুষ হয়েছ, পাঁচজনের একজন হয়ে দেশের শিক্ষিত সমাজে স্থান পেয়েছ। তোমার হাতে তোমার বাবার সম্পত্তি দিতে পেরে খালাস পেয়েছি আমি। অনেকগুলো বছর তোমার জন্তে আমি দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি। নাবালক ছেলেটিকে পথে বসালাম না দেখে লোকে ধন্য ধন্য করেছে আমাকে, আমার মত সামান্ত মানুষের এত বড় নির্লোভ নিঃস্বার্থপরতা দেখে তাক লেগে গেছে সকলের। কিন্তু তারা কেউ জানতো না যে, একদিন তোমার গলায় একটি কাল-সাপিনীকে ঝুলিয়ে দেবার বাসনা বুকে পুরে আমি তোমাব পরম হিতৈষী সাজে বসে ছিলাম। তুমি বড় হয়েছ, একটার পর একটা পরীক্ষায় পাশ করেছ, তোমার বাবার টাকা তোমায় পঠিয়েছি আমি, আর মনে মনে দিন গুনেছি, কবে তোমার চরম সর্বনাশটুকু করতে পারব, কবে তোমার জীবনটা বিধিয়ে দিতে পারব সেই চিন্তায় রাত জেগে কাটিয়েছি।”

উদ্ভেজনায় কাঁপতে লাগল পিতৃবাবুর গলা ।

“জ্যাস্ত কালকেউটের বাচ্চা, ওই মেয়ের শিরা-উপশিরার মধ্যে বইছে বিধ, তারানন্দের রক্তের বিধ । মায়ের পেটে থাকতে সেই বিধ খেয়ে ও বেড়েছে, ওর হাড়-মাংস-রক্ত-মজ্জা তৈরী হয়েছে সেই বিধ থেকে । পেটে থাকতেই ওর মা ওকে নিকেশ করে দিতে চেয়েছিল । আমি বাধা দিয়েছিলাম, ভূমিষ্ঠ হবার পর কেড়ে নিয়েছিলাম ওর মায়ের কাছ থেকে । আমার বিশ্বাস ছিল, এক ফৌটা মায়ের দুধ যদি ওর পেটে না যায়, যদি কাম্বিনকালে ওর জানতে না পারে কোন্ মায়ের পেটে জন্মেছে, তাহলে বিষক্রিয়া শুরু হবে না ও দেহ-মনে । ভুল ভুল, কালকেউটের বাচ্চাকে দুধ-কলা দিয়ে পুষলেও তার বিধ যাবে কোথায় ?”

অনেকক্ষণ কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না । সন্ন গলিটার মধ্যে দম আটকে এল আমার । মনে হ’ল, আকাশ নেমে এসেছে একেবারে মাথার ওপর । আকাশের চাপে এবার পিষে মারা যাবো । একেবারে আমার বুকের কাছে দরজার গায়ে লেগে আছে আর একটি প্রাণী । ওর লাল বেনারসীর রঙ পালটে গেছে । চিকচিকে কালো জেল্লা ঝিকরে বার হচ্ছে ওর সর্বাঙ্গ থেকে । ঘোমটা খসে পড়েছে, দুটো স্ফাপর কাঁটা গোঁজা রয়েছে থোঁপায় । থোঁপাটা যেন সাপের ফণা, কাঁটা দুটো সাপের দুই জলন্ত চক্ষু । ফণা তুলে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সাপটা । একটু নড়লে চড়লেই মারবে ছোবল ।

আমার দুই চোখ জ্বালা করে উঠল । কি একটা যেন ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আটকে গেল গলায় । কয়েক ঘণ্টা আগে এই কাল-সাপিনীকে তুলে নিয়ে পালিয়েছিলাম জলন্ত প্যাণ্ডেল থেকে । ইচ্ছে হ’ল, তৎক্ষণাৎ আর একবার তাকে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাই সেই দম-আটকানো গলিটার ভেতর থেকে । সেখানে ছিল আগুন আর এখানে নেই একবিন্দু বাতাস । আকাশ নেমে এসেছে মাথার ওপর, দু’পাশে অন্ধকার—নিরোট পাঁচিল, সাদা বন্ধ দরজা । পিছনে পালাবার পথটি খোলা আছে এখনও । একটু পরে যদি পিছনের পথও বন্ধ হয়ে যায় ! তখন দম আটকে মরা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না ।

হাত তুললাম, ওর কাঁধ ধরে টেনে আনবার জন্তে হাত বাড়লাম । সেই মুহূর্তে আবার কানে এল একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর ।

“ওর বাবা কে ?”

ধমকে খেমে বইল কয়েকটি মুহূর্ত । আবার শুনতে পাওয়া গেল সেই ধমধমে গলা ।

“তারানন্দের মেয়ের স্বামী বড় ছেলে জন্মাবার আগেই নিরুদ্ধেশ হয়ে যায় ।

তায়ও অনেকদিন পরে জন্মায় এই মেয়ে ।”

“তাহলে ওর বাপের কি কোনও পরিচয়ই নেই ?”

“আছে, স্বরেশ্বর আছে ! বাপের পরিচয়ই আছে তার—”

কে যেন চেপে ধরলে পিতৃ বৃদ্ধের মুখ ।

হঠাৎ সামনে থেকে আমি একটা ধাক্কা খেলাম । আমাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল গৌরী, পরমুহুর্তে দুর্দান্ত বেগে আছড়ে গিয়ে পড়ল দরজার ওপর । সে আঘাত সহ্য করতে পারল না দরজাটা, ভেতরের খিল ছিটকে বেরিয়ে গেল । খোলা দরজা পার হয়ে গৌরীও ছিটকে গিয়ে পড়ল উঠানের ওপর । চক্ষের নিমেষে উঠে দাঁড়াল সে, এক লাফে রোয়াকের ওপর উঠে সামনের খোলা দরজার হুঁপাশে হুঁহাত দিয়ে দাঁড়ালো । কয়েকটি মুহূর্ত—সব নিস্তব্ধ । তারপর একটা তীব্র চিংকার চিরে ফেললে অন্ধকার আকাশটাকে ।

“বল, বল শিগ্গির কে আমার বাবা ?”

ঘরের ভেতর থেকে আলো পড়েছে গৌরীর দেহের ওপর । ওর পিছন দিক অন্ধকার । অস্ফুট দেখাচ্ছে দৃশ্যটা, ঠিক যেন একখানি ছবি । দরজাটা হচ্ছে ছবির ফ্রেম । ফ্রেম-আঁটা একখানি ছবি । অন্ধকারে একটি দেহের চারিদিক দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে । জ্যোতির্ময়ী আধার-কন্ডা ।

বুক-ফাটা আর্তনাদ করে উঠল গৌরী—“বল, বল দয়া করে আমার বাবা কে ?”

উত্তর শোনার জন্তে আকাশ-বাতাস-বিশ্বচরাচর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে । সেই নিরুদ্ধ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটানা ভেসে আসতে লাগল একটা গোড়ানি ।

“সর্বনাশী; এই জন্তেই একদিন তোকে তোর রাক্ষসী-মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বৃকে করে বাঁচিয়েছিলাম আমি ? তোর গর্ভধারিণীর পরিচয় মুছে দিতে চেয়েছিলাম তোর কপাল থেকে ? জন্ম দিয়েছিলাম বলে মুখ বুজে বোল আনা ফল ভোগ করেছি । তবু তোকে রক্ষা করতে পারলাম না, যে বিষ তোর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে সে বিষের ফল ফলে তবে ছাড়ল ।”

প্রাণহীন ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে গৌরী । স্বরেশ্বরের কথা শোনা গেল, একান্ত নিরাসক্ত তার কণ্ঠস্বর ।

“কেন আবার ফিরে এলে এখানে ?”

আবার নিস্তব্ধতা । আমার চোখের সামনে ফ্রেম-আঁটা আলো-ঘেরা কালো ছবিখানি নিখর নিম্পন্দ হয়ে রয়েছে । পাষাণের মত ভারী সময় এতটুকু নড়ছে না । নিজের বৃকের মধ্যে ধক্ধক শব্দও শুনতে পাচ্ছি আমি তখন ।

নিস্তরক পুত্রে একটা মস্ত চিল ছুঁড়লে কে। আকাশের দিকে ছিটকে উঠল অনেকটা জল। অনেকগুলো ঢেউ উঠল জলের বুকে।

“যাও, দূর হয়ে যাও। দিনের আলোয় ও মুখ আর দেখিও না এখানে। আগুনে পুড়ে মরেছে এই ধারণা করবে সকলে।”

স্বরেশ্বরের বলা শেষ হ’ল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন পিতুবাবু।

“যা, যা, পুড়িয়ে ফেল তোর ঐ পোড়ার মুখ। তোকে স্থখী করবার জন্তে আজীবন আমি জলেপুড়ে মরেছি। এব’র তুই মর। তুই মরেছিস জেনে তবে যেন আমি মরি।”

টলতে টলতে নেমে এল গৌরী। উঠান পার হয়ে দরজার সামনে এসে পৌঁছল। ধরে ফেললাম তার একখানা হাত। মুখ তুলে সে চাইল একবার আমার দিকে। তারপর মাথা ঝেঁট করে হু হু করে কেঁদে উঠল।

চিৎকার করে উঠলাম আমি, “স্বরেশ্বরবাবু?”

গোয়াকের ওপর থেকে ধীরে শান্তকণ্ঠে সাড়া দিলে স্বরেশ্বর—“বলুন!”

“কেন তাড়িয়ে দিচ্ছেন গৌরীকে? কি অগ্নায় করেছে সে আপনার কাছে?”

স্বরেশ্বর নেমে এল, এসে দাঁড়াল গৌরীর পিছনে। প্রায় চুপি চুপি বলতে লাগল—“কোনও অগ্নায় করেনি গৌরী, অগ্নায় করেছে একথা আমি বলিনি। আমি শাস্তি চাই, ও মরে গেছে এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে আমি শাস্তিতে থাকতে চাই। এর বেশি আর কিছু চাই না আমি ওর কাছে। হয় ও যাক, নয়ত আমিই যাচ্ছি।”

শেষ চেষ্টা করলাম।

“গৌরীকে তুমি অবিশ্বাস করছ স্বরেশ্বর, তাকে তুমি—”

স্বরেশ্বর খামিয়ে দিলে আমাকে—“না, তা করি না আমি। বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনও কিছুই করবার দরকার করে না আমার! ওর ১য়ের পরিচয় পাবার পরে ওকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই আমার।”

তখনও ধরেছিলাম গৌরীর হাত। টান পড়ল। আর্তনাদ করে উঠল গৌরী : “আমায় ছেড়ে দাও, যেতে দাও আমায়।”

ছাড়লাম না গৌরীর হাত, বেরিয়ে এলাম দরজা পার হয়ে ওর হাত ধরে। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর সামলাতে পারলাম না নিজেকে। চিৎকার করে বলে ফেললাম—“ওর মায়ের সম্বন্ধে এত হীন ধারণা ধার মনে বাসা বেঁধে রইল, তার সমস্ত বাস করার চেয়ে মরাই ভাল! চল গৌরী।”

ভেতর থেকে পিতুবাবু জবাব দিলেন, “হ্যাঁ তাই যা। মরণে যা ঐ তও
বুজুকটার সঙ্গে। যা করে তোর গর্ভধারিণী ময়েছে, তাই করে তুইও মরণে যা।
নয়ত তোর—”

আর যাতে স্তনতে না হয় সেজন্ত হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলাম গলি
থেকে।

ছড়ছড় শব্দে গাড়িয়ে চলেছে গাড়ি, সামনাসামনি বসেছি দু’জনে। গাড়ির
এক কোণে মাথা রেখে পড়ে আছে গৌরী। নিঃশেষে নিভে গেছে ওর ভেতরের
আগুন। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম। দেখলাম কেউ আসছে
কিনা। কেউ না। নজরে পড়ল পূব আকাশটা, সেখানে তখন খুব ফিকে সাদা
রঙ ধরতে শুরু করেছে।

মহানবমী।

ব্রাহ্মমুহুর্তে ঢাক-ঢোল বাজছে শহরময়। প্রভাতের বাতাসে ভেসে এল
মহানবমীর বাজনা। ভয়ানক মুন্ডে উঠল বুকেব ভেতবটা। মাঘের পূজা দেখতে
ছুটে এসেছিলাম বাঙলায়। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, পূজার কটা দিন থাকবই বাঙলা
দেশে। সে প্রতিজ্ঞা গোলায় গেল। মহানবমীর ব্রাহ্মমুহুর্তে আবার টেনের
কামরাষ চড়ে বসে আছি।

বসে আছি দ্বিতীয় শ্রেণীর গদি-মোড়া আসনে। আমরা দু’জন ছাড়া আর
একটি প্রাণীও নেই গাড়িতে। বাইরের দিকে চেয়ে ওপাশের আসনে বসে আছে
গৌরী। রক্তবর্ণ বেনারসী-জড়ানো, হাতে-গলায় সোনাব অলঙ্কার, কপালে
সিঁথিতে লাল ডগডগে সিঁদু—চমৎকার। কে জানে ঠিক এই সাজেই একদিন ও
এসেছিল কিনা স্বরেশ্বরের ঘরে! যেভাবে এসেছিল সেটভাবেই বিদেয হচ্ছে।
আসা-যাওয়ার মাঝে যে সময়টুকু অথবা অপচয় হয়েছে, তার জন্তে অনর্থক মন
খারাপ করে কি লাভ? হঠাৎ নিজের দিকে নজর পড়ল। বহুমূল্য কাপড় চাদর
রয়েছে আমার অঙ্গে, মাথা থেকে ছড়াচ্ছে মহামূল্য আতরের গন্ধ। না, নেহাত
বেমানান দেখাচ্ছে না আমাকে গৌরীর সঙ্গে। চমৎকার।

এক প্যাকেট সিগারেট কিনে পোড়াতে লাগলাম। অনেকটা সময় পরে গলা
দিয়ে ধোঁয়া নামাতে মাথাটা সাফ হয়ে গেল। এক সঙ্গে অনেকগুলো মিল খুঁজে
পেলায়। সর্বশ খুঁয়ে বসলে মনের যে অবস্থা হয়, তার সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে
সব কিছু। হাতের মূঠোর পাওয়ার অসীম তৃপ্তি। বেঁচে থাকার চরম আনন্দের
সঙ্গে চমৎকার স্বাদ পাচ্ছি মৃত্যুর ওপারের পরম শান্তির। সামনে চোখ বুজে বসে

মূর্তিকে সঙ্গে নিয়ে এই যাত্রার শেষে যেখানে গিয়ে পৌঁছব, সেই নাম না-জানা ঠিকানার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে জীবন-নদীর ওপারের একটি ঠিকানা, যেখানে এপারের কলঙ্ক পৌঁছতে পারবে না। এক নৌকার যাত্রা আমরা হ'জনে, নির্ভয়ে পাড়ি দিয়েছি এবার। এই মহাযাত্রার শেষে যেখানে গিয়ে লাগবে আমাদের তরী, সেখানে কেউ কাউকে মিথ্যে সন্দেহ করে না। জন্মমৃত্যুহীন সেতু ছুঁয়ায়, কার গর্ভে কে জন্মেছে, এজন্তে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করার বেঞ্চ্যাজ নেই।

কান-ফাটা চিৎকার করে উঠল ইঞ্জিন। গাড়ি চলতে শুরু করলে। মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় পুড়ে গেল সেই প্রাতিমাখানি, যাকে তুলে এনেছিলাম নদীর ধারে থেকে। বিসজ্জিতা প্রতিমার পূজা হ'ল না। আবার মহানবমীর প্রভাতে আবার এতখানি বিসজ্জিতা প্রতিমা নিয়ে যাত্রা শুরু হ'ল। কোন বিধাতা বলে দেবে, কি লেখা আছে এই প্রাতিমাখানির কপালে!

নিবালম্ব নিরাশ্রাস নিকটেগ ফকড়ের জীবনে শাস্তি আছে কি শু সাংনা নেই। জাগরণের অবিচ্ছিন্ন উন্মাদনা আছে, নেহ স্তম্ভিত মন্দির মাধুর্য, নেই স্বপ্ন দেখার বিবর্তন। ফকড়ের চোখের পাতা যখন মুদ্রিত হয়, হাত-পা হয় অচল, দেহটা নিশের নিম্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে পথের পাশে, গাছ-লায় বা কোনও দেবালয়ের উঠানের কোণে, তখন তাকে ওদিকের ধারণা করা হ'ল। ধারণা যখন হবে যে, যন্ত্রটা কিছুক্ষণের জগতে থেমে আছে, একটু পরেই আবার চলতে শুরু করবে।

যুম কখনও স্পর্শ করে না ফকড়কে, ফকড় কিছুতে ঘুমায় না। ঘুমাতে হলে খাট-বিছানা না হলেও চলবে, কিন্তু চাই একটি মন। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, কামনা-হাসি, আশা-নিরাশায় আবুদুবু থেতে জানে, এমন একটি সহৃদয় মনের সাহায্য না পেলে ঘুমাতে পারে না কেউ। দুর্শ্চিন্তার ঘুম হচ্ছে না, ও একটা কথাও কথ। খারাপ ভাল যে কোনও জাতের চিন্তা না থাকলে মনেরও অস্তিত্ব থাকে না। তখন ঘুমাতে কে? মনে হয় জেগে থাকে, নয় স্বপ্ন দেখে, নয় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু খোরাক চাই মনের, যেখানে মনের খোরাক জোটে না সেখানে মনও নেহ।

বেচারী ফকড় কোথায় পাবে মনের খোরাক? কি দিয়ে মনকে খেলা দেবে ফকড়? কোনও দিন কিছু না পেয়ে মন ফকড়ের মুখে পদাঘাত করে সরে পড়ে। তখন সদাজাগ্রত ফকড় সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে হিসেব করে, নিঃশ্রাস নেবার মেয়াদ কতটা খরচ হয়ে গেল। অসহায়ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে, অগ্রাম চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে কলসীর জল, ফুরিয়ে আসছে চিরজাগ্রতের দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ। শেষে নেমে আসে সেই চরম মুহূর্তটি ফকড়ের দুই চোখের ওপর, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে তখন

ফকড়। এমন ঘুম ঘুমায় যে তা ভাঙবার সাধ্য নেই স্বয়ং সৃষ্টিকর্তারও।

গাড়ি ছাড়বার পর এক ফাঁকে আমার সেই পুরনো বকুটি এসে উপস্থিত। বহু কাল আগে যিনি আমার মুখে চড় মেরে সরে পড়েছিলেন, সেই হাংলা বকুটি আমার খোঁরাকের গন্ধ পেয়েই নির্লজ্জের মত উদয় হলেন আসমান থেকে। টেরও পেলাম না, কখন তিনি বেশ সপ্রতিভভাবে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন আমার সঙ্গে। লাল বেনারসী-পরা যে প্রাণীটি চোখ বুজে বসে রয়েছে সামনে, তার সঙ্গক্ষেই আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গেল বকুটির সঙ্গে। নাছোড়বান্দা বকুটি জেগে রইলেন সঙ্গে, কানের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করতেই থাকলেন। ফলে ঘুমিয়ে পড়লাম, ফকড়ের ঘুম নয়, আসল স্বপ্ন-দেখার ঘুম। যে ঘুম ঘুমিয়ে মানুষ ফাগুসেব মত উড়ে চলে যায় আকাশে, এই হৃদয়হীনা ধরণীর ধরা-ছোয়ার নাগালের বাইরে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পার হয়ে গেলাম অনেকটা পথ আর অনেকটা সময়। তারপর লাগল ঘুমের গায়ে ধাক্কা, যাকে অবলম্বন করে মন আমার ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই অবলম্বনটি নড়ে উঠল ভয়ানক ভাবে। চোখ চেয়ে দেখলাম তার মুখখানি। হুতাবনা-দুঃখ-ক্লান্তি অবসাদের চিহ্নমাত্র নেই সে মুখে। তার বদলে দেখতে পেলাম সত্ত ছুটি-পাওয়া একটি স্থলের মেয়ের মুখের ছেলেমানুষ চপলতা। আমার একথানা হাতে সজোরে নাড়া দিতে দিতে গৌরী বলছে—“ওঠ, ওঠ। এসো, নেমে পড়ি এবার। এখানে বদল করে নাও টিকিট। চাঁদপুর থেকে স্টীমারে গোয়ালন্দ যাব আমরা। যে করে হোক, কালই কাশী পৌঁছতে হবে আমাদের। এতটুকু সময় নেই নষ্ট করবার। কাশীতে থবর পৌঁছবার আগে আমি গিয়ে ঢুকতে চাই বাড়িতে।”

হেসে ফেললাম ওব হাবভাব দেখে। বললাম—“কালই কাশী পৌঁছতে হলে হু’খানা ভানা গজানো দরকার তোমার এখনই। উড়ে না গিয়ে উপায় নেই।”

হিসেব করতে লেগে গেল গৌরী।

“কেন পৌঁছব না কাল? ভোরবেলা গোয়ালন্দ পৌঁছব, দুপুরের দিকে কলকাতা। সন্ধ্যার পর হাওড়া থেকে যে কোনও মেলে উঠলেই ভোর-রাত্তি মোগলসরাই গিয়ে নামা যাবে। তারপর—”

উঠে ঝাড়িয়ে বললাম—“তারপর আগে চাঁদপুর পৌঁছে স্টীমারে চড়ো, সেই স্টীমার গিয়ে যথাসময়ে পৌঁছক গোয়ালন্দ। তখন আবার হিসেব আরম্ভ করো।”

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, লাকসাম অংশনে গাড়ি ঢুকছে। এ গাড়ি মোজা চলে যাবে লামডিং বদরপুর হয়ে গোঁহাটি! হু’খানা গোঁহাটির টিকিট কিনে-ছিলাম চট্টগ্রাম থেকে। তখন পরামর্শ করার মত অবস্থা ছিল না গৌরীর সঙ্গে।

কোনও কিছু না ভেবে চিন্তেই কিনেছিলাম গোঁহাটির টিকিট। জানতে পেরে-ছিলাম যে, গোঁহাটি পঞ্চম একটানা যাবে গাড়িখানা, সুতরাং অন্ততঃ দুটো দিন আর দুটো রাত নিশ্চিন্তে থাকতে পারব গাড়ির মধ্যে, এই আশাতেই কিনেছিলাম টিকিট দু'খানা।

নিশ্চিন্ততাকে নিবিবাদে গোঁহাটি পঞ্চম চলে যাবার সুযোগ দিয়ে আমরা নেমে পড়লাম লাকসাম জংগনে। সংবাদ নিয়ে জানলাম, খণ্টা তিনেক পরে আসছে চাঁদপুরের গাড়ি মাল্টি থেকে।

গৌরী বললে, “এল কোথাও। মানুষের চোখের আড়ালে গিয়ে বসে থাক, আমাদের সাজ-পোশাক দেখে সকলে ঠা করে চেয়ে আছে। এগুলো ছেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচতাম।”

ওয়েটিংকমের দিকে চললাম দু'জনে। পাশে চলতে চলতে গৌরী বললে—“একটা বাস-বিছানা অন্ততঃ সঙ্গে থাকা উচিত ছিল আমাদের। একেবারে কিছু নেই সঙ্গে, লোকে ভাববে কি?”

লোকে কি ভাববে? কত কি না ভাবতে পারে লোকে, কেউ কারও ভাবের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তা না পারুক, কিন্তু আর একটি নতুন জাতের মনের খোঁজক জুটল বটে আমার। এখন থেকে চোখ কান সজাগ রেখে অতি সাবধানে পা ফেলা প্রয়োজন। চতুর্দিকের তাবৎ মানুষ কে কি ভাবছে, সে সম্বন্ধে অনখুঁত হিসেব রাখতে হবে। ভাল করে বুঝতে পারলাম, শুধু যে গৌরীকেই পেয়েছি তা নয়, তার সঙ্গে ফাউ হিসেবে আরও অনেকগুলি ফ্যাসাদ জুটেছে—যার কোনওটিকেই অবহেলা করা চলবে না।

ওয়েটিংকমের দরজার পাশে একখানা বেঞ্চি পাতা রয়েছে। বেঞ্চির ওপর রয়েছে কার টিনের বাস আর বিছানার বাগিল। সন্ধ্যা বসে পড়ল এক ধারে। বললে—“যাক, বাঁচা গেল এতক্ষণে। এইবার লোকে ভাববে, এই বাস-বিছানাটা আমাদের সম্পত্তি।”

গৌরীর চাল-চলন দেখে সত্যিই বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। শেষ রাত্রে যে বিল্লী কাণ্ডটা ঘটে গেল, তার কিছুই কি মনে পড়ছে না ওর? এতটুকু সময়ের মধ্যে বেমালুম ভুলে মেয়ে দিলে নিজের ঘর-বাড়ি-স্বামীর কথা। যে লোকটিকে সে এককাল বাবা বলে ডেকেছে, যে তাকে বুকে করে মানুষ করেছে, ক্ষোভে দুঃখে হয়ত সে মারাই গেল এতক্ষণে! তার কথাও কি একবার মনে পড়ছে না গৌরীর? ঘর-সংসার, মান-সম্মান, নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে কোথায় ছুটেছে ও আমার সঙ্গে? কি করতে চলেছে এখন কানীতে? সবচেয়ে বড় কথা, আমরা সঙ্গে নিয়ে চলেছে

কেন ? আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি ? কি পরিচয় 'দেবে ও লোকের কাছে আমার ?

চট্টগ্রাম থেকে রওয়ানা হবার আগে যে চিন্তাগুলি মাথার মধ্যে উদয় হওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল, অনেকটা পথ পার হয়ে এসে সেগুলি একে একে উঁকি দিতে লাগল। ওর দিকে চেয়ে সিগারেটে টান দিতে দিতে একটা প্রশ্ন গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠল। স্পষ্ট করে একবার ওকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হ'ল যে—

গৌরী মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে চেয়ে ফিক কবে হেসে ফেললে। “অমন করে চেয়ে থেকে না আমার দিকে। লোকে কি ভাববে। মহাপুরুষ মানুষ না তুমি ?”

হালকা পরিহাসের সুর ওর গলায়। নিঃশ্বাস চেপে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। স্পষ্ট করে জানবার প্রশ্নটা আর করা হ'ল না আমার। চাপা গলায় অনর্গল বলে যেতে লাগল গৌরী—

“ঐ রাগ-অভিমানটুকুই শুধু সম্বল মহাপুরুষের। আমাদের মত সাধারণ মানুষের বোধজ্ঞান যদি থাকত, তাহলে একটি বারের জন্ত অন্ততঃ আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতেন তখন কাশীতে। তা নয়, উনি অভিমান করে গ্যাট হয়ে বসে রইলেন, কেন একটা আইবুড়ো মেয়ে লজ্জা-শব্দের মাথা খেয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল না! আব ওধাবে আমি একটাব পর একটা চিঠি লিখে ম'লাম। সেই হারামজাদী বুড়ী সবগুলো চিঠি পৌঁছে দিলে আমাব শত্রুব হাং। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।”

কিছুই বলবার নেই আমার। জবাব দেবাব আছে কি ? হয়ত বলতে পারতাম—“কই, চিঠি লিখতে তো বলিনি আমি তোমাকে !” জবাব শুনে নিশ্চয়ই মুখ বন্ধ হত গোবীব, আব মুখের মত জবাব দিতে পাশার বিমল আনন্দ লাভ হত আমার। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি পেলাম জবাব না দিয়ে। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, তবু যে আমিই হতে পেবেছি ওর সর্বনাশের হেতু, এই কথা শুনেই একটি অনাবিল আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলাম। অন্ততঃ এহটুক মূল্য আমায় দিলে গৌরী যে, আমি তার সর্বনাশের হেতু হতে পারি। আব ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক, শেষ পর্যন্ত গৌরী যে এসে পড়েছে আমার হাতেই, তার জন্তে নিজের বরাতকে ঠুকে একটা ধন্যবাদ দান করলাম। কিন্তু আবার ও ছুটেছে কেন কাশীতে সাত-তাড়াতাড়ি ?

সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করে ফেললাম সর্বপ্রথম, “আবার যাচ্ছ কেন কাশীতে ?”

তৎক্ষণাৎ পাণ্টা প্রশ্ন করে বসল গৌরী—“নয়ত কোথায় যাবো আর মরতে !”

তাই তো! কোথায় যে যাবো আমরা, কোথায় যে চলেছি ওকে নিয়ে, সেকথা তো একবারও ভেবে দেখিনি। ফকুড কোথায় নিয়ে যাবে ওকে? কোথায় লুকিয়ে রাখবে ঐ সম্পত্তি ফকুড? তাতেব মুঠায় পেয়েছি যাকে, তাকে নিয়ে এখন আমি করব কি? আজন্মকাল গৌরী নিশ্চয়ই ফকুডের চলনে চলতে পারবে না। এখন উপায়?

আমাব মুখেই অবস্থা দেখেই বোধ হয় গৌরীর দয়া হ'ল। মিস্তি হেসে গলায় মধু ঢেলে বললে—“বেশ তো, আগে চল না কান্নাতে। বাড়িতে যে ভাড়াটে আছে তার কাছে খবর পৌছবার আগেই আমরা পৌঁছে যাব। একথানা খাতা আছে আমার বাবার, খাতাখানা আমার চোখে পড়েছে অনেকবার। কিন্তু কখনও সেখানা হাতে পাইনি। খাতাখানা খুব যত্ন নিয়ে লুকিয়ে রাখা বুড়ো, তাতেই ও নিজের হাতে লেখে দেখেছে নিজের কাহিনী। আমার জন্মবৃত্তান্তও তাতে লেখা আছে নিশ্চয়। সেখাতাখানা আমি দেখল কবতে চাই। তাবপর যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব। বা কবতে বলবে তাহ কবব।”

সামান্য খাদ্য পরলেন এনেবানে গলে যায় আর ঘন ঘন নেড় নাড়তে থাকে, সেই জ্বরের পোকা জ্বরের মত তখন আমার মনেই অবস্থা। যাবলব তাই করতে রাজী গৌরী। এবার বলল মিস্তি কিছু বলতে হবে আমরা, চাইবাব মত কিছু চাইতে হবে ওর কাছে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে নাকি? বলাব আব চাইবার পরম সময় অনেকগুলো বছর আগে পর হয়ে আসিনি? সে দিনেব সেই না-বলা কথাটি কি আর এবার বুঝে পাওয়া সহজ? বুঝে গেলেও আজকের এত পোড-খাওয়া ফকুডের দুখ দিয়ে সহজে কি বেরোবে সেই ভাষা? সব চেয়ে বড় কথা, সে কথা শোনার মত কান কি এখনও আছে গৌরীর।

বেশ মিস্তি মুখে একটি ঝামটা দিয়ে উঠল গৌরী—না, আর পারি না বাপু তোমার সঙ্গে। মহাপুরুষের সঙ্গে পণ চলতে হলে স্টায় গলা শুকিয়ে মবতে হবে দেখছি। আমার মুখের দিকে চেয়ে সিগারেট ফুঁকে সময়টুকু কাটিয়ে দিলেই কি চলবে? এখান থেকে সন্তানঃ এটা জ্বলের জায়গা জোগাড় হবে নাও না। সাংগাটা পথ ছোটো প্রাণী কি এক চোক জলও মুখে দোব না?

এবার সম্পূর্ণ মজাগ হয়ে উঠলাম, বললাম—“টাকা দাও।”

হেসে গাড়ি পড়ল গৌরী, “টাকা কি আমার কাছে নাকি?”

আরে, তাও তো বটে! থলেট য এখনও বাঁধা রয়েছে আমার কোমরে! তাড়াতাড়ি মেটাকে কোমর থেকে খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। ধরলে গৌরী থলেটা, জিজ্ঞাসা করলে, “কত দোব?”

“দাও তোমার যা খুশি।”

কয়েকখানা নোট বার করে দিলে আমার হাতে। টিকিট দু’খানা বাঁধা আছে আমার চাদরের খুঁটে। টিকিটও বদলে আনতে হবে তো !

গৌহাটির টিকিটকে কলকাতার টিকিট বানাতে দু’চারটে ছোট-খাটো মিথ্যা কথা বলতে হ’ল। চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাতে একটা কেবিনের মধ্যে স্থান জোটে, তাব জন্তে চাঁদপুরে তার করবার আলাদা দাম দিলাম। তারপরে একটা কুঁজোর সন্ধান কবলাম। কুঁজো পাওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং কিনলাম একটা মস্ত বড় এলুমিনিয়ামের কেটলি আর একটি এলুমিনিয়ামের গেলস স্টেশনের সামনেব দোকান থেকে। এক হাঁড়ি মিষ্টিও নিলাম। দোকানদার হাঁড়ির গলায় দড়ি বেঁধে দিলে।

তখন এক হাতে হাঁড়ি ঝুলিয়ে আব এক হাতে জল-ভরতি চকচকে কেটলি নিয়ে দর্শন দিলাম গৌরীকে। গৌরীর পাশে তখন বসে আছে আব একটি বউ। দূর থেকে আমাকে দেখে হাসিতে একেবাবে ঘেঁটে পড়ল গৌরী। আর একটু কাছাকাছি পৌঁছে শুনতে পেলাম :

“দেখ না ভাই, কি রকম সঙ। এই মাত্র একবাশি জিনিসপত্র হারিয়ে এল চন্দ্রনাথ স্টেশনে, তার জন্তে দুঃখ আছে নাকি মনে একটু? আবার কোথা থেকে জোটাতে ঐ কেটলিটা। কি গো, ও কেটলিটা আবার পেলে কোথা থেকে?”

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম, “কিনলাম এখানে।”

উঠে এগিয়ে এসে হাঁড়ি আর কেটলি ধবলে গোঁবা।

বললাম, “আর বেশি দেবি নেই গাড়ির।”

গোঁবা বললে, “তবে আর এখানে এগুলো খুলে কাজ নেই। একেবারে গাড়িতে উঠেই যা হয় করা যাবে।”

গৌরী আবার দিগে গেল বেঞ্চিতে। কেটলি হাঁড়ি পাশে বেখে গল্প করতে বসল বৌটির সঙ্গে। আর একটা সিগারেট ধবিষে আমি পায়চারি করতে লাগলাম সামনের প্রাটফরমে।

চাঁদপুরের গাড়িতে উঠে দেখলাম, একজন বুড়ো সাহেব আব তার মেমসাহেব স্ত্রীয়ে আছেন দু’ধারের দু’খানা বেঞ্চিতে। রঙ দেখে মনে হ’ল, সাহেবের বাড়ি এ দেশেই এবং রেলেই চাকরি করেন তিনি। আমরা উঠতে সাহেব নিজের বিছানা গুটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন তাঁর মেমের পাশে। আধ হাত লম্বা একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে তাঁর নিজস্ব ভাষায় বক বক করতে লাগলেন বুড়ীর সঙ্গে।

গাড়িতে উঠে গৌরী আবার বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। ঘেন

একেবারে ভুলেই গেল আমার কথা। হাশ্মপরিহাসে উচ্ছল যে মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে এইমাত্র উঠলাম গাড়িতে, এ যেন সে নয়। এ একটি মূর্তিমতী হতাশা। ঠিক জানি না, মরবার সময় মানুষের মনের অবস্থা কি রকম হয়। জানা-চেনা এই দুনিয়াটার ওপর হয়ত কারও টান না থাকতে পারে, কিন্তু এটাকে ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা আর একটা জগতে একলা পাড়ি দেবার সময় আতঙ্কে আর হতাশায় কিভাবে মুখভে পড়ে মানুষ, তার স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে ওর চোখেমুখে। একটা জীবন্ত 'বিভাধিক', সর্বস্ব পিছনে ফেলে নিঃসঙ্গ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে এক হতভাগিনী। সামনে ধূ-ধূ করছে আদিগন্ত মকভূমি। চায়া নেই, আশ্রয় নেই, সাহস সাস্থ্যনা পাবার প্রত্যাশা করা নিঃসঙ্গ বাতুলতা।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ির ভেতরে নজর ফিরিয়ে আনলে গৌরী। নত চোখে বললে, “হাতে-মুখে জল দিয়ে এবার কিছু মুখে দাও।”

তথাস্থ। এতটুকু ভাগিদ ছিল না কিছু মুখে দেবার, তবু এক গেলাস জল নিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মুখে-হাতে দিলাম। তারপর এক গেলাস জল ওর হাতে দিয়ে বললাম—“তুমিও ধুয়ে ফেল হাত-মুখ।”

গেলাসটা নিলে আমার হাত থেকে। জানালায় মুখ বাড়িয়ে জলটা খাবড়ালে মুখে মাথায়! ঘুরে বসে গেলাসটা রেখে বেনারসীর আঁচলে চোখ-মুখ মুছতে লাগল। মোছা তার শেষ হয় না, আঁচল আর নামাতে পারে না চোখের ওপর থেকে। অনেকক্ষণ পরে যদিও বা নামানো আঁচল, কিন্তু মুখ আর তুলতে পারে না। নত চোখে কম্পিত হাতে হাঁড়ির ঢাকা খুলতে গেল।

হাত চেপে ধরলাম। বললাম—“থাক এখন শুট গৌরী। খিদের জ্বালায় এখনই আমরা কেউ মরে যাব না।”

হাত সরিয়ে নিয়ে রক্তবর্ণ ফোলা চক্ষু দু’টি ভুলে এক’ আর ও তাকালে আমার দিকে। তারপর আবার গাড়ির বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল। আরও অনেকক্ষণ পরে বুড়ো-বুড়ী দু’জনেরই নাক ডাকতে লাগল। তখন গৌরীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—“ভাগ করে নাও গৌরী, ভাগ করে নাও আমার সঙ্গে তোমার ব্যথার বোঝা। আমারও কেউ নেই, কিছু নেই এই দুনিয়ায়। তবু বেশ স্বচ্ছন্দে বেঁচে আছি এতদিন। অনেক বড় পৃথিবীটা, অনেক আলো অনেক বাতাসের সঙ্গে মিশে আছে অনেক দুঃখ অনেক বেদনা এখানে। তার তুলনায় তোমার-আমার দু’জনের দুঃখ বেদনা কতটুকু?”

বাইরের দিকেই চেয়ে গৌরী ফিস্ . . . করে বললে—“কিন্তু আজ যে তোমায় দেবার মত কিছুই নেই আমার। সর্বস্ব খুইয়ে এলাম যে, এখন তোমায় কি দিয়ে

সম্ভট করব আমি ?”

খুব জোর দিয়ে বললাম—“আছে গোঁরী, নিশ্চয়ই আছে। এমন বহুমূল্য কিছু এখনও আছে তোমার কাছে, যা পেলে আমার সব পাণ্ডার বড় পাণ্ডা হবে।”

চোখ খুলে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল গোঁরী আমার মুখে দিকে।

ওর চোখের ওপর চোখ বেখে খুব চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম—“দিতে পারবে তুমি ? দেবে আমায় তুমি সে জিনিস গোঁরী ? শুধু ভক্তি ভক্তি আব ভক্তি। ওই শুকনো জিনিস চিবিষে চিবিষে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ভয়-ভক্তি-ভালবাসা ও-সব এক জাতের জিনিস। ওতে আব আমার লোভ নেই। অন্য কিছু দাও তুমি আমায় গোঁরী, যা রক্ত মাংসে গড়া মানুষের কাছ থেকে আশা কবা যায় না কিছুতে।”

কঙ্কশাসে জিজ্ঞাসা কবলে গোঁরী—“কি সে জিনিস। কি চাও তুমি আমার কাছে ব্রহ্মচাৰী ?”

“অতি তুচ্ছ জিনিস গোঁরী, তুচ্ছা তুচ্ছ তার নাম। প্রেম নয়, ভালবাসা নয়, রক্তমাংসের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই তাব। কোনও কিছু বদলেই কেনা যায় না সে বস্তু। এই দুনিয়ায় দুর্ভাগা দুর্ভাগীদের বুকেব মাথা আছে সেই অমূল্য সম্পদ লুকানো। ভাগ্যবানদের ভাগ্যবে মেলেনা সে বস্তু।”

জানালাব বাইবে ছিল আমাদের দু'জনের ছা। গোঁরী আমার হাতখানা তাব মুঠির মধ্যে চেপে ধরে ব্যাকুল করে বর্ণন—“এল ব্রহ্মচাৰী, এল সে জিনিসের নাম ? দেবো, নিশ্চয়ই দেবো আমি, দেবো তোমায় যা তুমি চাইবে আমার কাছে।”

“দাও তাহলে, দাও তোমার বিশ্বাসটুকু আমায়। এহ দুনিয়ায় তুমি যে একা নও, তোমাব ব্যথা বেদনার ভাগ নেবার জগতে আব এক হ। ভাগাও যে রয়েছে তোমাব পাশে, এই বিশ্বাসটুকু শুধু কব তুমি আমার ওপর। এব বেশি আব এ টুকু কিছু আমার দাবি নেই তোমাব কাছে।”

গোঁরী আরও জোরে চেপে ধরলে আমার হাতখানা তাব মুঠির মধ্যে।

আপাশের আলো কমে আসছে। দূর গ্রামের গাছপালাব মাথাব ওপর আধাব এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বাসায় ফিরে চলেছে পাখীরা।

সন্ধিক্ষণ।

দিবা-রাত্রির মহাসন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা হ'ল কি আমাব ? সন্ধান পেলাম কি আর একটা প্রাণের ? গোঁরী কি আমায় সত্যিই বিশ্বাস করতে পারলে ?

আধার ঘনিজে উঠছে, আধারের মধ্যে ছুটে চলেছে গাড়ি। ঐ আধারের মধ্যে

লুকিয়ে আছে আমার প্রেমের উত্তর।

সহজ নয়, রক্ত-মাংস-গড়া প্রতিমাকে তুষ্ট করা সোজা নয়। রক্ত মাংসের সঙ্গে মিশে থাকে সন্দেহ, স্বার্থপরতা, ঘৃণা আর ক্ষুধা। সর্বগ্রামী ক্ষুধা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোচাই দিয়ে সে ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। মুন্সী প্রতীমার ক্ষুধা নেই, নিবেদিত নৈবেদ্যের সবটুকু ফিরে পাওয়া যায়, কিন্তু রক্ত-মাংসে গড়া প্রতিমার ক্ষুধা আছে। সে ক্ষুধাকে কতক্ষণ বিধামনে দোচাই দিয়ে তুষ্ট রাখা যাবে ?

মাস্তুলের অন্তঃপুরে অন্তঃকরণ নামে একটি মহাস্থান স্থান আছে, স্টায়ারের অন্ধমহলে আছে তেমনি ছোট ছোট কেবিন। ছোট্ট একটি খাঁচার মধ্যে নিগ্রালায় দু'টি মন বাবা থাকে, খসখস করে কাঁপতে থাকে চলন্ত স্টায়ার। তার অন্ধমহলের অভ্যন্তরে কাঁপে থাকে দুটি বুক। সেই কাঁপুনিতে হয়ত এক জোড়া বুকের রূপটি খুলে গেলে যে পোনে পোনে। যদ্যতন বুকের রূপটি খোলে না, একটি মনের সঙ্গে অপর একটি মনের শুভদৃষ্টি হলাব শুভলগ্ন সব সময় সর্বত্র আবির্ভূত হয় না। বিশাল নদীর বুকে ধর ধর করে তালে তালে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চলে স্টায়ার। যখন বাবা অন্ধমহলের ছোট্ট কেবিনের মধ্যে হয়ত দু'টি অন্তঃকরণ জানে পোনে জ্বলন্ত তন্তুপুরে মহাস্থা।

কেবিনের দরজা সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গৌরা। এক পা দরজার ভেতরে দিয়েই আবান টেনে নলে, যেন ভেতর থেকে কে ওকে বাধা দিলে চুপে। এক হাতে টিকিট হাতে আর এক হাতে কলেন কেটল নিয়ে আমাকেও থামতে চলে যাচ্ছে।

বললাম—“কি চলে আবান থামলে যে ?”

মুখ ফিরিয়ে দেখা অসম্ভাব্যভাবে আমার চোখের দিকে চেয়ে হিল গৌরা। নিম্নেবের মধ্যে বুকের পাললাম নাম চোখের ভাষা। বফেন ম. ঠাণ্ড শান্তি এতখানা ছন্দে স্নান করে আসল আমাব পাঁজরায়। এতটুকু অসাবধান হলেই ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে আমাব বুকের মধ্যে।

হেসে ফেললাম হো হো করে। বললাম—“এবার তোমার মাথাটাই না বিগড়ে যায়। ছেলেকান্ন বুক ত্যাগে, এটুকু আব মাথাখা আসছে না যে দরজাটা বন্ধ না করলেই চলবে। আমাদের কাছে কিছ নেই যা পেতে বাইরে বসা যাবে। ভেতরে চল, জল টল খেয়ে বস্তুর এসে, খাবার ঘর থেকে দু'খানা চেয়ার টেনে বসে, নদী দেখতে দেখতে আরামে খাওয়া যাবে।”

একটু যেন লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। তাড়াতাড়ি কেবিনের মধ্যে ঢুকে আমার

হাত থেকে মিষ্টির ইঁাড়িটা নিলে। জলের কেটলিটা কেবিনের দরজার ওপাশে নামিয়ে রেখে বললাম—“দাও এবার কিছু পয়সা, চায়ের কথা বলে আসি।”

টাকার খলিটা যে ওর জামার মধ্যে রয়েছে সে কথা ভুলে বসে আছে। ইঁ কবে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বললাম—“নির্ঘাত গোলমাল হয়েছে তোমার মাথায়, খলিটা যে জামার মধ্যে রেখেছ, তাও মনে পড়ছে না?”

এবাব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল গৌরী। তাড়াতাড়ি জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খলিটা টেনে বার করলে।

“কত দোব?”

“যা হয় দাও, চা আনাই আব অল্প কিছু যদি পাওয়া যায়। সিগারেটও নেই।”

একথানা নোট বাব করে দিলে আমার হাতে। ছুটলাম স্টীমারের দোকানে। যে কোনও উপায়ে ওব চোখেব আড়াল হতে পাবলে বাঁচি। আলোকোজ্জ্বল ছোট্ট কেবিনটার মধ্যে দু’পাশে দু’টি বিছানা ধপধপে সাদা চাদর দিয়ে মোড়া। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরের যেটুকু নজরে পড়েছিল তাই যথেষ্ট। কি ছুনিবাব আকর্ষণ সেই ছোট ঘরটির। কি অপরিমেয় প্রলোভন সেই বিছানার। কি ভয়ংকব অসহ্য নীতলতা গৌরীর চোখের দৃষ্টিব। বিশ্বাস আমায় করেছে গৌরী। এতটুকু ভেজাল নেই সে বিশ্বাসে। বিশ্বাস করেছে সে যে, আমি একটা রক্ত-মাংসে-গড়া জীবন্ত মানুষ। জীবন্ত মানুষের প্রাণ্য সম্মানটুকু সে আমায় দিয়েছে।

সেকেণ্ড ক্লাসেব গণ্ডির বাইরে দরাজ তৃতীয় শ্রেণীব এক কোণায় তৃতীয় শ্রেণীর চায়ের দোকান। চা-পান-বিড়ি-সিগারেট, মুড়ি মিছনি, খাবার-দই মিষ্টি সব কিছু পাওয়া যায়। আগে এক প্যাকেট সিগারেট নিলাম। একটা ধরিয়ে কবে গোটা কতক টান দিতে ফক্কেব কক্ষ মগজ গরম হয়ে উঠল। তখন এক কাপ চা নিয়ে বসে পড়লাম একথানা টিনের চেয়ারে। প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে শোনা গেল স্টীমারের বাঁশির কান ফাটা চিংকাব। অতবড় স্টীমারখানার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। যাত্রীদের মধ্যে কলহ কচকচি বেশ খিতিয়ে এল। দূর থেকে ক্ষতভালে ঝপ ঝপ আওয়াজ আসতে লাগল। ক্রমাগত পিছিয়ে যেতে লাগল কতকগুলি নাবির মালা। চাঁদপুরের মাটি আর নবমীর চাঁদ একদৃষ্টে চেয়ে রইল স্টীমারখানির দিকে।

আর এক কাপ চা নিলাম। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ আরাম করে বসলাম। অঙ্কার নদীর বুকে ধক ধক আওয়াজ ভুলে ছুটে চলল স্টীমার। কোথায় চলল? কোথায় চলেছি আমি? কোথায় শেষ হবে এ যাত্রার?

বহুদিন আগে।

কতদিন আগে তার সঠিক হিসেব নিজেও স্মরণ করতে পারি না এখন। মনে হয়, যেন এ জন্মের আগের জন্মে ঘটেছিল ঘটনাটা। একদা এই বকম চাঁদপুর থেকে স্টীমার ছেড়েছিল একথানা। একটি চৌদ্দ পনেরো বছরের ছেলে চলেছিল সেই স্টীমারে। দাদার সঙ্গে চলেছিল ছেলেটি কলকাতায়। ভূমিষ্ঠ হয়ে যে গ্রামখানির আলো শতাসে তার চৌদ্দটা বছর কেটে গেল, সে আলো বাতাসে আর কুলালো না! বিশাল বিশ্বের অনন্ত আকাশ এখন হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়েছে ছেলেটিকে। আপনি সন্তানকে কোলে আর ধরে রাখতে পারলে না গ্রাম। কঁদতে কঁদতে ছেড়ে দিতে হ'ল।

সেই সে যাত্রার শুরু।

স্টিমারের চাযের স্টলের সামনে টিনের চেয়ারে দাদার পাশে বসে চা খেয়ে ছিলাম। জীবনের সেই প্রথম চা-পান। মিষ্টি-তেতো গরম জল গলা দিয়ে নামছিল আর স্বকারণ পুলকে বোম্বাঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম। বাঁধন ছেঁড়ার ছন্নছাড়া হৃদে তখন নাচছে বকের রক্ত, চোখের সামনে জ্বলছে রামধনু রঙের ফুলঝুরি। অজানা অচেনা দুনিয়ার দুন্দুভি-নির্নাদ সেই প্রথম শুনেছিলাম কানে। তখন নিজের কাছে নিজেও ছিলাম অজানা অচেনা। সেই না চেনা নিজেকে নিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজও তাব্দ সমাপ্তি হ'ল না। এখনও পৌছাতে পারলাম না সঠিক ঠিকানাঘ। এখনও শুধু ঘুরে মরছি।

কিন্তু সেদিনের সেই অস্বাভাবিক পুলক কবে অস্বর্ধান করেছে। তার বদলে এখন অঝোরে বর্ষণ হচ্ছে মাথার উপরে—অস্বাভাবিক দুঃখ, লাঞ্ছনা আর অপমান। পাশ কাটিয়ে পাশিয়ে বেড়াচ্ছি নিজেকে নিয়ে। বেঁচে থাকার দায়িত্বটুকু ফাঁকি দিয়ে টিকে থাকার সাধনা চলেছে এখন। বড় বেশি কঠিন ফেলোছি নিজেকে, বড় নির্মমভাবে নিজেকে নিজে বুঝে ফেলেছি।

এই যে তেতো-মিষ্টি গরম জল গলা দিয়ে নামছে, এ তেতোও লাগছে না, মিষ্টি তো নয়ই। আর গরম? গরম হবার মত আর কোনও কিছুই এখন জোটে না জীবনে। শরীরের রক্ত শীতল হিম হয়ে জমে বসে আছে অনেক আগে।

একদা এই চাঁদপুর থেকে যে যাত্রায় শুরু হয়েছিল, তার চরম পরিণতি ঘটেছে একটি পোড খাওয়া পাকা ঝাড়-কড-জীবনে। গোঁরা গুল করলে, অনর্থক ভয় পেলে, ফকড আব যাই করুক, ভুলেও কাঁধ পেতে দায়িত্ব নববে না কিছুর! সর্ববাকমে দায়িত্বশূন্য জীবনট ফকড-জীবন। জীবন একে কিছুতেই বলা চলে না

—বলা উচিত জীবন্ত সমাধি।

একে একে অনেকে এসে দাঁড়ালো সামনে। সারা জীবনটা গডগড করে মুখস্থ বলে গেলাম, শোনালাম নিজেকেই। অবিরাম আত্মবঞ্চনার একটি সক্রিয় ইতিহাস। জীবনের আলো হাতের মুঠোয় ধরা দিতে সেধে এসেছে বারবার, সত্যে হাত টেনে নিয়েছি হাতে আঁচ লাগবাব ভয়ে। তারপর না পাওয়ার পরম তৃপ্তিতে চেখে চেখে লেহন করেছি বক্ষিতের ব্যথাটুকু। এই-ই ঘটেছে জীবনে, এই-ই ঘটেছে বারবার। দাবি করার সাহসের অভাবে চাবি হাতে পেয়েও মণি-কোঠার দরজা খোলা হ'ল না আমার।

আজও দরজার বাইরে থেকেই ফিবে আসতে হ'ল। ফিরে এসে শুধু কাপের পর কাপ তেতো মিষ্টি গরম জল গিলছি আর ধোঁয়া ছাড়ছি। অথচ কি অকল্পনীয় অস্বাভাবিক একটা কিছু প্রত্যাশা করেছে গোর্গী আমার কাছ থেকে। মরা মানুষের কাছ থেকে সে জীবনের ডাক শোনার ভরসা পেয়েছে। বহুদিন পরে ফক্কেব জমাট রক্তে সামান্য দোলা লাগল। 'তাহলে এখনও আমাকে মানুষ বলে চেনা যায়?' এই শতধা-বিদার্ণ চর্ম-ঢাকা যে 'আমি'টি এখনও চলে ফিরে বেড়াচ্ছে তাকে অনর্থক অযথা সম্মান দিয়েছে গোর্গী। শুধু এই জগেই বাকী জীবনটুকু বিনামূল্যে বিক্রি বরে দিতে পাবি আমি ওর পাশে।

হঠাৎ মনে পড়ে আর একজনের কথা।

প্রায়-শেষ-হয়ে আসা উপন্যাসখানিও অনেকগুলো পাতা তাড়াতাড়ি উল্টে গেলাম। পিছন দিকে হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে খুঁজে বাব করতে হবে। সেও যে দিয়েছিল আমার, শুধু সম্মান নয়, আরও অনেক কিছু সে উজাড় করে দিয়েছিল আমার নামে। মানুষের যা প্রাপ্য, তার সবটুকুই আমি পেয়েছি তার কাছ থেকে। সে হতভাগীর ভুলেব পূজা ব্যর্থ হয়ে গেল, ভাগ্যের পরিহাসে একজনের নামে নিবেদিত নৈবেদ্য আব একজন চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল। আজও সে ঘুবে বেড়াচ্ছে তার সেই ব্যর্থ পূজার ফল বুকে নিয়ে। আজও সে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে যে, একদিন তার মেয়ের জন্মদাতা ফিরে আসবেই তার কাছে।

যদি তাই হয়? আর একবার যদি দাঁত বার করে হাসে তার নিষ্ঠুর নিয়তি? যদি কোনও কালে সে জানতে পাবে তার মেয়ের বাপের আসল পরিচয়? যার ছবি বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে সে বেঁচে আছে, সেই মানুষটি তার মেয়ের জন্মদাতা নয়? সেই মর্যাদাসিক সত্যটুকু জানবার আগেই যেন তার মৃত্যু হয়। যাবার কেশা সে যেন তার একমাত্র অবলম্বন মিথ্যেটুকুকেই আঁকড়ে ধরে। পার হয়ে যেতে পারে।

ভুল-শাস্তি, মিথ্যে-নকল আর জাল নিয়ে কারবার। সারা জীবনে ঐসব জগ্গাল জমিয়ে জমিয়ে এক বিরাট অট্টালিকা গড়ে তুলেছি হাওয়াব ওপর। দায়-দায়িত্বকে এড়িয়ে চলার হীন প্রবৃত্তি, নিজের সঙ্গে ছল, চাতুরী আর জুয়াচুরি, এই সম্বল করেই কাটিয়ে দিলাম জীবনটা। জীবনদেবতা অরূপ হস্তে ঢেলে দিয়েছেন যা-কিছু কামনার ধন, সোনার কাঠি হান্দের মুঠোয় পেয়েছি। নিতে পারিনি, ধরে রাখতে পারিনি তাতে। নিজেই নিজের সব চেয়ে বড় শত্রু, এর চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি আছে ?

সজোবে একটা নাড়া দিলাম মাথাটায়। নাঃ, আব কোনও লোভেই ঠকাব না নিজেকে। যা আমার প্রাপ্য, তাব ষোল আনা হৃদে-আসনে আদায় করে নিশে নবে ছাড়ব।

গেঞ্জি পবা গোগালে বাঁধে ঝাড়ুদাব এসে সেলাম ঢুকে দাঁড়াল।

“হুজুব—আপকো মেনাং দিয়া মাজী।”

চমকে উঠলাম। মেশ একটু লজ্জিত হলাম। গবদেন ছোড পদ উচু ক্লাসেব যায়া একজন তৃতীয় শ্রেণীর চায়ে দোকানের সামনে টিনের চেয়ারে বসে এক স্টান্ড ওপর বসে থাকছে যার নিপাটে ফুঁকছে দোকানের লোভের আশ্রয় অগ্রসব যাওয়া হা কমে চেয়ে দেখছে চুল দাড়িওয়ালা আশ্চর্য জীবটিকে। ছি ছি ছি। এতটা বেহাশ কথা বলছে মজা। গোঁসী এখনও জল মুখ দেখনি। নাঃ, সত্যিই আমি মাহুব নহ।

সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছিল দোকানে এক মোড় নিলাম। এক কেটলি চা আব হুঁকোড়া পাণ্ডি পায়ে নলে ছুটলাম তোড়া হাতে কেবিনের দিকে। যাক, সিঙ্গাড়াগুলো যে পাণ্ডা গেল গহ রঞ্জে। বলব—এগুলো ভাজিয়ে আনতে এন্টা দেব হয়ে গে।

কেবিনের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হ’ল। বজা বন্ধ, কেবিনের মধ্যে কার সঙ্গে কথা বলছে গোঁসী। কান্ আপদ এসে জুটল আবাম এর মধ্যে ?

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম।

“আপনাকে নিয়ে গোসাঁই যখন স্টীমারে উঠছিল, তখন আমি দাঁড়িয়েছিলাম ওপরে। তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনারা যে ঘর পেয়েছেন তা তো—”

অদৃষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে গোঁসী—“তোমার আপনার লোকদের কাছ থেকে তুমি পালাতে গেলে কেন ?”

গোসাঁই আমাকে পালাতে বলছিল। যখন গোসাঁই নিয়ে আমি আমাদের বাড়িতে যাচ্ছিলাম, তখন পথে আমাকে বলেছিল ওদের কাছ থেকে পালাতে।

আবার যখন ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাই, তখনও একবার বলেছিল ওদের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে। চট্টেশ্বরীর দরজার পাশে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল গোসাঁই। কিন্তু তার আগেই আমি পালিয়ে এসেছিলাম গোসাঁইয়ের কাছে। রাত থাকতেই আমি পালাই! ভোর বেলা গোসাঁইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িলাম যখন তখন আর গোসাঁই আমায় চিনতে পারলে না। এই ধুতি আর এই চাদর হাতে দিয়ে দূর করে দিলে। তারপর আমায় পুলিশে ধরলে—”

রাগে ফেটে পড়ল গোরী—“কেন তোমায় দূর করে দেবে? দূর করে দিলে আর তুমি অমনি চলে গেলে? কেন গেলে? কেন ছেড়ে দিলে তাকে? তাড়িয়ে দিলেই অমনি চলে যেতে হবে? ওর যা খুশি তাই করবে কেন? কি মনে করে ও আমাদের? আমরা কি মাটির পুতুল যে, ওর খেলা শেষ হলেই ও আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে? কেন তোমরা ছেড়ে দাও ওকে? কেন ওর এত বড় স্পর্ধা?”

অপর পক্ষ ভীতিজ্জড়িত কণ্ঠে বললে—“তা কি করে জানব ঠাকরন? ওনারা গোসাঁই মোহান্ত মহাপুরুষ। ওনাদের মনের কথা আমরা ছোটলোক জানব কেমন করে?”

আরও তেতে উঠল গোরীর গলার স্বর।

“ওঃ—ভারি আমার গোসাঁই মহাপুরুষ রে! সাধু হয়ে শুধু ঐটুকুই শিখেছেন! আর যখন যার খুশি সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছেন। থাকবার মধ্যে আছে সর্বনেশে চক্ষু দু’টি। যে হতভাগী পড়বে ঐ সর্বনেশে চোখের দৃষ্টিতে তাকেই জ্বলতে হবে সারা জীবন। কোনও বাদ-বিচার নেই, তোমার মত মেয়েকেও ও বাদ দেয় না! পথের কাঙালিনার ওপরও ওর নজর পড়ে! এতদূর নেমে গেছে সে! কারও সর্বনাশ করতেই ওর আটকায় না। কিছুতেই ওর অর্কাচ নেই এখন। কানীতে সকলে ওকে ভয় করত যমের মত। সবাই জানত, ওর মত বশীকরণ করবার ক্ষমতা আর কারও নেই। সেই লক্ষ্মীছাড়া ক্ষমতটুকু নিয়ে আগুন জালিয়ে বেড়াচ্ছেন সকলের বুকে। যাক, তোমার বরাত ভাল যে, আবার তুমি ওকে ধরতে পেরেছ। কিছুতেই আর ছাড়বে না, যেভাবে হোক ওকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর যেন ও কাউকে ঠকাতে না পারে, আর কোনও হতভাগীর সর্বনাশ না করতে পারে ঐ চোখ দিয়ে!”

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল। হচ্ছে কি? মাথাটা সভ্যই খারাপ হয়ে গেল নাকি গোরীর? উপোসে আর দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে গেছে একেবারে!

কিন্তু ও আপদ আবার জুটল কোথা থেকে?

দরজায় যা দিলাম।

“দরজা খোল গৌরী। হাত পুড়ে গেল এখানে।”

খুলে গেল দরজা। হাসিতে মুখখানি বিকৃত করে তরল কণ্ঠে বলে উঠল গৌরী—“তবু যা হক, এতক্ষণে মনে পড়ল দাসীর কথা।”

খতমত খেয়ে বললাম, “এই সিঁজাভাঙুলো ভাজাতে একটু—”

“না না, একটুও দেবি হয়নি। দেবি হয়েছে বলে কি মরে গেছি নাকি আমি?”

ঠোঙাটা নিলে আমার হাত থেকে। তাবলব চোখ ঢুটিতে একটা ভারি বিলম্ব সংকেত ফুটিয়ে আহ্বান করলে আমাকে।

“এস, ভেতরে এস। দেখাব এস কে এসেছে গোমার কাছে।”

যেন একটা চড় খেলাম গালে। ওর চোখে আব গলার স্ববে যে ইন্ধিতটুকু প্রকাশ পেল, তাতে সর্বশবীর বিরি করে জ্বলে উঠল আমার ভাবনে কি ও আমাকে?/

কেবনের মধ্যে কাঠ হয়ে দাড়িয়ে আছে সেই স্ত্রীলোকটি। বিব্রণ ভয় তার দুই চোখে। আরও কক্ষ আবও কক্ষ হয়ে উঠেছে তার মূর্তি।

তাকেই জিজ্ঞাসা কবলাম—“আমার এখানে এসে জুটলে কোথা থেকে?”

জবাব দিলে গৌরী—“তোমায় খুঁজতে খুঁজতে এল গো। টান আছে বলেই ধরতে পারলে শেষ পর্যন্ত।”

অগুন জ্বলে উঠল আমার মাথার মধ্যে। দাঁতে দাঁত চেপে যতদূর সম্ভব চাপা গলায় তাকেই হুকুম কবলাম—“বেবিযে যাও ঘব থেকে।”

এবার তাকে আডাল করে দাঁডাল গৌরী।

“ইস, অত রাগ কেন? তুমি যে একজন পাকা ব্রহ্মচারী, তা কি আর আমি জানি না। ও যাবে না। ঘব ছেড়ে পালিয়ে আসবার প্যামর্শ দিতে গিয়েছিলে যখন, তখন এ বাগ ছিল কোথায় তোমার? কেন যাবে? কোথায় যাবে ও এখন? লজ্জা করে না তোমার ওকে তাড়িয়ে দিতে? কার জন্তে ও ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে?”

স্তব্ব হয়ে চেয়ে বইলাম ওর মুখের দিকে। শব্দ করছে না তো আমাকে। না তা নয়, হিংস্র উল্লাস নাচছে ওব চোখে। এবার বেশ ধীরে স্নেহে ওজন করে বলতে লাগল গৌরী, “এই খেলা খেলবাব জন্তেই তো তুমি সাধু হয়েছ। স্নযোগ স্নবিধে পেলে কোনও কিছুতেই তোমার অকটি নেই। কোনও মেয়ের সর্বনাশ করতে যাবার সময় মনে থাকে না যে, তার ভার বহিতে হবে।’ সবাইকে ফাঁকি

দিয়ে পালানো যায় না ব্রহ্মচারী, এবার আর কিছুতেই তা হতে দোব না আমি। এ বেচারী একটা গাঁয়ের মেয়ে, ওদের বোটমদের ঘরে চিরকাল শান্তিতে কাটাতে আর ভিক্ষে করে খেতো। কেন তুমি ওর সর্বনাশ করতে গেলে? কেন তোমার বিচ্ছেদ ফলাতে গেলে ওর ওপর? তোমার ঐ পোড়া চোখেব দৃষ্টিতে যে পড়বে, তারই তুমি মাথা খাবে কেন? ওকে দেখেও তোমাব লোভ হ'ল? ছিঃ।”

গৌরীব পিছন থেকে কি যেন বশতে গেল স্ত্রীলোকটি। এক দাবড়ি দিয়ে তাকে থামালে গৌরী। এক নিঃশ্বাসে বলে গেল আমায়, “ও আব আমি দু'জনে থাকব কেবিনের মধ্যে। তুমি বাহবে থাকবে। ওর টিকিট বদলে নিলেই চলবে।”

তাবপর হঠাৎ ওর কণ্ঠে উথলে উঠল দবদ আব মিনতি।

“ওকে আর দূব কবে দিও না ব্রহ্মচারী। আব পাপে ডুবিও না নিজেকে। নিজের কথাটাও একটু ভাবো। এভাবে মেয়েদের পথে বসিয়ে নিজে সাধু সেজে চিরকাল মজাষ কাটিয়ে গিয়ে পবকালে কি জবাব দেবে তুমি? এতটুকু পবকালের ভয় ববে না তোমাব?”

কাপ ডিস কেচলি হ'তে স্টলের ছোকরা দবজাব সামনে এসে দাঁড়ান। এবার হাত থেকে নিলাম সেগুলো। তাবপর অতি কষ্টে সামনে ফেললাম নিজেবে। একটু বোকা বোকা হাসি ফুটিয়ে তুললাম মুখে।

“বেশ তো, থাকো না তোমাব দু'টি-ও কেবিনের মধ্যে। তোমাব তো একজন সঙ্গী হ'ল। এখন ধবো এগুলো, চা টা খাও তোমাব। আমি ববং স্টলে বসেই কিছু খেয়ে নি।”

সামান্য একটু সময় আমাব মুখেব দিকে চেয়ে বইল গৌরী। বোধ হয় ঠাণ্ডাবাবর চেষ্টা কবলে আমাব মনেব ম'লবটা। কিংবা একেবাবে হতাশ হ'বে পড়ল, তার সব ক'টা বিবাক্ত শব বার্থ হয়ে গেল দেখে। তবু আব একবার শেষ চেষ্টা করলে আমার মন্তস্তবকে জাগ্রত করবার।

“কোথায় যে তুমি নেমে গেছ ব্রহ্মচাণী তা তুমি নিজেও জান না। ছি ছি ছি, কার স্বপ্ন বুকে বরে আমি কাটিয়েছি এতদিন।”

ওর বুক খালি করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেবিযে এল। চাঘের কেচলি, কাপ, ডিশ নামিয়ে দিয়ে কেবিন থেকে হাসি-মুখে বেরিয়ে এলাম।

স্টীমারের রেলিং ধবে দাঁড়িয়ে আছি।

রাত কত হ'ল?

কাল ঠিক এমন সময় নির্জন মাঠের মধ্যে খোয়া-গুঠা রাস্তার ওপর দিয়ে

একজনের হাত ধরে হাঁটছিলাম । ঐ চাঁদ তখন পশ্চিম দিকে নেমে যাচ্ছিল ।

আর আজ ?

ঢং ঢং টিং টিং নানা জাতের আওয়াজ উঠল ইঞ্জিন ঘরে । স্টিমারের বাশি
থেমে থেমে ডাক দিচ্ছে কাকে !

একথানা বড় নৌকা এসে লেগেছে স্টিমারের গায়ে । মাল উঠল, স্টিমার
থেকে কয়েকটি মেয়েপুরুষ নেমে গেল নৌকায় ।

তাদের পিছন পিছন আমিও ।

অঙ্ককারের বুকে ভেসে যাচ্ছে তরণী । আশা-আনন্দে-গড়া মিথ্যা মরীচিকা
ভেসে যায় ঐ আলোর তরণীতে ।

নৌকার ওপর বসে স্পষ্ট দেখা গেল পিছন দিকে বন্ধ কেবিনগুলোর দরজা ।

বন্ধ দরজাব বাইরে আমার স্থান ।

নিবিড় অঙ্ককার ।

ঐ অঙ্ককারের মাঝে ধরণীর বুকে নেমে যেতে চলে নৌকা থেকে ।

ফক্কড-তক্তের সব চেয়ে কড়া অহুশাসন, ফক্কড কখনও ঝগড় বাঁধে না ।

ঝগড় বেঁধে তার তলায় মাথা গুঁজে থাকলে সে আর তখন ফক্কড থাকে না ।

নৌকা এসে ঠেকল মাটিতে ।

মাটিতে পা দিলে ফক্কড ।

চিব-বলীভূতা জননী মাটির ধরণী । ঘৃণা-সন্দেহ করে না কখনও ফক্কডকে ।
মাটির সম্ভান ফক্কড । মাটির বুকে ঘুরে বেড়ায় চিবকাল । ঘোরা শেষ হলে
মাটির বুকেই লুটিয়ে পড়ে একদিন ।

କଳିତୀର୍ଥ କାଳୀଘାଟ

জননী

প্রভাবতী দেবীর শ্রীশ্রীচরণকমলে

আশা তৃষ্ণা জুগুপ্সাভয়বিশদয়ণামানলজ্জাভিষঙ্গাঃ ।
ব্রহ্মাগ্নাবষ্টমুদ্রাঃ পরস্মকৃতিজনঃ পচ্যমানঃ সমস্তাৎ ॥
নিত্যং সংখাদয়েত্তানবহিতমনসা দিব্যভাবানুরাগী ।
যেহসৌ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে পশুগণ বিমুখোরুদ্রতুল্যো মহাত্মা ॥

আশা তৃষ্ণা রাগি ভয় যুগা মান লজ্জা এবং আক্ৰোশ এই অষ্টমুদ্রাকে
ব্রহ্মজ্ঞান অগ্নিতে অতি সাবধানে পাক কবে যিনি ভক্ষণ করেন—সেই
দিব্যভাবাপন্ন মহাসাধকই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড মধ্যে পশুপাশবিমুক্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মসম মহাত্মা

সবই গরল ।

সবই গরল ।

সবই গরল ।

ঘুরছে । ঘুরে ঘুরে এগিয়ে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার ঘুরে আসছে ।
গরল নয়, কিন্তু স্বধাও নয়, ছাগশিশুর কণ্ঠে অন্তিম আকৃতি ।

এ গলি ও গলি সে গলি নয়, একই গলি । ইট-বাঁধানো অন্ধকার গলিটা
সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পড়ে আছে । দিনের আলো যায় না, রোদও পৌঁছয়
না, আকাশের ছোঁয়া লাগে না ।

মহামায়া কালী ভগবতী, ও সবই ত এক । একটা গলিকেই ভাগ ভাগ করে
তিন নামে ডাকা হয় । দুপাশের একতলা দোতলা তেতলা বাড়ীর দরজা জানালা
সব বন্ধ । গলির প্যাঁচের মুখে মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক একটা এক-
চোখো দৈত্য । মুখ উঁচু করে দেখলে দেখা যায়, সেই একটা চোখ, যে চোখে
আলো নেই, আগুন নেই, আছে শুধু একটা ফ্যাকাশে দীপ্তি । কোনই লাভ হয়
না তাতে, গলিগর্ভের আঁধার ঘোচে না একটুও । তাই কৈদে মরে একটা স্তব
প্রতি রাতে, সেই গলির মধ্যে ।

“দেবার মত অবিরত আছে শুধু নয়নজল ।

জানাই তোরে ওমা শ্যামা আর যা আছে সবই গরল ॥”

ওরা সব ঐদিকেতেই থাকে ।

ওরা হল তীর্থবাসীর দল ।

ওরা তাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শোনে, “আব যা আছে সবই গরল ।”

তীর্থবাসীরা ঘুমায়, ঘুমায় তাদের মা কালীও ।

সারাদিনের হৈ-হুল্লোড থেয়েখেয়ি খেচাখেচি, না-ধোয়া শালপাতার ঠোঙায়
পিণ্ডি-চটকানো কাঁচাগোল্লার ভোগ থাওয়া, সে কাঁচাগোল্লার ছানা ক্ষীর যে কোন
জীবের দুধ থেকে বানানো তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী মা নিজেও জানেন না । তবু
সে ভোগ খেতে হয় মাকে । ভোর থেকে রাত দশটা এগারটা বারটা পর্যন্ত সমানে
চেখে যেতে হয় সেই পিণ্ডি-চটকানো সন্দেশ । নয়ত ওরা যে ঘুমোতে যাবে খালি
পেটে ।

ওরা যে ঐদিকেতেই থাকে ।

ওরা যে তীর্থবাসীর দল ।

ওরা যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শোনে,

“দেবার মত অবিরত আছে শুধু নয়নজল ।

জানাই তোরে ওমা শ্রামা আর যা আছে সবই গরল ॥”

জড়িয়ে জড়িয়ে গাইছে । গাইছে, আর ঘুরে বেড়াচ্ছে গলিতে গলিতে । দুপাশের বাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ, বন্ধ দরজা জানালার ওধারে যারা ঘুমিয়ে আছে, তারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বলে দিতে পারে, কে গাইছে ও গান । শুধু বলতে পারে না, কেন ও ওভাবে গান গেয়ে বেড়ায় সারা রাত । সারা রাত, মানে কালীর যখন রাত হয়, তখন । কালীর রাত হয় মহানিশা-অতিমহানিশায় । কালীর রাত হয় অনেক দেৱীতে—

“দিবা চার্কপ্রহরিকা চাঞ্চন্তে পরমেশ্বরী ।

ঋতুদণ্ডাঙ্ঘ্রিকা তস্মাদ্ রাত্রিরুক্তা মনোবীভিঃ ॥”

রাতের প্রথম আধ প্রহর আর শেষ আধ প্রহর রাতই নয়, দিবা । প্রথম আধ প্রহর পর, ছ দণ্ড হল রাত্রি । তারপরেও দশ দণ্ড হল, নিশা আর মহানিশা । নিশা মহানিশাকে বলে সর্বদা । তাতে সর্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় ।

“সর্বদা চ সমাখ্যাতা সর্বসাধন কর্ম্মণি”

আধ প্রহর হল, দেড় ঘণ্টা, তারপর ছ দণ্ড হল, আরও দু ঘণ্টা চব্বিশ মিনিট । অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে অন্তত চার ঘণ্টা পার হয়ে গেলে তবে নিশা মহানিশা শুরু হয় । রাতের শেষ প্রহরের আগেই শেষ হয়ে যায় মা কালীর রাত । তাই মাঝ রাতেরই স্তনতে .পাওয়া যায় সেই গান । এ গলি ও গলি সে গলি দিয়ে এগিয়ে আসে । সবাই জানে কে আসছে ও গান গাইতে গাইতে, সকলেই চেনে তাকে, সকলেই ওকে এড়িয়ে চলতে চায় । তাই মহানিশা ছাড়া ও মুখ দেখায় না কাউকে । কারণ মহানিশায় ওর মুখ-দর্শনের জন্তে কেউ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে না ।

“জানাই তোরে ওমা শ্রামা

আর যা আছে সবই গরল ॥”

দাঁড়িয়েছে এবার ।

কালীর সামনে দক্ষিণ দিকের গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছে । গেট বন্ধ, ভেতরের নেপালী চৌকিদাররা চেনে ওকে । সবাই ওকে চেনে, কিন্তু ওর কাছে ঘেঁষতে

চায় না। ভেতরের চোঁকিদাররা আরও ভেতর দিকে সরে যায়। ও দাঁড়িয়ে, লোহার গেটের ফাঁকে যতটা সম্ভব মুখটা ওঁজো দিয়ে বার বার শোনাতে থাকে,

“জানাই তোরে ওমা জামা আর যা আছে সবই গরল।

দেবার মত অবিরত আছে শুধু নয়নজল।”

তারপর ও আর ওর নয়নজল দূরে সরে যেতে থাকে। মায়ের বাড়ীর পুবে, কুণ্ডের ধারে আর একবার শোনা যায় ওর গলা, হালদার পাড়া লেনের ভেতর থেকে আবার শোনা যায়। ক্রমে মিলিয়ে যায় সেই কান্না। আর তখন কংসারি হালদার মশায় চুপি চুপি উঠে পড়েন তাঁর বিছানা ছেড়ে। এতটুকু শব্দ না করে চোরের মত পা টিপে টিপে নেমে আসেন নীচে। একটিও আলো জ্বালেন না, একজনকেও ঘুম থেকে ওঠান না, সোজা গিয়ে ঢোকেন কলঘরে। মিনিট পনেরোর মধ্যে হাত মুখ ধুয়ে নিঃশব্দে সদর দরজা খোলেন। সেখানে অন্ধকারে জামা পরে জুতো পায়ে দিয়ে রাস্তার দিকের দরজা খুলে বাইরেব রকে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর সদর ঘরের বাইরের দিকের দরজায় তালা দিয়ে নেমে পড়েন ইট-বাঁধানো গলিতে। রইল বাড়ীস্বত্ব মানুষ ঘুমিয়ে। যখন ওঠে উঠবে, উঠে বেরিয়ে আসতে হয় কাউকে পথে, ত বেরবে সদর দরজা দিয়ে। সদর দরজা ত আর তিনি বন্ধ করে যাচ্ছেন না, বন্ধ থাকছে সদর ঘরের বাইরের দিকের দরজা। আর সদর ঘরে কেউ সাত-সকালে ঢুকতেও আসবে না।

কংসারি হালদার হাঁটা শুরু করেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা, কামাই নেই তাঁর ভোর রাতে হাঁটার। কিছুতেই নয়, আকাশ ভেঙে মাথায় নামলেও নয়। এক পথ, এক রকম চলা, একই দৃশ্য দেখা, মানে মনে মনে দেখা। দিনের পর দিন, মানে রাতের পর বাত, সমানে তিনি হাঁটেন। বর্ষায় মাথায় থাকে ছাতি, শীতে থাকে মাথায় এক ফালি গরম কাপড় জড়ানো, আর হাতে এক গাছা পাকা বাঁশের লাঠি। মাথা পর্যন্ত নয়, কোমর পর্যন্ত উঁচু লাঠি একখানা, যার মাথাটা রূপো দিয়ে বাঁধানো। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময়ই লাঠিখানা হাতে থাকে তাঁর। তা হল বৈকি, প্রায় ত্রিশ বৎসর পার হতে চলল লাঠিখানার বয়েস, ত্রিশ বৎসর ওখানা চলেছে হালদার মশায়ের সঙ্গে শেষ-রাত ভ্রমণে। আগে কংসারি হালদার মশায় লাঠিখানা বয়ে নিয়ে যেতেন, এখন লাঠিখানাই ওঁকে টেনে নিয়ে যায়। হালদার মশায়ের হাত ধরে নিয়ে যায় লাঠিখানা, এ কথা বললেও বলা চলে। যোজ্ঞ স্নান করার আগে তেল হাতটা ছুবার লাঠিখানার গায়ে বুলিয়ে দেন তিনি, খুব যত্ন করে আদর করে তেলটুকু ঘষে দেন তিনি লাঠিখানার গায়ে। যেন ছেলের

গায়ে তেল বুলোচ্ছেন, তা ছেলেই ত, বলা চলে লাঠিখানাকে। এমন ছেলে, যে ছেলে বাপকে হাত ধরে নিয়ে যায় অন্ধকার রাতের মহানিশা থাকতে থাকতেই। পৌছে দেয় সেখানে। যেখানে দিনান্তে, না, না, দিনান্তে নয় নিশান্তে একটিবার না পৌছলে বাপের প্রাণে প্রাণ থাকে না। তাই ছেলে নিয়ে যায় বাপের হাত ধরে সেখানে। যাকে বলে অন্ধের যষ্টি, তাই হল ঐ লাঠিখানি হালদার মশায়ের কাছে।

কিন্তু কোথায় পৌছে দেয় তাঁকে।

পড়ে আছে সব মড়াথেকে মড়াবা।

রোজই যেমন পড়ে থাকে।

কাদায় ধুলোয় পাক, গক ঘোড়াব গোববে, ছেঁড়া কলাপাতা পচা শালপাতা আর রাসীকৃত ত্রাকডাঘ সমস্ত পথ ছয়লাপ। ওর মাঝখান দিয়েই অতি সাবধানে কোনও কিছু না মাড়িয়ে পথ চলতে হয়। কংসারি হালদার মশায় জানেন, খুব ভাল করে জানেন যে, পথেব এই জঞ্জালগুলো সজীব। ভাঙা ভাঁড় খুঁবি মবার ওপর পা পড়ে হালদার মশাযেব। সেগুলো মড মড কবে ওঠে। তিনি ও মড-মডানিতে ঘাবড়ান না। কিন্তু দৈবাৎ যদি পা পড়ে কোনও ছেঁড়া ত্রাকডাঘ পুঁটলি ওপর তাহলে মড মড করে উঠবে না বটে, কিন্তু ককিয়ে কেঁদে উঠবে হয়ত কেউ। মুখখিস্তি করতে লেগে যাবে হয়ত অনেকে। হাতে পায়ে দগদগে ঘা-ওয়ালা তেলেক্বী-গুলো আবার নোঙরা ছুঁড়ে মাবে। রাতের নোঙরাটা ওরা পাশেই রেখে দেয় কি না, ভোর হলে ওদের সজী সজিনোরা এসে সেগুলো সবিয়ে নিয়ে গঙ্গায় দিয়ে আসে। ওবা যে কারও সাহায্য না পেলে নডতে পারে না।

হালদার মশায় বাঁশেব লাঠিটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘেঁষে পথ কবে চলেন। লাঠির মুখের ছেঁড়া ত্রাকডাঘ পুঁটলি ঠেকলে তিনি টেব পান। তখন সাবধান হয়ে পা ঘেঁষে ঘেঁষে পাশ কাটান।

প্রথমে গলি থেকে বেরিয়ে মায়েব দক্ষিণ দিকের গেটেব বাইরের আড়িনা। আড়িনায় পড়লে নাকই বলে দেয় কোথায় পৌছল। গেটের ভেতর থেকে পচা রক্তের গন্ধ বাইরে পর্যন্ত ছড়ায়। ওদিকটা ঐ রক্তের গন্ধে মাত হয়ে থাকে অষ্টগ্রহর। কম ত নয়, কোটি কোটি বলি হয়ে গেছে ওখানে। ধর, সেই রাজা মানসিংহের আমল থেকে। বলি অবশ্য শুরু হয়েছে সে আমলেরও আগের আমল থেকে। কম কথা ত নয়। একেবারে জলজ্জাস্ত জাগ্রত মহাপীঠ যে! বলির

বলি তত্ত্ব বলি মহাবলি পর্যন্ত হয়ে গেছে। হালদার মশায়ের নাড়ী-কাটা ইস্তক ঐ ভ্যাপসা গন্ধ উনি নাকে শুঁকছেন। নাড়ী-কাটার আগে মায়ের পেটে থাকতেও শুঁকেন। তাঁর বাপ, বাপের বাপ, তত্ত্ব বাপের বাপের বাপও মায়ের পেটে বসে ঐ গন্ধ শুঁকেন। বড় পবিত্র গন্ধ ও জিনিসের। কংসারি হালদার এসে দাঁড়ালেন গেটের সামনে, বন্ধ গেটের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে ঠিক দেড় মিনিট বিভবিড় করে কি বললেন। তাবপব চললেন লাঠি ঠক ঠক করে। ঘুরলেন ডান দিকে, কয়েক পা এগিয়েই নামলেন নহবতখানার সামনে। সব ঠিকঠাক হয় রোজ, ভুল হবার জো কি। কম ত নয়, নাড়ী-কাটার পরদিন থেকে ঠিক না হলেও, অন্নপ্রাশনের পরদিন থেকে ঠিক এই পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন হালদার মশায়। কাজেই ভুল হবার জো কোথায়।

অন্নপ্রাশনের পরে অবশ্য বেশ কিছুকাল কারও কোলে চেপে ঘুরেছেন এ সব জায়গায়। এখন ঘুরছেন লাঠির ঘাড়ে চেপে। কাজেই অসুবিধের কিছু নেই। মুখস্থ, সবই মুখস্থ। মাগাগোড়া সাবা জীবনটাই একদম মুখস্থ কণ্ঠস্থ চোটস্থ হয়ে আছে হালদার মশায়ের। কাজেই ভুল হবে কি করে।

কিন্তু আরও বেশী সাবধান হতে হয়।

নহবতখানার সামনের পাথরের টালি-বাঁধান রাস্তাটার সবটুকু বাতবে শয্যা কি না। মোটে ফাঁক থাকে না এতটুকু। তবে ওয়া সবাই জানে কখন হালদার মশায় ওই পথ ব্যবহার করেন। লাঠির শব্দ উঠলেই একটু নড়েচড়ে সরে, কোনও রকমে এক ফালি পথ কবে দেয় ওরা।

হালদার মশায় এগিয়ে চলেন। এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তাটা পার হন। তারপর ঢোকেন মায়েব ঘাটে যাবার পথে। দোজা এগিয়ে চলেন গঙ্গাব ঘাটে।

গঙ্গা।

মবে গেছে। তা যাক, তবু গঙ্গা। এক সময় ত বেঁচে ছিল। যখন ঠেঁয়ে ছিল, তখন অনেক মডাব নাতি আর অস্থি বয়েছে। এখন নিজেই গেল মরে। তা যাক, উদ্ধার হয়ে গেলেন মা গঙ্গা নিজেই। এতকাল সবাইকে উদ্ধার করতেন, এবার নিজে উদ্ধার হয়ে গেলেন। ভালই হল।

কাজেই কে ওড়াতলার ঘাটটিও এবার গেল। হালদার মশায় মনে মনে হাসেন। কংসারি হালদার মশায়ের পিতা, দৈত্যারি হালদার মশায়ের তিন দিন কাটে গঙ্গার তটে। তাঁকে অন্তর্জলি করা হয়েছিল। মানে তিনি ‘অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে অর্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে’ অবস্থায় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেছিলেন। কংসারি

হালদার মশায় মনে মনে হাসতে লাগলেন। এখন যদি ঐরকম ভাবে মরবার সাধ হয় কারও, তাহলে তার অর্থ অঙ্গ পুঁততে হবে মাটির মধ্যে। গঙ্গা ত শুকনো খটখট করছে। এক বিন্দু জল নেই কোথাও। এমন কি পচা পাক পৰ্বস্তু নেই।

খান দুই নৌকা সেই শুকনো ডাঙায় পড়ে আছে। মাড়িয়ে পার হতে হয়। ওপারের মাচায় একটা পয়সা দিতে হয়, পারানি। নয়ত অল্প যেখান দিয়ে মজি হয় হেঁটে পার হও। এক পয়সাও কেউ চাইবে না, পায়ে এতটুকু কাদাও লাগবে না।

পায়ে কাদা না লাগুক কিন্তু খেয়ার কড়ি ফাঁকি দিতে নেই। হালদার মশায় তা দেনও না কোনও দিন। লাঠি ঠুঁকে ঠুঁকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান। লাঠির মুখ দিয়ে ঠাণ্ড করে দেখে নেন নৌকার কোণটা। তারপর ঠুক ঠুক করে নৌকা দুখানার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ান মাচার সামনে। পয়সাটা ঠিকই থাকে রোজ, ঠিক জায়গায়। বার করে মাচায় ছুঁড়ে ফেলতে একটুও সময় নষ্ট হয় না গুর। সময় নষ্ট হয় বর্ষাকালে, যখন একটু আধটু জল থাকে খালে, তত্কি করে যাকে বলা হয়, আদি গঙ্গা। আদি গঙ্গায় জল থাকলে নৌকা দুখানা টলমল করে, তখন পা ঠিক রেখে পেরিয়ে আসতে একটু কষ্ট হয়, একটু সময়ও নষ্ট হয়।

তারপর এ গলি দিয়ে ও গলিতে গিয়ে পড়েন। বাঁ দিকে ঘুরে অল্প একটু হেঁটে ঠিক জায়গায় পৌঁছন। একটা ছোট জানালার গায়ে লাঠিটা ঠোকেন দু'তিন বার। জানালাটা অনেক উচুতে, প্রায় হালদার মশায়ের মাথা ছাড়িয়ে। তাই লাঠির নীচের দিকটা ধরে মাথার দিক দিয়ে যা দেন জানালায়। রোজই দেন।

জানালাটার ভেতর থেকে সাড়া আসে, “কে?”

“আমি।” হালদার মশায় বলেন শুধু, “আমি।” ব্যস, যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হল।

মিনিট দুয়েক আর কোনও সাড়াশব্দ নেই, এ পক্ষেও না ও পক্ষেও না। তারপর ডানধারের এক হাত চওড়া গলির মুখে দেখা দেয় একটা আলো। একজন বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় হালদার মশায়ের পাশে। তাঁর হাত ধরে বলে, “এস।”

হাত ধরে ‘এস’ না বললে হালদার মশায় নড়েন না একটুও। এমন কি নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলেন না তিনি। এই হাত ধরা আর ‘এস’ বলার অপেক্ষায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

আর একবার শোনা যায় ‘এস’। এই ‘এস’টির স্বরই অন্তরকম। এই দুটি অক্ষরের ছোট্ট শব্দটি শোনা যায়, যখন ঐ বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন হালদার

মশায়। তখন কিন্তু কেউ হাত ধরে না তাঁর। তখন লাঠি ঠক ঠক করেও চলতে হয় না তাঁকে। সেই সাত-সকালে যারা রাস্তার কলে জল নেবার জন্ত বেরয়, তারা তাকে লাঠিখানা বগলে গুঁজে হনহন করে রাস্তা পার হতে দেখে ধারণাই করতে পারে না যে, আকাশে আধার থাকলে এই মানুষটিও আধার দেখে জগৎ। সন্ধ্যা পার হবার আগেই এর দুই চোখে এমন আধার ঘনিয়ে ওঠে যে, ইনি ঠর ঐ লাঠির চোখ দিয়ে ছাড়া নিজের চোখে কিছুই দেখতে পান না।

নিশি পোতায়।

মিছরি মশায়রা গিয়ে মায়ের দরজার তাল খোলেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে মায়ের সাজসজ্জা করে দেন। ফলমূল দিয়ে আমান নৈবেদ্য সাজান। পৌছে যান তখন ভট্টচায় মশায়ও। মায়ের নিত্যপূজা শুরু হয়।

সবই হাত চালিয়ে কবতে হয় তখন। শান্তিতে ধীরে স্বপ্নে যে একটু স্নান করবেন বা জলটল খাবেন মা, তার ফুরসত কোথায়। সবাই এসে পৌছে গেছে কিনা ইতিমধ্যে। প্রতিটি মিনিটের মূল্য আছে। মিনিট জুড়ে জুড়ে হয় ঘণ্টা, ঘণ্টা জুড়তে জুড়তে হয় দিন। দিনটা আবার কিনে ফেলেছে একজন। নগদ টাকা দিয়ে কিনেছে। দয়াময়ী মা যদি মুখ ভুলে চান, তবে কাঁই না হতে পারে। না হতে পারে কি? পাচশো টাকা দিয়ে পালা কিনলে, পাঁচ পাঁচ পঁচিশ হাজারই বা হতে কতক্ষণ।

অবশ্য হয় না তা কিছুতেই, হবার জো আছে নাকি কিছু হাডহাবাতের জালায়। ঐ যে আহুড গায়ে, কোমরে গামছা বেঁধে, গলায় এক গোছা পৈতে ঝুলিয়ে, কপালে ইয়া বড সিঁহুরের গুল লাগিয়ে, পোড়া কয়লার বর্ণ, গুচ্ছের পাকানো মূর্তি এসে ঢুকেছে মায়ের বাড়িতে, ঐ যে মাথার ওপর উঁচু করে ধরে রয়েছে সকলে ছোট ছোট চুপড়ি। ঐ যে ওধারে নাটমন্দিবে উঠে সব বসছে আসন বিছিয়ে, রক্ত-বস্ত্র পরা, গলায় মাথায় কোমরে হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে রক্তাক্ষের বিচিত্র বঁধা, লম্বা চুলো সাধক-পুণ্ড্রবের দল, যাদের অসাধ্য কর্ম কিছুই নেই এই দুনিয়ায়। মারণ উচ্চাটন বশীকরণ স্তম্ভন থেকে শুরু করে, রেসের ঘোড়ার নম্বর পর্যন্ত বলে দিতে পারে যারা মক্কেলকে। শুধু পারে না, নিজেদের অবস্থাটা একটু ফিরিয়ে বোজ মায়ের বাড়ি এসে তীর্থের কাকের মত মুখিয়ে বসে থাকার হাত থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে। এই সব এতগুলো হস্তে হাঙরের হাঁ করা গ্রাস থেকে পরিজ্ঞান পেয়ে যদি কিছু পড়ে মায়ের হাতে পায়ে গায়ে, তা কুড়িয়ে আর

কতই বা হয়। যা হয়, তা দিয়ে পালার খরচও ওঠে না। অনর্থক দিকদারি ভোগের হাত থেকে পরিজ্ঞাপ পাবার জন্তেই পালাদার মশায়রা বেচে দেন পালা। যা মরণে যা, যা তোদের কপালে মা দেয়, কুড়ো গিয়ে। মায়ের সেবা পুজোর এতটুকু অজ্ঞহানি না হয়, এই দেখাই হল আমাদের কাজ। বাস, এইটুকু যতদিন মা করাবেন, ততদিন করব। কে যাচ্ছে, মায়ের দরজার পয়সা কুড়োতে, যা নগদ পাওয়া যায় তাই ভাল। মায়ের সেবা পুজোয় লাগে বড় জোর একশ শোয়াশো টাকা, ওর ওপর যা মেলে তাই যথা লাভ।

তা পালা বেচে দিলেও নজর রাখতে হয় সব দিকে ঠুঁদেরই। আসলে ঠুঁরাই হলেন মায়ের সেবায়ত। ঠুঁরা ত ভুলতে পারেন না, ঐ হৈ হট্টগোল ছডোছডি কাডাকাডি খেয়োখেয়ির মাঝে মা কাউকেই চেনেন না, জানেন না, কারও কথা কানে তোলেন না। চেনেন শুধু নিজের সেবকদের, চৌদ্দ পুরুষে যারা মার নোকর, মা শুধু তাদেরই চেনেন জানেন। হঠাৎ কোনও কিছুর দরকার যদি হয় মায়ের, তাই যতক্ষণ মন্দিরের দরজা খোলা থাকে, নোকর বংশের কেউ না কেউ ঠিক হাজির আছেন মায়ের বাড়িতে। ঠুঁরা মাকে স্পর্শ কবেন না সহজে, সে কাজ ঐ মিছরিদের। ঠুঁরা মায়েব পুজো কবেন না, সে কাজ ভট্টচাযদেব। ঠুঁরা মাযের ভোগ রাঁধেন না, তার জন্ত লোক নিযুক্ত করে রেখেছেন, যারা রাত দশটা পর্যন্ত উপোষ করে থাকবে। ঠুঁরা সত্যি কিছু করেন না, ঠুঁরা করান। আব যদি দৈবসৈবে নিজেদের কোনও যজ্ঞমান আসে মায়ের বাড়ী, এসে অন্ন কোনও ঘড়েলের গ্রাসে না পড়ে খুঁজে বার করে ঠুঁদের, তখন সম্মানে নিজেদের যজ্ঞমানকে নিয়ে গিয়ে ঢোকেন মায়ের ঘরে। পুজা করান, অঞ্জলি দেওয়ান, মায়েব আশীর্বাদী হাতে দিয়ে যজ্ঞমানকে বার করে নিয়ে আসেন মায়ের বাড়ী থেকে। যজ্ঞমান মায়ের হাতে পায়ে কি দিল, না দিল, ফিবেও তাকান না সে দিকে। মায়ের বাড়ার বাইরে এসে যজ্ঞমান যদি কিছু প্রণাম দিবে প্রণাম করে তবে তাই যথেষ্ট। ঠুঁরা যে মায়ের খাস সেবায়ত। ঠুঁরা কি ফেউ ফেউ করতে যাবেন না কি লোকের পেছনে!

ফেউরাও ততক্ষণে তৈরী হয়ে গেছে ফেউ ফেউ করার জন্তে।

ভেতরে এরা, বাইরে ওরা। সেই ক্রাকডা-কানি-জডানো সজীব হাড়মাংসগুলো হন্তে হয়ে উঠেছে বাইরে! পূবে কালী টেম্পল রোডের শুরু থেকে রাস্তার দুপাশ জুড়ে থিকথিক করছে ওরাই। গড়াচ্ছে, কাতরাচ্ছে, কেঁদে কেঁদে লোকের নজর ফেরাবার মর্শাস্তিক চেষ্টা করছে, রাস্তার পাশে পড়ে। যারা চলতে পারে, হাঁটতে পারে, তারা দৌড়ছে মাহুঘের পিছু পিছু। ওদের আবার সীমানা ভাগ করা

আছে। যারা ঐ কালী টেম্পল রোডে পাহারা দেয়, তারা ছুটতে ছুটতে আসে হালদার পাড়া লেনের মুখ অবধি। আবার এধারের যাত্রী যারা ওধারে ফিরে যায়, তাদের পিছনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পৌঁছয় সদানন্দ রোডের মোড়ে। হালদার পাড়া লেনের মুখ থেকে আরম্ভ করে এক দলের চৌহদ্দি। ওরা ওদের শিকার ধরে, মায়ের বাড়ীর পুৰদিকের কুণ্ডের পাড়ে আর উত্তর দিকটার সারা রাস্তাটায়। আবার কালীঘাট রোড হল আর একদলের সীমানা। তাবা আবার নহবতখানার সামনের পথটুকুতে কিছুতে ঘেঁষতে পারে না। গঙ্গার ঘাটের রাস্তাগুলোয় যাওয়া থাকে, তারা এদের কাউকে ওদিকে দেখলেই কামড়ে খেতে আসে। নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ভাগযোগ করে নিয়েছে। কাজেই বড় একটা কামড়াকামড়ি হয় না ওদের মধ্যে।

কিন্তু এদের মধ্যে তাও হয়।

কাবণ এরা কোনও নিয়ম মেনে চলে না। যুবছে, হবদম টহল দিচ্ছে। হঠাৎ পশুর দৃষ্টি এদের চোখে, ঠিক চিনে ফেলছে প্রকৃত শিকার কোনটি। আর অর্মানি পাঁচজনে চিলের মত ছোঁ মেরে গিয়ে পড়ছে শিকাবের ঘাড়ে। এদের সীমানারও সীমা পবিসীমা নেই। সেই ওধাবে পোলেণ মুখে যেখানে কালীঘাট রোডের আরম্ভ, সেখানেও এরা আছে, কালীঘাট ট্রাম ডিপোতেও আছে, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটে আছে, ঘাটে ঘাটে আছে। কোথায় নেই এদের সজাগ স্তোন দৃষ্টি। কোথায় না শুনতে পাওয়া যায় এদের ককণ কুণ্ঠিত মিনতি, “এই যে, দর্শন কববেন না কি। আস্থন না এধারে, বেশ ভাল ব্যবস্থা রয়েছে।” কিংবা, “ডালা টালা কিছু নেবেন না কি মা। আস্থন না এধারে, ভালভাবে দর্শন কবিয়ে দিচ্ছি।” আবার গুরই মধ্যে যারা একটু বেশী চালাক, তারা দাঁত বার করেই এগিয়ে আসে, যেন কতদিনের চেনা-পরিচয়, “আস্থন বাবু আস্থন। সেই যে গতবার, আমিই আপনার কাজকর্ম করে দিলাম।” শিকার যদি সত্যিই শিকার না হয়, তাহলে গম্ভীরভাবে ওদের দিকে না তাকিয়েই এগিয়ে চলে যায়। দূবে দাঁড়িয়ে একটি কথা বললেই আর রক্ষে নেই। লেগে গেল খেয়োখেয়ি, কে ছিনিয়ে নেবে শিকারটি, তার জন্তে করতে না পারে এরা, হেন কর্ম নেই। মুহূর্তের মধ্যে গালমন্দ, এমন কি, হাতাহাতিও লেগে যেতে পারে।

এরাই হল ভালাধরা। ভালা ধরাই এদের পেশা। কলিতীর্থের এরাই হল কাক।

ওরা সব ঐদিকেতেই থাকে।

ওরা হল তীর্থবাসীর দল।

ওরা মায়ের এমন সন্তান যে, ওদের সম্বল শুধু নয়নজল ।

মায়ের বাড়ী জেগে উঠল ।

হয়ে গেল নিত্যসেবা, আমান্ন নৈবেদ্য বেরিয়ে গেল মন্দির থেকে । এবার শুধু ডালা ধরা, ডালা ধরা আর ডালা ধরা । কুথেরে উঠেছে সকলেই, যা জনা দশ বিশ যাত্রী এসেছে, তাদের চোখে ধাঁধা লাগাতে হবে । ভিড় দেখাতে হবে, ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করতে হবে, করাতে হবে । মায়ের ঘরে ঢুকে মায়ের পাদম্পর্শ করে আসাটা যে একটা যা তা কাজ নয়, সেটুকু সদা সর্বক্ষণ ফলাও করে দেখাতে হবে সকলকে । নয়ত যে বিলকুল মাটি হয়ে যাবে । হুড়হুড় করে যদি মাতুষে মায়ের সামনে যাওয়া আসা করতে পায়, যদি লোকের একবার ধারণা হয়ে যায় যে, মায়ের সামনে গিয়ে পৌঁছনটা যমের সামনে গিয়ে পৌঁছনর মত একটা কঠিন কর্ম নয়, তাহলে আর ওদের পরোয়া করবে কে । তাই ওরা নিজেরাই নিজেদের ঠেলে, গুঁতোয়, চোখ রাঙায় । অথবা চৈচায়, ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর অনবরত চূপড়ি নিয়ে মায়ের ঘরে ঢোকে, বেরয় । এই ওদের কর্তব্য, এইটুকুই ওদের কারবারের কারসাজি ।

ঝন ঝন ঝনাং, শিকল আছড়াচ্ছে কেউ দরজার গায়ে । “বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস”, চিংকার করছে দরজার মুখ জুড়ে দাঁড়িয়ে । কে বেরিয়ে আসবে, বেরিয়ে আসবার মত আছে না কি কেউ, মায়ের সামনে । যারা আছে, তারা কিছুতে বেরবে না । তাদের দায় হল, মায়ের সামনের সামান্য স্থানটুকু দখল করে থাকা, আর মায়ের হাতে পায়ে যা কিছু পড়বে, তা চোখের পলক ফেলার আগেই তুলে নিয়ে ট্যাঁকে গোঁজা । ওদের বংশাবলীই মায়ের অঙ্গসজ্জা করে, মায়ের নৈবেদ্য সাজায়, মাকে পাহারা দেয় । ওরাই ছুঁতে পারে মাকে । তাই ওদের যে গুপ্তির যেদিন পালা পড়ে, সেদিন সেই গুপ্তির যে যেখানে আছে মাকে ছেকাপেকা করে ঘিরে থাকে । ওরা বেরিয়ে আসবে কি রকম ? যখনই উঁকি দাও মায়ের মন্দিরের মধ্যে, দেখবে একদল মাতুষে ছিনে জোঁকের মত লেগে রয়েছে মায়ের গায়ে ।

হুতরাং ভিড় ভিড় আর ভিড় । বাইরে ভিড়, ভেতরে ভিড়, উঠানে ভিড়, নাটমন্দিরে ভিড় । পাঠা-কাটার ওধারে ভিড় । নানা জাতের ভিড় । কত রকমের কত মতলব নিয়েই যে মায়ের বাড়ী জেগে রয়েছে সদা সর্বক্ষণ, তা বোঝার সাধ্য মায়ের বাপেরও নেই ।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না ।

ভাইনে আনতে বায়ে নেই কারোরই ।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়, দুপুর গড়িয়ে বিকেলের পিছু ধরে । মায়ের মন্দির বন্ধ হবার উপক্রম হয় তখন । মা এবার ভোগ খাবেন ।

সবাই ফিরে চলে, যে ঘর মাথা গোঁজার স্থানে । মনে মনে হিসেব করে চলে, এ ট্যাকে ও ট্যাকে গোঁজা আছে কত । হিসেব করে মনে মনে, আর রেগে কাঁই হয় । ধুস্তোর ডালা ধরার মুখে ছুড়ো জ্বলে দিতে হয় । শালার সাত-সকাল থেকে মায়ের বাড়ী চেটে মোটে নগণ্য পয়সা ! নিকুচি করেছে মায়ের ।

ফিনকিও ফিরে যায় রোজ, একদম খালি আঁচল নিয়ে । আঁচলের কোনও কোণে তাকে গিঁট দিতে হয় না বড় একটা কোনও দিন । কারণ ফিনকি আর ফ্রক পরে না, তাই যাত্রীর জামা কাপড় ধরে টানাটানি করতেও পারে না । “কুমারীকে কিছু দিন,” এ কথাটা বলতেই কেমন যেন তার মুখে বাধে । ফিনকি শুধু দাঁড়িয়ে থাকে মন্দির ঠেস দিয়ে, হয় পুলের নীচে নয় ষষ্ঠীতলার ওধারে । তাও কারও নজরে পড়লেই তাড়া লাগায় । মায়ের বাড়ীর মধ্যে ও সমস্ত আজকাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কি না ।

কিন্তু মায়ের বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে কাউকে তাড়া করা—মা গো—। ঐ কুটে কাঙালীগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ানো, ভাবলেই ফিনকির মাথা ঘুরে যায় । তাই সে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মন্দিরের গায়ে ঠেস দিয়ে, আর দাঁত দিয়ে নখ ছেঁড়ে । আবার নজরও রাখতে হয় চারিদিকে, কে যে কখন গায়ে হাত দিয়ে বসবে, তার ঠিক নেই । গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে আসবে হয়ত কেউ, কেউবা তাড়াতে এসেও আগে থপ করে গায়ে হাত দেবে । মোটের ওপর গায়ে হাত তার পড়বেই । এমন কি ঐ হাফপ্যান্ট পরা পুঁচকে ছোঁড়াটা, ঐ যে পেঁচো, চায়ের পেয়ালা ধোবার কাজ করছে চায়ের দোকানে, ও ছোঁড় ঐ সাহসও কম নয় । মনিবকে লুকিয়ে তিন দিন তিন ভাঁড় চা খাইয়েছিল ফিনকিকে । বলেছিল, “আসিস একটু সবদিকে নজর রেখে, চা খেয়ে যাস ।” তা ফিনকি কি করে জানবে যে, অতখানি সাহস ওর । চায়ের ভাঁড়টা হাতে দিয়েই থপ করে একেবারে—। থু থু, সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড়টাই ছুঁড়ে মেরে দিলে ফিনকি, ছোঁড়ার বুক । তারপর দৌড়, দৌড়ে গিয়ে মিশে গেল ভিড়ের সঙ্গে । ঢুকে গেল মায়ের বাড়ীর ভেতরে, ঢুকে মন্দিরের পেছনে চরণামৃত নেবার নর্দমার পাশে মন্দিরের গায়ে মুখ রগড়াতে লাগল । রাগে নয়, দুঃখে নয়, অভিমানেও নয়, এমনি । এমনি অন্তঃকরণ মুখ রগড়াতে লাগল সে । অনেকেই দেখল, কেউই কিন্তু দেখল না, ফ্রক পরা অন্ধ

সকলে দেখেও দেখল না। কিন্তু একজন দেখল, পেছন থেকে সে বলে উঠল, “ওরে, ও মায়ী, আষ ত মা এদিকে। এই দেখ মা, ফিরে দেখ, ইনি তোকে কি দিচ্ছেন দেখ।”

ঝট করে ফিরে দাঁড়াল ফিনকি, চিনতে পারল। ভয়ে তার বুক টিপটিপ করতে লাগল। সামনে স্বয়ং হালদার মশায়।

কিন্তু না, হালদার মশায় তাড়াতে আসেন নি তাকে। তিনি তার পাশেব ভুঁড়িওয়ালা মাডোয়াডিকে কি বললেন। আর অমনি সে নগদ চকচকে একটা টাকা দিলে ফিনকিব হাতে। টাকাটা হাতে দিয়ে আবার ওব পাষে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। হালদার মশায় বললেন, “যা এবাব পালা, আব কাঁদতে হবে না মন্দিবের গাষে মুখ ঘষে,” বলে মাডোয়াডিকে নিষে ওধাবে চলে গেলেন।

কিন্তু সে ওই এক দিনই। বোজ্ব কি আব মা দয়া কবে। তাহ বোজ্ব ফিনকি ফিবে যাষ খালি আচল নিষে। আচলের কোণে তার গিট পড়ে না কোনও দিন।

ফিনকিব দাদা ফণা।

ফণা খেলে বেস। তাই তাব বিস নেহ, আছে শুধু কুলো পানা চরব। বলে, “জ্ঞানলি ফিনকি, এবাবে ঝেড়ে ধবব পাঁচ সিকেব টিপিণ চোট। এবাব দেখে নিস তুই, মাব কাকে বলে। এ বাকবা একটিবান্হ হাতে আসে, বলস সাহেবের আস্তাবল—হুঁ হুঁ।”

আস্তাবলের মুখে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে ফণা হুঁ হুঁ পযন্ত এগোষ। তাবপব বন্ধ কবে বলা। মাথা নিচু কবে এক গরাস ভাত মুখে ঢোকাষ। বোধ হয় চিন্তা কবতে থাকে, বলস সাহেবের নামটা কবাও সমীচীন হযেছে কি না। দেওয়ালেরও কান আছে ত, যদিও ছিটে বেড়ার কান আছে কি না, তা ঠিক ফণা জানে না এখনও।

ঠিক চার হাত লম্বা আড়াই হাত চওড়া বাবান্দাটুকু, এধারে ছিটে বেড়া ওধারে ছিটে বেড়া। মেঝেটা সিমেন্টের, যাকে বলে পাকা মেঝে। বাবান্দাব পেছনে ঘর, ঘরের মেঝেও পাকা। তবে দেওয়াল চাল সমস্ত টিনের। ঘবখানি ঠিক চার হাত লম্বা, একদম বাবান্দার সঙ্গে সমান। কিন্তু চওড়াটা অন্ততঃ হাত সাতেক হবে। মানে ভেতরদিকে অনেকটা চলে গেছে। এই এক মাপেব পাঁচখানা ঘর এক চালের নীচে, সামনের বাবান্দাটা তাই চার চাব হাত ভাগ করা হয়েছে ছিটে বেড়া দিয়ে। ঐখানেই খাওয়া, ঐখানেই রান্না, ঐখানেই বসা দাঁড়ানো সমস্ত। সমস্ত বাবান্দাটায় সারি সারি এ বেড়ার ও বেড়ার পাশে পাঁচটা উল্লন জলে রোজ। পাঁচ রকমের রান্না হয়। পাঁচখানা ঘরে পাঁচ রকমের

সলাপরামর্শ চলে। ঐ মায়েয় বাড়ীর কথাই হয় প্রায়। যা দিন কাল পড়ল। সকলেই এসম্বন্ধে একমত যে, যা দিনকাল পড়ল তাতে আর মায়েয় বাড়ী চেটে কিছুতেই দিন চলে না।

ফণা ফিনকির মা কিছু বলেন অল্প রকম। ছেলে মেয়ের সামনে এনামেলের কানা-উচু খালায় ভাত, তা শুধু ভাতই তাকে বলা চলে, ভাত আর তার সঙ্গে একটু টকের ডাল ধরে দিয়ে তিনি খুবই ফিস ফিস করে বলেন, “ফণা, আর ত চলে না বাবা। না হয় আমায় ছেড়ে দে, কারও বাড়ীতে বান্নার কাজ যদি একটি যোগাড় হয় দেখি।”

ছেলে মেয়ে দুজনেরই মুখে হাত তোলা হয় বন্ধ। ফণা কিছু বলার আগেই ফিনকি খু-উ-ব চাপা গলায় গর্জন কবে ওঠে, “ফের ও কথা বললে আমি লরীর তলায় লাফিয়ে পড়ব।”

ফণা প্রায় চুপি চুপি মিনতি করে মা বোনকে।

“ফিনকি, তুইও আব বের হোসনি ঘর থেকে। খবরদার এক পা দিবি নি পথে। দেখি শালার কি করতে পারি। সন্ধ্যার পর একটা কিছু ফেরি টেরির কাজই জোটাতে হবে এবার।”

ফিনকি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, “সেই ভাল দাদা, খু-উ-ব ভাল হবে তাতে। আমিও যাব তোমার সঙ্গে, ফেরি করে বেড়াব।”

ফণা হেসে ফেলে। বলে, “ধুং—গরু কোথাকার।”

ফিনকি তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বলে, “না দাদা, কিছুতেই আমি থাকতে পাবব না এই ঘরে। দুদিন বন্ধ থাকলে ঠিক দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। দেখ তুমি, এই তোমায় বলে রাখছি—”

ফণার আর শোনার অবসর হয় না। তাড়াতাড়ি একটা কুলকুচো করে সে ছোটো রাস্তায়। খাল পেরিয়ে চেতলার বাজারে তাকে পৌঁছতে হবে এখনই। সে গেলে তবে তার মনিব পরাণকেষ্ট গুঁই আডত থেকে উঠে বাড়ী যাবেন ভাত খেতে। আসা যাওয়া থাওয়ার জন্তে ফণা ছুটি পায় মাত্র একঘণ্টা, বেলা দুটো থেকে তিনটে। তিনটের পর পরাণকেষ্ট গুঁই ভাত খেতে বাড়ী যান। তিনটের একটু দেড়ী হলেই রেগে টং হন তিনি। তাই ফণা দৌড়য়।

ফণার মা ছেলেকে ভালো ধরতে দেননি মায়েয় বাড়ীতে। যে সংসারে তিনি বধুরূপে এসে দুখে-আলতার পাথরে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেটা ভালো ধরার সংসার ছিল না। কি করে যে কি হয়ে গেল, কিসের থেকে কেমন কত্নে যে তাঁকে এই মরা খালের ধারে এসে টিনের খাঁচায় ঢুকতে হল, কবে থেকে ফণা ফিনকির

বাবা ভালা হাতে নিয়ে মায়ের বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াল, সবই তিনি চোখ বুজলেই দেখতে পান। স্পষ্ট দেখতে পান তিনি, কেমন করে সেই কাঁচা হলুদ রঙের নরম শরীরটা পাকিয়ে তেউড়ে পোড়াকাঠ হয়ে গেল। বিড়ি থেকে গাঁজা, তারপর আক্ৰিম থেকে চণ্ডুতে গিয়ে উঠল নেশার দৌড়। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা হবার প্রত্যাশার আগুন জ্বলে উঠত দুই চোখে, সর্বদেহে শিকারীর বস্তু হিংস্রতা জেগে উঠত, ছুটে বেরিয়ে যেত বাড়ী থেকে কোমরে গামছা বেঁধে ভালা হাতে নিয়ে। তারপর ফিরত যখন খালি হাতে খালি পেটে সেই দুপুর গড়িয়ে যাবার পর, তখন একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়ে ফিরে আসত মাহুঘটি। দিনের পর দিন প্রত্যাশা আর হতাশার জোয়ার ভাঁটা, সেই জোয়ার ভাঁটার টানে সব শুকিয়ে গেল। শেষে নেশা, নেশাব ওপর আরও নেশা, অভাবের নেশা, বাচার নেশা, সব রকমের নেশাতেও যখন কুলোল না তখন পেয়ে বসল মরণের নেশা। ঐ ভালা ধরার নেশায় মাহুঘকে যে কোথায় নিয়ে নামাতে পারে তার নাড়ীনক্ষত্র সবটুকু মর্মে মর্মে জানেন যে ফণা ফিনকির মা। তাই তিনি ছেলেকে কিছুতে ভালা ধরতে দেননি। বহু চেষ্টা বহু তদবির ধরাধারির ফলে, ফণা শেষ পর্যন্ত জুটিয়েছে ঐ কাজ, পরাণকেষ্টের আড়তে। পরাণকেষ্ট লোকটি ধার্মিক জুতের। কাজে নিয়েই দিন আট আনা দিতে আরম্ভ করেন। শেষে যখন বুঝতে পারেন যে স্ত্রীবিধে পেলোও ফণা চুরি করে না তখন একেবারে ত্রিশ টাকা মাস মাইনে করে দিয়েছেন।

কিন্তু ত্রিশ টাকার সাড়ে সাত টাকাই চলে যায় ঘর ভাডায়। আর বাকী থাকে কত? যা থাকে তা দিয়ে মা বোন নিয়ে ফণা চালায় কি করে!

কি করে- যে চলে তা ফণা ভাবেতে চায় না। চলে, যে ভাবেই হোক চলে, তিনটে মাসের পেট চলছেই ত ত্রিশ টাকা থেকে সাড়ে সাত টাকা ছেঁটে ফেলে। চালান ফণা ফিনকির মা। তিনিই জানেন, কেমন করে সংসার চালান তিনি।

আর জানে ফণার বোন ফিনকি। এতদিন ঠিক জানত না, এখন সব একটু একটু জানতে আরম্ভ করেছে।

তখন কুমারী হওয়ার নেশা ছিল।

লুকিয়ে যেত খেলার সাথীদের সঙ্গে মায়ের বাড়ী। হৈ হৈ ছড়োছড়ি লাফালাফি করে বেড়াত ঐ মায়ের বাড়ীতেই ছোট্ট ইজের আর ছোট্ট ব্রক পরা এক মাথা কৌকড়া চুলযুক্ত এক ফোঁটা মেয়েটা। দরকার পড়লে হালদার মশাররা হুকুম দিতেন, “ধর, ধরে আন সব কটাকে।” ধরে এনে সার বেঁধে বসিয়ে সকলের

পা ধোয়ানো হত আগে, তারপর হাতে হাতে মিষ্টি দেওয়া হত, তারপর চার আনা বাঁটা আনা নগদ পয়সা। অনেকবার তেলের বোতল সিন্দুর আলতা এমন কি ছোট্ট ডুরে শাড়ী পর্যন্ত পেয়ে যেত। বাড়ীতে আনলে মা রাগ করত, “কেন আনলি এ সব?”

“বা রে আমি কি চাইতে গেছি নাকি?”

“না চেয়েছিল বেশ, কিন্তু খবরদার আর যাবি না মায়ের বাড়ী।”

“হঁ, কেন, সবাই ত যায়, খেলতে—”

মা গর্জে উঠত, “চুপ মুখপুড়ি, লজ্জা করে না ভিক্ষে করতে।”

ফিনকি চুপই করে যেত। ঠিক বুঝতে পারত না ভিক্ষেটা আবার করা হল কোথায়। কিন্তু বাপ বাড়ী ফিরে লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েকে বলতেন, “যাবি, নিশ্চয়ই যাবি। রোজ যাবি। কেন যাবি নে, বামুনের মেয়ে তুই, লোকে কুমারী করবে তীর্থস্থানে। এতে লজ্জার কি আছে।”

তাই ফিনকি ফেব যেত। মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে একবার বেরতে পারলেই, সিঁধে মায়ের বাড়ী। যদিও হাতে পেত, নিয়ে আসত বাড়ীতে। বকুনি খেত মায়ের কাছে, তবু এনে মাঝে মাঝেই সব তুলে দিত।

আবার এব মধ্যে তার বাবাও দু একবার দু একজন যাত্রীকে ধরে তাকেই কুমারী করালেন। পা ধোয়ানো, আলতা পরানো, জল খাওয়ানো, দক্ষিণা দিয়ে প্রণাম করানো। ভয়ানক ভাল লাগত তখন এ সমস্ত ফিনকির। কেমন একটা নেশা ছিল ঠাকুর হাওয়ায়। আবার রেবারেঘিও ছিল আর পাঁচটা তার মত কুমারীর সঙ্গে। কে কতবাব কুমারী হল, কে ক পেল না পেল, এ নিয়ে রেবারেঘি ছিল। দশ বারজন জমত তারা মায়ের বাড়ীতে। তার মধ্যে একজনকে কুমারী হওয়ার জন্তে ডাকলে অল্প সবাই কেমন যেন মনমরা হয়ে যেত। তখন যেত ক্ষেপে, যাকে ডাকা হল তার ওপর।

“আহা! আধিক্যোতা দেখ না ধুমসাব।”

“যেন উনিই কত সুন্দরী।”

“তবু যদি না বোঁচা নাক হত।”

“হেন্দ্রীর হৃদ। দেখা পি না, জামা ধরে টানাটানি করছিল।”

দেখতে দেখতে দিন পালটাল। কুমারী যে কত জুটল তার ইয়ত্তা নেই। টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি কামড়াকামড়ি। আর সে কি খেড়ে খেড়ে কুমারী সব। ফিনকির মোটে পাত্তাই পেত না তাদের সঙ্গে। যাত্রার কাঁধে হাত দিয়ে কুমারী হওয়ার জন্তে তারা বেরিয়ে যেতে লাগল মায়ের বাড়ী থেকে। অনেকের আবার

রোগ হল কি সব, হাতে মুখে গায়ে ।

তারপর ফিনকিও বুঝতে শুরু করলে সব কিছু ।

মা তাকে ঝক পরতে আর দিতে চায় না । সেও ঝক পরে বেড়াতে পারে না । দাদা শাড়ী এনে দিলে ।

হু একবার হু একজন, আর ঐ ডালাওয়ালাদের ঝি হু একটা, যারা যাত্রীর হাতে জল ঢেলে দেয়, তারা তাকে ভেকেও ছিল মায়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুমারী হওয়ার জন্তে । ফিনকি ছুটে বাড়ী পৌঁছে বসে পড়েছিল মার গা ঘেঁষে । সহজে আর বেরতে চাইত না ঘর থেকে ।

কিন্তু নেশা আছে মায়ের বাড়ীর ।

ফুল বেলপাতা পচা গন্ধ, মাহুঘের ভিড়, আর কয়েক আনা কাঁচা পয়সার নেশা আছে । তবে সাবধানে থাকতে হয়, ঘাপটি মেরে থাকতে হয় । নয়ত স্বযোগ পেলেই গায়ে হাত পড়বে । হয় তাড়াবার জন্তে মায়ের বাড়ী থেকে, নয়ত একটু আদর করার লোভে । মোটের ওপর গায়ে হাত পড়বেই ।

তবু যেতে হবে ।

কিন্তু এখন আর নেশায় নয়, পেশায় । এখন আর ধমকানি দেয় না মা, কিছু আনলে হাত পেতে নেয়, কিন্তু কাঁদে । অনবরত কাঁদে, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে । ফিনকির কাছে ধরা পড়বার ভয়ে ভেতরে ভেতরে কাঁদে মা । ফিনকি কিন্তু ধরতে পারে ঠিক ।

সেদিন ত সে স্পষ্ট বলেই ফেললে, “মা, এ পয়সা খারাপ পয়সা নয় । এমনি লোকে দেয় । সাধতেও যাই না আমি ।”

মা শুধু চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ মেয়ের দিকে । বোবা পাঁঠা যেমন চোখে হাঁডিকাঠের দিকে চেয়ে থাকে । ফিনকি আর চাইতে পারলে না মার চোখের পানে ।

অনেকক্ষণ পর মা বললেন, “তুই আর বেরসনি ফিনকি । আর তুই দেখাস-নি ও মুখ কাউকে । আয়, তোতে আমাতে বিষ খাই ।”

“বিষ !”

মানে মরতে হবে । কেন ? কিসের জন্তে ? কি অত্যাচার করেছে তারা যে বিষ খেয়ে মরতে যাবে ? কেন ?

ফুঁসিয়ে ওঠে ফিনকি ভেতরে ভেতরে । কেন ? কেন ? কেন ? কিসের জন্তে মরতে যাবে সে ? আর তার মা-ই বা অনর্থক অত কাঁদবে কেন ? কার কাছে কাঁদছে ? কে শুনছে কান্না ? কেঁদে, কান্না লুকিয়ে কেঁদে, কার মন গলাতে চায় মা ?

কক্ষ চুলগুলোয় একটা ঝাঁকি দিয়ে ফিনকি উঠে যায় খালের ধারে। মরা খালটার দিকে চেয়ে চূপ করে বসে থাকে আন্তাকুড়ের পাশে। আঙুল মটকাতে থাকে, দাঁত দিয়ে নখ ছিঁড়তে থাকে। তার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় সামনের ঐ মরা খালটার মত। তবু ফিনকি একটা প্রশ্নেরও জবাব খুঁজে পায় না।

তারপর এক সময়ে ভাবতে শুরু করে কোথা গেল তার বাবা। কেন গেল? কবে ফিরবে?

কংসারি হালদার মশায় মায়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন মন্দিরে জল ঢালা হয়ে গেলে পব। তাব মানে সেই বেলা চারটে। অনর্থক বসে দাঁড়িয়ে থাকেন মায়ের বাড়ীতে, এমনি ঘুরে বেড়ান চারিদিকে। বড় একটা কথাবার্তাও বলেন না কারও সঙ্গে, আলাপ পরিচয়ের নেইও কিছু। নিত্যকার ব্যাপার, নৃতনও কোথাও কিছু নেই। কয়েকটা ছোটখাট ঝগড়া, যাত্রী নিয়ে দু' একবার টানাটানি, হয়ত বা একজনের গাঁট কাটা গেল। বাস, এর বেশী আর কিছু নয়। নৃতন লোকসব মথ দেখা যায় না মায়ের বাড়ীতে। যারা আসে তারাই ঘুরে ঘুরে আসে বারবার। বছরে একবার অন্ততঃ তারা আসেই মায়ের চরণ স্পর্শ করতে। অগ্র যারা আসে, তাদের আসা না আসা দুই-ই সমান। পাঁচ সিকের বিয়ে, সোয়া পাঁচ আনার মুখে ভাত, আর আড়াই টাকায় উপনয়ন। সবই ফুরনের ব্যাপার। দায় সারতে আসে সবাই আজকাল মায়ের বাড়ী, আর হালখাতা করাতে আসে বছরের প্রথম দিনটিতে। শ্রীশ্রীকালী মাতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ কারবার কর্ম করবার বাসনায় গণেশ একটি কিনে খাতা বগলে করে আসে। ব্যবসা করতে গেলেই পাঁচ রকমের পাঁচটা গোলমেলে কাজ করতে হয়। আথেরে মা যেন সামালটুকু দেন। এই জগ্গেই মাকে জামিন দাঁড় করানো। এই জগ্গেই আসে সকলে।

কিন্তু আগে, হালদার মশায়ের বয়সকালে, ঠিক এমনটা ছিল না। খা খা, খাই খাই, দেহি দেহি সতিয়াই যেন ছিল না এত। এমন যাত্রী অনেকে আসত তখন, যারা এসেই কিছু চেয়ে বসত না মার কাছে। এমনি দর্শন করতে আসত, আনন্দ করতে আসত, একটু শাস্তি পাবার আশায় আসত সবাই। সে সব যাত্রী নামলেই মায়ের বাড়ীর হাওয়াই যেত বদলে। আজকালও লোকে দান-ধ্যান করে মায়ের বাড়ীতে, কিন্তু সে একেবারে বোল আনা পুণ্যার্জনের জগ্গে দান-ধ্যান করা তীর্থ-স্থানে। কিন্তু আগের তারা দানও করত না। তারা শুধু খরচ করে যেত দু' হাতে মায়ের বাড়ীতে। সব খরচই মায়ের বাড়ীর খরচ, ও সবই মায়ের

পূজা দেওয়া। এই রকমই যেন ছিল তাদের ধারণা। নাও লাগাও দশ ধামা, টাকা কড়ি ছড়াও মায়ের মন্দিরের বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতে। “হাঁ, কতজন ব্রাহ্মণ আছেন হালদার মশায়? ও, আচ্ছা, সকলকে যোল আনা করে দক্ষিণা আর একখানি করে চণ্ডী দিতে চাই, ব্যবস্থা করুন হালদার মশায়। একটু কষ্ট করে দেখুন না, একশ আটটি কুমারী আব একশ আটটি সম্বা যোগাড় করা যায় কি না। হাঁ হাঁ, বস্ত্র দক্ষিণা ত বটেই, শীখা সিঁদুর আর মিষ্টি এক সরাও অমনি দিতে হবে। আব এই নিন, আজকেব মাঘের ভোগরাগের যাবতীয় খরচা এই একশ এক।”

এ সমস্ত ত ছিলই তখন মাহুষের সখ, তাব ওপর অস্ত্র সখও যে ছিল না, তা নয়। “ব্যবস্থা করুন, বাড়ীর ব্যবস্থা করুন, সন্ধ্যাব পর একটু ইয়ে মানে, বুঝলেন না। মায়েব স্থানে একটু আমোদ আহ্লাদ না করে ফিরব কেন। আপনাবা যখন রয়েছেন মাকে নিয়ে, আপনাদেব একটু আমোদ শ্রুতি না কবিয়ে গেলে মা কি তুষ্ট হবেন হালদার মশায়। আজ্ঞে ইয়া, ধারা প্রবীণ, ধাবা মান্তগণ্য, সকলকে বলা চাই বইকি।”

অর্থাৎ বাতে ভাল কবে আলো জ্বলত কোনও বাড়ীৰ ঢালাও বৈঠকখানায়। ঘুড়ুর তবলা সাবেকীর সঙ্গে তাল ঠুকে চেঁচাত সবাই। সবই হত, কিন্তু সেও ঐ মায়ের সন্তুষ্টিব জন্তে। মাঘের দামাল ছেলের কেউ এলে তবে হত। লজ্জাব কি আছে, মাঘের কাছে আবার লুকোচুবির আছে কি। হঁ, যত সব—

কংসারি হালদার মশায় হাঁডিকাঠের দিকে চেয়ে ভাবতে থাকেন যে, তখনকার পাঠাগুলোও ঠিক এখনকার এই পাঠাব মত এমন মরণাপন্ন পাঠা ছিল না। এখনকার পাঠাকে হাঁডিকাঠে ফেললে যে জাতেব বীভৎস চেঁচান চেঁচিয়ে মরে তখনকার পাঠাব চেঁচানি এতটা কদর্ঘ ছিল না। এগুলোব কাতরানি, বাঁচাব জন্তে আকুল-বিকুলি, দেখলে দয়া হয় না, মন খাবাপ হয় না। শুধু রাগ হয়। মনে হয় এদের বেঁচে থাকার দায় থেকে এগুলোকে নিষ্কৃতি দেওয়াটাই সব থেকে বড় কাজ।

কংসারি হালদার মশায় কৌচাব খুঁট গায়ে জড়িয়ে মাঘেব বাড়ীৰ চারিদিকে হাঁটেন। হাঁটেন আর মনে মনে মিলিয়ে দেখেন। না, সবই ঠিক চলছে। কোথাও বদলায়নি কিছু। তবে হালদার মশায়দের যজ্ঞমানরা আর নেই। ভালধরাদেব যজ্ঞমান যথেষ্ট। সোয়া পাঁচ আনা, পাঁচ সিকে বড় জোব পাঁচ টাকা খবচা করার মত বুকের পাটা নিয়ে আসে সকলে মায়ের বাড়ী। আনন্দ শ্রুতিও করে না, তা নয়। তবে তাও সারে ঐ আট আনা এক টাকার মধ্যে। ভালধরাই সে ব্যবস্থা করে দেয় ঐ ওধারে খালধারে ছোট ছোট টিনের খুপয়িতে। যেমন

পুজো তেমনি সব দক্ষিণে । ভালই হয়েছে, হালদার মশায়দের বংশধরেরা উকিল ডাক্তার হয়ে মায়ের বাড়ীর দিকে পেছন ফিরেছে । অনেকে তো চাকরি নিয়ে চলেই গেছে বিদেশে । ভালই হয়েছে । উজ্জ্বলতার হাত থেকে উদ্ধার হয়ে বেঁচেছে ।

মিছরি বংশও তাই করছে । মিশ্র থেকে মিশরি, মিশরি থেকে একেবারে মিছরি হয়ে গেছে বেচারারা । সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ওরা, মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করবার অধিকার নিয়ে ওদের পূর্বপুরুষ মায়ের সেবায় লাগেন । উচ্চস্তরের সাধক না হলে সে অধিকার পেলেন কি করে তিনি । কিন্তু তাবপর, বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে পৌঁছল । সাধনা শুধু দাঁড়িয়েছে এখন টাঁকের । এবার টাঁকও শুকিয়ে শ্মশান হয়ে দাঁড়িয়েছে । বেশ কবছে যে ছেলেপুলেদের লেখা পড়া শিখিয়ে অল্প কজি রোজগারের ধান্দায় পাঠাচ্ছে । বেশ করছে, কি হবে এই হতচ্ছাভাদের সঙ্গে খেয়োখেয়ি করে । তাতে পোষায় কি কারও । শুধু শুধু জাত ভিত্তারী হয়ে জীবন কাটানো । সব শুখিয়ে গেছে, যাচ্ছে, আরও যাবে । একেবারে ঐ মগা খালটার মত মরে যাবে । ঐ আদিগঙ্গার মত । আদিগঙ্গায় লোকে আগে আত্মশ্রদ্ধ কবত । এখন আদিগঙ্গারই আত্মশ্রদ্ধ হয়ে গেল । হালদার মশায়ের চোখের সামনে দেখতে দেখতে এমনটা হয়ে গেল । বেশ হল ।

কিন্তু এবার তাড়াতাড়ি করতে হয় । সঙ্ঘার আগেই বসতে হবে ভাতের খালার সামনে হালদার মশায়কে । সঙ্ঘা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাবে তাঁর পৃথিবী আধার হয়ে । তাব আগেই শেষ করা চাই দিনের কাজ । দিনের কাজ মানে ঐ একবার ভাতের খালার সামনে বসা । আঃ এটুকুর হাত থেকে যদি নিষ্কৃতি পাওয়া যেত ।

হালদার মশায় ফিরে গেলেন বাড়ীতে । নিজের বাড়ীতে ফিরে গেলেন তিনি । বাড়ীর মানুষরা তাঁব নিজের মানুষ, ছেলে বউ নাতি নাতনী সব তাঁর নিজের । লোকে বলে কংসারি হালদার মশায়ের বাড়ী, এখনও তাই বলে । লোকে যেমন বলে কংসারি হালদার মশায়ের পালা । পালা কিন্তু সত্যিই তাঁর নয়, যে করে তার । যে কিনে নেয় তারই পালা । তিনি শুধু মায়ের ভোগটা পুজোটা চালান । কেউ যদি পালা নাও কেনে তবু তিনি চালাবেন । কি করে চালাবেন তা শুধু মা জানবে আর তিনি জানবেন, আর কেউ জানবে না ।

ছেলেরা বড় বড় চাকরি করে সবাই । বৌমায়েরা সব ভাল বংশের মেয়ে । তাঁরা মায়ের বাড়ীর মহাপ্রসাদ নিয়ে মাথায় ঠেকান । তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও ও সব ছুঁতে দেন না । বলেন, “ভক্তিরে মাথায় ঠেকিয়ে একধারে সরিয়ে রাখ

ও সমস্ত, কাল কি এসে গল্পায় দিয়ে আসবে।” পচা খালের জল দিয়ে বাগ্না হয় কি না। কে বলতে পারে, কি রোগের বীজ এসে ঢুকবে বাড়ীতে ঐ মহাপ্রসাদের সঙ্গে।

মাংস, তাও কালীবাড়ীর বলির মাংস অচল। বৌমায়েরা জানেন, ও সব পাঠার হেন রোগ নেই যা নেই। তার চেয়ে বাজার থেকে ছাপ দেওয়া খাসির মাংস এনে খাও। নয়ত, যা সব থেকে ভাল ব্যবস্থা, তা হচ্ছে ছুটিছাটার দিন সিনেমা-টিনেমা দেখে ভাল হোটেল থেকে মাংস খেয়ে বাড়ী ফেরা। বোগ হওয়ার ভয় নেই, হান্কামাও নেই কিছু। তাই বাড়ীতে মাংসটা হয়ই না বড একটা। যে ছেলে যে দিন তার বউ ছেলে নিয়ে বেড়াতে যায়, সে ভাল হোটেল থেকে ভাল মাংস খাইয়ে আনে তাদের।

হালদার মশায় খেতে বসেন। বাড়ীর সকলের খাওয়া দাওয়া ঘণ্টা পাঁচ ছয় আগেই চুকে গেছে। বিকেলের চা জলখাবার খাওয়াও শেষ। হালদার মশায় খেতে বসেন। তাঁর ছেলেরা বৌমায়েরা খুবই কড়া নজর রাখেন তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ওপর। বামূনের ওপর হুকুম দেওয়া আছে, “খবরদার, তিনটের পর থেকেই উঠুন ধরিয়ে জল চাপিয়ে বসে থাকবে ঠাকুর। আতপ কটি একেবারে বেশ করে ধুয়ে সামনে নিয়ে বসে থাকবে। আর নজর রাখবে, বাবা আসছেন দেখলেই দেবে ফুটন্ত জলেব মধ্যে চাল ফেলে। পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে। খবরদার, কিছুতেই যেন ঠাণ্ডা না হয়ে যায়। খুব সাবধান।”

খুব সাবধানের গরম আতপ চালের ভাত, একটু ঘি আর ঐ ভাতের মধ্যে যা সিদ্ধ হয় তাই, খুব সাবধানেই তাঁর সামনে নামিয়ে দেওয়া হয়। হালদার মশায় খান।

দুধ খান তিনি রাজ্জে, ওটা তাঁর ঘরে চাপা দেওয়া থাকে। গরম থাকে না, তা না থাকুক, হালদার মশায়ের ঠাণ্ডা দুধ খেতে কষ্ট হয় না। রাতে ঐ দুধটুকুই খান তিনি, আর কিছু নয়।

কারণ এক সময় উনি খুবই খেয়েছেন। খেতেও পারতেন খুব। লোকে বলে, আস্ত একটা পাঠা নাকি খেতে পারতেন উনি। নিজেও খেতেন যেমন, খাওয়াতেনও তেমনি লোককে। হালদার বাড়ীতে নাকি রোজই যজ্ঞি লেগে থাকত। দৈত্যারি হালদার মশায়ের আমলে প্রতিটি পালায় তিনি কালীঘাট হুঙ্কার মাছুষকে প্রসাদ নেওয়ার নেয়তন্ন করতেন। কেউ না গেলে রাগ করতেন, বগড়া করতেন, এমন কি মারও দিতেন। ছেলে কংসারি যদিও অতটা পারতেন না, তবু হেন দিন নেই যে দশ বিশ জনকে সাথে নিয়ে বাড়ী ঢোকেননি তিনি খাওয়ার সময়। খুঁজে পেতে ধরে আনতেন। “আরে বাবা, কালীঘাটে এসেছ কি

হোটলে খাবার জন্তে ? এস আমার সঙ্গে, যা হয় দু'মুঠো মুখে দিয়ে যাও । মায়ের অন্নছত্র খোলাই আছে । আরে বাব্বা, হালদার গুটি থাকতে মায়ের স্থানে কেউ উপোস করে থাকবে নাকি ?”

মায়ের স্থানে কেউ উপোস করে থাকতে পারে না ।

হালদাররা থাকতে মায়ের স্থানে এসে কেউ যেন উপোস করে না ফিরে যায় ।

এতে মায়ের অপমান, কেউ উপোস করে থাকলে মায়ের স্থানে, মাও উপোসী থাকবে যে । সুতরাং মাকে খাওয়াতে গেলে হালদারদের গুটিকে ও নজর রাখতে হবে । সেই জন্তেই হালদাররা কালীঘাটের হালদার ।

এই সমস্তই হালদার গুটিব ছেলেরা জানত । শাদের বোয়েবা তাই ঠাঁড়ি চৌলাটাকে ঠাঁড়িচৌলা বলে মনে করত না । সব বাড়ীতেই মায়ের ভোগ হত । যা রান্না হত, সবই বাড়ীর গিন্নী মনে মনে মাকে নিবেদন করে দিতেন । কিংবা দুটি মহাপ্রসাদ নিয়ে এসে ছিটিয়ে মিশিয়ে দিতেন বাড়ীতে রান্না ভাত তবকারির সঙ্গে । বাস, খাও এবার মায়ের প্রসাদ । সবাই খাও, কর্তারা ছেলেরা যাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ঢুকবে তারা ত খাবেই । কিছুতেই কম হবে নাকি মায়ের প্রসাদ । সেটি হবার জো নেই হালদার বাড়ীতে । কারণ কালীঘাটের হালদার বাড়ীতে লোকে খাবেই ।

এই ছিল দম্ভর । এইটুকুই ছিল হালদারদের অভিমান । মানে এরই নাম ছিল মায়ের সেবা চালানো । কেউ মায়ের বাড়ী এসে উপোসী থেকে ফিরে না যায়, সর্বনাশ, তাহলে মাও উপোসী থাকবেন যে ।

কিন্তু সব শুকিয়ে গেছে । ঐ আদিগঙ্গার মত সব শুকিয়ে গেছে । এমন কি মায়ের বাড়ীতে যে পাঠা এখন চৈচায়, তার চৈচানিটা পৰ্ব্বন্ত বিধিয়ে একেবারে এমন জঘন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ওটা উঠিয়ে দিলেও মন্দ হয় না ।

হালদার মশায় আতপ চালের ভাতে-ভাত মুখে তোলেন । কিন্তু গিলতে পারেন না সহজে । কেমন যেন গলার কাছে সব আটকে যায় ।

আটকে যায় আরও অনেক কিছু সেই সঙ্গে । ভাবতে গিয়ে ভাবনাও যায় আটকে । রেযারেষি করে পান্না দিয়ে পালা চালানো যেমন আটকে গেছে । কোন হালদার কতগুলো মানুষকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেছে খাওয়ার জন্তে, এ আলোচনা যেমন আটকে গেছে হঠাৎ একদিন । কোন হালদার কবে কাকে সোজা হুকুম দিয়েছে, “নাও ঠাকুর, এখানেই থেকে যাও, মায়ের দরজায় দু'মুঠো জুটবেই, মা কাউকে উপোসী রাখেন না ।” এ সমস্ত হিসেব নিকেশ করাও যেমন একেবারে উঠে গেছে কালীঘাটের কালীর ত্রিসীমানা থেকে । কংসারি হালদার মশায়

খাওয়ার পরে অন্ধকার ঘরে আস্তে আস্তে হাঁটেন আর ভাবেন। ভাবতে গিয়ে তাঁর ভাবনাও যায় আটকে। সবই আটকে যায়।

তার মানে—!

হালদার মশায় থমকে দাঁড়ান ঘরের মাঝখানে। দাঁড়িয়ে আবার নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করেন, তার মানে ?

উত্তরটা খুঁজে পান। হাঁ হাঁ, ঠিকই ত ! একেবারে ঠিক। এতগুলো লোকের এ ভাবে আজ ভিথিরী হয়ে যাবার জন্তে কে দায়ী ? কারা দায়ী ?

দায়ী হালদাররা, তাঁদের পূর্বপুরুষেরাই দায়ী এতবড় সর্বনাশাটা হওয়ার দরুন ! হালদার বাড়ীর ভাত ছুবেলা ছুমঠো খাও, আর যা পার, মায়ের বাড়ী চেটে যা পাও নিয়ে দেশে পাঠাও। তোমাদের মাগ ছেলে বাঁচুক। নয়ত তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানরা করবে কি।

এ আশ্বাস কারা দিয়েছিল এই হাবাতে গুপ্তির পূর্বপুরুষদের ? হালদাররা, মায়ের খাস সেবায়তরা, যারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করত মা কাউকে উপোসী রাখেন না। তাই তখন, সেই দৈত্যারি হালদার মশায়ের ঠাকুরদাব আমলের আগের আমল থেকে কালীঘাটে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে কেউ ফিবে যাননি। তাই তখন, সেই সব মহা অভিমानी হালদারদের মধ্যে রেবারেণি ছিল, কে কটা মানুষকে বসাতে পারল কালীঘাটে, তাই নিয়ে। তাই তখন হালদার বাড়ীর অন্ন-ছত্র হরদম থাকত খোলা। আর মায়ের মুখটাও দিনরাত অমন আধার হয়ে থাকত না।

আরও আছে, অনেক হিসেবের গরমিল আছে, যা তখনকার হালদার মশায়রা করে গেছেন। স্রেফ এই গর্বেই তাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন যে, তাঁরা মায়ের সেবায়ত। এই দেমাকেই যাকে যা খুশি ছকুম দিয়ে বসতেন মায়ের নামে। এখন তাঁদের বংশধরেরা দায়িত্ব এড়াবার জন্তে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

কিংবা হয়ত কারও মনেই হয় না একবার পূর্বপুরুষদের কথা।

যেমন কংসারি হালদার মশায় নিজেই নিজে স্মরণ করতে ভয় পান, কতগুলো মানুষকে তিনি খামকা ভরসা দিয়ে ধরে রেখেছেন মায়ের বাড়ীর মাটি চেটে খাবার জন্তে। ভাগ্যে তারাও ভুলে গেছে তাঁর কথা। নয়ত—

নয়ত, হালদার মশায় দিনের আলোতেও পোঁচার মত মুখ লুকিয়ে থাকতেন। তাছাড়া আর কি উপায় ছিল তাঁর।

তাঁর বাড়ীতে, তিনি বেঁচে থাকতে, যদি কেউ এসে দাঁড়ায় ছপুর্বেলা ছটি প্রসাদের জন্তে, কি করতে পারেন তিনি ? বৌমায়েদের সে কথা বলতে যাবেন

না কি তিনি !

হা হা হা হা, হালদার মশায় নিঃশব্দে হা হা হা হা হাসতে লাগলেন অনেকক্ষণ। বললে যে কি ফল দাঁড়াবে তাই ভেবে হাসতে লাগলেন মনে মনে। মনে মনে অট্টহাস্য হাসতে লাগলেন। যেমন একদা মায়ের নাটমন্দির ফাটিয়ে হাসতেন তাঁরা হাসার মত একটা কিছু ঘটলে।

তখন হাসার মত সহজে কিছু ঘটত না, তাই লোকে হাসতে জানত। এখন হাসার মত ব্যাপার আকছার এত ঘটছে যে লোকে হাসতেই ভুলে গেছে। শুধু কান্না, কান্নায় কান্নায় এমন ভরে গেছে দুনিয়াটা যে মায়ের মন্দিরের চুড়ো ছাড়িয়ে উঠেছে কান্নার পাহাড়।

সে হল ঐ বলির পঙ্কর কান্না। ও কান্না শুনে হালদার মশায়ের প্রাণ কাঁপে না।

তেমন তেমন দিনে মেয়েমাছুষ-পুলিস আসে মায়ের বাড়ীতে। থাকী পরে আসে না, সাদা কোট প্যান্ট পরে আসে। যেমন ঐ রাস্তার সার্জেন্টদের পোশাক। মন্দির থেকে মায়ের মন্দির পর্যন্ত পড়ে একখানা ছোট্ট হাত চারেক লম্বা কাঠের সাঁকো। মেয়ে পুলিশরা সেই সাঁকোর উপর জটলা করে। মেয়েযাত্রীদের সে সব দিনে মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। নাটমন্দির থেকে সেই কাঠের সাঁকো দিয়ে মায়ের সামনের দরজার সামনে এসে মেয়েরা দর্শন করে যায়। সে সব দিনে মায়ের বাড়ীতে ঢোকার বেরবার পথও মেয়ে পুরুষের জন্তে আলাদা আলাদা। তাই মেয়ে-পুলিস আসে মেয়েদের রক্ষা করার জন্তে। কাজেই মা কালীর আর কাউকে রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে না। কাজেই হালদার মশায়রা সে সময় বিশেষ দিনে পরম নিশ্চিন্ত থাকেন।

কিন্তু কপালে দুবিপাক থাকলে বখেড়া বাধতে কতক্ষণ। বলা নেই, কওয়া নেই, একটু খবর পর্যন্ত দেওয়া নেই, চঠাৎ ছুম করে এসে উপস্থিত হল জলজ্যাস্ত দুবিপাক। সেই সদানন্দ রোডের ওখানে গাড়ী রাখতে হয়েছে, পুলিশে একখানি গাড়ীও এখানে আসতে দিচ্ছে না। তা তাই সই, হেঁটে এসেছে সকলে এতটা পথ, গাড়ী ওখানে রেখে! কেন, এ সমস্ত হান্ধামার দরকারই কত না যদি একটু সংবাদ দিয়ে আসা হত। থানায় বলে ব্যবস্থা করে হালদার মশায় ঐ গাড়ী এখানে আনাতেন। মায়ের বাড়ীর পাশেই আসত গাড়ী, যেমন অল্প দিনে আসে। থামকা এই কষ্ট করা।

হালদার মশায় গজগজ করতে লাগলেন।

যজ্ঞমানরা কিন্তু মহাখুশী। এই ভিড়ে হালদার মশায়কে খুঁজে বার করতে পেরেছেন তাঁরা, এতেই যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছেন। গিন্নীটি অর্থাৎ এখনও যিনি খোদ রাণীমা, তিনি প্রণাম করালেন সকলকে রাস্তার ওপরেই।

“নাও নাও, কর সকলে প্রণাম কর ঠাকুরমশাইকে। তীর্থঙ্কর আমাদের বংশের, আমাদের সাতপুরুষের ভালমন্দের জন্তে এঁরাই দায়ী। ঠাকুরমশাই, এই এইটি হল বৌমা, হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল মায়ের ইচ্ছেয়। আপনাকে খবর দেওয়ার সময় পেলাম না। তাই বিয়ের পরই ছুটে আসছি মায়ের স্থানে। মায়ের সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে মায়ের প্রসাদী সিঁদুর দেবেন এর কপালে, মায়ের পায়ে ছোঁয়ানো মোহর বেঁধে দেবেন আঁচলে, যেমন আপনার বাবা আমার কপালে সিঁদুর দিয়ে আঁচলে মায়ের প্রসাদী বেঁধে দিয়েছিলেন। তারপর বৌ নিয়ে ঘরে ফিরব। সেই প্রসাদী মোহর, বৌ লক্ষ্মীর চূপড়িতে নিজে হাতে তুলবে, তবে এ বংশের বৌ-গিরি করা আরম্ভ হবে। জানলে বৌমা, এখন ইনি যা করাবেন সেইটুকুই আসল ব্যাপার। এই নিন ঠাকুরমশাই, বৌ এনে খাড়া করে দিলুম আপনার কাছে। যা যা করবার কলন এবার। আমার দায়িত্ব এতদিনে শেষ হল।”

কংসারি হালদার একটা ঢোক গিললেন জোর করে। মুখ তুলে একবার চেয়ে দেখলেন মায়ের মন্দিরের চূড়োটা। নীচে নজর নামাতেই দেখতে পেলেন, ঘিরে দাঁড়িয়েছে সকলে। জ্বলছে সকলের থোন্দলে-বসা চোখগুলো, গলা উঁচু করে ডিঙি মেবে দেখছে অনেকে। হাড়-হাংলার ঝাড় সব, ভাবছে মারলে আজ মজা কংসারি হালদারই। কপাল বুঝি ফিরে গেল ব্যাটা বুড়ো শকুনের।

যজ্ঞমানদের শকুনের চাউনি থেকে বাঁচবার জন্তে হালদার মশায় তাড়াতাড়ি সরতে চাইলেন সেখান থেকে। হালদার পাড়া লেনের মুখেই একখানা বাড়ীর দোতলা ঘরে তিনি যাত্রী তোলেন। ও বাড়ীর মালিক তাঁর মান রাখতে দরকার হলে খুলে দেয় ঘরখানা এক আধ ঘন্টার জন্তে। সেই ঘরেই নিয়ে যেতে চাইলেন সকলকে। কিন্তু গুরা একেবারেই ধুলো পায়েই দর্শন করলেন মাকে। তাই নাকি করা নিয়ম গুঁদের বংশের। মায়ের স্থানে এসে আগে মায়ের চরণ স্পর্শ করে তবে অন্য কাজ।

কিন্তু চরণ দর্শন, চরণ স্পর্শ। তাই ত!

হালদার মশায়ের ঘাড়ের শিরগুলো একটু টানটান হয়ে উঠল। অল্প সকলে চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। অর্থাৎ দেখতে চায়, কেমন করে কংসারি হালদার তার বড়লোক যজ্ঞমানকে এমন দিনে মায়ের চরণ স্পর্শ করাবে।

মেয়েদের যে চুকতেই দেয় না মন্দিরের মধ্যে। তাই ত!

আর একবার মায়ের মন্দিরের চূড়োর দিকে তাকালেন হালদার মশায়। তার-

পর বললেন, “বেশ, তবে তাই হক। চল, এগিয়ে চল সকলে। হাঁ, ঠিক আমার পেছনে এস। সাবধানে এস। সাবধানে এস, এত গয়নাগাঁটি স্বদ্ধ বোরাগীকে আজকের দিনে না আনলেই ভাল হত মা। আচ্ছা, যা করেন মা, এস তোমরা।”

হালদার মশায় পৌঁছলেন সকলকে নিয়ে উত্তর-পূব কোণের দরজাটায়। তিনি ভাল করেই জানতেন, সে দরজায় মেয়েদের যাওয়া আসা নিষেধ। শুধু পুরুষরা যাবে আসবে সে দরজা দিয়ে। মেয়েরা যাওয়া আসা কবছে পূব দিকের মাঝের দরজা দিয়ে, ওখানে মেয়ে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। হালদার মশায় ওঁদের ওখানে দাঁড় করিয়ে ছুটলেন ব্যবস্থা করতে।

ব্যবস্থা হতে মিনিট পাঁচেকও লাগল না। হালদার মশায়ের আর এক সম্ভ্রান্ত যজ্ঞমান, পুলিশের একজন হোমরাচোমরা কর্তা, সঙ্গে এসে কোণের দরজা দিয়ে মেয়েদের ঢোকান লুকুম দিলেন এবং নিজের এগিয়ে গিয়ে ভোগ রান্নার রান্নাঘরের সামনে দিয়ে সকলকে উঠিয়ে দিলেন পুলের ওপর। মন্দিরের মধ্যে যারা ঢুকেছে তারা বেরলেই যাতে হালদার মশায় ঢুকতে পারেন তাঁর যজ্ঞমানদের নিয়ে, সে ব্যবস্থা করে গেলেন। নিজের বানানো ব্যবস্থা নিজেরা ভাঙবার ব্যবস্থা করলেন। হালদার মশায় দেখাবেনই তাঁর যজ্ঞমানদের যে, কংসারি হালদার এখনও বেঁচে রয়েছে। কংসারি হালদার বেঁচে থাকতে তাঁর যজ্ঞমান মায়ের চরণ স্পর্শ করতে পারবে না! আচ্ছা, এবার দেখুক সকলে চোখ মেলে কংসারি হালদার কি পারে না পারে।

হালদার মশায় গলা থেকে কৌচার খুঁট নামিয়ে কোমরে বেঁধে নিলেন শস্ত করে। ডান দিকে তাকালেন একবার। বাঁশ বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে মাণ্ড-গুলোকে মন্দিরের বারান্দায়। দম প্রায় আটকে এসেছে সকলের, চোখগুলো ফেটে বেরিয়ে আসার মত হয়েছে চাপের চোটে। মন্দিরে ভেতর যাবার দরজাটা পরিষ্কার, ভেতরে ঢোকানো হয়েছে মাণ্ড। যা ঢোকা উচিত, তাব অন্ততঃ তিন গুণ বেশী ঢোকানো হয়েছে। এখন তারা বেরলেই হয়। একেবারে দরজার মুখে দাঁড় করালেন সকলকে হালদার মশায়।

ঝন ঝন ঝনাৎ, শিকল আছড়াতে লাগল দরজার গায়ে লালপাগড়ি-ওয়ালা। “বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস, বাহার আ-যাও।”

আরম্ভ হল বেরনো। দরজার এক ধারে সরিয়ে দাঁড় করালেন হালদার মশায় যজ্ঞমানদের। নতুন বোঁ, তার শাশুড়ী স্বামী আর দুটি মেয়ে, একজন বিবাহিতা, একটি বোধ হয় বিধবা। হালদার মশায় ভাল করে তাদের বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া-টেওয়া কিছুই আর হবার জো নেই, টপ করে

একবার চরণ স্পর্শ করে ফিরে আসা, ব্যস। হালদার মশায় পরে এসে পূজা করে যাবেন।

তারা বুঝলে বোধ হয়। নতুন বোটির স্বামী সভয়ে বললেন তাঁর মাকে, “তাহলে না হয় আজ ভেতরে নাই বা যাওয়া হল—”

তাঁর কথাটা শেষও হল না, পেছনের ওঁরা সকলে আচমকা মন্দিরের দরজা পার হয়ে গেলেন।

হালদার মশায় দু’হাতে ধরলেন বোটির আর তার শান্তডীর কজ্জি দুখানা। মুহূর্তের মধ্যে সিঁড়ি কটা দিঘে নামিয়ে লোহাব বেড়া পার করালেন মায়ের পেছনের ছোট্ট দরজা দিয়ে। তারপরই নীচু হতে হবে। গুঁড়ি মেরে বাঁশের নীচে দিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে মায়ের সামনে। সেটুকুও করালেন। দাঁড় করিয়ে দিলেন নতুন বোঁ আর তার শান্তডীকে মায়ের সামনে। মিছরিদের তিন চারটি জোয়ান ছেলে রয়েছে মায়ের সামনে। হালদার মশায়কে দেখে আর তাঁর যজমানদের দেখে তারা চক্ষের নিমিষে অবস্থাটা বুঝে ফেললে। এমন দিনে সাধ্য আছে কার, সাহসই বা হত কার, মেয়েদের মন্দিরের মধ্যে ঢোকাবার।

কিন্তু হালদার মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা প্রমাদ গণল। এই বয়সে ভয়ানক সাহস করেছেন তিনি, নিজে একেবারে হলদে হয়ে গেছেন ওদেব ভেতরে আনতেই। কেমন যেন মুখেব অবস্থাটা হয়ে উঠেছে হালদার মশায়ের। এখন মন্দির থেকে বার করা যায় কি কবে, এঁদের।

মিছরিরা চোখে চোখে কথা কয়। চক্ষের নিমিষে মায়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে দিলে বোটির আর তার শান্তডীর। মায়ের কপাল থেকে সিঁদুর নিয়ে লেপটে দিলে বোটির কপালে। কি একটা দিতে গেল বোঁটি মায়ের পায়ে, সেটাও মায়ের খাঁড়া-ধরা-হাতে ঠেকিয়ে ধরিয়ে দিলে বোঁটির হাতে। পবমুহূর্তেই ওদের ঘাড় ধরে মাথা নীচু করিয়ে বাঁশ পার করে দিলে। দুজন মিছরি প্রাণপণে লড়তে লাগল সিঁড়ি কটা উঠিয়ে দরজা পার করে দেবার জন্তে। শেষ পর্যন্ত হল তাদের জয়, দরজার বাইরে ছিটকে এসে পড়লেন হালদার মশায়, তখনও তিনি বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছেন শান্তডী বোঁয়ের কজ্জি দুখানা।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে লাগল মিনিট দুয়েক সময়। বোঁটির কথা বলারও সামর্থ্য নেই তখন, তার শান্তডী শুধু বলতে পারলেন, “ওরা কোথা গেল, ওরা যে—”

তাঁর কথাটা আর শেষ হল না।

হালদার মশায় টলে পড়লেন তাঁদের গায়ের ওপর।

ভয়ঙ্কর কাণ্ড একটা ঘটতে গিয়েও ঘটতে পেল না। টনক নড়ে উঠল সকলের। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল হালদার গুটির যে যেখানে ছিল সবাই। ঘিরে দাঁড়াল পুলিশ। তারপর কে কখন কি ভাবে যে ঠুঁদের সকলকে মায়ের বাড়ির বাইরে এনে ফেললে তা হালদার মশায় জানতেও পারলেন না।

হালদার পাড়া লেনের মুখের সেই দোতলা ঘরেই ঠুঁদের তুলে দিয়ে সবাই চলে গেল। সেদিন তখন সময় নষ্ট করার মত সময় নেই কারও। স্মরণে যে ঘটটুকু করতে পারল তাই যথেষ্ট।

হালদার মশায়ও সামলে উঠেছেন ততক্ষণে। মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন তিনি। এ ভাবে যে তাঁর মাথাটা তাঁর সঙ্গে হঠাৎ নিমকহারামি করে বসবে, তা তিনি বুঝতে পারেননি। যজ্ঞমানরাও ভয়ানক মনমরা হয়ে গেছে। এমন দিনে মন্দিরের মধ্যে যাওয়ার জন্তে আবদার করাটা সত্যিই ঠিক হয়নি।

তবু চরণ স্পর্শ করা হয়েছে ঠিক। মায়ের কপালের সিঁদুর নতুন বোয়ের কপালময় লেপে রয়েছে। বোঁটি তখনও মুঠির মধ্যে ধরে আছে মায়ের খাড়া-ধরা-হাতে ছোঁয়ানো সোনার মোহরটি। স্মরণে সবই ঠিকঠাক হয়ে গেছে। হালদার মশায় চেয়ে দেখলেন যজ্ঞমানদের দিকে। দামী কাপড় জামাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ঠোঁড় পরম তৃপ্ত। তৃপ্তির আলোয় জ্বলছে ঠুঁদের মুখ চোখ। গিন্নী বারবার বলছেন, “দেখ বোঁমা, ভাল করে চিনে নাও। এঁরা আমাদের তীর্থগুরু। তোমার স্বস্তুর বংশের ভালমন্দের জন্তে এঁরাই দায়ী। ইনি না থাকলে আর কার সাধ্য ছিল বল আজকের দিনে আমাদের মায়ের চরণ স্পর্শ করাবার। আর কে পারত এ কাজ—”

বোঁমাটি তখন মাথা নীচু করে এক হাতে দেখে নিচ্ছে তার কানের মাথার গলার গয়নাগাঁটিগুলো। হঠাৎ একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল। আর্তনাদ ঠিক নয়, কেমন যেন একটা বোবা গোঙানি।

চমকে উঠল সকলে। ঘিরে দাঁড়াল বোঁটিকে। পরমুহূর্তেই হালদার মশায় লাফিয়ে উঠলেন আবার।

“কি হল! কি গেছে?”

গেছে একটি মহামূল্য হার বোয়ের গলা থেকে। তাতে সোনা যা আছে তার জন্তে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু আছে একখানি লকেট সেই হারের সঙ্গে। লকেটখানির মূল্য অপরিমীম। সেখানা হারালে কিছুতেই চলবে না। সেই লকেটের মধ্যে আছে এমন জিনিস, যা এই বংশের প্রথম বোঁকে, আগাগোড়া গলায় বুলিয়ে রাখতে হয় স্বস্তুরবাড়ীতে পা দিয়েই। তারপর তার ছেলের বোঁ

এলে তার গলায় জুলিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি। নয়ত ভয়ানক একটা কিছু অমঙ্গল ঘটবেই বংশে।

হালদার মশায় আর শুনলেন না লকেটের গুণব্যাখ্যান। যাই থাক সেই লকেটে, লকেট কিন্তু পাওয়া চাই।

তিনি ছুটলেন আবার। তরতর করে নামতে লাগলেন সি ডি দিয়ে। গুঁরা বাধা দেবার ফুরসতই পেলেন না। বাধা দেবার মত অবস্থাও ছিল না তখন গুঁদের, এতটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন সকলে লকেট হাবিয়ে। সকলে নেমে গেলেন রাস্তায় হালদার মশায়ের পিছু পিছু।

আবার সেই পুলিশের কর্তাকে ধবলেন গিয়ে হালদার মশায়। জড় হল হালদার গুপ্তির কর্তা ব্যক্তির। কি করা প্রয়োজন ঠিক হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। বন্ধ কর মায়ের বাড়ির সব কটা দরজা। চোখা চোখা পুলিশের লোক দাঁড়াক সব দরজায়। দেখে দেখে লোক ছাড়ুক। সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে ছাডবে না কিছুতে। এমন কি তেমন কোনও মেয়ে দেখলেও তাকে খানাতল্লাশ না করে ছাডবে না। হারটা ছিঁড়েই নেওয়া হয়েছে গলা থেকে। দাগও দেখা গেল গলায়। ছিঁড়ে না নিলে ও হার নেওয়াই যাবে না। হারটা পড়তেই পারে না বোঁয়ের মাথা গলে। খোলবার বন্ধ করবার ব্যবস্থাও ছিল না হারে।

সুতরাং বাজাও বাঁশী। এখনও যদি চোর ভেতরে থাকে ত আটকা পড়বেই। বাজাও বাঁশী।

পুলিসের বাঁশী বাজতে শুরু হল। একটা বাজতেই বেজে উঠল একশটা। বন্ধ হল মায়ের বাড়ির সব কটা দরজা। দেখে দেখে লোক ছাড়া আরন্ত হল। দুঁদে পুলিশ অফিসার কয়েকজন ঢুকলেন গুঁদের নিয়ে মায়ের বাড়ীতে।

অসম্ভব। এ একেবারে অসম্ভব আশা। সৃষ্টি হুঙ্কার জমেছে মায়ের বাড়ীর মধ্যে। এর ভেতর থেকে চোর খুঁজে বার করার আশা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন হালদার মশায়ের যজ্ঞমান গিন্নী মায়েরা উঠোনে।

গর্জন করতে লাগল পুলিশের চোঙা।

“আপনারা ব্যস্ত হবেন না। দয়া করে একে একে বেরিয়ে যাবেন মায়ের বাড়ী থেকে। আপনারা যদি ব্যস্ত না হন আর একটু সাহায্য করেন তাহলে একজন দুর্দান্ত চোরকে এখনই আমরা ধরতে পারব। সে আছে এখন এখানেই, আপনারা দয়া করে বিরক্ত হবেন না। আপনাদের এই কষ্টটুকু দিতে হচ্ছে বলে আমরা লজ্জিত। কিন্তু আজকের দিনের যে বদমাশ মায়ের বাড়ির মধ্যে মেয়েদের গা

থেকে গহনা ছিনিয়ে নিয়েছে তাকে ধরা চাই। হুতরাং দয়া করে আপনারা একে একে শাস্তভাবে বেরিয়ে যান। পুলিশ ভাল লোককে আটকাবে না, ভাল লোককে অনর্থক কষ্ট দেবে না। আপনারা সাহায্য করুন।”

বার বার বলা হতে লাগল এক কথা চোড়ায়। মাযের বাড়ির ভেতরে বাইরে গুণ্ডা গুণ্ডা চোড়া খাটিয়েছে পুলিশ। আকাশ বাতাস খরখর করে কাঁপতে লাগল পুলিশের গর্জনে।

বুঝা আশা।

আস্তে আস্তে ভিড় পাওলা হয়ে গেল। এক এক মিনিট যেন এক এক ঘণ্টা মনে হতে লাগল হালদার মশায়ের। তিনি ছুমছুম করে মাযের মন্দিরেব গায়ে মাথা কোটা শুরু করলেন।

আচম্বিতে হৈ হৈ ধব ধব মার মার রোল উঠল মন্দিরেব ওধাশ থেকে। তাঁর-বেগে একটা ছোঁড়া ছুটে এল মন্দিরের পশ্চিম দিকের বাবান্দার ওপর দিয়ে। চরণামৃত নেওয়ার নর্দমার ওপর পষন্ত এমেরি রেলিং টপকে ঝাঁপ দিলে নীচে। নামল একেবাবে ফিনকির গায়েব ওপর। ছমডি খেয়ে পড়ল ফিনকি। পরমুহুর্তেই তাঁর মনে পড়ল যেন একটা সভাং কবে নেমে গেল তার পিঠ বেয়ে জামাব নীচে দিয়ে। ঠাণ্ডা কি একটা জিনিস মোজা হয়ে উঠতেই সে পারল না কিছুক্ষণ। তার ওপর দিয়ে মাছুষ ছুটেতে লাগল।

মাথা তুলে মোজা হয়ে যখন দাঁড়াতে পারল ফিনকি, তখন তার মুখ ফুলে গেছে। বানে আসছে ভয়ানক গোলমাল, মার মার শব্দ আর একটা মর্মস্পর্ক আত্মনাদ উঠছে ওধারে। কি হয়েছে, কে ধরা পড়েছে, তা জানব'রও উপায় নেই। কার সাধ্য এগোয় ওদিকে।

কিন্তু নামল কি একটা পিঠ বেয়ে যেন।

ফিনকি সরে গিয়ে দাঁড়াল মন্দির ঘেঁষে। হাত ঘুরিয়ে বহু চেঁচায় টিপে ধরলে সেটাকে জামার ওপর থেকে। পেছন দিকে বোমবের কাছে আটকে রয়েছে। তারপর টেনে বার করলে সেটা। সঙ্গে সঙ্গে তার হুই চোখ কপালে উঠে গেল। হাতের মুঠিতে চেপে ধরে কোনও রকমে সে এগুতে লাগল সামনেব দিকে মন্দিরের গা ঘেঁষে।

ততক্ষণে পুলিশ ভিড় হটাতে আরম্ভ করছে।

“চলে যান, আপনারা অনর্থক ভিড় করবেন না, একে একে বেরিয়ে যান মাযের বাড়ি থেকে।”

এর ওর তার পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছলে ফিনকি এগিয়ে গেল। ঐ যে, তোলা

হয়েছে চোরকে পুলের ওপর ।

আরে, এ যে ধনা ।

ইস, কি অবস্থা হয়েছে ওর চোখ মুখের ।

ফিনকি আরও এগিয়ে গেল ।

ঐ ত হালদার মশায় না । মাথা খুঁড়ছেন কেন উনি ওভাবে ।

স্পষ্ট শুনতে পেল ফিনকি হালদার মশায় বলছেন, “দে বাবা ধনু, বলে দে তুই, কোথায় ফেলেছিস সেটা । ও হারে যতটা সোনা আছে তাব দাম তোকে আমি এখনই দিচ্ছি । আমার মুখটা রাখ বাবা—”

কে একজন হংকার দিয়ে উঠল, “থামুন আপনি, থামুন । দেখছি আমবা ও বলে কি না ।”

তারপর উঠল আবাব একটা বুক-মোচডানো চিংকার । যেন কার ঘাড় মুচড়ে দেওয়া হল ।

আবাব একজন গর্জে উঠল, “তা হলে পালাচ্ছিলে কেন তুমি ?”

কি যেন বলতে গেল ধনু, বলতে গিয়েও বসতে পাবলে না । আবাব ককিয়ে কেঁদে উঠল ।

হালদার মশায় মুখ তুললেন । তাঁর কপাল ফেটে দবদব করে বক্ত বরছে ।

ফিনকি আর ঠিক থাকতে পারলে না । নীচে থেকেই টেচিয়ে উঠল, “হালদাব মশায়, পেয়েছি আমি, পেয়েছি সেটা, এই দেখুন ।”

সমস্ত লোকের নজর গিয়ে পড়ল তার দিকে । পুলের নীচে দাঁড়িয়ে ছেড়া-খোঁড়া ময়লা কাপড় পরা মেয়েটা ডান হাত তুলে টেচাচ্ছে । তার হাতে কুলছে সেই হার, চকচক করছে হার ছড়া । সেই লকেটটিও ছলছে হাবের তলায় ।

এক দিনের জন্তে রাগী হয়ে গেল ফিনকি ।

একটি মাত্র প্রশ্নের জবাব দিতে হল ওকে ।

“কোথায় পেলে তুমি মা হার ছড়া ?”

“কুড়িয়ে পেলাম মায়ের চরণায়ুত নেওয়ার নর্দমায় ।” একটা ছোট্ট ঢোক গিলে ফিনকি বললে ।

বাস—আর একটি কথাও কেউ জিজ্ঞাসা করলে না ওকে । হতদরিদ্র মেয়েটাকে মাথায় তুলে নাচতে লাগল সকলে । তৎক্ষণাৎ নতুন শাড়ী সাদা জামা পরানো হল, নগদ পঁচিশ টাকা দিয়ে প্রণাম করল কুমারীকে নতুন বোঁটি । তার শাড়ী দিলেন নিজের কড়ে আঙুল থেকে আংটি খুলে ওর আঙুলে পরিয়ে ।

আংটি টলটল করতে লাগল। আরও পঞ্চাশজন যাত্রী টাকা পরমা ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ওর পায়ের কাছে। নাটমন্দিরে ওকে দাঁড় করিয়ে প্রণাম করা শুরু হয়ে গেল।

হালদার মশাই একটিবারের জন্তে নড়লেন না ওর পাশ থেকে। তাঁর যজ্ঞমানরা তাঁকে ওখানে প্রণাম কবেই বিদেয় নিলে। এতবড় একটা ঘটনা ঘটান দৃষ্টিই বোধ হয় তাঁর ছুটি ছেলে এসে উপস্থিত হল মায়েব বাড়িতে। বাপ মারা যাচ্ছে শুনেই বোব হয় ছুটে এসেছিল তারা। কাজে যজ্ঞমানদের তরাই বিদেয় দিলে। সঙ্গে কবে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। হালদার মশায় যা কিছু পেলেন, তা তাবাই নিয়ে গেল বাড়িতে। হালদার মশায় কিছুই সে সময় বাড়ী যেতে রাজী হলেন না। এমন কি নাকে মুখে একটু জলও দিলেন না তিনি। ঠায় বসে বইলেন মেয়েটার পাশে।

এরপর এক সময় টাকা পরমা সব কুড়িয়ে মেয়েটার তালুতে নৈধে দিয়ে বললেন, “চল ত মা, এবার তোর বাড়িতে পৌঁছে দি নাকে।”

বেশ ঘাবড়িয়ে গেল ফিনকি। কেন, নাকে আবার পৌঁছে দিতে যাবেন কেন হালদার মশাই। সে ত একলাই বেশ যেতে পারবে। আর সেই হতচ্ছাড়া বাড়িতে নিয়েই বা সে যাবে কি কবে হালদার মশায়কে।

কিন্তু কোনও খাপিওই খাটল না। একটু যেন গোঁড়াতে খোঁড়াতে, যেন একটু কেমন ঢংয়ে ঢলতে ফিনকি হাত ধরে হালদার মশায়ের নিয়ে গেলেন নহবতখানার নীচের গেট দিয়ে। সবাই চেয়ে রইল, অনেকে আবার চেয়েও দেখলে না। হালদার মশায় কিন্তু কাবও দিকে শাকালেন না। ফিনকি শুধু এভাবে মেজেমেজে সকলের চোখের সামনে দিয়ে হালদার মশায়ের হাত ধরে বোবয়ে যেতে লক্ষ্য মবে যেতে লাগল। মাথা নীচু কবে সে বেব সেদিন মায়েব বাড়ী থেকে। তবে বাগীর মত বেবিযে গেল, কিন্তু মুখখানি তুহয়ে।

মুখ আর তুলতেই পারল না ফিনকি বেশ কয়েকটা দিন। কেন মায়া নেই যে তারপর সেধে ওদের বাড়িতে এসে দুকথা শুনিযে গেল না ওকে আর ওর মাকে।

“এমন হাবা মেয়ে মা তোমার, হাতেব লক্ষী পায়ের ঠেললে।”

“কপাল মা, সবই তোমার ঐ পোড়া কপালেব নেখন। ঐ সোনাটুকু দিয়েই পার করতে পারতে ঐ আপদকে।”

“মেয়েবও কপাল মা, বলে কপালে নেইক ঘি, ঠক্কাকালে হবে কি।”

“তা নয় গো তা নয়। হাড় বিচ্ছু মেয়ে বাবা, হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি। যখন

দেখলে ওর ঐ ধনাকে মেয়ে তুলো ধুনে দিচ্ছে তখন আর থাকতে পারলে না।”

“ও বাছা, ও সব আমরা বুঝি। বুঝলে, সবই আমরা বুঝি। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে হবে ত।”

সকলের সমস্ত রকম মতামত ঘরের ভেতর মুখ লুকিয়ে বসে শোনে ফিনকি। তার মা দাঁতে দাঁত দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন পাকা মেঝেব দিকে চেয়ে। রাতে যখন বাড়ি ফেরে ফণা, তখন তাকে মা বলেন, “হ্যাঁ রে বাবা, আর কোথাও কি একটু মাথা গুঁজে থাকার ঠাই জোটে না কিছুতে।” বোন ফিনকি দাদা ফণাকে খুব লুকিয়ে বলে, “দাদা আমাদের নিয়ে চল কোথাও, আর যে পারি না আমি এখানে এভাবে মবতে।” নিরুপায় দাদা দাঁতে দাঁত ঘষে আর গর্জায়, “শালা শালীয়া আমার সামনে কিছু বলতে আসে না কেন কোনও দিন। টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব কামড়ে।” কিন্তু কামড়াকামড়ি সত্যিই কবতে যাবে না ফণা। কারণ ওরা তিনজন মবমে মবে আছে যে। আজ যদি ফণার বাবা থাকত, অন্ততঃ কোথায় সে লুকিয়ে আছে এটুকুও যদি জানতে পারত ওবা, তাহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারত ফণা। মুখ লুকিয়ে থাকতে হত না ওব মাকে। আর বোনটাকেও ওভাবে কেউ বেইজ্ঞত করতে পারত না। শাহসই করত না কেউ ওদের মুখের ওপর কথা বলতে। ঐ একটি মাত্র দগদগে যা আছে যেখানে কেউ ছুঁলে যন্ত্রণায় শিউরে ওঠে ছেলে মেয়ে মা তিনজনেই। তাই ওবা মুখ বুজে সহ্য করে সব, অনবরত চেষ্টা করে যাতে ঐ কথাটা উঠে না পড়ে কোনও মতে। আর মানুষ্যেও ঠিক ঐ দগদগে যা-খান্য ওপবেট চিমটি কাটে।

ফণা ফিনকির বাবা পালিয়ে গেছে।

ওদের বাবা লুকিয়ে আছে কোথাও।

কেন লুকিয়ে আছে, কি এমন করেছে যে লুকিয়ে আছে সে? লুকিয়ে থাকবে আর কতকাল? কোথায় লুকিয়ে আছে?

ছেলে মেয়ে দুজনের মনেই এ জাতের অনেক প্রশ্ন অনেকবার মাথা তুলে উঁকি মারে। কিন্তু কিছুই জানার উপায় নেই সঠিক। নানা জনে নানা কথা বলে। কেউ বলে চুরি করে গা ঢাকা দিয়েছে ধরা পড়বার ভয়ে। কিন্তু কবে সে বার কি চুরি করেছে তা কেউ বলতে পারে না। কেউ বলে সাধু হয়ে চলে গেছে তপস্যা করতে। কিন্তু কোথায় গেছে তপস্যা করতে তাও কেউ বলতে পারে না। আবার এমন কথাও অনেকে বলতে ছাড়ে না যে লোকটা পালিয়েছে নিজের ঐ বৌয়ের জ্বালায়। তারপর সব এমন কথা বলে যা ফণা ফিনকির শুনলেও পাপ হয়।

তাদের মা, হাড-চামড়া-সার মা তাদের, শতছিন্ন একথানা কয়লার মত কালো শাড়ী আর হাতে দুগাছি শাখা পরা জনম দুঃখিনী তাদের জননীকে কেউ কিছু বলছে মনে হলেই, তারা পালায় সেখান থেকে। ঝগড়াঝাঁটি বাদ প্রতিবাদ করার, এমন কি মুখ তুলে টুঁ শব্দটি করারও আর সামর্থ্য থাকে না ছেলে মেয়ের। ঘবে ফিরে মাকে জিজ্ঞাসা করেও সাহস হয় না কোন কথা।

বাবা কেন গেল, কোথায় গেল, কবে ফিরবে এ প্রশ্নগুলো জানতে চাইলেও যে বোবা মা কি ভাবে ভেতরে ভেতরে গুমবে মরেন এটুকু ওরা চাক্ষুষ দেখে কি না। কাজেই বোবা হয়ে থাকে।

বোবাব নাকি শত্রু থাকতে নেই।

ওরা ভাট বোন কিঞ্চ হাডে হাডে বুকেছে যে বোবাব শত্রু সবাই। মুখ ছোটোতে পারলে অনেক আপদ বাংলাই দূবে ঠেপিয়ে বাখা যায়। বোবা হয়ে থাকলে আপদ বাংলাই হুমডি খেগে এসে পড়ে ঘাড়ে। জানে যে বোবাব বড় জোর দাঁত খিঁচুবে, মুখেব জোরে ভূত-ত আন ভাগাতে পারবে না।

শিশু দাঁত খিঁচিয়েছ মেদিন এন ভূতকে তাড়িয়ে ছাড়লে ফিনকি। ঈ্যা, শুধু দাঁত খিঁচিয়েছ শাডালে থাকে, এবং বলা চলে দাঁতও খিঁচুতে হল না তাকে তাড়াতে। চোখ বাক্য কণে চাইতেই হুডহুড করে মনে পড়ল সে। আর মুখগানাকে এমন কবে গেল যে সে মুখ মনে পড়লেই হাসিব তেলাখ দম ফেটে মরবার দশা হয় ফিনকিব। পাকা চোরেরাই ও বকম কাঁচুমাচু করতে পারে মুখেব অবস্থা, আর মেই জন্তেই অত মার খেয়ে মরে।

সে দিন সকাল হবার আগে থেকে টিপ টিপে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। সারাটা দিন ফিনকি আটকে রইল ঘবে। বিশেষের দিকে জলটা একটু ধরল, চিকচিকে বোদ দেখা দিল একটু। ঘরে নেই এক ফোঁটা কেরোসিন, কাজেই একটবার বেরতে হল ফিনকিকে বোতলটা হাতে করে। মা বললেন, “যাবি আর আসবি, বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়ে একটা কিছু বাধিয়ে বসিস না যেন এ সময়।” ফিনকি ছুটল, এক রকম ছুটেই বেরল বাড়ি থেকে। কিন্তু আর ছোটো সম্ভব নয়, গলিতে একইটু কাদা। কাজেই পা টিপে টিপে কাদা বাঁচিয়ে এগতে লাগল। গলি থেকে রাস্তায় উঠতেই একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল সে। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, “একবারটি সোনার কাতিকের ঘাটে যাবি সন্ধ্যাবেলা, একটু কথা আছে।” বলেই হনহন করে সোশা চলে গেল।

এমন হকচকিয়ে উঠেছিল ফিনকি যে প্রথমে বুঝতেই পারেনি মাল্লবটা কে। অনেকটা এগিয়ে গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে চাইলে সে ফিনকির দিকে। তখন ফিনকি চিনতে পারলে। ওবে মুখপোড়া হুমান এতখানি সাহস তোর! আচ্ছা দাঁড়া।

তেল নিয়ে তাড়াভাঙি ফিনকি ফিরে গেল ঘরে। তারপর ভাবতে বসল। আচ্ছা কি কথা আছে ওর! ফিনকিব সঙ্গে ওর কি এমন কথা থাকতে পারে। আব এমন কবে লুকিয়েই বা ও বলে গেল কেন ফিনকিকে সোনার কার্তিকের ঘাটে যাবাব জন্তে? যা বলবাব তা ওখানে বলে গেলেই ত পারত, সে কথা শোনাবাব জন্তে সোনার কার্তিকের ঘাটে যেতে হবে কেন?

নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে ভেতরে। পাকা চোব ত গুটা, চোরের মন পুঁই আদাড়ে। হয়ত কোনও বদ মতলব থাকতে পাবে ওর পেটে। কিন্তু সে সব মতলব থাকলেই বা কববে কি ও ফিনকির। ওঃ, ভারি আমাব নবাব বে, ঠাঁর ডাকে অমনি আমি ছুটলুম আস কি ঘাটে।

এই পর্যন্ত মনে মনে ভেবে ফিনকি নবাবটিকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে চাইলে মন থেকে। তারপর ঘর বাঁট দিলে, কেরোসিন পুবেল বাতিতে, ঘরের মেঝের মাঝের আর তাব বিছানাটা পেতে ফেললে। দাদার ধুতিখানা কুঁচিয়ে রাখলে তার তল্লপোশের ধারে, কাজ থেকে ফিবে আডতেব কাপড ছেড়ে ফেলে দাদা। তারপর আর কোনও কাজ খুঁজে না পেয়ে নিজেব জট-পাকানো চুলগুলো নিয়ে একটা দাড়াভাঙা চিক্রনি দিয়ে টানাটানি করতে বসল। তখন আবার নতুন করে মনে পড়ে গেল সেই চোয়াড ভূতটির কথা।

আচ্ছা কি এমন কথা আছে ওর।

যদি যায়ই ফিনকি সেট ঘাটে, তাহলে কিই বা করতে পারে সে ফিনকির। ওঃ, অমনি করলেই হল কিছু। দাঁত নেই ফিনকির, এক কামড়ে এক খাবলা মাংস ভুলে নেবে না ওর গা থেকে। মার খেয়ে মরেই যেও সেদিন, ভাগ্যে ফিনকির দয়া হল। হ্যাঁ, দয়াই ত, দয়া করেই ত সে ফেরত দিলে হারটা। দয়া নয় ত কি? চুপচাপ থেকে সব ঠাণ্ডা হলে যদি সে গুটা বাড়ি নিয়ে আসত ত কি হত? মার খেতে খেতে বাছাধনকে সেদিন ঐ মায়েব বাড়িতেই চোখ গুলটাতে হত। আবার সাহস দেখাতে এসেছে ফিনকির কাছে, মড়া থেকে যম কোথাকার।

কিন্তু যদি ফিনকি যায় ত সে বলবে কি ওকে!

চেনা নেই জানা নেই, জীবনে কখনও ওর সঙ্গে ফিনকি কথা বলেনি। কে এক ধনা না ধনা। দেখেছে অনেকবার ওকে মায়েব বাড়িতে, এখানে ওখানে।

সবাই গুর নাম জানে, সবাই জানে যে ও হল কে এক ভালামার ছেলে, এই কালী-
ঘাটেই থাকে। পকেট মারতে গিয়ে প্রায়ই মারধোর খায়, মারধোর দিয়েই ছেড়ে
দেয় ওকে সকলে। তাহ সবাই গুর নাম জানে। সেই ধনার এমন কি কথা থাকতে
পারে ফিনকিব সঙ্গে ! কি বলবে সে ফিনকিকে যদি ফিনকি যায় এখন ঘাটে ?

নচ্চারের বেহুদ বাদরটা। গুর জন্তেই এত কথা এখন শুনতে হয় ফিনকিকে।
লোকে মনে করে যেন কতকালের ভাব গুর সঙ্গে ফিনকির। লোকে বাড়ি বয়ে
এসে মুখের ওপর বলে যায় যাচ্ছেতাই সব কথা। কেন বাদরটা গুর জামার মধ্যেই
বা ফেলতে গেল সেদিন হারছড়াটা। আচ্ছা, ওহ ধনাই যে ফেলেছিল হার গুর
জামার মধ্যে তাই বা কে বললে। এমনও ত হতে পারে যে ও শুধু শুধু মার খেয়ে
মরছিল। ও পকেট মাঝে বলে ওকে ধবে পিটানো হচ্ছিল। আসলে যে লোক
ছিঁড়ে নিয়েছিল ঐ হাবটা বোটব গলা থেকে, তাকে মোটে ধবতেই পারে নি
কেউ, আব সেই পোকটাই হারছড়া ফিনকির ঘাড়ের কাছ দিয়ে জামার ভেতর
ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ল।

আচ্ছা, কি হয় একবার গেলে ঘাটে এখন।

কি কবতে পাবে ঐ ছোড়া, ফিনকিব।

ওঃ অর্মান করলেই হল কানা কিছ, ছেলেমানুষ কিনা ফিনকি এখনও।

কিন্তু যদি কেউ দেখেটেখে ফেলে।

কে দেখবে এখন ? দেখবাব জন্তে কে এখন ঠাঁ করে বসে আছে সেই ঘাটে ?

আর দেখলেই বা হবে কি ?

কার কথাব তোবাক্বা কবে ফিনকি ?

দেখুক না কে দেখবে, বলুক না কে কি বলবে। এমনই মিছিমিছি যখন এত
কথা বলছে লোকে তখন যাবে ফিনকি ঘাটে। বলুক লোকে যা বলবার। লোকের
কথার মুখে ফিনকি লাগি মাঝে এই অর্মান করে।

সত্যিই পা'টা তুকে ফেললে ফিনকি মেঝেয়।

কিন্তু তাবপর। এখন মাকে কি বলে বেরনো যায় বাড়ী থেকে ? একটু পরেই
ত মা সন্তোষ করবে বসবে আসনে।

তখন ফিনকিও দেবে এক ছুট। শুধু বলে যাবে, “ঐ যাঃ, পরমা কটা আবার
ফেলে এসেছি মুদির দোকানে।” বলেই দেবে ছুট, মা বাধা দেবার ক্ষুদ্রসতাই
পাবে না।

যথা সঙ্কল্প তথা সিদ্ধি।

পৌছল ফিনকি ঘাটে। একে যেমলা দিনের সন্ধ্যা, তার ওপর কাঁদায় এমন পিছল হয়েছে পথঘাট যে আছাড় খেয়ে মরবার শখ না চাপলে কেউ সহজে বেরবে না ঘর ছেড়ে।

কাক পক্ষী নেই ঘাটে। বেশ একটু কোল-আধারে গোছের হয়ে উঠেছে। ফিনকির মনে হল, এতক্ষণ পরে তার খেয়াল হল কথাটা, যে এসে হয়ত সে ভাল কাজ করে নি। গেল কোথায় ছোঁড়াটা।

মানে ফিনকি এ কথাটা একরকম ধরেই নিয়েছিল যে সে থাকবেই ঘাটে। এসেই ফিনকি তার দেখা পাবে। কিন্তু একি! কেউ নেই ত কোথাও!

একবার ঘুরে দেখল ফিনকি সব ঘাটটা। না কেউ নেই কোথাও। গোটা কতক কুকুর শুধু পড়ে রয়েছে এক কোণে কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে। আর একেবারে ভেতর দিকে বৃষ্টির ছাট যাতে না লাগে গায়ে এমন এক কোণে কে একটা ছেঁড়া কাঁথা মূড়ি দিয়ে পড়ে আছে।

তখন আর করবে কি ফিনকি, দেৱী করার উপায় নেই তার। কাজেই ফিরল। গোটা কতক সিঁড়ি নেমে মায়ের ঘাটে উঠতে যাবে এমন সময় ঠিক পেছনে স্তন্যভেদে পেল, “এই, ফিরে যাচ্ছিস যে?”

ফিনকি ঘুরে দাঁড়াল টপ করে।

আরে আবার দাঁত বার করে হাসছে যে!

দুই চোখে আগুনের ফিনকি ছুটল ফিনকির। মুখটা একদম ফাঁকই হল না তার। দাঁতের ভেতর থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, “ডেকেছ কেন?” আর একজনের দাঁতও বন্ধ হল তৎক্ষণাৎ। খাবি খাবার মত একবার হাঁ করলে সে, বোধ হয় কিছুই বলতে চাইলে, পারলে না।

আবার ফিনকি সেই স্থরে সেই রকম ভাবে ওর চোখের দিকে চেয়ে বললে, “কই বল না, কি বলবে।”

জবাব হল শুধু খানিকটা তোতলামি—“এ এ এ এই তা তা এই মা মা মানে—”

ধমকে উঠল ফিনকি, “বল না ভাল করে, কি বলতে চাও।”

তোতলামি বন্ধ হল। শুধু সে জুলজুল করে চেয়ে রইল ফিনকির চোখের দিকে। নিজের হাত দুটো নিয়ে যে কি করবে ঠিকই করতে পারছে না যেন। অনবরত দুহাত মোচড়াতে লাগল।

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল ফিনকির, অবস্থা দেখে। হাসি চেপে গলার স্বয়ং বেশ নরম করে বললে, “ছিঃ, চুরি কর কেন? অত মার খাও তবু লজ্জা করে না তোমার?”

এতক্ষণ পরে আজওয়াজ ফুটল গলায়। কেমন যেন কান্নার মত শোনাল কথা কটা, “চুরি আর আমি করব না, মাইরি বলছি তোকে, আর কখনো আমি ও সব কাজে হাত দেব না।”

ফিনকি বললে, “তাহলে আব তোমায় ধরে কেউ ঠেঙাবেও না। কিন্তু আমার ভেঙে আনলে কেন? শীগগির বল, এক্ষণি না গেলে মা টেব পাবে।”

চঠাৎ সে নড়ে উঠল। পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কি একটা বার করলে। ঝাঁকবে ধবলে ফিনকির হাত। তাবপরই তবাব কয়ে মিঁড়ি দিয়ে নেমে খালের ভেতর মিলিয়ে গেল।

ব্যাপাবটা ঘটল চোখের পলক না ফেলতেই। বেশ ভেবাচাকা খেয়ে গেল ফিনকি, তারপর সে টের পেলে যে তার হাতের মুঠোয় কাগজে মোড়া কি একটা শক্ত জিনিস যেন রয়েছে।

কিন্তু আব দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই তখন। গাড়াগাড়ি দিবে চলল ফিনকি। এমন পেছল যে গাড়াগাড়ি পা ফোঁস উপায় নেই। গলিতে গ্যাস জ্বলে উঠেছে। ফিনকির সাহস হল না কোনও গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে কাগজের মোড়কটা খুলে দেখে কি হাতে গুঁজে দিয়ে গেল সে। দেশী না হয়ে যাষ বাড়ী কিবতে। আচনের খুঁটটা সে টিপে দেখে নিবে। কেবোদিন আনার ফেঁত পয়সা কটা ঠিকই আছে ছাঁলে। গিগেচ মাষের সামনে পয়সা কটা নামিয়ে দিয়ে বলবে যে, কি ঝগাট হবে পয়সা কটা আদায় করতে হল তাক দোকানীর শাভ থেকে। কাল সকালে গেলে কিছুতেই আব দিত না দোকানী। বাস, কোনও গোলমাল হবে না।

কিন্তু কি ও দিয়ে গেল হাতে গুঁজে।

যাই হোক, সে এক সময় দেখলেই তাই। পেটের কাছে গুঁজে ফেলে ফিনকি জিনিসটাকে। তখন তাব আবাব মনে ভুগল সেফ মূখানার অবস্থাটা। পয়সাক হাসিও পেয়ে গেল ফিনকি। ঢাব না হলে কেউই ও একম কাঁচুমাচু কবতে পাবে মুখ। অসম্ভব।

দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই, অস্তুতঃ থাকা উচিত নয়, এইই হল কংসাবি হালদার মশায়ের সৃচিস্তিত অভিমত। অনেক দেখে অনেক শুনে শেষ পর্যন্ত এইই তাঁর ধারণা হয়েছে। নয়ত এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে যে দিনের পব দিন তিনি ঘরে বসে হয়ে বয়েছেন, রাতের পর রাত তিনি চুপ করে চিত হয়ে শুয়ে

আছেন বিছানায় আর তাঁর লাঠিখানা। ঐ কোণে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেয়াল ঠেস দিয়ে। ঠিক সময় স্বর্ধ উঠছে, মায়ের মন্দির খুলছে, মায়ের রান্নাঘরে ভোগ চাপছে, লোকে মাকে দর্শন করতে আসছে, ডালাধরারা হোক-হোক করে ঘুরছে মায়ের বাড়ীর ভেতরে বাইরে, টিনের কৌটো-ধরারা আর ভাঙা সরা-ধরারা রাস্তায় ঘাটে কাতরাচ্ছে, কুমারীর গর্ভধারিণীরা কুমারী হবার জন্তে হন্তে হন্তে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নাম-না-জানা জন্তু জানোয়ারের দুধ থেকে তৈরী সন্দেশচটকানো মায়ের মূখের সামনে ধরা হচ্ছে। ওধারে গঙ্গাটায় শুকনো ধুলো উডছে, কেওডাতলার ধোঁয়ার গন্ধ ঘরে শুয়েও হালদার মশায় নাকে টানছেন। আর মায়ের মন্দির যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেই নিশা মহানিশায় মায়ের বাড়ীর আশে পাশে বাস্তায় ঘাটে গলিত কুষ্ঠওয়ালো গোদা গডিযে গডিযে গিয়ে নাক কান খসে যাওয়া পক্ষাঘাতে পঙ্গু হুন্দরীর পাশে স্থান পাবার জন্তে কানা উডেটার সঙ্গে নিঃশব্দে খামচা খামচি করছে। নামছে, সবাই নেমে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে, এক হয়ে যাচ্ছে। এতকাল পরে ছুটি পেয়ে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে হালদার মশায় একটি বড় মিষ্টি স্বপ্ন শুনতে পাচ্ছেন, গুনগুন করে যেন কে গান গাইছে তাঁর কানেব কাছে। নামার গান, সব এক হয়ে মিশে গিয়ে পথের ধুলোয় সমান হওয়ার গান।

মনে মনে দিব্যরাত্র অষ্টপ্রহর হালদার মশায় সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছেন আগা-গোড়া জীবনটাকে। জীবনভোর কত কি খেয়েছেন পবেছেন, বা কাব কাছে কতটুকু পেয়েছেন, কাকে কি দিয়েছেন, এ সমস্ত হিসেব নিকেশ তাঁব মনেও পড়ছে না। শুধু কত রকমের কত কি দেখেছেন, কেমন কবে আগাগোড়াব সব কিছু পালটাতে পালটাতে কি রূপ ধারণ কবেছে এখন, এই সমস্ত মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন হালদার মশায়। যতই মিলিয়ে দেখছেন ততই তাঁব ধাবণা হচ্ছে, ছুনিয়ায় অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই, অস্তুতঃ থাকা উচিত নয়।

হালদার মশায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে একবার ঘুরে এলেন আগাগোড়া কালীঘাটটা। সেই উত্তরে পোলের কাছ থেকে দক্ষিণে কেওডাতলা পযন্ত আর পূবের সেই ট্রাম রাস্তা থেকে পশ্চিমে খাল পযন্ত। বাস, বলা উচিত এইটুকুই কালীঘাট। কিন্তু তাও ঠিক নয়, কালীঘাট মানে হল সেইটুকু স্থান, যেখানে থাকে তারা, যারা কালীবাড়ী আছে বলেই টিকে আছে, যাদের বাঁচা মরা নির্ভর করে মা-কালীর বাঁচা মরার ওপর। আচম্বিতে যদি এমন হয় যে মা তাঁর মন্দির হুদু রাতারাতি অন্তর্ধান করেন কালীঘাট থেকে! এমন হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়, তাহলে এতগুলো মানুষ করবে কি! রাত পোহালে যখন সবাই দেখবে যে মন্দির নেই, কিছুই নেই, একটি অতলম্পর্শ দ ই করে রয়েছে ঐ জায়গায়, তখন মানুষ-

গুলোর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ! মন্দির আছে, মা-কালী আছে, তাই ওরা আছে । একটি মাত্র পেশা সকলের, পেশাটির নাম মা-কালী পেশা । মানে মা-কালীর নামে হাত পাতা পেশা । ওই পেশারই কয়েকটা ধাপ বানানো হয়েছে । যারা ভাল ধরে, যারা ঘাটে বসে পিণ্ডি দেওয়ায়, যারা নাটমন্দিরে বসে হোম, যাগ করে মাতুলি দেয়, এরা সব উঁচু ধাপের লোক । এরা মনে করে যারা রাস্তায় ঘাটে চৈচায় আর কাতরায়—তাদের থেকে এদের পেশাটা বেশী সম্মানের পেশা । যেমন ঐ ওধারে, খালধারে টিনের থুপরিদ দরজায় যে জীবগুলো মেজেগুজে হা-পিত্যশ করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারাও মনে করে যে, রাস্তায় যারা গড়াগড়ি খাচ্ছে তাদের চেয়ে ওদের পেশাটার অন্ততঃ কিং মর্যাদা আছে । যেমন ঘর ভাড়া করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে যে জ্যোতিষী, রাজা সম্রাট বনে গেছেন আজ, তিনি মনে করেন নাটমন্দিরে বসে মাতুলের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা কারবার চালায়, তারা অতি নিচু দরের প্রাণী ।

হালদার মশায়ের মনে পড়ে যায় অনেককে । তিনিই একদিন যাকে দেখেছেন ছেঁড়া আসন আর কোমাকুমি বগলে নিয়ে নাটমন্দিরের কোণে বসতে, তিনিই তাকে দেখলেন তেতলা বাড়ী ঠাঁকিয়ে সম্রাট জ্যোতিষী বনে যেতে । যে মেয়েঃ তিনিই দেখেছেন সত্যপীঠতলায় মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, তিনিই তাকে দেখলেন চাউস মোটরগাড়ী থেকে নেমে মায়ের মন্দিরে দোনার গিনি দিয়ে প্রণাম করতে । আবার উল্টোও বহুত দেখেছেন । দেশ থেকে এলেন পণ্ডিত মশাই, বাড়ী ভাড়া নিয়ে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে বসলেন মাতুলি দেবার বাবসা ফেঁদে, দেখতে দেখতে একেবারে ভালধরা হয়ে গেলেন । বাসা নিলেন দেই খাল ধারেই । কিছু দিন পরে তাঁকেই দেখলেন চুপটি কবে মুখ বুজে হাঃ একটি ঘটি নিয়ে সামনে গামছা বিছিয়ে ঘাটের একধারে বসে থাকতে । গামছার ওপর চালে ডালে মেশানো পোয়াখানেক খুদকুঁড়ো ধার কয়েকটা পয়ঃ পড়ে আছে । এমন মেয়েকেও তিনি চেনেন, যে মহিম হালদার ষ্ট্রাটের মোড়ে দোতলা বাড়ীর বাড়ী-উলি ছিল, সেই মেয়েই এখন ভালাওয়ালার দোকানে যাত্রীর হাতে জল ঢেলে দেওয়ার কাজ করছে ।

অজুত ব্যাপার নয়, তাজ্জব কাণ্ড নয়, সবই সম্ভব । অসম্ভব বলতে কোনও কিছু নেই এই ছুনিয়ায় । কংসারি হালদার মশায় দিবারাঃ বিছানায় শুয়ে চিন্তা করেন আর মিলিয়ে দেখেন যে ছুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছু থাকারাই শুধু অসম্ভব । আর অসম্ভব কিছু নেই !

অন্ধকার ঘরে হালদার মশায় চোখ চেয়ে কান খাড়া রেখে রাত কাটান। ই, ঐ ত! ঐ ত এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে, ঘুরছে গলির ভেতর, এগিয়ে আসছে মহামায়া লেন, কালী লেন, ভগবতী লেন দিয়ে। ঐ ত।

নিজের নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন হালদার মশায়। দম বন্ধ করে স্তনতে লাগলেন—

“তাই মা আমি নিলাম শরণ
তোব ও দুটি রাঙা চরণ
নিলাম শরণ
এডিয়ে গেলাম মায়ার বাঁধন
মা তোব অভয় চরণ পেয়ে।
জগত জুড়ে জাল ফেলেছিস মা
গামা কি তুই ছেলের মেয়ে।”

হালদার মশায় একটু পাশ ফেরাব চেষ্টি কবলেন। চিডিক মেয়ে উঠল শিরদাঁড়ার মধ্য। সেটা সামলাবাব ক্ষত্রে বেশ কিছুক্ষণ আর গানব দিকে মন দিতে পাবলেন না তিনি। দম বন্ধ কবে আবও কিছুক্ষণ থাকতে হল তাঁকে। না, আর তাঁকে হয়ত কখনও নিজে উঠে দাঁড়াতে হবে না বিছানা ছেড়ে। সকলে ধরাধবি করে যেদিন তাঁকে বিছানা থেকে নামিয়ে মাটিতে শোয়াবে, সেই দিনই তিনি মাটি স্পর্শ করতে পারবেন। শব আগে আব নয়।

যন্ত্রণাব দমকটুকু কমতে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিল। শেষে আবাব দম ফেললেন হালদার মশায়। দম ফেলে আবাব কান খাড়া কবলেন। অনেকটা দূর থেকে, বোধ হয় সেই হালদার পাড়া লেনেব ভেতর থেকে ভেসে এল—

“পড়ে মা তোর মায়ার কাঁদে
কোটি নবনারী কাঁদে মা”—

হঠাৎ কি হল হালদার মশায়ের, হ হ কবে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন তিনি। বুক ঠেলে কান্নাব চেউ তাঁর গলায় এসে আটকে যেতে লাগল। বড় স্মারাম বোধ হল তাঁর। অন্ধকার চরে একলা শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদার চেয়ে বড় বিলাসিতা যেন আর কিছুই নেই এই ছুনিষায়। ভারী সোয়ান্তি পেলেন তিনি কাঁদতে কাঁদতে। তাঁর মনে হল, না, যতটা নিঃশব্দে একলা বোধ কবছেন ততটা একলা নন ঠিক। এই ত, এখনও একটা কিছু তাঁর সঙ্গী রয়েছে। বেশ তৃপ্তনে একসঙ্গে শুয়ে আছেন অন্ধকার ঘরে, তিনি এবং তাঁর কান্না। কান্নাটুকু ত এখনও মরে যায় নি তাঁর, কান্না ত তাঁর ছেড়ে পালায় নি এখনও। সব গেছে, ওঠা হাঁটা চলা ফেরা দেখা

শোনা এ সমস্ত তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু কান্না এখনও তাঁকে পরিত্যাগ করে যায় নি। ইচ্ছে করলে তিনি যতক্ষণ খুশি যতবার খুশি কাঁদতে পারেন এখনও ; কান্না তাঁর কিছুতে ফুরাবে না।

খুশি হলে তিনি দুনিয়া স্বন্ধ সকলের কান্নাই একা কাঁদতে পারেন, একলা ঘরে বিছানায় শুয়ে। কেউ তাঁকে বাধা দিতে আসবে না।

“পড়ে মা তোর মায়ার কাঁদে

কোটি নরনারী কাঁদে

তোর মায়ার জালে মহামায়া বিশ্ব ভুবন আছে ছেয়ে।

বার বার এইটুকু মনে মনে আঙড়ালেন বংশরি হালদার। আঙড়াতে আঙড়াতে রাগে তাঁর ব্রহ্মপুঞ্জ ফেটে যাবার যোগাড় হল। কান্না ভুলে গেলেন।

কি ভয়ানক মিথ্যে কথা। কি বিতর্কিত রকম অনর্থক বদনাম দেওয়া মাকে। বদং বলা উচিত—

“পড়ে মা তুই মিস কঁদে

কোটি নরনারী কঁদে—”

কে কাঁদে ! কাঁদছে কে ? শুধু কাঁদছে, না মা কাঁদছে ?

বহুবান্ধব দেখা একটা দৃশ্য চোখের ওপর ভেসে উঠল হালদার মশায়ের। মায়ের বাড়ীতে হাড়িকাঠে পাঠা চোকানোর দৃশ্য। চারিদিকে মাষ্টার দাঁড়িয়েছে, সকলে চেয়ে রয়েছে পাঠাটান দিকে। অনেকেই মতামত প্রকাশ করছে, “বেশ বড় যে হে, হবে ত এক কোপে ? ঘাড়টা কি মোটা দেখছ, দাঁও হে ঘাড়ে খানিকটা ঘি মালিশ করে দাও।” অহা হা হা, করছ কি কামাবের পো, সামনেব ঠ্যাং দুখানা আগে মুচড়ে ভেঙে ওপর দিকে তুলে ফেল না। পায়ে জোর পেলে ওকে রাখবে কি করে ? ধর ধব, এবার এবজন টেনে ধর লুট্টা, ভাঙল বুঝি হাড়িকাঠের খিল।”

নানা জাতের মতামত, সকলের চোখে একটা ঝাঁকালো দৃষ্টি, তার মাঝে হয়ত দু একবার পাঠাটা চোঁচিয়ে উঠল। ঝাঁ করে চকচকে খাড়াখানা উঠল আকাশের দিকে, নামল চক্ষের নিম্নে। বাস, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল সকলে। চারিদিকের মানুষ নড়েচড়ে উঠে যে যার পথ দেখল।

এ দৃশ্য, ঠিক এই জাতের ঘটনা অসংখ্যবার হালদার মশায় দেখেছেন মায়ের বাড়ীতে। বিছানায় শুয়ে আগাগোড়া সেই দৃশ্যটাই তিনি দেখতে পেলেন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ তাঁর চোখের ওপর ফুটে উঠল সেই ব্যাপারটার একটা নতুন দিক। এতদিন ধরে তিনি দেখেছিলেন সেই বোবা পশুগুলোর

চোখে ভয় আর একটা করুণ কাকুতি। জীবনের জন্তে আকুলি বিকুলি। কিন্তু না, ও সমস্ত কিছুই নয়। এতদিন তিনি মহাভুল করে এসেছেন, ওদের চোখে তখন যা থাকে তার নাম ঘৃণা, চতুর্দিকের মানুষগুলোর ওপর একটা ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাবই ত থাকে সেই বলির পশুর চোখে। এবং আর যা থাকে, তার নাম হচ্ছে অপমানের তীব্র জ্বালা। একলা এতগুলো মানুষের দৃষ্টির সামনে অসহায় ভাবে মরতে যে অপমানটা হয়, সেই দুর্জয় অপমানের দরুণ একটা জ্বালা থাকে সেই বলির পশুর চোখে। কাতরতা, করুণা-ভিক্ষা, মরণের ভয় এ সমস্ত কিছুই থাকে না তখন ওদের মনে প্রাণে কোথাও। অপমানের জ্বালা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

মায়ের চোখেও ঐ অসহায়তা আব অপমানের জ্বালা ছাড়া অন্য কিছু নেই। মার আবার তিনটে চোখ। আর একটা চোখে যা রয়েছে তা হল পরিত্রাণ পাবার জন্তে ব্যাকুলতা। বছবেব পব বছব, শত শত বছব ধরে ঐ ভাবে চেয়ে রয়েছে মা, আর অসহায় ভাবে সহ্য কবছে সকলেব জুলুম। ভালবাসাব জুলুম, ভক্তির জুলুম, হাংলামোর জুলুম। যার যা খুশি আনছে মায়ের সামনে, যাব যা খুশি চেয়ে বসছে মায়ের কাছে, যার যা খুশি ঘুম দিতে চাচ্ছে মাকে। উদয় স্তম্ভ, অস্তম্ভ পরেও অর্ধেক বাত পর্যন্ত সহ্য কবতে হচ্ছে ঐ বিড়ম্বনা অসহায় ভাবে মাকে, ছেদ নেই, ছুটি নেই, একটি দিনের তবেও পরিত্রাণ নেই। মাত্তবে কালীঘাট থেকে আলিপুরে যায় চিড়িয়াখানা দেখতে। সেই চিড়িয়াখানাও বিশেষ বিশেষ দিনে বন্ধ থাকে, সেই চিড়িয়াখানাও উদয় থেকে অস্তম্ভ এবং অস্তম্ভ পবেও ঘন্টা চাব পাচ খোলা থাকে না কোনও দিন। অষ্টগ্রহবের ভেতবে ছ' গ্রহব চিড়িয়াখানাও পশুকেও মানুষের চোখের দৃষ্টিব সামনে বেইজ্জত হতে হয় না, যেমন হয় কালীঘাটের কালীকে। চিড়িয়াখানাও পশুব সঙ্গে মায়ের তফাত আবও অনেক রয়েছে। ওরাও বন্দী, মাও বন্দিনী, কিন্তু তফাত হচ্ছে চিড়িয়াখানাও পশুকে দেখিয়ে রোজগারের আশায় এক পাল মানুষবেব নোলায় দিবারাত্র নাও ঝরছে না। চিড়িয়াখানাও পশুর চতুর্দিকে যে সব মানুষ থাকে তারা মনে করে ভিড় যত কম হয়, মানুষজন যত না আসে, ততই মঙ্গল। পশুগুলো তবু শাস্তিতে থাকতে পাবে। আর কালীঘাটের কালীকে যারা বন্দিনী করে রেখেছে, তারা অহোরাত্র আশা করছে যে আরও মানুষ আসুক, আরও ভিড় বাড়ুক, আরও বেইজ্জত জ্বালাতন হোক মা-কালী। তবেই না তাদের ছুপয়সা রোজগার হবে!

কংসারি ছালদার মশায় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাসটির শব্দও তিনি শ্রুত শুনতে পেলেন কানে। একটু চমকেও উঠলেন, তাঁর মনে হল ঘরে যেন অন্য কেউ

রয়েছে, অল্প কেউ যেন শ্বাস ফেলল তাঁর ঘরের মধ্যে। কিন্তু না, বুঝতে পারলেন, ওটা তাঁর মনের ভুল। এখন কেউ আসবে না তাঁর ঘরে, যেমন মায়ের ঘরেও কেউ ঢোকে না এখন। ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ছেকাপেকা করে ধরবে সবাই মাকে, তেমনি হালদার মশায়েব ঘবেও লোক ঢুকতে থাকবে। দেখতে আসবে সকলে হালদার মশায়েকে, যাব যা খুশি মনামত বলতে থাকবে। কার সইএর বোএব বকুলফুলের গন্ধাজ্জলব বোনপো পৌষেব মায়ের পায়েব তেলপড়া দিয়ে কোন রোগ সেরেছিল, আর সেই তেলপড়াটুকু এনে হালদার মশায়ের শিরদাঁড়ায় মালিশ করলেই যে তাঁর শিরদাঁড়াটা টনটনে টনকো হয়ে উঠবে চক্ষের নিমেষে, সে সমস্ত শুনতে হবে তাকে নিঃশব্দে নিবিচল চিত্তে। কারণ যাবা তাকে দেখতে আসবে বাত পোহালেই, তাবা সকলেই তাঁর আপনাত জন। তাঁকে একান্ত ভালবাসে বলেই তাঁর ঘবে এসে ভিড় করেছে এখন। কিন্তু গ্রাম্য, এতদিন এঁরা সব ছিলেন কোথায়? কস্মিনকালে কেউ তাঁর ছায়া মাড়িয়েছেন বলেও মনে পড়ে না।

হালদার মশায় ভাবেন আর হাসেন। তাঁর দশ হাত মা কালীও দশা আজ সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসহায় ভাবে তাঁকে যাব ম কাশীকে, দুজনকেই সহ্য করে শব্দ ভাববাস্য জ্বলম, অক্লি জ্বলম দরদ দেখানোর জ্বলম। এই বলির পশুর চোখের চাউন দিয়ে তিনি চেয়ে দেখবেন সকলের মুখের দিকে। সবাই হুঁশ করবে, মনে করবে সে চাউনিতে বৃষ্টি পড়েছে সকলের কাছে রূপা ভিক্ষাব মৌন শ্রাবদন। হায়, বুঝবে না কেউ, যে ক্রি অসহ্য অপমান তিনি বোধ করেন তাঁর বচনানার পাশে এসে কেউ দাঁড়াবে, কি বক্ষ অসহায় ভাবে সহ্য করেন তিনি মাঝসে দন্দ দেখানো। সাধ্য থাকলে ছোট ঘর থেকে বেশি গিয়ে তিনি এদেব আত্মায়নার আবদাবেব হাত থেকে নিশ্চয় পেনে।

সাধ্য কুলোনে আবও অনেক কিছু করতে পারতে। হালদার মশায়, কিন্তু একটি অসাধ্য সাধন করতে গিয়েই ইহজীবনের সমস্ত সাধ্য সামথ্যাটুকু তিনি খুহষে বসেছেন। সেদিন সেই বডলোক যজ্ঞমানের নতুন বোকে নিয়ে মন্দিরে ঢোকান দুঃসাহস না কবলে এত তাড়াশাড়ি এ দশা হত না তার। বড্ড বেশী বিশ্বাস কবেছিলেন তিনি নিজেকে, বহুকালের পুর্বনো শরীটটার ওপর তিনি বড্ড বেশী নির্ভর কবেছিলেন। তাঁর ভাগ্য ভাল যে মিছবিদেব ছেলেবা ঠিক সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, নযত যজ্ঞমানদেব নিয়ে তিনি বেবোঃঃ পারতেন না মন্দির থেকে। শিরদাঁড়াটা একেবাবে একেজো হয়ে গেছে, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু যজ্ঞমানদেব কিছু একটা হত যদি সেদিন, আর তার ও যদি তাঁকে বেঁচে থাকতে হত, তাহলে করতেন কি তিনি সে জীবন নিয়ে। শিরদাঁড়া গেছে যাক, ঘাড় কিন্তু তাঁর সোজা

আছে। মাথা তাঁর নোয়াতে হয় নি এখনও। হালদার বংশে জন্মে আগাগোড়াটা সারাটা জীবন তিনি ষোল আনা হালদারগিরি করে গেলেন। চলে বেড়াবার সামর্থ্যটুকু যতদিন ছিল, ততদিন তিনি ঠিক হাজির হয়েছেন মায়ের বাড়ীতে। একটি দিনের জন্তেও বামাই করেন নি, শুধু জাতাশোচ মৃত্যুশোচের দিন কটি ছাড়া।

কিন্তু তারপর !

তারপর আর নেই। এইখানেই শেষ হল এ বংশের হালদারগিরি করা। দুঃখও নেই তাতে কংসারি হালদার মশায়ের। অনেক হালদার গুটিই আজ নেই। মায়ের পালা চালাচ্ছে মুখুজ্যে চাটুয্যে বাডুঘোষা, হালদারদের ভাগনে দৌহিত্ররা সব। আবার অনেক হালদার পুরোহিত বা মিশ্রদের পালা দিয়ে গেছেন চিরকালের জন্তে। এখন সেই সব ভটচাষ মিশ্ররাই পালাদার মায়ের। কাজেই দুঃখ করার কিছুই নেই হালদার মশায়ের।

কিন্তু তাঁর পালা তিনি যে দিয়েও গেলেন না বাউকে। তাঁর ছেলেবা হবে ঐ পালার মালিক। চমৎকার হবে, মায়ের বাড়ীর ছায়া যাগা মাডাঘ না বখনও, যারা মায়ের মহাপ্রসাদ মুখে ঢোয়ায় না রোগ হবার ভয়ে, তা'র হবে পালাদার ! ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে যারা কোট প্যান্ট পবে ব্রেকফাস্ট সেরে আফিসে ছোট্টে, যাদের বৌয়েরা মুরগির ডিম কাঁচা বেঘে আর খাইয়ে নিজেদের আর তাঁদের ছেলে-পুলেদের শরীর ভাল রাখেন, তাঁরা হবে মায়ের পালাদার, চমৎকার। বহুবাদ তিনি ছেলে-বৌয়েরদের আলাপ করতে শুনেছেন যে, কালীঘাটের বালীবাড়ীর আওতার এই চোদ্দপুরুষের ভিটেটাকে বেচে বা ভাড়া দিয়ে সেই বালিগঞ্জে চলে যাওয়াই উচিত। এখানে নাকি ছেলেপুলেদের ঠিকভাবে মানুষ করা সম্ভব নয়। এখানে এই গলির ভেতর এই পচা বাড়ীতে থাকলে এ বংশের নামটাম বান্ধন-কালেও হবে না। ওদের সব গণ্যমান্ত বন্ধু বান্ধবীদের এ বাড়ীতে আনতেও ওরা লজ্জা পায়। একবার ত ওরা ক্ষেপেই উঠেছিল হালদার উপাধি ত্যাগ করে নামের শেষে 'শর্মা' লেখবার জন্তে। ওদের সেই সমস্ত সাধ আহ্লাদ এখন মিটবে। বাপের শ্রাদ্ধ হবার পরে ওরা শর্মা হবে, উঠে যাবে বালীগঞ্জের গুধারে। আরও কত কি করবে। কিন্তু হালদার বংশের হালদারত্ব, এই পালা চালানো কর্মটি কাকে দিয়ে যাবে ওরা ! কে বইবে এর পর এই দায়িত্ব ? ছেলেরা মোজা হিসেব করে বলে আছে, মায়ের বাড়ীর পরিসার যখন তাদের দরকার নেই, তখন মায়ের বাড়ীর সঙ্গে ঝগড়াই বা তারা রাখতে যাবে কেন ? একদম স্ত্রীয়া কথা, এমন কোন আইন আছে দেশে যে মায়ের সেবায়তকে মায়ের সেবা করতে বাধ্য করবে ? সেবা

চালাই, কারণ সেবা চালালে পেটটাও চলে যায়। পেট যখন চালাবার অল্প উপায় হয়েছে তখন কে যাচ্ছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে। অতি বড় হক কথা, বোল আনা পাকা যুক্তি, কার সাধ্য এর ওপর কথা বলবে।

যে ছেলে বাপের বিষয়-আশয়ের পরোয়া করে না সে কেন বাপকে ভাত দিতে যাবে? মা-কালীর বিষয়-আশয় বলতে যেটুকুর মালিক এখন পালাদাররা, ওটুকুর উপর নেহাত বেল্লিক ছাড়া আর কারও লোভ থাকতেই পারে না। বংশ বাড়তে বাড়তে, ভাগ হতে হতে আর হাত বদলাতে বদলাতে শ্রীশ্রীশ্রীমতী কালীমাতা-ঠাকুরানীর নোকরদের বর্তমানে যেটুকু চাকরান অবশিষ্ট আছে, তাই মায়া ছাড়তে পারা খুব বড় একটা বাহাদুরির কাজও নয়। মায়েব পালার ওপর লোভ, পালার দরদামের ওপর নির্ভর করে। যাদের সে লোভ নেই, তাদের মা খাটকে রাখবে কিসেব টানে?

হালদার মশায় আড্ডে হয়ে ভাবতে লাগলেন, কিন্তু এই বাডী, এবং এই বাড়ীর যা কিছু আসবাবপত্র, ঐ ছেলেদের জন্ম থেকে খাওয়া পরা, লেখাপড়া শেখা, মানুষ হওয়া, ওদের বিয়ের যাবতীয় খরচা, ওদের বাপ মা ঠাকুরদা ঠাকুরমা এই বংশের ওপর দিকের চোদ্ধ পুরুষের খেয়ে পরে টিকে থাকা—সব কিছুই চালিয়ে এসেছে ঐ কালীবাডী। এখন ওরা সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে চাচ্ছে ঐ কালীবাডীর সঙ্গে। হালদার মশায়ের মনে পড়ে গেল, একবার তিনি নিধু গোয়ালাকে আর তাব তিনটে ব্যাটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে জুতোপেটা করিয়েছিলেন। কারণ তারা দুধ ছেড়ে দেওয়ার দকন একটা গরুর কসাইবাডী বেচে এসেছিল। নিধু গোয়ালাকে মনে পড়তে হালদার মশায়ের মনে পড়ে গেল যে, আগে হালদাররা গুণ্ডা গুণ্ডা গয়লা পুষতেন। তাদের আদিগঙ্গার ওপারে জায়গা-জমি দিয়ে ঘরবাড়ী করে বসিয়েছিলেন। গরু কিনে দিয়েছিলেন, সেই গরুর দুধ তা নিয়ে আসত মায়ের বাড়ীতে। তখন মায়ের বাড়ীর বাইরে একখানিও ডালা দোকান ছিল না। এতটুকু মিষ্টি, বাইবে থেকে কিনে আনলে, মন্দিরে ঢুকে পেত না। মায়ের বাড়ীর ভেতর যে সমস্ত মিষ্টির দোকান ছিল, সে সব মিষ্টি তৈরী করত যারা, তারা স্নান করে উপোস করে দুধ জাল দিত। বেচত যারা, তাঁরাও স্নান করে উপোস করে বসে থাকত সে সব দোকানে। তাই তখন একমাত্র ঝাঁচাগোজা ছাড়া আর কোনও প্রসাদ মিলত না মায়ের বাড়ীতে। সে সমস্ত মিষ্টিতে আবার কালীর চিনি ছাড়া অল্প কোনও চিনি দেওয়ারও উপায় ছিল না। আর এখন দুধ কেউ জালই দেয় না, বাজার থেকে ছানা কিনে নানা রকম মিষ্টি তৈরী হয়। কোথায় হয়, কে করে সে সব মিষ্টি কে তার খোজ রাখতে যাচ্ছে। তিনশতান।

ভালার দোকানই ত গজিয়ে উঠেছে মায়ের বাড়ীর বাইরে। ভালাধরাদের সঙ্গে আবার দোকানদারদের কি সমস্ত লুকানো ব্যবস্থা আছে, টাকায় নাকি তারা ভিন আনা হিসেবে দস্তুরি পায়। বাঙালী ওড়িয়া মেডুয়া কে না খুলে বসেছে দোকান, মায়ের বাড়ীর আশেপাশে। কত রকমের কত কারবারই না চলছে কালীঘাটের কালীমন্দির ঘিরে। সব বিজ্ঞী হচ্ছে, ধর্ম শ্রায় নীতি নিষ্ঠা সতীত্ব মহত্ত্ব, সব। আথেরে গুছিয়ে নেবার গরজে চৌপ ফেলে বসে আছে সকলে। কাজেই কি করে তিনি বাধা দেবেন তাঁর ছেলেদের যদি তাদের গুছিয়ে নেবার গরজ না থাকে এখানে। সম্বন্ধ যখন তুলেই দিতে চায় ওরা কালীবাড়ীর সঙ্গে, তখন কেন তিনি জোর করতে যাবেন। হালদার মশায় জানান, যেচে মান আব কেঁদে সোহাগ মেলে না কখনও। স্বতরাং দিক ওরা দুধ-ছাড়া গরুটাকে কসায়ের হাতে তুলে, তিনি বাধা দিতে যাবেন না।

কিন্তু কার হাতে এ দায়িত্ব তুলে দিয়ে শাস্তিতে সরে পড়বেন তিনি।

কার হাতে ?

ঘরের ভেতরটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল। জানলার কাঁচে লাল আলো এসে পড়ল। হালদার মশায় কাঁচ কথানা গুণে ফেললেন। গুণতে পেরে বেশ একটু নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। রোজই হন, কাঁচ কথানা গুণতে পারার মানে হল, চোখের দৃষ্টিটুকু যে এখনও তাঁকে ছেড়ে যায় নি তার প্রমাণ। অর্থাৎ এখনও তিনি ষোল আনা মরে যান নি। উঠতে পারেন না, নড়তে পারেন না আর সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত চোখে কিছু দেখতে পান না। কিন্তু ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখতে পান। অবশ্য বাইরে বেরিয়ে ইচ্ছামত কোনও কিছুই দেখে আসতে পারেন না। তা না হোক, তাতেও দুঃখ নেই। তবু ত আলোটুকু দেখতে পান। নিবিড় আঁধার এখনও গ্রাস করতে পারে নি তাঁকে। এই জগতের সঙ্গে এখনও ষোল আনা সম্বন্ধ চুকে যায় নি তাঁর। এ কি কম কথা নাকি।

আবার হিসেব করতে লাগলেন হালদার মশায়। একঘেয়ে হিসেব, কতটুকু তিনি হারিয়েছেন, কতটুকু তাঁর হাতে আছে এখনও। অনেক কিছু এখনও হাতে আছে, দিনের আলো চোখে দেখতে পাচ্ছেন। অর্থাৎ এখনও দিন রাত হচ্ছে তাঁর জীবনে। রাতের আঁধারে একলা ঘরে শুয়ে মনের স্রুখে অঝোরে কাঁদতে পারছেন। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে প্রাণখোলা হাসিও হাসতে পারেন তিনি এখনও। কিন্তু হাসবার মত একটা কিছু পেলে ত হাসবেন। হাসবার মত এখন আর কি ঘটতে পারে তাঁর জীবনে।

খুঁজতে গিয়ে চমকে উঠলেন হালদার মশায়। তাই ত, কাদবার মতই বা এখন এমন কি ঘটতে পারে তাঁর জীবনে !

কেন কাদতে যাবেন তিনি।

কি উপলক্ষ নিয়ে কাদবেন।

কৈদে কার মন গলাবেন ?

কার কাছে কাদবেন তাঁর কান্না ?

হঠাৎ হালদার মশায় ঘাড় ফিরিয়ে ডান দিকে চাইলেন। খাটেব ডান দিকটা খালি। বাঁ দিকে একেবারে কিনাবায় তিন স্তম্ভে আছেন। অনেক কাল এই জায়গায় শোন তিনি, আর তাঁর ডান দিকটা খালি পড়ে থাকে। আগে ঐ খালি জায়গাটায়, মানে দেওয়ালের দিকে তিনি শুতেন আব এখাবটায়, মানে এখন যেখানে তিনি স্তম্ভে আছেন, এই জায়গাটায় আর একজন শুত। কিন্তু সে অনেক কাল আগে।

ধীরে ধীরে হালদার মশায় সেই অনেক কাল আগের কালে ফিরে যেতে লাগলেন। পিছিয়ে গেলেন অনেকটা পিছুতে। হুলে গেলেন তাঁর পঙ্খ, বাবান্ন ঋধার দিনের আলো সব উবে গেল তাঁর মন থেকে। মায়েব পালা কার ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়বেন তিনি, সে প্রশ্নও ঘুলিয়ে গেল। হাসি কান্না স্থখ দুঃখের নাগাল ছাড়িয়ে ডুবে গেলেন হালদার মশায় বহুকাল আগে ফুরিয়ে যাওয়া একটা স্বপ্নের মধ্যে। অনেকদিন উৎকট বকম জেগে থাকার পর যেন তিনি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন হঠাৎ।

তিনি দেখতে লাগলেন—ইয়া চওড়া বুকেব ছাতি, ইয়া গৌফ আর ঘাড় পর্যন্ত লম্বা কৌকড়ানো চুল এক কংসারি হালদারকে। দেখলেন, আর একজনকে। নাকেব নথটি পর্যন্ত দেখতে পেলেন। তারপর স্তম্ভ দেখতে লাগলেন, সেই ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না।

তারপর স্তম্ভে লাগলেন। কংসারি হালদার স্তম্ভাসা করছেন গাঢ় স্বরে, “কাদছ কেন ?”

তার উত্তর আরও ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না।

“কি মুশকিল, কাদছ কেন মিছিমিছি ?”

উত্তর, আরও ফুলে ফুলে নিঃশব্দে কান্না।

নিজের চওড়া বুকের ওপর কংসারি হালদার চেপে ধরলেন তাকে, “ছিঃ, কাদতে নেই, কেন কাদছ শুধু শুধু ?”

উত্তর, কংসারি হালদারের চওড়া বুকে মুখ ঝুঁজে, কংসারি হালদারের বলিষ্ঠ

বাহুর বাঁধনের মধ্যে নিরাপদে নিৰ্ঝাটে আরও কান্না। যেন কান্দবার মত এতবড় আশ্রয় আর কোথাও নেই ছুনিয়ায়।

আর সেই কান্নার উত্তরে হঠাৎ কান্দতে শুরু করলেন হালদার মশায়! অনর্থক কান্না তিনি কান্দতে লাগলেন তার মাথাটার ওপর নিজের মুখখানা গুঁজে দিয়ে। সেই দুর্জয় কংসারি হালদার, যে একটা ক্ষেপা মোষকে দুহাত লম্বা একটা ডাঙা দিয়ে ঠেঙিয়ে মেরে এসেছিল ছুদিন আগে, সে অসহায় ভাবে একজনকে বৃকের সঙ্গে সবলে আঁকড়ে ধরে তার মাথাব ওপর সেই ভয়ানক গোঁফ সুন্দর মুখখানা গুঁজে দিয়ে কান্দতে আরম্ভ করল। যেন কান্দবার জন্তে সেই মাথাটার মত একান্ত নিরাপদ আশ্রয় আর কোথায় ছিল না ছুনিয়ায়। চলল কান্নার পালা দেওয়া আরামে। তারপর কঁদে সন্তুষ্ট হয়ে দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে হাসি। সে হাসিও নিরর্থক হাসি। বোধহয়, শুধু একটু লজ্জার খাদ থাকত সে হাসিতে। শুধু শুধু চোখের জলে দুজনে দুজনের বুক মাথা তেজানোর জন্তে লজ্জা। হাসির গমকে কাঁপতে থাকত কংসারি হালদাবের গোঁফ জোড়াটা, কাঁপতে থাকত সেই নখটি, নখের নিচের মুক্তাটি দুলতে থাকত।

খুঁট করে একটু শব্দ হল।

ঘরে ঢুকলেন হালদার মশায়ের বড় ছেলে। ঢুকে তিনি প্রথমে জানালাগুলো খুলতে লাগলেন।

হালদার মশায় একটি নিঃশ্বাস ফেলে আবার চোখ চাইলেন। নাঃ, সত্যিই আর কান্দবার মত কোথাও একটু আশ্রয় নেই তাঁব। কার কাছে কান্দবেন তিনি তাঁর কান্না? কঁদে কার কান্না থামাবেন এখন? কান্নাব শেষে কার সঙ্গে মন মিলিয়ে হাসবেন?

বড় ছেলে ত্রিপুরারি হালদার জানালাগুলো খুলে দিয়ে বাপেব প্রস্তাব-পাত্রটা খাটের পাশে টুলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেজ ছেলে তারকারি ঘরে ঢুকল, এক বালতি জল আর একখানা সাদা গামলা নিয়ে। কংসারি হালদার মশায় চূপ করে দেখতে লাগলেন তাঁর দুই ছেলেকে। বহুদিন পরে এই কয়েকটা দিন তিনি বেশ ভাল করে আর অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন তাঁর দুই ছেলেকে। সত্যিই ওরা এতবড় হয়ে উঠেছে এ তিনি এতদিন সত্যিই খেয়াল করেন নি। রোজই প্রায় এক আধবার দেখতে পেতেন তিনি ছেলেদের। রোজ সকালে যখন ওরা দাড়ি কামাত, ছুটোছুটি করে সাজ-পোশাক পরত বা অফিস বেরিয়ে যেত, এই সব সময়ে তিনি হয়ত এক পলক দেখতে পেলেন কাউকে।

সন্ধ্যার পর ওরা যখন ফিরত বাড়ীতে, তখন ত তিনি থাকতেন তাঁর নিজের ঘরে বন্দী হয়ে ; তখন তাঁর দুই চোখে আঁধার ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না তিনি । কংসারি হালদার মশায় সত্যিই বেশ ঘাবড়ে গেলেন । এঃ, ছেলে দুটোও যে তাঁর বুডো হয়ে গেছে । এরা তাঁর সেই ছেলে দুটো, যারা এই বিছানায়, তাঁর পাশে শুয়ে জড়াজাড় কবে ঘুমত ! এই ভাবিক্তি চালের ভঙ্গলোক দুজন হল পু আর তারু । নি আশ্চর্য ।

মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছেন শ্রীতারকারি হালদার, মাননীয় সরকার বাহাদুরের একজন উচ্চদেব হিমাব-পরীক্ষক । তাঁর গলায় বুলছে একগোছা সাদা পৈতে, যে ধুতিখানা পবে যাচ্ছেন তার কঁচাটা খুলে বেশ কবে ভুঁড়িটা বেঁধে নিয়েছেন । দাঁত মাজাব শুঁড়ো নিজের হাতে টেলে বাপের আঙুলটা নাতে লাগিয়ে দিলেন । কংসারি হালদার মশায় সেই আঙুল নিজের মুখে পুরে অনর্থক মাড়িতে একবার বুললেন । তখন কাঁচের বাটিতে করে বাপের মুখের মধ্যে একটু একটু জল দিতে লাগলেন শ্রীতারকারি হালদার । আর সেই জল কুলকুচো কবে ফেলবার জন্তে আর একটা পাত্র এগিয়ে ধবতে লাগলেন মুখের কাছে । খুব সাবধানে খুব সম্ভর্ণে সব কাজ চলতে লাগল । ইতিমধ্যে বড ছেলে ফিবে এলেন আবার । সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর মান হয়ে গেছে, মাথার সামনের টাকটা ভাল কবে মোছারও সময় পান নি । স্নান কবে একখানা গবদ পরে কাঁধে ভিজে গামছা নিয়ে আর বাপের কাপড় হাতে করে ছুটে এসেছেন । তারপর দু ভায়ে বাপের কাপড় বদলানোর বিছানা ঠিক কবে দিলেন একজন চাকর এনে ঘব মুছে বাসন্তি গামলা ছাড়া-কাপড় সব বাব কবে নিয়ে গেল । সব কাজ নিঃশব্দে চলতে লাগল । অবশেষে ঘবের কোণের এক কুলঙ্গি থেকে ছোট্ট একটি তামার কমণ্ডলু এনে বড ছেলে এক ছিটে জল দিলেন বাপের হাতে । হালদার মশায় আঙুলে পৈতে জড়িয়ে পকেস পপব হাত রেখে চোখ বুজলেন ।

সেই ফাঁকে দুই ভাইয়েব চোখে চোখে কি কথা হয়ে গেল । দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে ঘাড় নাডলেন । হালদার মশায়ের জপ শেষ হল, তিনি দুহাত জোড করে কপালে ঠেকালেন ।

তখন ছোট ছেলে তারকারি একটা ঢৌক গিলে বললেন, “আজ আমাদের পালা বাবা ।”

কংসারি হালদার একটু যেন চমকে উঠলেন । তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন কড়িকাঠের দিকে । শেষে তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠল, তিনি কিছু বলছেন কি না তা শোনবার জন্তে দুই ভাই খুঁবে পড়লেন তাঁর বিছানার ওপর । শোনা

গেল হালদার মশায় বললেন, “তোমার ভায়ে চাচা আছে, নিয়ে লোহার সিন্দুকটা খোল। তোমাদের মায়ের দু একখানা গয়না এখনও আছে। নিয়ে বেচে পালার টাকাটা দিয়ে দাওগে।”

বড় ছেলে জিপুরারি বললেন, “টাকা কাল সকালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে বাবা।”

এবার হালদার মশায় সত্যিই বেশ চমকে উঠলেন, “হয়ে গেছে! কে দিলে?”

“এ ত আমাদের পালা বাবা, আমরাই দিয়েছি।” ছোট ছেলে বললেন।

“তোমরা দিয়েছ! মানে তোমরা পালা চালাবে?” হালদার মশায় যেন আতকে উঠলেন।

বড় ছেলে, যেমন স্বরে শিশুকে সাহুনা দেয়, সেই স্বরে বললেন, “আমাদের পালা আমরা চালাব না ত কে চালাবে বাবা? আমি ত চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। এখন ছ’ মাস ছুটির জন্তে দরখাস্ত করেছি। ছুটি ফুরলে আর কাজে যোগ দেব না। বছর পাঁচেক পরে তারকও বেরিয়ে আসবে। বাস, তখন আর ভাবনা কি।”

ছোট ছেলে বললেন, “দাদা যাচ্ছে মায়ের বাড়ী এখনই, কি করতে হবে বলে দাও ওকে বাবা।”

হালদার মশায় বলবেন কি, দম বন্ধ করে তিনি চেয়ে রইলেন তুই ছেলের মুখের দিকে। কোথায় গেল সেই কোট-প্যান্ট-আঁটা সাহেব তুমি! জলজ্যান্ত ছোটো হালদারই ত দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে।

বেশ কিছুক্ষণ লাগল এ ধাক্কা সামলাতে তাঁর। তারপর প্রথম যে কথা তাঁর মুখ থেকে বেরল তা আরও আশ্চর্য ব্যাপার।

“তবু যাচ্ছিস মায়ের বাড়ী! পালা করতে যাচ্ছিস? উপোস করে থাকতে হবে যে রে সেই রাত এগারোটা পর্যন্ত। চা না খেয়ে তুই থাকবি কি করে?”

হা হা করে হেসে উঠল তুই ছেলেই। তপু মানে জিপুরারি হালদার ছোট ছেলের আবদারে গলায় বললেন, “বাবা মনে করে, আমরা এখনও সেই তপু আর তাকুই আছি। উপোস ত করতেই হবে বাবা, তোমার বোঁমায়েরাও সব উপোস করে থাকবে। আজ প্রথম দিন পালা করতে যাচ্ছি বাবা, কি কি করতে হবে বলে দাও। বজ্র দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি চলে যাই।”

হালদার মশাই আরও কিছুক্ষণ রইলেন চুপ করে। তারপর আন্তে আন্তে বললেন, “বা। মায়ের পালা মা নিজেই করে নেয় রে পাগল। আমাদের আর করবার কি আছে। শুটচাক্কি মশায়ের বাড়ীতে ভোগ নৈবিদ্য যেন ঠিক পৌঁছ

আর কাঙালীদের খাওয়াবার সময় যেন কেউ গালমন্দ না দেয়, এইটুকু শুধু নজর রাখিস ।”

মায়ের পালা মা নিজেই করে নেয় ।

কংসারি হালদার ফলেব রস খেয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে মনে মনে আওড়াতে লাগলেন ঐ কথাটি—মায়ের পালা মা নিজেই করে নেয় ।

বহুবায় বহুজনের মুখ থেকে শোনা বহু পুরনো কথাটা অনেকবার আওড়ালেন তিনি মনে মনে । আর জ্বলতে লাগল তাঁর বৃকের ভেতরটা । একটা মোক্ষম সংবাদ শোনার জন্তে তাঁর চোখ কান মন সব উন্মুখ হয়ে রইল ।

একটু পরেই মায়ের মল্লিরের কাজ সেবে ভটচাজ্জি মশায় আসবেন এ বাড়ীতে । তেতলায় উঠে লক্ষ্মীনারায়ণেব নিত্যসেবা কববেন । আর তখনই জানাজানি হবে ব্যাপারটা । তারপর এই সংসাবে কি ঘটবে আর কি ঘটবে না তা একমাত্র ঐ মা-কালীই জানেন ।

কংসারি হালদার মশায় ঘামতে লাগলেন । এগিয়ে আসছে সেই মোক্ষম কণ্ঠটি । ঐ মায়ের বাড়ীতে ঢাক বেজে উঠল । প্রথম বলি হয়ে গেল । মায়ের নিত্যপুজোও শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে । এলেন বলে ভটচাজ্জি মশায় খড়ম খট খট করে ।

সত্যিই তিনি খড়মেব শব্দ শুনতে পেলেন সিঁড়িতে । হালদার মশায় দুই চোখ যতটা সম্ভব মেলে চেয়ে বইলেন দবজার দিকে ।

আজকাল ভটচাজ্জি আগে তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে দেখে, তারপর তেতলায় যায় । খড়মের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল তাঁর ঘরের দিকেই ।

মুহূর্তের মধ্যে হালদার মশায় মতলব ঠিক করে ফেললেন ।

ঘরে ঢুকলেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য মশায় ।

“কেমন আছ আজ কাঁসারী ?” কংসারি হালদারকে হ ‘ নাম ধরে ডাকতেন তাঁরা কাঁসারীই বলতেন ।

“ভাল, সরে এস ভটচাষ, একটা কথা বলি তোমাকে ।” চাপা গলায় বললেন হালদার মশায় ।

“ত্রিপুরারি গেছে মাথের বাড়ীতে । কি মানান মানিয়েছে যদি দেখতে কাঁসারী । গরদ-পর্য ধবধব করছে বর্ণ, আমি কপালে বেশ করে লেপে দিয়েছি মায়ের কপালের সিঁদুর, দাঁড়িয়েছে তোমার ছেলে মায়ের দরজায় । আঃ, কি মানান মানিয়েছে । যদি দেখতে কাঁসারী চোখ জুড়িয়ে যেত তোমার । ছেলে-ভাগ্য করেছিলে বটে তুমি ।” ভটচাষ মশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ।

কংসারি হালদার ফিসফিস করে বললেন, “কিন্তু ভটচায়, মায়ের যন্ত্রটা বোধহয় ওপরে গিয়ে আর দেখতে পাবে না তুমি।”

“এ্যা! কি বললে! কেন!” চোখ কপালে উঠল ভটচায়ের।

চোখ বুজে বেশ ধীরে ধীরে আউড়ে গেলেন কংসারি হালদার, মা আমার স্বপ্নে কাল বলে গেল ভটচায় যে—“খামলেন হালদার মশায়।

“কি বলে গেল তোমায় মা?” প্রায় ধমকের মত শোনাল ভটচাজ্জি মশায়ের স্বর, “কি তোমায় বলে গেল আবার স্বপ্নে?”

আরও আস্তে আস্তে কোনও রকমে হালদার মশায় বললেন, “আমি চললুম এ বাড়ী থেকে।”

“এ্যা—”মিনিট খানেক চেয়ে রইলেন ভটচায় মশায় হালদার মশায়েব মথের দিকে। তারপর খডম ফেলে রেখে শুধু পায়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। তেতলার ঠাকুর ঘরের দরজার শিকল পড়ল আছড়ে। আগুয়াজটা চেনন হালদার মশায়। তিনি শুধু ঘামতে লাগলেন শুয়ে শুয়ে।

আর ঠিক তখন অঝোরে চোখের জল ঝরে পড়ছে একখানি ছোট্ট পাথবেব ওপর ফিনকির মায়ের দুই চোখ থেকে। হতভম্ব ছেলেমেয়ে ফণা আর ফিনকি চেয়ে আছে হাঁ করে মায়ের দিকে। পরপর কবে কাঁপছেন তাদের মা। মাধো-অঙ্ককার সেই টিনের খুপরি দরজার সামনে দুহাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফণা ফিনকির মা। তাঁর জোড়হাতে একখানি নীল রঙের চৌকো পাথব। পাথব-খানি ইঞ্চিদেডেক লম্বা চওড়া, বোধ হয় আধ-ইঞ্চিটাক পুরু। ওপবটা চুড়োর মত। বেশ নজর দিয়ে দেখলে দেখা যায়, ঘোর অঙ্ককারের মধ্যে আগুন জ্বললে যেমন দেখায়, তেমনি একটু আলো ফুটে বেরচ্ছে পাথরের ভেতর থেকে।

অনেকটা সময় লাগল মায়ের সামলাতে। তারপর তিনি চুপি চুপি কোনও রকমে জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় পেলি এটা তুই ফিনকি? কোথায় পেলি এ জিনিস? ঠিক করে বল মা, ঠিক করে বল।”

বলবে কি ফিনকি, গলা দিয়ে স্বর বেরুলে ত বলবে। মায়ের অবস্থা দেখে তার চোখ কপালে ওঠার যোগাড় তখন। কে জানত যে ঐ পাথরের টুকরোটা মায়ের হাতে দিলে মায়ের এ রকম মরোমরো অবস্থা হবে!

আগের দিন সন্ধ্যাবেলা কাগজে মোড়া শক্ত মত জিনিষটা যখন সে ছোঁড়া তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাঁ করে সরে পড়ল, তখন কি সে জানত যে কি অলঙ্কারে জিনিস

সে পেটের কাছে গুঁজে বাড়ী নিয়ে আসছে। তারপর রাতে আর কাগজ খুলে জিনিসটা দেখার ফুরসতই পেলে না ফিনকি, খাওয়া দাওয়ার পরে আলো নিভিয়ে দিলে মা। সকালে উঠে যখন মনে পড়ে গেল ফিনকি, তখন কাগজ খুলে দেখে ঐ পাথরের টুকরোটা। পাথরের টুকরো না পাথরের টুকরো, তবে দেখতে বেশ। ফিনকি ওখানাকে তুলে রেখে দিয়েছিল বাসনের চৌকির কোণে। ভেবেছিল, ঘর মুছে বাসন মেজে কাপড় ছেড়ে এসে ওখানা সপিয়ে রাখবে। কোথাও, কোনও বাক্সের ভেতরে ফেল রাখবে। মা যে ওর মধ্যে ওখানা দেখে ফেলবেন আর দেখেই অমন ভাবে চিৎকার করে উঠে কঁাদতে লাগবেন, এ নি কবে জানবে ফিনকি।

“এটা এখানে কে রাখাল,” বলে মা চোঁচিয়ে উঠলেন।

ফিনকি বলল- “মামি, ঘর ঝাঁট দিতে দিতে পেলাম ঐ কোণায়।”

‘কোন কোণে ছিল বে? কোন কোণে?’

বাস, একেবারে পাগলের মত মা চুকতে লাগলেন পাথরখানা তার কপালে। তারপর নিঃশব্দে কঁাদতে লাগলেন পাথরখানার দিকে চেয়ে। ব্যাপার দেখে ছেলেমেয়ে থ’ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার দিকে গর্হিত।

শাস ফণা বলল মত কথা খুঁজে পেলে এবটা। হা • পাতলে মাঘের সামনে।

“দাদু ত মা— দেখি কি ওটা।”

মা • ব জোড়হা • বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে লুকিয়ে ফেললেন পাথরখানা। যেন এখুনি ছোপ কেঁড়ে নেবে তার হা • থেকে। সভয়ে বললেন, “ছুঁবি কিনে। এ জিনিস ি ছোষা যায় যখন •খন। যা, নেয়ে আষ চট করে, এবপর তোর হাতে এটা সপে দেব আমি, যা।”

ব্যাপার াব বুকে • না পেলে েয়া আসতে ছুট- গা বালি • নিয়ে বাস্তার কলে। আডে • যেতে দেরি হবে তাব। হোক, •বু সে • থ যাবে জিনিসটা কি।

•খন ফিনকি ব ছাঁশ হল। বাঃ, মৎকাব ব্যবস্থা ততে চলল ত। জিনিসটা ঘাই হোক, কিন্তু পেয়েছে সে। দাদার হাতে সঁপে দেবার মানে?

ফুঁসে উঠল ফিনকি।

“দাদু ত মা, দেখি, কি ওটা।”

মা রেগে গেলেন।

‘তুই ছুঁবি এটা। তোর ছুঁতে আছে এ জিনিস? জানিস তুই, কি জিনিস এ?’

ফিনকিও রেগে গেল। প্রাষ টে য উঠল সে, “জানবার মদরকাব নেই

আমার। আমি ওটা পেয়েছি, ওটা আমার জিনিস, দাও আমার।”

মাও চোঁচিয়ে উঠলেন, “কি বললি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোর জিনিস এটা। তুই পেয়েছিস বলে তোর হাতে দিতে হবে?”

হঠাৎ যে কি হল ফিনকির, বাঁপিয়ে পড়ল সে মায়ের গারে। দাঁতে দাঁপ চেপে গর্জে উঠল, “দেবে না তুমি? আমার জিনিস, আমি পেয়েছি, দেবে না আমার?”

অতি অল্প সময় সামান্য ছোটোপটি হল মায়ে ঝিয়ে। হঠাৎ ফিনকি দরজা টপকে বারান্দা ডিঙিয়ে আছড়ে পড়ল উঠোনে। চোখে অন্ধকার দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে বসে কপালে হাত দিয়ে দেখল হাতটা চটচট করছে। হাতখানা নামিয়ে মেলে ধরল চোখের সামনে, টকটক করছে লাল। আন্তে আন্তে উঠে দাঁড়াল। চেয়ে দেখল ঘরের দিকে, মা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার চৌকাট ধবে, তাঁর দুই চোখে আগুন জ্বলছে।

ফিনকির গলা থেকে বেরোল একটা অশ্লষ্ট গর্জন, “আচ্ছা”।

তাবপর সে আঁচলটা কপালে চেপে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

এ গলি ও গলি সে গলি দিয়ে ছুটতে লাগল ফিনকি। শেষ বেরিয়ে এল রাস্তায়। গলির মধ্যে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তবু একটু আঁড়াল ছিল। গলি হল অন্ধ, কিন্তু রাস্তার সহস্র চোখ। গলিতে ছুটে চলা সম্ভব, কিছু রাস্তায় সহস্র চোখের চাউনিকে অবহেলা করে ছোটা কিছুতেই সম্ভব নয়। গলির ভেতর ঠেলে ঝুঁতিয়ে পথ করে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু রাস্তার বৃকে নিজের পথ নিজে করে না নিলে কোথাও পৌঁছন সম্ভব নয়।

ছোটা বন্ধ করে হনহন করে হাঁটতে লাগল ফিনকি। চেয়েও দেখল না মায়ের রাড়ীর দিকে। কোথায় যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, এসব চিন্তা একটি বারের জন্তেও মনের কোণে উদয় হল না তার। বাঁ হাতে আঁচলের খুঁট চেপে আছে কপালে। ডান হাত দিয়ে মাঝে মাঝে চোখের ওপর থেকে চুলগুলো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। পা কিন্তু থামাচ্ছে না কিছুইতেই। ফিনকি হাঁটছে।

রাস্তা, কালীঘাটের কালীবাড়ী যাবার-পথ। দম্ভরমত তীর্থপথ। যে তীর্থ-পথের প্রতিটি ধূলিকণাই অতি পবিত্র। কিন্তু ধূলিকণার সাক্ষাৎ মেলে না কালী-তীর্থ পথে। পায়েয় নিচে যা লাগে তা হল কালো কাদা। সিমেন্ট পাথর পিচ দিয়ে বাঁধানো রাস্তার বৃকে মাটি নেই। যা আছে তার নাম পথের কালি। পেছল প্যাচপ্যাচে কালীবাড়ীর পথে পথের কালি গায়ে মুখে সর্বান্নে না মেখে কার সাধ্য এগোয়। ৬রোজ জল দিয়ে ছবেলা ধোয়া হয় সে পথ, কাজেই ধুলো থাকবে

কি করে সে পথে। ধুলো না থাকলেও, গড়াগড়ি খাওয়াটা আটকায় না। একটু অসাবধান হলেই পতন। ষাঁড় গরু ছাগল কুকুর সাধু ফকির চোর গাঁটকাটা ফেরিওয়ালা ডালাধরা ঘাটর বামুন কুঠে ভিথিরী খদ্দের-ধরা মেয়েমানুষ আর গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝি গিজগিজ করছে সেই তীর্থ পথে। তার মধ্যে একটু অগ্ন্যম্নস্ব যে হচ্ছে তার আর পরিজ্ঞান থাকছে না। তীর্থপথের কালো পিচের ওপর পবিত্র ধুলো-গোলা কালো কালিতে গড়াগড়ি দিয়ে উঠতে হচ্ছে।

ফিনকিও পরিজ্ঞান পেল না।

একটি ষাঁড় একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমনো অভ্যাস করেছিল। রোজই বেচারা বেলা বারটার আগে উঠতে পারে না শয়্যা ছেড়ে। পার্কের গায়ের ফুটপাথে আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে সে নাক ডাকাচ্ছিল। তার সঙ্গিনী দাঁড়িয়ে ছিল তার পাশেই। সে বেচারা বোধ হয় স্মৃতিকায় ভুগছে, অনবরত তার পেছনের পা আর লেজ বেয়ে পাতলা ময়লা গড়িয়ে নামছিল। ফলে ফুটপাথের সেই জায়গাটার এমন পিচ্ছিল হয়েছিল যে ইহুরের পা পড়লেও হডকাবে। ষাঁড়ের এপাশ ওপাশ পার্কের রেলিঙ ঘেঁষে ঘর কল্লা সাজিয়ে বসেছিল কয়েকটি কুঠে পরিবার। তাদের হেলে-পিলেদের পাছে মাড়াতে হয় এই ভয়ে সকলে ফুটপাথের কিনারাটুকুই ব্যবহার করত। কিন্তু সেই হাতখানেক জায়গাতেও ষাঁড়ের সঙ্গিনীর স্মৃতিকা রোগের ফল ফলেছে। যেই সেখানে পা পড়া অমনি ঠিকরে ফিনকি ফুটপাথের ধারের নর্দমার ওধারে এক গাদা কাটা কাপড়ের ওপর। ফুটপাথে স্থান না পেয়ে রাজ্যের জিনিসপত্র সাজিয়ে বসেছে ব্যবসাদাররা রাস্তায়। ছোট ছোট খেলনা, বাসন ছুরি কাঁচি, গামলা, গামছা, মোটর টায়ারের শ্রাঙেল, কাটা কাপড়, সব রকমের মাল ঢেলেছে ফুটপাথের ধারে রাস্তায়। ফিনকির কপাল ভাল যে সে পড়ল কাটা কাপড়ের গাদায়। ছুরি কাঁচি বাসন কোসনের ওপর পড়লে আর একবার রক্ত ছুটত তার কপাল থেকে।

তেলে বেগুনে তিডবিড়িয়ে উঠল কাপড়ওয়ালা। সে বেচারা সব এসেছে চিতোরগড় থেকে। বড়বাজারের দোকানে দোকানে ঘুরে নানা রঙের টুকরো ছিট যোগাড় করেছে। মনে তার আশুন জ্বলছে, বড়বাজার ঘুরে জাত ভাইয়েদের সাত আটতলা বাড়ী আর গদি দেখে তার রক্তে তোলপাড় লেগে গেছে। টুকরো বেচার অবসান হবে খান খান কাপড় বেচার, তারপর গিয়ে পৌঁছবে গাঁট বেচা পর্যন্ত। শেষে একেবারে খুলে বসবে কাপড়ের মাল একটা, এই হল তার স্বপ্ন। সে স্বপ্ন এ ভাবে ভেঙে যাবে শুকতেই, কোথাকার একটা কে আছড়ে এসে পড়বে তার টুকরোর ওপর, এ সে সহ্য করে কেন। হাতে ছিল এক পঞ্জি একখানা

লোহার শিক, আতকে উঠে সে শিকখানা উচিয়ে ধরল ওপর দিকে। বাস—হা হা হা করে ঝাঁপিরে পড়ল বাস্তবস্থান মানুষ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কিল চড়ে খেঁতো হয়ে গেল চিতোরগড়ের বীর। ছিটের টুকবোগুলো উধাও হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। লোহার শিকের বাড়ী মেরে মেয়েছেলের মাথা ফাটনো, একে-বাবে রক্ত বার কবা—এ ত যা তা কাণ্ড নয়। বারোয়ারি মার ধাক্কাব চোটে এক মুহূর্ত সে তিষ্ঠতে পারল না। ছিটের টুকবো, ছিট মাপবাব লোহার শিক সব ফেলে সে ছুটতে লাগল। তাতেও কি নিস্তার আছে, কালীঘাটের ত্রিশাশা ছাড়াবার জন্তে এক দল মানুষ ছুটতে লাগল তাব পেছনে।

ইতিমধ্যে ফিনকি পৌঁছে গেল হাত কয়েক দূরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভেতর। চোখ চাইবার আগেই কাবা তাকে তুলে ফেললে কাপড়ের গাদা থেকে, হাঁ করবার আগেই সে বুঝতে পারলে যে তাব মাথা কপাল পেঁচিয়ে বাঁধা আরম্ভ হয়ে গেছে। ছাড়া পেয়ে সে দেখল যে যাবা তাকে ডাক্তারখানায় পৌঁছে দিয়ে গেল তাদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। স্মরণ কি আব কববে ফিনকি তখন, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথা নিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল আবার কুটপাথে। পাশেই একটা পান বিড়ি দোকান, দোকানেব আশনায় ফিনকি দেখতে পেলে নিজেব ছায়া। একটু এগিয়ে গিয়ে ভাল করে সে দেখে নিলে নিজেকে। বাঃ—একেবাবে চেনাই যাচ্ছে না তাকে। কান মাথা ফর্সা কাপড় দিয়ে পেঁচানো ঐ মেয়েচাচ যে ফিনকি, তা সে নিজেই সহজে বিশ্বাস করতে পারল না।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল ফিনকি। সহজে কেউ আব তাকে চিনতে পারবে না ভেবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। কিন্তু কাপড়ময় কাদা আব বক্তের দাগ। কাপড়-খানার সঙ্গে মাথাব ফর্সা ব্যাণ্ডেজটা একেবারে বেমানান দেখাচ্ছে। তা আর করবে কি ফিনকি, ফর্সা কাপড় এখন জুটছে কোথা থেকে। ফিনকি হিসেব করে দেখলে যে, এখনও তিনখানা কাপড় তার বয়েছে বাক্সে। তাব মধ্যে একখানা একটু ছেঁড়া। কিন্তু পবা চলত আরও অনেক দিন। যাক্ গে চুলোয় সে সব কাপড়চোপড়, যার ইচ্ছে পকক এখন তার জামাকাপড়। ফিনকি আব ওমুখো হচ্ছে না।

উত্তরমুখো এগিয়ে চলল সে। আবার না আছাড় খায় এই ভয়ে সাবধানে হাঁশ রেখে লোকের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল। চেনা লোকের সামনে পড়বার ভয় নেই আর, পড়লেও কেউ চিনতে পারবে না তাকে! কান মাথা ভুল পযন্ত এমন ভাবে ঢাকা পড়েছে যে ফিনকি নিজেই নিজেকে চিনতে পারছে না পান বিড়ির দোকানগুলোর আশনায়। কিন্তু কানে যেন কম শুনছে সে, আর তেঁটো পেয়েছে

ভেমনি । আঙুল দিয়ে ঠেলে ঠেলে কানের ওপর থেকে কাপড়টা খানিক ওপরে তুলল । এবার বেশ শুনতে পাচ্ছে সব । কিন্তু তেঁটা পেয়েছে তার খুবই, একটা কল পেলে এক পেট জল খেয়ে নিতে পারত । নজর রেখে চলতে লাগল ফিনকি, একটা কল দেখতে পেলে হয় ।

বাজার ছাড়িয়ে গেল ফিনকি । বাজারের সামনে বাস্তাব ওপর পৌঁছে কমলা কলা সাজানো দোকানগুলোর সামনে দিঘে এগিয়ে গেল সে । কমলা দেখে মনে হল তার অনেক কষ্টে জমানো পয়সাগুলোর কথা । বত জমছে কে জানে, দু তিন টাকাও হতে পারে হয়ত । চাব পয়সা দিঘে ছেঁদা করা এতটা মাটিব লক্ষ্মীর ঝাঁপি কিনে সেই ছেঁদার মুখে যখন যা পেরেছে ফেলেছে ফিনকি । অনেক দিন ধরে ফেলছে, সেই স্নানযাত্রার দিন থেকে । চার পাঁচ টাকাও খাবতে পাবে । যদি দু আনা পয়সাও থাকত এখন কাছে, ফিনকি একটা কমলা কিনে খেত । এখন সেটা ভেঙে পয়সাগুলো নিয়ে দাদা বেস খেলবে । খেলুক গে, গোলায় যাক সে পয়সা, ফিনকি আর ওমুখো হচ্ছে না ।

কিন্তু জল কোথায় ।

কলও কি নেই নাকি এখানে ?

আব কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকেই একটু গলি ভেতর একটা কল দেখতে পেল ফিনকি । অনেকগুলো বালিও ঘড়া জমে রয়েছে সেখানে, নানা রঙের কাপড় পরে অনেকগুলো মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে । থাকুক গে, কাবও দিকে না চেয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে । সত্যিই কাব ছাতি ফাটছে তখন তেঁটায়— একটা ঘড়া বসানো ছিল কনের মুখে, ঘড়াটা ভাঙি হতে সে আর এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, “আমি একটু জল খাব ।”

ভ্যানন মোটা ভয়ঙ্কর কালো একটা মেয়েমানুষ কোন একখানা আর গায়ে একখানা গামছা জড়িয়ে ঘড়াটা তুলে নিচ্ছিল । হঠাৎ এ বারে ওঁড়ে কামড়াতে এল সে ।

“আহা হা, কোথা থেকে মবতে এল যে ঘেঘো কুড়িটা, জল খাবাব আর ঠাই দেলে না কোথাও । উনি এখন এঁটো করে যান কলওলাটা, আবাব আমি ছিটি ধুয়ে মরি আর কি ।”

পেছন থেকে কে বলে উঠল, “আহা দাও না গো একটু জল খেতে মাসী, দেখছ না মাথা ফাটিয়ে এসেছে ।”

আর যাবে কোথা, একেবারে তুলব গাম কাণ্ড বেধে গেল । মাসী গায়ের গামছাখানা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে এল ইঁ করে ।

“তবে ব্যা হারামজাদা, আমি কলে এলেই যত ধম্মজ্ঞান তোদের চাগিয়ে
শুঠে—”

হারামজাদারীও ছেড়ে কথা কবার পাত্রী নয় কেউ। চক্ষের নিমেষে এমন
কাণ্ড বেধে গেল যে ফিনকিকে জল তেঙা ভুলে পিছিয়ে যেতে হল কয়েক পা।
কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে, গলির মুখের একটা চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে
এল একজন লোক। লোকটা যেমন জোয়ান তেমন তার চোখছুটো আর গৌফ
জোড়াটা। পরে আছে একটা রঙচঙে লুঙ্গি আর একটা ফতুয়া। লুঙ্গিটা
শুটতে শুটতে এগিয়ে গেল সে কলের দিকে। গিয়েই সর্বপ্রথম লাথি মেরে মেরে
ঘড়া-বালতিগুলোকে ছিটকে ফেললে চতুর্দিকে। তারপর মার, এলোপাণ্ডি
চালাতে লাগল তার হাত দুখানা। মেয়েমানুষগুলো ছুটতে লাগল। চক্ষের
নিমেষে তারা অন্তর্ধান করলে দুদিকের খোলার বাড়ীর ভেতর। মোটা মেয়ে-
মানুষটা ছুটতে পারল না। পেছন থেকে তার চুল ধরে ফেলল সেই লোকটা।
চুল ধবেই মাঝ, সে কি কিলের আগুয়াজ। কিলের আগুয়াজ ছাপিয়ে পরিত্রাহি
চিংকাব কবতে লাগল মেয়েমানুষটা। গামছা দুখানা খসে পড়ে গেল তার গা
থেকে। ধপাস করে সে নিজে পড়ে গেল মাটিতে। তাতেও রেহাই নেই, তখন
আরম্ভ হল লাথি। গোটা কতক লাথি মেরে তাকে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে এল সেই
লোকটা ফিনকির দিকে।

ভ্যাক কবে কেঁদে ফেলল ফিনকি।

এই সর্বপ্রথম লোকটা কথা বললে। ভয়ঙ্কর গলায় জিজ্ঞাসা করলে, “কে রে
তুই? এলি কোথা থেকে মরতে এখানে?”

জবাব দেবে কে? ফিনকির প্রাণ উড়ে গেছে তার চোখের দিকে তাকিয়ে।
মুখে ঝাঁচল পুরে সে কারা চাপতে গিয়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

লোকটা একটুখানি চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর ঘুবে দাঁড়িয়ে হাঁকার
দিয়ে উঠল, “এবে এ বেটা, এ শালু দেশো, ইখার আয় বে।”

চায়ের দোকান থেকে জন চার পাঁচ মানুষ বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ফিনকির চার
পাশে।

“চিনিস নাকি বে এটাকে?” জিজ্ঞাসা করলে সেই যমের মত লোকটা।

কেউই চেনে না, সবিনয়ে তা নিবেদন করলে তারা।

তখন পেছন থেকে শোনা গেল মেয়েমানুষের গলা। কে বললে, “ও কলে
জল খেতে এসেছিল ষোড়াদা, বেড়া মাসী মুখ করে উঠল।”

“জল খেতে এল এই কলে! এই কলের জল মানুষ খায় নাকি? যত শালী

পচা শকুন জল খায় যে কলে সে কলে ও জল খেতে এল কেন ?”

ক্রমে চড়তে লাগল ঘোড়াদার গলা। টু শব্দটি নেই আর কোথাও।

“আচ্ছা ঠিক আছে। চল বেটি আমার সঙ্গে, জল খাওয়াব আমি তোকে—” বলেই টপ করে তুলে নিলে ফিনকিকে ঘোড়াদা। নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল সেই গলি থেকে। তাব হাতের ওপর কাঠ হয়ে বটল ফিনকি, এতটুকু নড়াচড়া করারও সাহস হল না তাব।

ঘোড়া পৌঁছল তাব আস্তাবলে ফিনকিকে নিয়ে। কোথা দিখে কোন পথে কতক্ষণ ধরে এল ফিনকি তাব হিসেব বাখতে পাবে নি। একরকম দম বন্ধ করেই ছিল সে ঘোড়ার হাতের ওপর। নামিয়ে যখন দেওয়া হল তাকে তখন সে দেখল একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের ওধাবে বসে আছেন একজন ভদ্রলোক, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিনকি বুক খালি করে নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণে এমন একজন মানুষের সামনে সে পৌঁছল যাব চোখের দিকে চাইলে বুকের বক্ত হিম হয়ে যায় না। সোনার ফ্রেমের চশমাব ভেতব দিখে বেশ কিছুক্ষণ তিনি তাকিয়ে বইলেন ফিনকির দিকে। তাবপব ঘোড়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, “কি গো পালোয়ানজী, এর মাথাটা ফাটল কি করে ?”

“কি করে জানব সে খবর বড়দা। সত্যপীত তশাব কলে গিয়েছিল জল খেতে এ, বেঙ' বাডীউলী তেডে কামডাতে যাব এতটুকু মেয়েটাকে। তখন লাগে চুলো-চুলি অগ্নি মাগীগুলোর সঙ্গে বেঙা বাডীউলীব। গোলমাল শুনে আমি গিয়ে মেয়েটাকে ছো মেবে তুলে নিয়ে এলাম।” নরম স্ববে জবাব দিলে পালোয়ানজী।

“আর সেই সঙ্গে তাদের ঠেঙিয়ে একটু হাতের স্থখ করে এলে, কি বল ?” বলে হো হো করে হাসতে লাগলেন সেই ভদ্রলোক। শশি শেষ হাল বললেন, “হাত তুমি তুলবেই যে কোনও ছুতোয়, একটা ভাল কা কবতে গিষেও কাউকে না কাউকে না মেবে থাকতে পার ন' তুমি। এ স্বলাবটা আর তোমার গেল না শশী। শরীয়ে শক্তি থাকলেই যদি মেবে বেডাতে হয় মানুষকে তবে না থাকাই বরং ভাল। তা যাক, বোস না শশী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।”

শশীর স্বব আরও নরম হয়ে গেল। বসল না সে, কতুয়ার ছুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুব মিনতি করে বললে, “না মেবে আমি থাকতে পারি না যে বড়দা। যত মনে করি আর ঠেঙাব না কাউকে, তত ছুনিয়ার ঝগাট যেন বোঁটিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শালা আমারই ঘাড়ে। যাক, যেত দাও বড়দা, এখন এ মেয়েটাকে নিয়ে কি করব বল। না জেনে খাস সত্যপীর তলার নরকে ঢুকে পড়েছিল একেবাবে,

ঠিক সময়ে আমার নজরে না পড়লে এতক্ষণে কোথায় যে পাচার হয়ে যেত, কার খপ্পরে যে গিয়ে পড়ত, তাই বা কে বলতে পারে। এখন একে নিয়ে কি করা যায় তাই বল।”

ভদ্রলোক তাঁর পাশ থেকে ফোনটা তুলে বললেন, “ব্যবস্থা যা করার করা যাচ্ছে। তুমি কিন্তু এবার তোমার ঐ হাতদুটো একটু সামলাও শশী।”

বাড়ী থেকে বেরোবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিনকির পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল। সত্যপীর তলার নামকরা মুরব্বী শশী গুণ্ডা গুরফে ঘোড়াশলী তাকে তুলে নিয়ে যার কাছে পৌঁছে দিল তিনি পাকা ব্যবস্থা করার জন্তে যাকে ফোন করতে গেলেন তাকে তখন না পেয়ে শশীকে বললেন, “এখন আর কাউকে ফোনে পাব না শশী। কোর্ট থেকে আবার আমি ফোন করব। এখন এ মেয়ে রইল আমাব এখানেই, দেখি কি করা যায় একে নিয়ে।”

আকর্ণ হাঁ করে কৃতার্থ শশী বললে, “বাস-বাস। খাসা ব্যবস্থা হল বউদা। আমার ত কোথাও চাল-চুলো নেই যে সেখানে নিয়ে যাব এটাফে। যে সব আড্ডা আছে আমার, সেখানে যত শালা ঘডেল হাঁ করে রয়েছে। যাক, দরকার পড়লে ঘোড়াশলীকে একটা ভাক দিও বউদা, আমি চলি এখন।” বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে শশীর বউদার পেছনের পর্দা ঠেলে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁর দিকে চেয়ে হাঁ করে রইল ফিনকি। তাবই মত বা তার চেয়ে মাথায় হয়ত একটু বডু হবেন তিনি, কিন্তু তিনি ছোট মেয়ে নন। দস্তরমত একজন গিল্লীবান্নী মানুষ। কপালে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা, টকটকে লাল পাড গরদ পরে আছেন। চোখে মুখে এতটুকু ছেলেমানুষি নেই।

ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, “আরে এ কে। মাথা ফাটল কি করে?”

বলতে বলতে টেবিলের পাশ দিয়ে এসে একেবারে মাথার ওপর হাত রাখলেন ফিনকির। মুখখানাকে একটু তুলে ধরে বললেন, “এ হে হে রক্ত গড়িয়ে শুথিয়ে রয়েছে যে নাকের ওপর পর্ষভ। এ রকম হল কি করে?”

শশীর বউদা বললেন, “যত পার প্রাঙ্গ করে যাও এক নিশ্বাসে। তারপর ওকে নিয়ে যাও বাড়ীর ভেতর, সারাদিন ধরে ঐ সব প্রাঙ্গের জবাব বার করে সম্বোধন আমায় জানিও। আমি এখন চললাম কোর্টে।”

“মানে!” আশ্চর্য হয়ে তিনি চাইলেন আবার ফিনকির মুখের দিকে। তারপর তার হাত ধরে বললেন, “সেই ভাল, আমি নিয়ে যাচ্ছি একে। তুমি কিন্তু আর দেয়ি করো না যেন। চল ত ভাই, চল তোমার চোখ মুখ ধুইয়ে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি আমি।”

আপত্তি করল না ফিনকি, আপত্তি করার সামর্থ্যও ছিল না তার। এমন একজন লোক ফিনকির হাত ধরবে এ যে স্বপ্নেও কখনও ভাবে নি ফিনকি। শাস্ত মেয়ের মত সে চলল তাঁর সঙ্গে, কি রকম একটা মিষ্টি গান্ধ তখন সে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। গম্ভীরা আসছিল তাঁর গা থেকেই।

আচ্ছন্নর মত কাজকর্ম সব করে গেলেন ফণা ফিনকির মা। বাসন কথানা না মেজেই মেয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে, একটু কিছু হলেই বাড়ী থেকে ছিটকে বেরোয়। এবার আত্মক ফিরে, বাড়ী থেকে বেরোন জন্মের মত বন্ধ করবেন তিনি মেয়ের।

যে জিনিস হারিয়ে তিনি পথের ভিখিরী হযোঁছিলেন সে বস্তু আবার ফিরে এল তাঁর হাতে। এবার আবার দিন ফিরবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি এবার চলে যাবেন কালীঘাটের জিঙ্গীমানা ছেড়ে। আড্ডতের দাঁড়িপাল্লা আর ছুঁতে হবে না তাঁর ছেলেকে, মেয়েকে তিনি চোঁকাঠ পেরোতে দেবেন না কখনও। অত রাগ মেয়ের, এবার নিজে থেকেই কমবে। রাগ হবে না কেন, পেট ভরে খেতে পায় না, পরনের কাপড় পায় না, মাথায় একটু তেল পষন্ত পায় না। জন্মছাঁখনী মেয়েটা তা, -নু মেয়ে এফটুও বেচাল হয় নি। চারটে পয়সা হাতে পেলেও তাঁর হাতে এনে তুলে দেয়। আর তিনি নিদাক্ষণ অভাবের তাড়নায় হাত পেতে নেনও মেয়ের ভিক্ষে করা পয়সা। কিন্তু আর না, এই শেষ হল তাঁর দুর্দশার দিন। ফিরবেই দিন এবার, ঠিক আগের মত হবে সব কিছু। কি করে হবে তা অবশ্য তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু হবেই, ও জিনিস ঘরে থাকলে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন। কখনও এব অল্পখা হয় না, হতে পারে না।

মনে মনে তিনি আর একবার প্রণাম করলেন সেই পাথরখানিকে। ছেলে স্নান করে আসতে তাকে দিয়ে তিনি স্নান পূজো কার্য হন সেই পাথরখানির। তারপর ছেলের হাত দিয়েই সেখানিকে ফুল বেলপাতা তাম্রকুণ্ড সূক্ষ বাস্কের মধ্যে রাখিয়ে বাস্ক চাবি দিয়ে রেখেছেন। চাবি ঝুলছে তার আঁচলে, স্ততরাং নিশ্চিন্ত আছেন তিনি। এখন মেয়েটা ফিরলে হয়। ফণা বোনকে খুঁজতে যেতে চেষ্টা ছিল, কিন্তু তিনি মানা করলেন। কি হবে সাধতে গিয়ে, সাধলেও সে আসবে না—যতক্ষণ না রাগ পড়বে। ফণাকে বলে দিয়েছেন তিনি, একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে আর বিকেলে ছুটি নিয়ে আসতে। বিকেলে তিনি ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে বসিয়ে বলবেন যে কী জিনিস ফিরে পেল আজ তারা। তাদের বংশের চোদ পুরুষ ঐ সাক্ষাৎ কালীর সেবা করে ছ। ঐ আসল কালীঘর, কালী পাথরের

ওপর খোদাই করা রয়েছে মায়ের যজ্ঞ। ফণা ফিনকির মা চেনেন ওর সব কটা দাগ, তাঁর শব্দের তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। ঠিক মাঝখানে একটি বিন্দু, বিন্দুকে ঘিরে পরপর পাঁচটা ত্রিকোণ, ত্রিকোণ ঘিরে অষ্টদল আর পদ্ম আর অষ্টদল পদ্ম ঘিরে চতুর্দ্বারযুক্ত চারকোণা বন্ধনী। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ লাভ হয় ঐ যজ্ঞের সেবায়। ছিলও তাঁর শব্দেরকূলে লক্ষ্মী-সরস্বতী বাঁধা। কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেল যেদিন ঐ যজ্ঞ নিয়ে ভিটে ছেড়ে নামতে হল পথে। তারপর ঐ সাক্ষাৎ মা কালীকে অবজ্ঞা কবে যেদিন এই বংশের ছেলে কালীঘাটের কালীর দরজায় পয়সা কুড়োতে গেল সেদিন এই বংশের কুললক্ষীও হাতছাড়া হলেন। আবাব নিজের ইচ্ছেয় ফিরে এসেছেন মা, সুতরাং আবাব সব হবে। হয়ত—

একটু অল্পমনস্ক হয়ে পড়লেন ফণা ফিনকির মা। তাঁর হাত দুটো একটু থামল কাজ করতে কবতে। বেশ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ। হয়ত—পষন্ত ভেবে তার পরের ভাবনাটা ভাবতে আর শাহস হল না তাঁব। থাক, যেখানে সে আছে শান্তিতে থাক। ফিরে এলে এখন কি যে হবে আব কি কি যে হবে না তার সবটুকু কল্পনা করার সামর্থ্যও নেই তার। তাব চেয়ে সুখে থাক সে, যেখানে আছে সেখানে যেন একটু শান্তি জ্বোটে তার কপালে। তার কপালের সিঁদুর আর হাতের নোয়া নিয়ে যদি তিনি মবতে পারেন তাহলেই তাঁর যথেষ্ট পাওয়া হল জীবনে। কালীঘাটের কালীদ' থেকে যদি তিনি কখনও উদ্ধাব পান, ছেলেমেয়ে-দুটোকে যদি এই বংশের ছেলেমেয়ের মত দাঁড় কবতে পারেন তিনি কখনও, তাহলে মরেও তিনি শান্তি পাবেন। বেঁচে থাকতে তাঁর কপালে সুখ শান্তি জুটল না, তার জন্তে কখনও তিনি কাউকে স্বপ্নেও দায়ী করেন নি। শেষের দিন কটাও নিজের পোড়া অদৃষ্ট ছাড়া আর কাউকে তিনি দোষ দেবেন না।

কিন্তু এখনও ত ফিরল না ফিনকি। এত দেয়ী ত সে করে না কোনও দিন। বারোটা বোধহয় বেজেই গেল।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে ফিনকির মা আর একবার দরজাব দিকে তাকালেন।

সত্যিই বেজে গেল বারোটা।

হালদার মশায় অনেকক্ষণ একভাবে চেয়ে আছেন দরজাটার দিকে। যেন একটা কিছু অবটন ঘটাব প্রতীক্ষা করছেন তিনি ঐ দরজার বাইরে। হয়ত ঐ মুহূর্তে একটা ছায়া পড়বে বাইরের বারান্দায়, তারপর ছায়াটা এগিয়ে এসে দাঁড়াবে তার দরজায়, তারপর ঘরে ঢুকবে সেই ছায়া। ঘরের মধ্যে ছায়াটা আর ছায়া

ধাকবে না, কথা বলে উঠবে। বলবে, “চল, তোমায় ভুলে নিয়ে যেতে এসেছি আমি, আর এখানে এমন ভাবে একলা তোমার পড়ে থাকা চলবে না।” তা শুনে হালদার মশায় হাসবেন, নিঃশব্দে একটু হাসবেন শুধু। সে হাসির মানে কি সে বুঝতে পারবে। বুঝবে কি সে যে অনেক দেরী হয়ে গেল, একেবারে বারোটা বেজে গেল এই ডাকার ক্ষণটি এসে পৌঁছতে। হালদার মশায়ের হাসি কি এ বারতা বলতে পারবে তাকে, যে ঠিক সময় ঠিক ডাকটি না দিতে পারলে সাড়া পাওয়ার এতটুকু সম্ভাবনা থাকে না আব। তেল ফুরোবাব পবে পিদিমটা জ্বলেও যদি আরও কিছুটা সময়, তাহলে তা থেকে শুধু খানিক বিকট গন্ধই বেরোয়। তখন সে পিদিমের কাছ থেকে আলোব আভা আশা করা শুধু অস্ত্রাঘই নয়, সেটা সেই বুকজ্বলন্ত পিদিমটাকে মুখ ভেংচানোব শামিল হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু বারোটাও যে অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল।

আর একটু পরেই যে আঁধাব ঘনিষে উঠবে তাঁর দুই চোখে। তারপর যে ছায়াটুকুও আব দেখতে পাবেন না তিনি। তখন তিনি বোঝাবেন কি তাকে তাঁর বোবা চাউনি দিয়ে। মুখ ফুটে ত আর কিছু বলতে পারেন না হালদার মশায়। অসংখ্যবার অসংখ্য বার ক্ষণ এসেছে আর চলে গেছে। হালদার মশায় শুধু চোখেব ভাষায় বলতে চেয়েছেন তাকে তাঁর বলাব কথাটা, মুখ ফুটে একটিবাবের জন্তেও এতটুকু দয়া চান নি তার কাছে। আর এইভাবে দিনের পব দিন বহুব পব বছর চোখ দুটোকে কথা বলার কাজে ব্যবহার কবার ফলেই তিনি হারিয়েছেন তাঁর চোখের আলোটুকু। দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের আলো নিভে যায়। কালির সমুদ্রে ডুবে যান তিনি, তলিয়ে যান মৌনতার অতল গহবরে। তখন তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত গুনে গুনে কাটে আলোর প্রতীক্ষায়। কারণ আলোই হল ভাষা, ভাষাই হল আলো। যেখানে আলো নেই, ভাষাও নেই সেখানে। হালদার মশায় মর্মে মর্মে নন যে আলোহীন ভাষাহীন জীবনের নামই মৃত্যু। যে মৃত্যুকে তিনি স্বদীর্ঘকাল ধবে চুষে চুষে পান করছেন। যে মৃত্যুকে তিনি ভয় ত করেনই না, এমন কি স্থগা পর্ষন্ত করেন না, একান্ত বন্ধুর মত জ্ঞান করেন যে মৃত্যুকে। সেই মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে তাঁর মাথার শিয়রে, আর একটু পরেই তাঁকে গ্রাস করবে। এবং আবাব তাঁকে উগরে দেবে কাল ভোরে, যখন আকাশের গায়ে আলোর ভাষায় কথা কয়ে উঠবেন আলোর দেবতা।

কিন্তু কই এল না ত সে এখনও।

আলো মুছে যাবার আগে তবে কি আশাবে না সে তাঁর সামনে! কিংবা এও

কি সম্ভব যে কংসারি হালদারের সামনে এসে দাঁড়াবার বিন্দুমাত্র গরজ নেই আর তার।

সেও কি তাহলে মনে করলে নাকি যে কংসারি হালদার ফুরিয়ে গেছে একেবারে ?

কিংবা যা তারা হাতে পাবার জগ্গে এককাল সহ করেছে কংসারি হালদারকে, সে জিনিস হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে কংসারি হালদার একেবারে মুছে গেল তাদের মন থেকে ?

ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হালদার মশায়। আবার ঘামতে লাগলেন তিনি, আবার তাঁর শিবদাঁড়ার মধ্যে যন্ত্রণাটা শুরু হয়ে গেল। সমস্ত প্রাণটুকু গিয়ে জমা হল তাঁর দুই চোখে। জলন্ত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন দরজাটার দিকে।।

শেষ পর্বন্ত একটা ছায়া পড়ল দরজার সামনে। ঘরে ঢুকলেন হালদার মশায়ের বড় বোঁমা বেদানাব বস এক গেলাস হাতে নিয়ে। এইবার নিয়ে সকাল থেকে চারবার আসা হল তাঁর হালদার মশায়ের ঘবে। ঘন্টায় ঘন্টায় তিনি খুবকবে যা খাওয়ানোর তা খাইয়ে যাচ্ছেন নিঃশব্দে। নিঃশব্দে হালদার মশায় সেবার অত্যাচার সহ করে চলেছেন। ঘড়ির কাঁটার মত চলেছে তাঁর সেবা, একেবারে কলের মত চলেছে ছেলে-বোদের কর্তব্য পালন কবা। কোনও দিকে এতটুকু ত্রুটি নেই, বিন্দুমাত্র ছিদ্র নেই তাদের আন্তরিকতায়। সেবা আন্তরিকতা আর কর্তব্য পালনের জগদ্বল পাথরটা নির্ঝঞ্ঝাটে গড়িয়ে চলেছে হালদার মশায়ের বুকেব ওপর দিয়ে। এতটুকু নড়াচড়া করারও শক্তি নেই তাঁর।

ভিজ়ে তোয়ালেব খুঁটে শব্দের চোট দুখানি অতি যত্নে মুছিয়ে দিয়ে বড় বোঁমা থালি গেলাসটা হাতে নিয়ে ফিরে চললেন ঘব ছেড়ে। বোঁমাঘেরা কখনও কথা বলেন নি তাঁদের শব্দের সঙ্গে, কখনও মুখ তুলে তাকাননিও শব্দের মূখের দিকে, শব্দের এতটা কাছে কখনও আসতেও হয় নি তাঁদের। এখন স্বহস্তে সেবা করতে হচ্ছে শব্দের। নিখুঁত ভাবে করে যাচ্ছেন তাঁরা যা কবার, কারণ যে বংশের মেয়ে তাঁরা সে বংশের মেয়েরা জানে কি করে শব্দের সেবা করতে হয়। দেখে শুনে ভাল বংশের মেয়েই ঘরে এনেছেন কি না হালদার মশায়, কাজেই সেদিকে এতটুকু আশঙ্কপ করার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। তবে একটা কথা তিনি ভাবছেন মাঝে মাঝে। ভাবছেন যে তাঁর বৌ দুটো বোবা নয়ত। মরতে বসেছেন তিনি, আর কয়েকদিন পরে এই খাটেও তিনি থাকবেন না, তবু এরা তাঁর সঙ্গে এক আধটাও কথা কয় না কেন ? শেষের দিন কটা তাঁর পাশে

বসে তাঁর সঙ্গে ভাল মন্দ ছোটো কথা বললে কি এমন মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত ? ওরা কি ওদের শব্দকে কাঠ পাথর লোহা গোছের কিছু মনে করে নাকি ! না ওরা এই মনে করে যে এ লোকটার সঙ্গে আলাপ করার মত কিছু নেই এই ছুনিয়ায় ! কেন ওরা এমন ব্যবহার করে তাঁর সঙ্গে ?

কেন সকলে এ রকম ব্যবহার করছে তাঁর সঙ্গে ?

কেন ?

হঠাৎ ডেকে ফেললেন হালদার মশায় তাঁর বৌমাকে, “বড় বৌমা।” চৌকাঠের ওধারে এক পা দিয়েছেন তখন বড় বৌমা, পা টেনে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। ছুই চোখে তাঁর উপচে উঠেছে তখন ভয় আর বিস্ময়। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন তিনি খাটের পাশে। নীচু হয়ে মুছ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমায় ডাকলেন বাবা ?”

হালদার মশায় তখন বুজ্জে ফেলেছেন তাঁর চোখ। ঠোট একটু নড়ে উঠল তাঁর, অম্পষ্ট কণ্ঠে বলতে পারলেন শুধু, “তপু ত ফিরল না মা এখনও।”

অনেকক্ষণ আর কোনও সাড়াশব্দ পেলেন না হালদার মশায়। চোখ মেলে দেখলেন, ঘরে কেউ নেই। মনে মনে হাসতে লাগলেন তিনি। ভয় করে সবাই তাঁকে বিষম ভয় কবে। উত্থানশক্তি-রহিত হয়েছেন তিনি, তবু তাঁকে যমের মত ভয় করে সকলে। ভয় পেয়েই পালিয়ে গেল বৌটা। জীবনে কখনও শোনে নি ত তাঁর ডাক, তাই ডাক শুনে কি যে করবে বুঝতেই পারল না। ভয় পেয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। যতই এ কথা ভাবতে লাগলেন হালদার মশায় ততই হাসিতে তাঁর শরীর ঘুলিয়ে উঠতে লাগল। মন মেজাজ বেশ হালকা হয়ে উঠল তাঁর, বহুকাল পরে খুশী হবার মত একটা কিছু পেয়ে তিনি খুশিতে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

ভয় করে সকলে, বিষম ভয় করে এখনও সকলে হালদার মশায়কে।

ভয়ে একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম হল ত্রিপুরারি হালদারের। সামনে যাকে দেখতে পেলেন তাকেই সংবাদটা জানিয়ে তিনি ছুটলেন বাড়ীর দিকে। মুহূর্ত মধ্যে কালীবাড়ীতে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে শেষ সময় উপস্থিত কংসারি হালদারের। পিলপিল করে মানুষ ছুটল হালদার বাড়ীর দিকে। পঞ্চানন ভট্টাচার্য মশায়ের কাছেও সংবাদটা পৌঁছল। কে আবার স্মরণ করে দিলে তারকারি হালদারের অফিসে। হালদার মশায়ের চেয়ে বয়সে বড় ঈশ্বরী তাঁরাও ঝুঁকঠুক করে এগোলেন শেষ দেখাটা দেখবার জন্তে। কেউ বললেন, ভাঙল এবার

একটা পাহাড়ের চূড়া, কেউ বললেন, মস্ত বড় একটা নক্ষত্র গেল খসে কালীঘাটের আকাশ থেকে। কয়েকজন ডালাধরা কৈদেই ফেলল একেবারে। কংসারি হালদার চললেন, এ সংবাদে তাদের বৃকের ভেতরটায় মোচড় দিতে লাগল। একদিন ঐ বদরাগী গস্তীর মাহুঘটার সামনে কোনও না কোনও ছুতায় পড়ে গিয়েছিল তারা, তাই তারা আশ্রয় পেয়েছে কালীবাড়ীতে। প্রথমে খেতে হয়েছে ধমক, “মরবার আর ঠাই ছুটল না কোথাও তোমার, তাই মরতে এসেছে পোড়া পেট নিয়ে কালীবাড়ীতে। আচ্ছা থেকে যাও, চুরি ছ্যাচডামি করো না যেন। বামুনের ছেলে যখন—তখন দুটো অন্ন জোটাবেই বেটা। কেউ এখানে উপোস করে থাকে না।” তারপর তারা থেকে গেছে, ডালা হাতে চরে বেড়াচ্ছে কালীবাড়ীর আশেপাশে। মা সত্যিই উপোস রাখেন না কাউকে, কিন্তু সে ঐ একটা পেটের দায়ই মা বইতে পারেন। একটা পেটের সঙ্গে আরও পাঁচটা পেট যে এসে জুটেছে কালীঘাটে, মা তাদের জন্তে দায়ী হন না। তাই ডালাধরাব সংসারে মুন আনতে পাশ্চাত্য ফুরিয়ে যায়, তাইনে টানলে বাঁধে থাকে না কিছুই। তা না থাকুক, তবু ঐ কংসারি হালদারের মুখের বাক্য না পেলে কি ওদেব সাধ্য ছিল ডালা হাতে মায়ের বাড়ীতে ঢোকার। টিপে পিষে খেঁতলে শেষ কবে দিত তাদের আগে যারা এসেছে তারা। সেই আশ্রয়দাতা কংসারি হালদারের যাবাব সময় এগিয়ে এসেছে, তাই তিনি বড় ছেলেকে কাছে ভেকে পাঠিয়েছেন, এই সংবাদ শুনে হতভাগা ডালাধরাদের চিরন্তক চোখও ভিজে উঠল। পায়ে পায়ে তারাও গিয়ে দাঁড়াল হালদার বাড়ীর দরজার সামনে।

ছুটল সবাই, অনেকে কিছু না জেনেই ছুটল। চলেছে যখন সকলে তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটনার মত ঘটছে ওখানে, এই আশায় ছুটল অনেকে। ভিথিরীরা ছুটল কিছু দান হচ্ছে ভেবে, বামুনরা ছুটল কোনও রাজা গজা এসেছে ভেবে। কেউ বা ছুটল শুধু মজা দেখবার আশায়। হয়ত ধরা পড়েছে একটা গাঁটকাটা, কিংবা কোনও মেয়েমাহুঘ নিয়ে কেলেকারি লেগে গেছে। কিংবা হয়ত কোনও অসাধারণ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, তিনি যাকে সামনে দেখছেন তাকেই একেবারে রাজা করে ছেড়ে দিচ্ছেন। কিছুই অসম্ভব নয় কালীঘাটে, মুঠো মুঠো গিনি মোহর ছড়িয়ে উধাও হয়ে যায় এমন মহাপুরুষেরও আবির্ভাব ঘটে কালীঘাটে। কিন্তু মজা হচ্ছে, গিনি মোহরগুলো কুড়িয়ে ঘরে আনলেই অমনি উবে যায় সেই সব মহাপুরুষদের মত। কাজেই কালীঘাটের আইন হল কোথাও একটা কিছু হচ্ছে শুনলেই ছোটা। কালীঘাটের আইন অহুযায়ী ছুটতে বাধ্য সকলে। স্তব্রাং ছুটল মাহুঘ হালদার বাড়ীর দিকে।

জিপুরারি হালদার পা টিপে টিপে ঢুকলেন বাপের ঘরে। বাবা চোখ বুজে আছেন। দম বন্ধ করে অনেকক্ষণ তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন বাপের বৃকের ওঠা-নামা। ইতিমধ্যে নিঃশব্দে ঘর বোঝাই হতে লাগল। বউ ছুজন পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। ছেলে মেয়েরা স্কুলে, তাদের আনবার জন্তে চাকর ছুটেছে তখন স্কুলেব দিকে। খডম ছাড়া ভট্টচায় এসে দাঁড়ালেন মাথার কাছে, বউ মিশ্র মশায় ধম্মকের মত শরীর নিয়ে ঘরে ঢুকে এক কোণে বসে পড়লেন। বউ বড়রা একে একে ঢুকতে লাগলেন ঘবে। সকলেই নির্বাক নিম্পন্দ নিস্তব্ধ, এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন হালদার মশায়ের মুখের দিকে। একবার অন্ততঃ চোখ খুলবেনই কংসারি হালদার, শেষ দেখা তিনি দেখবেনই তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের। এই আশায় সকলে গলা বাড়িয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন হালদার মশায়ের মুখের দিকে।

বাইরেব বাবান্দায় জুতোব আওয়াজ উঠল। ঘরের মধ্যে নড়েচড়ে সরে দাঁড়াবার শব্দ হল। সকলে বাস্তা করে দিলেন। ভাক্তার নিয়ে ছোট ছেলে তারকাবি দুই লাফে বাপেব খাটেব পাশে উপস্থিত হল। চমকে উঠে চোখ চাইলেন হালদার মশায়। চোখ চেয়ে একেবাবে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। গকি, এত মানুষ কেন তাঁব ঘবে।

ততক্ষণে তাঁব ডান হাতখানা ধবে ফেলেছেন ভাক্তাব, নাড়ী ধবে ঘড়ির দিকে চেয়ে আছেন তিনি। বাপেব বৃকের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাবকারি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করেছে। বউ মিশ্র মশায় কণ্ঠকণ্ঠে তারকব্রহ্মনাম জুড়ে দিয়েছেন। পঞ্চানন ভট্টচায় বিড়বিড় করে করে বাজ গায়ত্রী জপছেন শিয়রে দাঁড়িয়ে।

সকলের মুখেব দিকে একবার তাকিয়ে দেখে হালদার মশায় আবার চোখ বুজলেন। ত্রপুবাবি আব থাকতে পারলেন না, টেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, “বাবা, বাবা গো—” চোখ আব চাইলেন না হালদার মশায়। বা হাতখানা তুলে ছেলের গায়ে রাখলেন। গুজগুজ ফুস ফুস আরম্ভ হল ঘরের। ভাক্তাব নাড়ী দেখা বন্ধ করে বললেন, “ঠিক আছে, এখন আর কোনও ভয় নেই। ওষুধটা আনিয়ে নিন। ওষাচ রাখবেন, একটু অস্বস্তি বোধ করলেই দুফোটা দেবেন জিভের ডগায়।”

ভাক্তার বেরিয়ে গেলেন ঘব ছেড়ে, তাঁর জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই বৈ বৈ আওয়াজ উঠল হালদার বাড়ীব সামনে। হাতে পায়ের গলায় কোমরে সর্বান্তে নানা রঙের ছেঁড়া স্নাকডার ফালি দিয়ে বাধা রাজ্যের ইট পাটকেল খোলামকুচি বুলিয়ে বিকট দর্শন একটা পাগল ঢুকে পড়েছে ভিড়ের মাঝখানে। খুব সম্ভব আপাদমস্তক লোকটা মশলা মেখে আছে। দুঃখে মানুষ অস্থির হয়ে তাকে তাড়াবার জন্তে বৈ বৈ করে উঠেছে। সে কিন্তু ঢুকবেই বাড়ীর মধ্যে,

জোর করে ঢুকবে। পথ না ছেড়ে দিলে আঁচড়ে কামড়ে নিজের পথ করে নেবে সে। দু একজনকে জাপটেও ধরেছে তার সেই বাঁহুঁস চেহারার সঙ্গে। পাছে আবার কাউকে ছুঁয়ে ফেলে এই ভয়ে লোকজন ছুটতে আরম্ভ করেছে। আবার কেউ কেউ দূর থেকে গলার জোরে তাড়াবার চেষ্টাও করেছে লোকটাকে। কিন্তু সে ক্রমেই এগিয়ে যেতে লাগল হালদার বাড়ীর দরজার সামনে। বাড়ীর ভেতর এখন ও ঢুকে পড়লে কি সর্বনাশ হবে এই ভেবে প্রাণপণে চেষ্টা করে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল সকলে।

হঠাৎ সমস্ত গোলমাল ছাপিয়ে শোনা গেল—

“হরি নাম লিখে দিও অঙ্গে।”

হালদার বাড়ীর দরজার সামনে পৌঁছে ওপর দিকে মুখ তুলে পাগলটা আবার চেষ্টা করে উঠল—

“হরি নাম লিখে দিও অঙ্গে।

তোমরা সকলে এই করিও মিলে

আমার প্রাণ যেন যায় হরি নামের সঙ্গে।”

ওপরের ঘরে হালদার মশায় আবার চোখ চাইলেন। অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন তিনি চতুর্দিকে। যেন ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছেন তিনি, যেন ওঠবার শক্তি থাকলে এখনই উঠে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে ফেলতেন নিজেকে, যেন কেউ ধরতে আসছে তাঁকে। মরণের চেয়ে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনার মধ্যে যেন এখনই তাঁকে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

পঞ্চানন ভট্টাচার্য চেষ্টা করে উঠলেন, “কি হল! হল কি কীসারী? ও রকম করছ কেন?”

হালদার মশায় জবাব দিতে পারলেন না। আবার তিনি চোখ বুজলেন, চোখ বুজে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইলেন। ওপরে ওঠবার সিঁড়িতে তখন শোনা যেতে লাগল—

“আনিও তুলসী দল যত্ন করে তুলে

তারি মালা গাঁথে পরাইও গলে

হরেকৃষ্ণ নাম দিও কর্ণ-মূলে

জাহ্নবীর কোলে নিয়ে যেও সঙ্গে।

হরিনাম লিখে দিও অঙ্গে।”

একবারে ওপরে উঠে এল যে!

কে চেষ্টা করে উঠল, “বার করে দাঁও, দুই করে দাঁও ব্যাটাকে।”

সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন হৈ হৈ করে উঠল। ত্রিপুরারি তারকারি ঘরে দাঁড়ালেন ঘর থেকে বেরোবার জন্যে।

হালদার মশায় চোখ চেয়ে হাত বাড়িয়ে বড় ছেলের হাতখানা ধরে ফেললেন। যেন ভিক্ষা চাইছেন তিনি, এই রকমের ভাব ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। কি যে বললেন টোট নেড়ে তা কেউ শুনতে পেল না। কিন্তু বুঝল সকলে যে তিনি শুকে আসতে দিতে অনুরোধ করছেন।

ইতিমধ্যে একেবারে দরজার সামনে শোনা গেল—

“কফে কণ্ঠরোধ হইবে, না সন্নিবে বুলি
আমায় বলিতে না দিবে রাধাকৃষ্ণের বুলি
আমার মাথায় বেঁধে দিও হরি নামাবলী”

ঘরের মধ্যে পা দিল। ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করে সরে দাঁড়াল সকলে, ছুঁয়ে না ফেলে লোকটা কাউকে। সে এগিয়ে আসতে লাগল বিছানার পাশে।

“আমার মাথায় বেঁধে দিও হরি নামাবলী

নিদান কালে যেন হেরি গো ত্রিভঞ্জে।

আমার নিদান কালে যেন হেরি গো ত্রিভঞ্জে”—

খাটের পাশে দাঁড়িয়েছে একেবারে। সামান্য একটু ঝুঁকে পড়েছে হালদার মশায়ের ওপর। ভয়ানক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন হালদার মশায় ওর মুখের দিকে। ঘরের মধ্যে অল্প সবায়ের নিখাস বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। তখনও গান চলছে তার, “হরি নাম লিখে দিও অঞ্জে।”

তারপর খামল গান।

সঙ্গে সঙ্গে এমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘরের ভেতরটা যে এক গাছা চুল পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। পাথরের মত দাঁড়িয়ে সকলে দেখতে লাগল। এতটুকু নড়াচড়া করারও শক্তি নেই কারও।

কি করবে এবার পাগলটা।

করবে কি ও!

পাগলটা কিছুই করলে না। প্রায় মিনিটখানেকের মত নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইল হালদার মশায়ের চোখের ওপর। তারপর খটখট খটখট শব্দ উঠল তার শরীরে ঝোলানো ইট পাটকেলগুলো থেকে। ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগল লোকটা। হাসতেই লাগল সে অনেকক্ষণ ধরে হালদার মশায়ের দিকে তাকিয়ে।

তবু কেউ নড়ল না একটু। হাসির শেষে আর কি করবে ও, তাই দেখবার

জন্তে রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে রইল সকলে তার দিকে ।

শেষে বন্ধ হল হাসি । তারপর গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠল পাগলটা—

“হালদার, সময় ত হয়েছে এখন । এবার ফিরিয়ে দাও আমার সেটা । আর ত তোমার দরকার নেই হালদার সে জিনিসের ।”

নিস্তব্ধ হল ঘর । পাগলটার দুই চোখে ফুটে উঠেছে ব্যাকুলতা । তার চোখ কান মুখ সর্ব-অবয়ব জবাব শোনার জন্তে ক্ষুধার্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছে । অদ্ভুত ভাবে সে চেয়ে রয়েছে হালদার মশায়ের মুখের দিকে ।

অনেকটা সময় কেটে গেল । তারপর আবার গমগম করে উঠল তার গলা ।

“দেবে না হালদার ? ফিরিয়ে দেবে না আমার সে জিনিস ? কি লাভ হবে তোমার জিনিসটা নষ্ট করে ? তুমি চলে যাবার পরে ও জিনিসের দাম বুঝবে কে ? কার কি উপকায়ে আসবে ওটা তখন ? ফিরিয়ে দাও হালদার, শেষ সময় আমার হাতে আমার জিনিস তুলে দিয়ে যাও ।”

আবার নিস্তব্ধ । ঘরের প্রতিটি মানুষ তখন একেবারে বাহুজ্ঞানশূন্য অবস্থায় চেয়ে রয়েছে ওদের হৃদয়ে দিকে । আবার কি বলে পাগলটা, কি জবাব দেন হালদার মশায়, শোনার আশায় সকলের সর্বেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছে তখন । কিন্তু এ-পক্ষ ও-পক্ষ কোন পক্ষেরই আর সাড়া নেই ।

অনেকক্ষণ কাটল সেই ভাবে । তারপর নড়ে উঠল হালদার মশায়ের ঠোঁট । নষ্ট শোনা গেল তিনি যা বললেন । সর্বস্ব খোঁষালে যে স্বর বেরোয় মানুষের গলায়, সেই স্বরে বললেন তিনি, “নেই, বিশ্বাস বর তুমি, নেই সে জিনিস আমার কাছে । আমি সেটা খুঁইয়েছি ।”

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ কবে রইল পাগল । তারপর আবার কেঁপে ফুলে ফুলে আরম্ভ হয়ে গেল তার হাসি । উদ্ভট হাসি হাসতে লাগল সে, খট খটখট আওয়াজ উঠল তার সর্বাঙ্গে ঝোলানো ইটপাটকেল থেকে । তারপর সে ফিরে দাঁড়াল, এগিয়ে যেতে লাগল আস্তে আস্তে । পার হয়ে গেল দরজা । তারপর সিঁড়ির মুখে শোনা গেল—

“কাজ কি মা সামান্ত ধনে ।

আমার কাজ কি মা সামান্ত ধনে ।

ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে ।

কাজ কি মা সামান্ত ধনে ।”

হালদার মশায় কাঁঠ হয়ে শুনে লাগলেন—

“সামান্ত ধন দেবে তারা

পড়ে রবে ঘরের কোণে !

যদি দাও মা আমার অভয় চরণ

রাখি হৃদি পদ্মাসনে ।

কাজ কি মা সামান্য ধনে ।

আমার কাজ কি মা সামান্য ধনে ॥”

পৌছে গেছে নীচে । এগিয়ে যাচ্ছে সদরের দিকে । রাস্তায় গিয়ে পড়ল
এবার । রাস্তা থেকে শোনা গেল—

“গুরু আমায় রূপা করে মা

যে ধন দিলে কানে কানে ।

এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র ও মা

তাও হারালাম সাধন বিনে ।

কাজ কি মা সামান্য ধনে ।”

হঠাৎ প্রাণপণে টেচিয়ে উঠলেন হালদার মশায়, “ওরে ফেরা, ফেরা ওকে ।
ওকে বুঝিয়ে বলি, সত্যিই আমি হারিয়েছি সে জিনিস, সত্যিই সেটা আমার হাত-
ছাড়া হয়ে গেছে ।”

কেউ নড়ল না, ঘরের ভেতর সব কটা মানুষ যেন পঙ্গু হয়ে গেছে ।

আবও দূরে হালদাবপাড়া লেনের মুখে শোনা গেল—

“প্রসাদ বলে রূপা যদি মা

মা মাগো মা—”

ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল সেই কান্না, “মা মাগো মা”

অনেক দূর থেকে ভেসে এল—

“প্রসাদ বলে রূপা যদি মা

হবে তোমার নিজ ” ।

তবে অস্তিম কালে জয় দুর্গা বলে

স্থান পাই যেন ঐ চরণে ।

কাজ কি মা সামান্য ধনে ॥”

আচম্বিতে যেন ককিয়ে কেঁদে উঠলেন হালদার মশায়, “ভট্টাচার্য—কি হবে ?
কি উপায় হবে ভট্টাচার্য ? ও যে ফিরে গেল কাদতে কাদতে, ফিরে গেল
যে ও ।”

পঞ্চানন ভট্টাচার্য একটিও কথা বললেন না । নীরবে হালদার মশায়ের কপালে
হাত বুলতে লাগলেন । চোঁট তাঁর নড়তেই লাগল । কান পেতে শুনলে শোনা

‘যেত তিনি জপ করে চলেছেন সমানে—‘কালিকায়ৈ বিদ্বাহে শ্মশানবাসিন্ধে ধীমহি তন্নোঘোরে প্রচোদয়াৎ ।’

ফণা ফিনকির মা জপছেন ।

জপছেন তাঁর ইষ্টমন্ত্র । জপের সঙ্গে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন তিনি—ফিরিয়ে দাও মা, আমার মেয়েকে দাও । না হয় মরা মেয়েই ফিরিয়ে দাও মা, তবু ফিরিয়ে দাও ।

দিন গড়িয়ে গেল প্রায়, বাইরের কাজ সেরে গলির মানুষ ফিরে আসছে সকলে গলিতে । ফণা কাজ থেকে ফিরেছে অনেকক্ষণ, ফিরেই বেরিয়েছে বোনকে খুঁজতে । একবার দুবার তিনবার সে ফিরে এল বাড়ীতে, ফিরে একই দৃশ্য দেখল । মা ঠায় একভাবে বসে আছেন দরজার দিকে তাকিয়ে । মায়ের ঠোঁট নড়ছে, আঁচলের মধ্যে হাতের আঙুলও নড়ছে, কিন্তু চোখের পাতা নড়ছে না । শেষবার, তা প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়েছে ফণা, সেও আর ফিরছে না ।

ফণা ফিনকির মা জপছেন, জপে চলেছেন তাঁর ইষ্টমন্ত্র । ইষ্টমন্ত্র ফিরিয়ে আনবে তাঁর মেয়েকে । নয়ত তিনি ইষ্টমন্ত্র ভুলেই যাবেন যে । মেয়েকে যদি যমেনিত তাহলেও তিনি ইষ্টমন্ত্র ভুলতেন না । সর্বস্ব খুইয়েও তিনি ভোলেন নি তাঁর ইষ্টমন্ত্র । সব দুঃখ তিনি ভুলেছিলেন ইষ্টমন্ত্রের প্রভাবে । কিন্তু এতবড় সর্বনাশটা তিনি সহ করতে পারবেন না । তাঁর পেটের মেয়ে বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে গিয়ে নাম লিখিয়ে রোজগারে নামবে, তারপরও তিনি জপবেন নাকি তাঁর ইষ্টমন্ত্র ! তাঁর পেট থেকে যে রক্ত-মাংসের ডেলাটা পড়ল, যেটাকে তিনি বুকের রক্ত দিয়ে অত বড়টা করে তুললেন, যেটা তাঁর শরীরেরই অংশ, সেটা এখন বিক্রি হতে শুরু হবে । অসহ্য, এই ভাবনাটাই কিছুতে ভাবতে চান না তিনি, এতবড় সর্বনাশের ছায়াটা তাঁর মনের কোণে উদয় হলেই তিনি সজোরে সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেন মন থেকে । আর মানুষে ঠিক ঐ জায়গাটাতেই দাগ দেয় ।

এ বাড়ীর অল্প ভাড়াটেরা বার বার খোজ নিচ্ছে, “ফিরল না কি গো তোমার মেয়ে ?”

জিজ্ঞাসা করার স্বরটাই কেমন যেন হাড়-আলানে গোছের । যেন ফিরবে না মেয়ে, এটা জেনেই ওরা প্রশ্নটা করছে বার বার । প্রশ্ন করে জবাব শোনার অপেক্ষা না করেই স্মারন্ত করে দিচ্ছে ফিলফিস কথাবার্তা আর চাপা হাসি । নাডু ঠাকুরের পিসি ত বলেই ফেললে, “ফিরবে গো ফিরবে । কেন অমন আউরে উঠছ

বাছা। মেয়ে তোমার সেয়ানা, কাজ শুছিয়ে ফিরবে একেবারে।” পিসীর কথা শুনে চাপা হাসি আর চাপা রইল না। প্রত্যেকের ঘরেই সেয়ানা আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে। তা সেই মেয়ের সঙ্গেই গলা মিলিয়ে মা মাসী পিসী ঠাকুমা হিলহিল খিলখিল করে হেসে উঠল।

শেষে পাডাতেও ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। ফিনকিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই সকাল থেকে। শুনে পাড়ার মানুষ এ ওকে ও তাকে চোখ ঠেরে বললে যে, এটা সকলের জানাই ছিল। ও মেয়ের চালচলন দেখেই সকলে জেনে ফেলেছিল যে, ঘরে থাকার জন্তে ও জন্মায় নি। আবার পাড়ার মধ্যে ধারা আরও বেশী ওয়াকিফহাল, তাঁরা বললেন, “যাবেই মা ও মেয়ে, যাবেই ও। ঐ মায়ের পেটে ও মেয়ে ঢোকবার আগেই ওর বাপ মরেছে ত, ও যে কোন গাছের ফল তা কি আর আমরা জানি না মা। ধম্মের কল বাতাসে নড়ে মা, ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। দিন রাত মুখ টিপে ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকে যে ঐ মাগী, সে কি শুধু শুধু নাকি। মুখ ও দেখাবে কি করে পাঁচজনকে।”

অতএব পাঁচজনে যাতে তাঁর মুখ দেখতে পায় এ জন্তে দরজার সামনে মুখ খুলে ঠায় একভাবে বসে আছেন ফিনকির মা। ধম্মের কল বাতাসে নড়ছে, নড়ছে তাঁর ঠোট দুখানি। ফিনকি তাঁর রক্ত মাংস থেকে যদি জন্মে থাকে, যদি সত্যিই তিনি মেয়েকে পেটে ধরে থাকেন দশ মাস, তাহলে জ্যান্ত না হোক অন্ততঃ মরা মেয়েটা ফিরিয়ে দাও মা। সেও তিনি সহ্য করতে পারবেন, তাহলেও তিনি জপে যেতে পারবেন তাঁর ইষ্টমন্ত্র। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে তিনি ইষ্টমন্ত্রও যে ভুলে যাবেন।

ভোলবার মত অনেক কথা অনেক ছবিই ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। কত কি যে ভুলতে হবে ইষ্টমন্ত্রের সঙ্গে, সব পর পর ছবির মত দেখতে লাগলেন তিনি। সে দিনটির কথা মনে পড়ে গেল। রক্তবর্ণ বেনারসী, তাঁর বিয়ের বেনারসীখানি পরে তিনি বসেছেন বা দিকে, ডান দি। বিয়ের জোড় পরে যিনি বসেছিলেন তাঁকেও মনে পড়ে গেল। গুরুদেব বসেছেন সামনের আসনে। পূজা হোম হয়ে গেছে। যজ্ঞের গন্ধে আর ধোঁয়ায় ঘরের ভেতরটা থমথম করছে। গুরুদেব অভিষেকের কলস তুলে পঞ্চপল্লব ডুবিয়ে ঘটের জল ছিটতে লাগলেন দুজনের মাথায়। ফণা ফিনকির মা অভিষেকের শেষ মন্ত্রটি আওড়ালেন মনে মনে।

“নশ্বন্ত চাপদঃ সর্বাঃ সম্পাদ সন্ত স্তম্বিরাঃ।

অভিষেকেন শাস্তেন পূর্ণা সন্ত মনোরথা ॥”

হঠাৎ কি হল তাঁর। মুখের ওপর আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন তিনি। ইষ্টমন্ত্র ইষ্টদেবতা সব ভুলে গিয়ে অস্ত্র একজনের কাছে একান্ত সংগোপনে জানাতে লাগলেন তাঁর আকুল আকৃতি, “আর যে পারিনে আমি, আর যে সইতে পারিনে আমি গো। একলা আর সইতে পারি না আমি এ ভার। মেয়েও আমার ছেড়ে চলে গেল। এবার অন্ততঃ একবার তুমি এস, যেখানে থাক একবার এসে খুঁজে এনে দাও তোমার মেয়েকে।

হয়ত আরও অনেকক্ষণ চলত তাঁর গোপন আবেদন নিবেদন। কিন্তু বাধা পড়ল। ফণার মনিবকে নিয়ে ফণা ঢুকল বাড়ীতে। আড়তদার মশায় একেবারে তৈরী হয়ে এসেছেন। যা করার সব শেষ করে এসেছেন একেবারে। থানা পুলিশ হাকিম কাউকে আর বাদ দেন নি তিনি। পয়সা আছে, লোকজন আছে, আর আছে সাদামাটা বোধজ্ঞান। তিনি মনিব, তাঁর আড়তের কর্মচারী ফণা। স্ততরাং তাঁরই লোক। তাঁর লোকের বোন চুরি গেছে, এ তিনি মুখ বুজে সহ্য করবেন কেন? মানে, তাঁর কি একটা মানইজ্জৎ নেই নাকি? কালীঘাট শালার পাড়রী জায়গা। নোংরার জায়গাষ কিই না হতে পারে। ওকি আর দেরি করতে আছে? লাগাও থানা পুলিশ উকিল হাকিম। যায় যাক দু চার শ খসে। তা বলে তাঁর লোকের অপমান তিনি মুখ বুজে সহ্য করবেন নাকি? শুধু তাই নয়, এখনই নিয়ে আর ফণা তোর মাকে। চল, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে, ঠাককণকে পায়ে ধরে নিয়ে আসব ঐ নরক থেকে তুলে। তারপর দেখাচ্ছি সব হারামজাদাদের। আমার লোকের গায়ে হাত দেওয়া, দেখাচ্ছি। ছুটে এসেছেন আড়তদার মশায়। ফণার মাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন ওপাবে। ইজ্জৎ যেখানে থাকে না সেখানে মাহুষ থাকে নাকি।

বাস্তবিকই বিন্দুমাত্র ইজ্জৎ নেই বিচারালয়ের। বিচারালয় না বলে ওটাকে বলা উচিত একটা মস্ত বড় ভিথিরীদের আড্ডা। হাত পেতেই আছে সকলে, উকিল মোস্তাফ় মুহুরী পেশকার থেকে শুরু করে আদালতের ছুঁচো ইহুরটা পর্যন্ত সবাই পেতে আছে হাত। ঘুষ নিচ্ছে বলে কেউ মনেই করে না, ঘুষ দিচ্ছে বলেও কেউ মনে করে না। আদালতে এসেছি ছুঁচো কাঁচা পয়সার মুখ দেখতে, আদালতে যখন ঢুকতেই হয়েছে তখন সর্বস্বাস্থ্য হতেই এসেছি—এই হল দু-পক্ষের মত। ওখানে টাকার খেলা, ওটা আদালত এই রকম যেন ধারণা মাহুষের। ছি ছি ছি ছি ছি—মহাবিরক্তি হয়ে একটা চোক গিললেন চতুরানন চৌধুরী। বেশ তেতো লাগল মুখ-গলার ভেতরটা হাকিম সাহেবের। তেতো মুখ নিয়েই বাড়ী ফেরেন

রোজ। সারাটা দিন এক পাল ঘুঘু ঘড়েলের বাক-চাতুরী শুনে আর নাকের ভগায় ঘুঘু নে ওয়। দেওয়া দেখে মন মেজাজ তেতো হয়ে যায় তাঁর। আইন আইন আর আইন! চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছেন তা যত বড় বে-আইনীই হোক, তাঁকে মুখ বুজে বরদাস্ত করতে হচ্ছে। কারণ আইনের ফাঁদে পা না দিলে আদালতের কিছুই করার নেই। আবার পা দিলেও পা ফসকে যায় যদি টাকার জোর থাকে। টাকার ছিনিমিনি খেলার একটা আড্ডা হচ্ছে ঐ আদালত। বড় বড় করে লিখে দেওয়া উচিত ঐ আদালতের গায়ে যে, টাকা দিয়ে এখানে যে কেউ যা খুশি কিনতে পার। টাকা খরচ করতে পারলে আইন তোমায় আইনসম্মত উপায়ে বে-আইনী করতে বাধ্য দেবে না।

পোলের ওপরে আদালত, এপারে কালীঘাট। হাকিম চতুরানন চৌধুরী এপারে থাকেন, ওপারে গিয়ে বিচার করে এপারে ফিরে আসেন। যেমন ওপারের আদালতে বিচারের লড়াইয়ে জিতে এপারে আসে মাহুঘ, কালীঘাটের মা কালীকে পূজা চড়াতে। ওপারের পূজা চড়ানো শেষ হলে তবে এপারের পূজা চড়ানো। সবই পূজা চড়াবার ব্যাপার। হাকিম সাহেব একটু হাসলেন নিজের মনে। হাম্পে এই ভেবে যে, মা কালী এপারে বসে ওপারের হাকিমের কলম এমন ভাবে ঘুরিয়ে দিতে পারেন, যাতে হয় হয়ে যায় নয়, নয় হয়ে দাঁড়ায় হয়। এইটুকু ক্ষমতা আছে বলেই মা কালী বেচারী করে থাকেন। আদালত ওপারে এত কাছে না থাকলে সত্যিই দিন চলা ভার হত মা কালীর। মামলায় যে হারে আর যে জেতে, দু পক্ষই যেমন উকিল পেশকারকে টাকা খাওয়াতে বাধ্য, তেমন মা কালীকেও উভয় পক্ষ ঘুষ দিচ্ছে। মামলা জেতবার জন্তে আগে থাকতে পূজা পড়তে থাকে মায়ের পায়ে। মামলা জিতলে ত পড়েই। হেরে গেলেও মাহুঘ পূজা দিয়ে যায় কালীঘাটে এসে। এই প্রার্থনা জানায় পূজা দিয়ে যে, এবারটা যা হবার তা ত হল, কিন্তু আসছে বারটা সামলে দিও মা। আসছে বারটা মুখ রেখো জননী। এই বলে ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা-পর্যামর্শ করে আবার একটা মিথ্যে মামলা লাগায়।

চতুরানন চৌধুরী সাহেবের গাড়ী পোলের ওপর উঠল। বাঁ দিকে জেলখানা, জেলখানাটার দিকে তিনি তাকালেন একবার। রোজই তাকান। কালীঘাট আর আদালতের মাঝখানে এই জেলখানা। আদালত থেকে কালীঘাটে সবাই পৌঁছতে পারে না। মাঝখানে এই জেলখানায় আটকা পড়ে। তিনি আটকেছেন কত মাহুঘকে, পূজা চড়াতে আসতে পেরেনি কালীঘাটে। অর্থাৎ মা কালীর

হাতঘশ তিনিই অনেকবার খাটো করেছেন। কিছু আরও কমেছে মা কালীর। এ জন্তে তিনি এবং তাঁর মত লোকেরাই দায়ী। স্তবরাং মা কালী যদি মনে করেন যে চতুরানন তাঁর ব্যবসার কষ্টক তাহলে কিছুই বলবার নেই। তবে একটু বুঝলে মা কালীও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে হাকিম, জেলখানাব ভয় ন। থাকলে মানুষ আর তাঁর কাছে গিয়ে আছড়ে পড়বে না। কশ্মিনকালে যদি কখনও আদালতটা উঠে যায় ওখান থেকে, তাহলে মা কালীর দিন চলাও মুশকিল হবে।

গাভী নকুলেশ্বরতলার পেছনে নতুন রাস্তায় একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে পৌঁছল। চতুরানন চৌধুরীর পৈতৃক সম্পত্তি। রাস্তা বেরোবার দরুন বাড়ীর সামনেটা ভেঙে নতুন হারে গড়া হয়েছে। অনেক কালের বাড়ীটা, একদা ওটা বানিয়েছিলেন যিনি, তিনি ভয়ঙ্কর মানুষ ছিলেন। নাম ছিল তাঁব সহস্রানন চৌধুরী। চতুরাননের ওপর দিকে সাত আট পুরুষ আগের পুরুষ তিনি। তাঁর সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গল্প বলে এখনও কালীঘাটের পুরনো লোকে। তিনি নাকি আস্ত একটা পাঠা প্রত্যহ জলযোগ করতেন। একবার তিনি একশ আটটা নরবলি দিয়েছিলেন মা কালীর বাড়ীতে। দক্ষিণের একটা ভালুকের বজ্রাত প্রজাদের শায়েস্তা করবার জন্তে এই কর্ম করতে হয়েছিল তাঁকে। ছিপ পাঠিয়েছিলেন একশ-খানা প্রজাদের ধরে আনবার জন্তে। ধরে আনিয়া শ্রেফ বলিদান। একটার পর একটা, একেবারে একশ আটটায় পৌঁছে তাবপর থেমেছিলেন।

একথাও নাকি লেখা আছে কোন দলিলে যে, সাবর্ণ গোত্রীয় এই চৌধুরী বংশই মা কালীর সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন সেই মহাবাজ মানসিংহেব আমলে। হাকিম চতুরানন চৌধুরী তাই কালীঘাটের সঙ্গে সম্বন্ধ তুলে দিতে নারাজ। অবশু নরবলি দেবাব লোভে নয়, নরবলি এমনিই কত হচ্ছে এখন মাঘের বাড়ীর চতুর্দিকে। ধড় থেকে মুণ্ড খসাবার জন্তে সহস্রানন মাত্র একটা বরে চোপ দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই, এখন ঐ চোপের কায়দাটা একটু পালটেছে। এখন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটা হয়। সাবর্ণ চৌধুরী বংশের বংশধর চতুরানন কালীঘাটে বাস করছেন ঐ পেঁচিয়ে কাটাদের গায়ে একটু হাত বুলাবার জন্তে। তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী দেবী নিয়েছেন অল্প এক ব্রত। তিনি কালীঘাট থেকে নাবীবলিটা উঠিয়ে দিতে চান। আর বলিদান হয়েই গেছে যে সব নারীর, সেগুলোকে আবার জুড়েতেডে কালীঘাটের কালী' দ থেকে উদ্ধার করতে চান।

হাকিম নামলেন গাভী থেকে। নেমেই তাঁর মনে হল লেই মেয়েটার কথা। মাখাফাটা মেয়েটাকে সকালে দিয়ে গেল শশেঘোড়া। কে জানে ওটা আবার আমদানি হল কোথা থেকে! যাক, তবু ভাল যে জাহান্নমে নামবার আগের

মুহুর্তে ও পড়ে গেল শশেবোড়ার নজরে। নয়ত এতক্ষণে ওর কপালে কি যে ঘটত, তা ভেবে হাকিম সাহেবের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। অদ্বুত মানুষ ঐ শশী, দিন রাত নিজে ডুবে আছে নরকে। কিন্তু কাউকে সেই নরকে নামতে দেখলেই 'তাড়া' করবে। সেদিন ধরে এনেছিল কয়েকটা ফুলের ছোড়াকে। গলা টিপলে ছধ বেরায় এতটুকু সব বাচ্ছা, গিয়ে জুটেছে সত্যপীতলার মেলায়। মেয়ে একেবারে হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে ধরে এনেছিল সব কটাকে শশী। হাকিম চতুবানন তখন অভিভাবকদের তাকিয়ে তাদের হাতে ছেলেদের সঁপে দেন।

কিন্তু গায়ে হাত তোলাটা যদি বন্ধ কবো পারত শশী। ঐ একটা রোগেই একদিন ওকে থাকে। শুধু ওকেই থাকে না, হাকিম চতুবাননকেও ভোবাবে। সেই ছেলেদের অভিভাবকরা এসে দস্তুরমত শাসিয়েই গেলেন হাকিমকে বে-আইনী কাজ সমর্থন করা বন্ধন। গায়ে হাত তোলাটা বে আইনী কাজ যে, কিন্তু বেশী যখন পরসাদ দিলে মেলে বাজাবে তখন বেশীবাড়ী যাওয়াটা বে আইনী নয়। তাগো ছেলেগুলোর বয়স চোদ্দ বছরের কম ছিল, তাই অভিভাবকদের চোখ রাঙিয়ে সেদিন তাড়াতে পেরেছিলেন চতুবানন। সব কটা ছেলেকে রিফর্মেরিতে ঢুকিয়ে চিরকালের জন্য মাথা খেয়ে দেবেন দাগী কবে, এই কথা বলতে তবে তাঁরা আইনের ভয় দেখানো বন্ধ করেন।

এ মেয়েটার বয়সও বোধ হয় চোদ্দ বছরের কমই হবে। এই বকমের ছোট মেয়ে কত দে রয়েছে তীর্থস্থানের নবকে, কে তাব হিসেব রাখে। আইন বাঁচিয়ে বেচা-কেনা চলে ঐ সব ছোট ছোট মেয়ের। কাজেই ওপারের আদালতের নাগাল এপাবে পৌঁছয় না।

চতুবানন বাড়ীর ভেতর ঢুকলেন। শোনা যাক, গায়ত্রী কি সংবাদ বার করেছে মেয়েটার পেট থেকে।

গায়ত্রী দেবী ব সঙ্গে মুখোমুখি হয়েই এমন সংবাদ শুনলেন হাকিম সাহেব যে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছুটেতে হল যে ঘরে ফিনকি শুয়ে আছে সেখানে। বেহুঁশ ফিনকি জানতেও পারল না যে, একজন হাকিম তার পাশ বসে তাব হাতখানা ধরে তার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বইলেন। গায়ত্রী দেবী শোনালেন, ভাক্তার ডাকা হয়েছিল, ইন্জেকশন দিয়ে গেছেন। রক্তও নিয়ে গেছেন। বলে গেছেন টিটেনাস বোধ হয়, সাবধান না হলে টিকনো মশকিল।

আবার আধার।

একটু একটু করে আবার ঘুমিয়ে আসছে অন্ধকার হালদার মশায়ের দুই চক্ষে। আবার তিনি চলে যাচ্ছেন মরণের জঠর গহ্বরে। কালিতে ছেয়ে যাচ্ছে তাঁর দৃষ্টি, কালিতে ডুবে যাচ্ছে তাঁর অন্তর। সত্যিকারের মরণ কি এর চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর!

এ মরণ রোজই তিনি মরেন একবার করে। কিন্তু এতদিন এ মরণে দুঃখ ছিল, ভয় ছিল না। আজ যেন ভয় করছে তাঁর। যদি তিনি আর ফিরে না আসেন এই কালো অন্ধকারের গ্রাস থেকে! যদি কাল ভোরের আবার না দেখতে পান জানালার কাঁচগুলো! যদি কাল তপু তারুকেও চিনতে না পারেন হালদার মশায়!

আজ জীবনে সর্বপ্রথম তিনি জানতে পেরেছেন যে, মানুষ তাঁকে কি ভালোটাছ বাসে। আজ তিনি তাঁর ছেলেদের বৌদের ভট্টাচার্যকে বুড়ো মিশ্রকে সকলকে নতুন চোখে দেখেছেন। জীবনের ওপর আবার নতুন করে মায়া জন্মেছে তাঁর। তাই হালদার মশায় ভয় পাচ্ছেন আবার মরণের মাঝে তলিয়ে যেতে।

তা ছাড়া—

হাঁ, তা ছাড়া একটা বোঝাপড়া এখনও বাকী থেকে গেল। সেটা চুকিয়ে ফেলবার জন্তেও তাঁকে বঁচে থাকতে হবে আরও কিছুদিন। চোখের আলো কিছুতেই নিভে গেলে চলবে না এখন। চোখ না থাকলে যে কিছুই কবতে পারবেন না তিনি। শুয়ে শুয়েও তিনি অনেক কিছু করতে পারবেন, সেটাকে উদ্ধার করে এনে, যার জিনিস তার হাতে দিয়ে যেতে পারবেন, যদি চোখের আলোটুকু বজায় থাকে। নয়ত ঐ পাগল ঐভাবে কৈদে কৈদে ঘুরতে থাকবে আর যারা সেটা হাতে পেল তারা সেটা নিয়ে মজা করবে। ভাববে কাঁসারী হালদারকে ঠকিয়ে কি বস্তুই না হাতে পেয়েছি। বেটা হালদার চেয়েছিল যে, ঐ জিনিসের বদলে চিরকাল ওর পালা চালিয়ে মরতে হবে। গোপাল্য যাক, হালদার আর হালদারের পালা। আর ত বেটা উঠে এসে দাঁড়াতে পারবে না আমাদের দরজায়।

মাড়ি দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন হালদার মশায়। সবাই এল, আদিগঙ্গার এপার ওপার ছুপারের চেনা জানা কেউ বাদ রইল না আসতে। কাঁসারী হালদার মরছে শুনে রাস্তার ভিথিরী থেকে লাথপতি কোটিপতি পর্ষন্ত সবাই ছুটে, এল, এল না শুধু তারা। তার মানে কংসারি হালদার একেবারে উবে গেছে তাদের জীবন থেকে। কারণ যা তাদের পাবার ছিল কংসারি হালদারের কাছে, সেটা তাদের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়েছে।

পড়াচ্ছি, ঐ মুঠো আলাগা করার মন্ত্র জানি আমি। যদি কাল ভোরে আবার চোখের আলো ফুটে ওঠে কাংসারি হালদারের, তাহলে ভেব না তোমরা, যে কাংসারীর হাত থেকে পরিজ্ঞাণ পাবে। তোমাদের সর্বনাশ করে তবে আমি মরব। সে মরণের সময় একটি প্রাণীও আসবে না আমার ঘরে, হয়ত ঐ ছেলে বোঁরাও মুখে একটু জ্বল দেবে না, তাদের মুখ চিরকালের জন্তু হেঁট করিয়ে দিয়ে গেলাম বলে। হয়ত ভট্টচাঁষ প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্রগুলো পড়াবে না। সমস্ত কালীঘাট কাংসারি হালদারের নাম করে তখন থুতু ফেলবে। কাংসারি হালদারের উদ্ধর্তন চৌদ্দ পুরুষের নাম চিরকালেও জন্তু কালিতে কালো হয়ে যাবে। যাক, তবু এত বড় বেইমানির শাস্তি না দিয়ে কাংসারি হালদার মরবে না। জিনিসটা হাতে পেয়ে একটবার দেখতেও এল না। মরণ-শয্যায় শুয়ে আছেন তিনি, তবু তাঁর পালার ব্যাবস্থা করলে না তারা। ভাবলে, হালদারের বিষদাঁত আর নেই। আচ্ছা, সকালটা হোক, তারপর তাদের দেখাচ্ছি। যত বড় সর্বনাশই হোক কাংসারি হালদারের, তবু হালদার তাদের দংশন না করে মরবে না।

আঃ—

একশটা বিচ্ছেদ যেন একসঙ্গে ছল ফুটিয়ে দিলে হালদার মশায়ের শিরদাঁড়ার ওপর। আড্ডট হয়ে গেলেন তিনি।

একদিন আগেও যদি তিনি জানতে পারতেন যে তার ছেলেরা তাঁর পালার চালাবে। যদি তিনি একটিবারের জন্তুও বিশ্বাস করতে পারতেন এই বংশের ছেলেদের! যদি তাঁর বোমায়েরা একবারও জীবনে এত কাছে এসে দাঁড়াত তাঁর।

এই ত, এক বোঁ বসে আছে তাঁর পায়ের কাছে। নিঃশব্দে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওরা এবার তাঁর কাছে বসে রাত জাগবে। এক মুহূর্ত আর ওদের সজাগ সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে : ত পাববেন না তিনি। আঃ, এই সেবায়ত্ত আত্মীয়তার ছিটে-ফোঁটার আনন্দও যদি তিনি পেতেন এর আগে!

তাহলে এত বড় সর্বনাশ কিছুতেই হত না। কিছুতেই হাতছাড়া করতেন না তিনি সেই যন্ত্র। এ বংশের মান-ইজ্জৎ কখনও ধূলায় লোটাত না। ঐ যন্ত্র ঘরে থাকলে লক্ষ্মী সরস্বতী ঘরে বাঁধা থাকেন। তিনি পুরুষ পর্বন্ত লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন ঘরে, সরস্বতী বাস করেন মুখে। মনে মনে একবার আঙড়ালেন হালদার মশায়—

**সর্দারমুখ্য কমনা বাগেদবী মন্দিরে মুখে ।
পৌত্রান্তং শৈর্য্যমাস্মায় নিবসত্যেব নিশ্চিভম ॥**

সেই লক্ষ্মী সরস্বতীকে তিনি স্বহস্তে বিদেয় করেছেন ঘর থেকে । যা নিজের পালা নিজেই চালিয়ে নেন, এ কথাটা জীবনে বহুবার তিনিও উচ্চারণ করেছেন । কিন্তু সেই পালা চালাবার গবজে মাকেই তিনি ঘর-ছাড়া করে ছেড়েছেন । আর তাঁর ছেলেরা এই বংশেব ছেলের মত সারা দিন উপোস করে আজ পালা চালাচ্ছে ।

মনে মনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করলেন হালদার মশায়, কাল যদি আবার আলোর মুখ দেখতে পান তিনি, তাহলে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, একবার দেখে নেবেন তাদেব । হয় তাবা ফেরত দেবে সেই যন্ত্র, নথত জাহান্নমে যাবে । হালদার মশায়ের বংশও সেই সঙ্গে নামবে জাহান্নমে । তা নামুক, তবু তাদের ছাড়বেন না কংসাবি হালদাব । এত বড় বেইমানি কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করবেন না ।

অন্ধকার নেমে এল ফিনকিদের গলিতেও ।

সেই অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে গলিতে ঢুকে পড়ল ধনা । সারা দিনে অনেকবার সে হাঁটাচলা করেছে গলির মুখে, যদি একবার দেখাটা হয়ে যায় এই আশায় । একবার সে বেরোবেই, তেল, ছুন, লঙ্কা, হলুদ একটা কিছুব দরকার হলেই বেরোতে হবে তাকে গলি থেকে । আর তখন ধনা তাকে আবার একবার ঘাটে যাবার জন্তে অহুরোধ জানিয়ে হুট করে মিশে যাবে রাস্তার ভিড়ে । ব্যস, সোজা কাজ ।

কিন্তু গলির ভেতর ঢোকা সোজা কাজ নয় । ধর, যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে বসে কোনও কথা ? কেন সে ঢুকল গলিতে, কাকে সে চায়, কি দরকার আছে তার ও পাড়ায়, এই জাতের কোনও প্রশ্ন যদি কবে বসে কেউ ? কিংবা হয়ত ধর, দেখা হয়ে গেল খোদ সেই ফিনকির সঙ্গেই ? গলিতে ভিড় নেই, কারও না কারও নজরে পড়বেই যে, ধনাতে ফিনকিতে কথা বলছে । তাহলেই সেরেছে কর্ম, যা ছাঁচড়া মাছুষ সব, তৎক্ষণাৎ যার যা মুখে আসবে রটাতে শুরু করবে ।

তাছাড়া যা ভয়ানক মেজাজ মেয়ের, গলির ভেতর কিছু বলতে গেলে যদি অমনি

ওঁচামেটি করে লোক জমা করে ফেলে! কোনও কিছুই অসম্ভব নয় ও মেয়ের পক্ষে। এই সব সাত-পাঁচ বিবেচনা করেই ধনা দিনের বেলা গলিতে ঢুকতে সাহস করেনি।

কিন্তু সন্ধ্যার পর আর সে থাকতে পারলে না, ঢুকে পড়ল গলির ভেতর। সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই সে বেরোবে না বাড়ী থেকে, দেখা হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই তার সঙ্গে। তবু তাদের দরজার সামনে দিয়েও ঘুরে আসা হবে একবার। ভাল করে দেখে আসা হবে তাদের বাড়ীটা। আর সম্ভব হলে, অবশ্য কি করে যে সম্ভব হবে তা ধনার মাথায় এল না। কিছুতে, মোটের ওপর সম্ভব হলে তাকে একটু জানিয়ে আসা যে, ধনা ছায়ার মত আছে তার সঙ্গে। কারণ দেখাটা একবার হওয়াই চাই যে, আজ হোক কাল হোক, যেদিনই হোক। দেখা হলে ফিনকিকে বেশ করে সাবধান কবে দেওয়া চাই ঐ পাথরখানা সম্বন্ধে। জিসিসটাকে যেন হেলাফেলা না করে ফিনকি, কোনও রকমে যেন যত্ন করে লুকিয়ে রাখে আর কয়েকটা দিন। কংসারি হালদার চোখ ওটাল বলে, আজই যাচ্ছিল বুড়ো খতম হয়ে। তারপর ঐ পাথরখানা দিয়েই তাদের কপাল ফিরে যেতে পারে। তাদের মানে, তার আর ফিনকির দুজনেরই। দুজনের কপাল একসঙ্গে ফিরে যাবে ঐ গান্ধার পয়ে মানে, ঐ পাথরখানার পয়েই হয়ত জোড়াও লেগে যেতে পারে দুজনের দুখানা কপাল, জুড়ে এক হয়ে যেতে পারে। ধনা ত একবকম সব ঠিকই কবে ফেলেছে। চুরি-ছাঁচডামি আর কস্মিনকালে হবে না তার দ্বারা। ওসব ওঙ্কতেব কাজে আর সে নেই। খামকা মারধর খেয়ে মরা শার-তার হাতে। তাতে না ভরে পেট, না বাঁচে ইজ্জৎ। আর বিয়ে হয়ে গেলে তখন দু-দুটো পেট, দু-দুজনের ইজ্জৎ। কাজেই ওসব কাজে হাত দিয়ে আব হাত ময়লা করবে না ধনা। বরং সে সাইকেলের দোকানে একটা কাজ জুটিয়ে নেবে।

এ কথাটাও ফিনকিকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে যে সাইকেলের কাজে দিনে তিন সাড়ে তিন টাকা পর্যন্ত অনায়াসে কামানো যায়। ধনাই পারে সাড়ে তিন টাকা পর্যন্ত কামাতে, যদি বড় একখানা সাইকেলের দোকানে কাজ জোড়াতে পারে। সেই ধান্দাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ধনা। ওধারে ধনার ঠাকুমা বুড়ীও হচ্ছে হয়ে উঠেছে নাতির বিয়ে দেবে বলে। কিন্তু ধনা ঠাকুমাকে সাফ বলে দিয়েছে, যে, বিয়ের আগে কাজ পাওয়া চাই। ডালাধরা হয়ে চিরকাল সে মায়ের বাড়ীতে পচে মরতে পারবে না। আর মায়ের বাড়ীতে ধনা টিকতেও পারবে না কিছুতে। কোথাও একটা কিছু ঘটলেই লোকে খুঁজে বার করবে ধনাকে। ব্যস, তারপর চড়-খাপ্পড় আরম্ভ হয়ে গেছে কথরচায়। সেইটুকুই ভুল করে বুঝিয়ে

বলতে চায় ধনা ফিনিকিকে যে, বদনাম যখন একটা উঠে গেছে তার নামে কালীঘাটে, তখন কালীঘাটে থাকা তাদের কিছুতে পোষাবে না। সাইকেন সারাবার দোকান দুনিয়াময় আছে, পেটের ভাতও আছে সবখানে। এখন কোনও রকমে বিয়েটা হয়ে গেলে হয়। তারপর ধনা আর ফিনিকির জায়গার অভাব হবে না কলকাতা শহরে।

কিন্তু—।

ধনার পা ফেলা অনেকটা আড়ষ্ট হয়ে এল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কপাল কুঁচকে সে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু সে মেয়েই যদি বলে বসে—না। যা মেয়ে ও, ওই হয়ত বৈকে বসবে ধনাকে বিয়ে করতে। হয়ত বলে বসবে, ঐ চোরটার সঙ্গে বিয়ে দিলে বিষ খাব, গলায় দড়ি দেব। কিছুই অসম্ভব নয় ও মেয়ের পক্ষে।

সেইজন্তেই বিশেষ করে একটিবার দেখা কবতে চায় ধনা তাব সঙ্গে। মুখের কথায় যদি বিশ্বাস না করে তাহলে ধনা ওব গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করবে। বলবে, এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি যে চুরি-ছ্যাচডামি আমি ছেড়ে দিয়েছি। সেদিন মা কালীব মন্দিরে লোকে আমায় মেবেই ফেলত। তুমিই আমায় ঝাঁচিয়ে দিলে, নয়ত অত দামী হারছড়া ফেলত না দিলে, এবত কে কি তোমাব! সেদিন থেকেই ওসব ছোট কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি জন্মেব শোধ। ও সব কথা মনে উঠলেই সেদিনেব তোমার সেই চোখ মুখ আমার মনে পড়ে যায়। হাবছড়া ঝুলিয়ে ধরে হাতখানা মাথার ওপর তুলে নিচে থেকে তুমি চোঁচিয়ে উঠেছিলে, “হালদাব মশায়, পেয়েছি আমি, পেয়েছি সেই হার।” হাজার মানুষ সেদিন তাকিয়েছিল তোমাব মুখেব দিকে। সে মুখ আমিও দেখেছিলাম। সেইজন্তে ওসব কাজ মনে উঠলেই তোমার সেই মুখ আমি দেখতে পাই। আব অমনি মনে হয়, আবার ঐ ছোট কাজে হাত দিলে তোমার মুখ ভার হয়ে উঠবে। তাই আমার আর কিছুই করার উপায় নেই। বিশ্বাস করাতে হবে তাকে, যে হাজার ইচ্ছে থাকলেও ধনা আর জীবনে কখনও ছোট কাজ করতে পারবে না।

কিন্তু দেখা পেলে ত বিশ্বাস করাবে তাকে। বেকলই না যে সারাদিন সে গলি থেকে। অগত্যা ধনাকেই ঢুকতে হল গলির মধ্যে। যদিও সে ভাল করে জানে যে, এখন সন্ধ্যার পরে কিছুতেই দেখা হতে পারে না তার সঙ্গে। তবু ধনা চলল এগিয়ে, শুধু শুধু একবার ফিনিকিদের দরজার সামনে দিয়ে ঘুরে আসতে পারবে ত! আর ধর যদি তেমন বরাত হয় ধনার, তা হলে টপ করে একবার সাবধান করে দেবে পাথরখানা সন্ধ্যা। যেন কিছুতেই না খোয়া যায় ওখানা।

ভয়ানক দামী জিনিস ওটা, ফিনকি ত আর জানে না ওটার দাম। হালদার মশায় বার বার না বলে দিলে ধনাই বা বুঝত কি করে ওটার মূল্য কত। বুঝতে পেরেই ত ধনা ওখানা সঁপে দিলে ফিনকির হাতে। যেভাবে হালদার মশায় পাথরখানা ঠাকুরঘর থেকে আনালেন ধনাকে দিয়ে, যেভাবে তিনি ধনাকে ওখানা পৌছে দিয়ে আসতে বললেন খালের ওপারে একজনের নাম ঠিকানা দিয়ে, যেভাবে বার বার হালদার মশায় সাবধান করে দিলেন ধনাকে যেন কিছুতেই না হারায় সেটা, তাতেই ধনা বুঝে নিয়েছিল যে ঐ পাথরখানা যা-তা জিনিস নয়। পাথরখানাকে ধনার হাত থেকে নিয়ে বাব বার কপালে ঠেকালেন যখন হালদার মশায়, আবার ধনার হাতে দিতে গিয়ে তাঁর মত লোকের চোখে যখন জল এসে গেল, তখনই ধনা বুঝে নিয়েছিল যে একটা কিছু ব্যাপার আছে ঐ পাথরের মধ্যে।

কালীঘাটের হালদারদের বাড়িতে অমন কত কি সব মহামূল্য বস্তু আছে। তাই জন্তেই না হালদাররা লোকের মাথায় পা দিয়ে ঠাটে। আর তাই জন্তেই ধনা তৎক্ষণাৎ মতলবটা ঠিক করে ফেললে, ও জিনিস কখনও হাতছাড়া করতে আছে হাতে পেয়ে। কিন্তু বাথবে কোথায় সে লুকিয়ে ঐ পাথর? ঠাকুমা বুড়ীর হাতে দেওয়া যায় না বিশ্বাস করে, কারণ হাতেই দেওয়া যায় না। বিশ্বাস ধনা স্ট্রাকট কে না এই ছুনিয়ায়। অগত্যা শেষ পন্থা একমাত্র যাকে সে বিশ্বাস কবে, তাকে গঙ্গার ঘাটে ডেকে এনে তার হাতে গুঁজে দিয়ে সব পড়ল। মানে, কি যে হল সেদিন ধনার, একটা কথাও বলতে পারলে না তার সঙ্গে। যা ধমকা-ধমকি আরম্ভ কবল মেয়ে চোখ পাকিয়ে। নযত সেই সময়েই ধনা সাবধান করে দিত তাকে পাথরখানা সম্বন্ধে। কিন্তু কি যে হল তার তখন, না পারলে চোখ তুলে তার মুখের দিকে চাইতে, না পারলে পাথরখানা সম্বন্ধে ছোটো কথা বুঝিয়ে বলতে। এমন কি সব চেয়ে দরকারী কথাটাও বলা হল না।

সেটাও কিন্তু জানাতে হবে মেয়েকে। এ খবর দিতেই হবে যে ধনা তার ঠাকুমাকে বলেছে, বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে কঃ সে ঐ ফিনকিকেই। ঠাকুমা বুড়ী প্রথমে বঁকে বসেছিল, কারণ ফিনকির মা-ভাই এক পয়সা খরচা করতে পারবে না। না পারে না পারুক. তবু ঐ মেয়ে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না ধনা। এইটুকু বেশ বুঝতে পেরে শেষে ঠাকুমা রাজী হয়েছে। ফিনকির মা-ভাইও নিশ্চয়ই রাজী হবে। কারণ বিয়ে দিতে গেলে পয়সার দরকার। মেয়েকে খেতেই দিতে পারে না ত বিয়ে দেবে কোথা থেকে। কাজেই রাজী হয়ে বসে আছে ওরা, যখন জাত গোত্র সব ঠিকঠাক মিলে গেছে। এখন ঐ মেয়েই না বঁকে বসলে হয়। সেই ভয়েই আগে থাকতে আর একবার তার সঙ্গে দেখা

করাটা একান্ত দরকার খনায় ।

তাই এ গলি ও-গলি দিয়ে এগিয়ে চলল খনা সন্ধ্যার পর । শেষ পর্যন্ত পৌঁছল, শেষ মোড়টা ফিরতেই দেখা গেল ফিনকিদের দরজা ।

কিন্তু ও কি ! বাড়ীর দরজায় ভিড় কেন ? জিনিসপত্রই বা সব বার করা হয়েছে কেন বাড়ী থেকে সন্ধ্যার পর ?

খনা ভুলে গেল যে, এ-সময় তাকে ওখানে দেখলে লোকে পাঁচ রকম প্রশ্ন করে বসতে পারে । সোজা সে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফিনকিদের দরজাব সামনে । প্রথমেই যে কথা তার কানে গেল, তাতে তার দুই চোখ কপালে উঠে গেল একেবারে । সুনলে, ফিনকির মা কাঁদছেন । কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, “আজ রাস্তিবাটা অন্ততঃ আমায় নিয়ে যাসনি ফণা এখান থেকে । ফিববেই ফিনকি, ওরে আমি বলছি সে ফিববে । ফিববে আমাদের দেখতে না পেলে সে কববে কি ? যাবে কোথায় ?”

যাবে কোথায় ? গেল কোথায় সে ?

কোথায় যেতে পারে ফিনকি ? কেন সে পালাতে গেল ?

ও মেয়েকে কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাবে এ কি কখনও সম্ভব হতে পারে ?

খনা নিজের মনেই নাড়লে একবার নিজের মাথাটা । না, কিছুতেই ফিনকিকে কেউ চুরি করে নিয়ে যায়নি । কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে, ফিনকির চোখের ওপর চোখ রেখে যা তা কিছু একটা বলবে । আব জোর করে, তাকে আটকে রাখা, ওরে বাপরে । তাহলে এতক্ষণে হয়ত আঁচড়ে-কামড়েই তাদের দু-একজনকে খতম কবেছে ফিনকি । নয়ত নিজেই গেছে শেষ হয়ে, মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে । সবই সম্ভব ওই মেয়ের পক্ষে, শুধু সম্ভব নয় একটি জিনিস । খনা বার বার মনে মনে ঘাম নাড়ল । না, কিছুতেই তা সম্ভব নয় কোনও লোভেই ফিনকি খারাপ কাজ করতে পারে না, না ।

অতএব এখন প্রধান কাজ হল তাকে খুঁজে বার করা । চুলোয় যাক সে পাথর-মাথর, কুচুপোড়ার পয় আছে সে পাথরে । ঐ পাথরখানাব জন্তেই হয়ত কোনও বিপদে পড়েছে ফিনকি । ঐ পাথরখানার লোভেই কেউ আটকানি ত তাকে ? কাউকে হয়ত দেখিয়ে থাকবে পাথরখানা, যে জানে ওটা কি । ব্যস, তারপর সেই অলক্ষণে পাথর নিয়ে লেগে গেছে থেয়োথেয়ি । যা সাংঘাতিক মেয়ে ফিনকি, কিছুতেই দিতে চায়নি সেই পাথর । শেষ পর্যন্ত পাথরের জন্তেই বেচারাকে পড়তে হয়েছে কারও ফাঁদে । পাথর হাতছাড়া না করলে আর ফাঁদ কেটে বেরোবার উপায় নেই তার ।

কিন্তু পাথরখানা এখন আছেই বা কোথায় ?

পাথরখানা কি এখনও সঙ্গে আছে ফিনকির ?

ওঁরা ত চলে গেলেন আড়তদারটার সঙ্গে ওপারে । ঐ ঘরেই কোথাও লুকিয়ে রাখেনি ত ফিনকি পাথরখানা ?

কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে ধনা, কে-ই বা উত্তর দেবে তাকে ? সর্বপ্রথম ধনার জানা দরকার কখন গেল ফিনকি, কি অবস্থায় গেল সে । বাড়ী থেকেই সোজা চলে গেল, না অন্ত কোনও কাজে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরেনি ? অনেক কথাই জানা দরকার এখন ধনার, কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে সে কাকে ? ও-বাড়ীর বা ও-পাড়ার কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে উন্টে বিপদ ঘটবে । আড়তদার মশায় যে পুলিশটাকে ফিনকিদের বারান্দায় বসিয়ে রেখে গেল, সেই পুলিশটাকে তখন জানিয়ে দেবে লোকে যে এই ছোড়া মেয়েটার খোঁজ কবছে । বাস, তার মানে তাকেই ধরে টানাটানি জুড়ে দেবে তখন । খানায় নিয়ে গিয়ে মারধর করে আটকে রাখবে সারা রাত । তাহলেই সব কাজের দফা দফা একেবারে । এখন কিছুতেই কোথাও আটকে থাকলে চলবে না ধনার । খুঁজে বার করতেই হবে তাকে, এই রাতেই খুঁজে বাব করতে হবে । কে বলতে পারে এখন কি অবস্থায় আ । সে । কিন্তু যে অবস্থাতেই পড়ুক, যেখানেই থাকুক, খুঁজে তাকে বার করবেই ধনা । ধনাব ইচ্ছে করতে লাগল, নিজের গালে থান্ড লাগাতে । কেন সে মবতে দিতে গেল সেই সর্বনেশে পাথরখানা ফিনকির হাতে । যাদেব দেবার জন্তে হালদার মশায় বিশ্বাস করে তুলে দিলেন পাথরখানা ধনার হাতে, তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এলেই ত চুকে যেত লেঠা । কেন ঐ দুর্বুদ্ধি হঠাৎ ঘাড়ে চাপল ধনার ? মরণাপন্ন একজন মানুষ তাকে চোব জেনেও বিশ্বাস করে একটা কাজের ভার দিলেন । কাউকে না জানিয়ে ধনাকেই বিশ্বাস করলেন হালদার মশায় । আর ধনা তাঁব সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে, অথচ হালদার মশায় যদি না বাঁচাতেন সেদিন, তাহলে কিছুতেই পুলিশ তাকে ছেঁত না । মাল পাওয়া যাবার পরেও পুলিশসাহেব চোরকে চালান দিতে চেয়েছিল । হালদার মশায় সাহেবের হাতে ধরে তবে ছাড়ালেন । সেই জন্তেই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তাকে, মনে করেছিলেন ধনা অন্ততঃ তাঁর সঙ্গে নিমকহারামিটা করতে পারবে না । নিমকহারামি করার ফল হাতে হাতে ফলল, সর্বনাশ হাফ গেল ধনার । ধনার ইচ্ছে করতে লাগল রাস্তার গ্যাসপোস্টের গায়েই নিজের কপালটা ঠুকতে । এখন কোথায় যাবে সে ? কার কার কাছে গিয়ে ফিনকির কথা জিজ্ঞাসা করবে ?

হঠাৎ একটা মতলব খেলে গেল ধনা মাথায় ।

আজ্ঞা, এমনও ত হতে পারে, যে তারাই আটকে রেখেছে ফিনকিকে । যাদের কাছে পাথরখানা পৌঁছে দেবার ভার দিয়েছিলেন হালদার মশাই । কোনও রকমে হয়ত তারা জানতে পেরেছে যে, পাথরখানা আছে ফিনকির হাতে । তাই তারা ধরে নিয়ে গেছে তাকে । কিছুই অসম্ভব নয়, যে রকম ভাবে সকলকে লুকিয়ে হালদার মশায় ধনাকে দিয়ে সরাতে চেয়েছিলেন পাথরখানা তাঁর নিজেরই বাড়ী থেকে, তাতে এটুকু ত স্পষ্ট জানা গেছে যে, হালদার মশায়ের ছেলেরা জানতে পারলে কিছুতেই ওটা বাড়ী থেকে বেরতে দিত না । আর এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে যাদের হাতে ও জিনিস পাচার করতে চেয়েছিলেন হালদার মশায়, তাদের উনি ওঁর ছেলেদের চেয়েও বেশী বিশ্বাস কবেন বা আপন জন মনে করেন ।

কিন্তু কে তারা । কি সম্বন্ধই বা আছে তাদের সঙ্গে হালদার মশায়ের ? এমনও ত হতে পারে যে তাদের খোঁজ করতে পারলেই ফিনকির খোঁজ পাওয়া যাবে । কি যেন ঠিকানাটা তাদের ।

ধনা নিজেব মনে বিডবিড কবে আঙড়ে নিল তাদের ঠিকানা । প্রথমে পার হতে হবে খালটা মা কালীর ঘাট থেকে । তারপর কোন্ দিক দিয়ে কোন্ গলির ভেতর যেতে হবে, কতবাব ডাইনে বাঁয়ে ঘুবতে হবে, শেষে কোন্ বাড়ীর কোন্ জানালায় নীচে দাঁড়িয়ে কি একম ভাবে ডাকতে হবে, সব পাখি-পড়ানো কবে পড়িয়ে দিয়েছিলেন তাকে হালদার মশায় । একটুও কষ্ট হবার কথা নয় সে বাড়ী খুঁজে বার করা । অতএব ধনা চলল ঘাটে, সর্বপ্রথম আগে সেহ বাড়ীতেই খোঁজ নিয়ে আসা যাক, যে ফিনাকিকে তারা ধরে রেখেছে কি না ।

ধনা পার হল খাল । খালের ওপারে হয়ত পাওয়া যাবে তাব ফিনকিকে, এই আশায় সে খাল পার হয়ে গেল ।

হালদার মশায়ও খাল পার হয়ে গেলেন মনে মনে । ওপারে তাঁরা এপারে তিনি, মাঝে বয়ে চলেছে ঐ খাল । শুকনো মরা খাল, কখনও এক ছিটে ময়লা-গোলা ঘোলা জল থাকে, কখনও একেবারে খটখট করে । তবু ঐ আদিগঙ্গা, আরও ভক্তিভরে যাকে বলা হয় কালীগঙ্গা । তাঁরে বসে লোকে চোদপুরুষের পিণ্ডি দেয়, কেওডাতলার ঘাটে নাভি বিসর্জন দেয়, আবও কত কি বিসর্জন দেয়, ঐ খালে । বিসর্জনের বিষে শেষ পর্যন্ত মা গঙ্গা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেন দেখতে দেখতে, যেমন হালদার মশায় নিজেও বিশ্বের জালায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছেন ।

ঐ খালের পচা পাকে কতটা পরিমাণ বিষ জমে আছে তাও যেমন কেউ বলতে পারে না, তেমনি হালদার মশায়ের ভেতরে যা জমা আছে তাও কেউ জানে না ।

জানে না তাই রক্ষে, নয়ত পালাত সকলে তাঁর ত্রিসীমানা ছেড়ে । এই যে ছেলেরা, বোমায়েরা তাঁর আশেপাশে বসে রাত জাগছে, ওরা কেউ তিষ্ঠতে পারত না বিঘের জালায় । সহ করতে পারত না সেই আঁচ, যা সদাসর্বক্ষণ হালদার মশায়ের বুক, পিঠ, পাঁজরা, শিরদাঁড়া ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে পোডাচ্ছে । তিন কুড়ি বছরের ওপর মা কালীর সেবায়তে কংসারি হালদার মশায় নিবিড় আধারের মাঝে ডুব দিয়ে হাতভাতে লাগলেন, এমন কিছু একটা হাতে পাবার জন্তে আঁকুপাঁকু করতে লাগলেন, যেটা ধরতে পারলে আবার তিনি ভেসে উঠতে পারবেন, আলোর মুখ দেখতে পারবেন, নিশ্বাস নিয়ে বুকটা জুড়তে পারবেন । কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত কিছুই ঠেকল না তাঁর হাতে, দম ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল । অবশেষে আবার সেই খাল, মরা খালের এপারে এতটুকু আলো নেই, হাওয়া নেই, কিছু নেই । কাজেই হালদার মশায় আবার খাল পার হয়ে গেলেন মনে মনে । গিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলেন । এতটুকু হাওয়া নেই এপারে কংসারি হালদারের জন্তে, আলো ত নেই । মরা খালের এপারটা অনেক কাল আগে মবে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আশা-নিবাশা ভয়-ভক্তি প্রেম-করুণা পাপ-পুণ্য সব চেটেপুটে থেয়ে বসে আছে ঐ কালামুখী কালী । সব দোহাই দিয়ে হেন ব্যবসা নেই যা চলছে না এপারে । কংসারি হালদার মশায় তাঁর তিন কুড়ি বছরের কারবারের জের টানতে গিয়ে দেখলেন মজুদ কাঁবিল একটা কানা ক'ডও পড়ে নেই । লাভের গুড পিঁপড়েয় থেয়ে গেছে ।

এলোমেলো ভাবনা সব দল বেঁধে হুল্লোড় করতে লাগল হালদার মশায়ের মাথাব মধ্যে । এক দল এসে আসন পেতে বসতে না বসতেই আর এক দল এসে নান্দেব ঘাডেন ওপর বসে পড়ল । যেন কালী বাড়ির কাঙালী ভোজন, ভাবনা-গুলো সব কাঙালী যেন । হালদার মশায়ের নজরটা একটু যাতে পড়ে তাদের ওপর, এই আশায় সবাই হুড়-হুড় হেউনি জেঙুলি জুড়ে গেছে । ভাবনাক ভয় পেয়ে গেলেন হালদার মশায়, ভয়ে একেবারে শিটিয়ে পড়ে রইলেন ।

ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না ত তাঁর ভাবনাগুলোকে ।

ওরা যে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি মেলে বসে আছে ওঁর চারিদিকে । একা হালদার মশায় কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু ওদের চোখে ত আধার নামেনি । সর্বনাশ হালদার মশায়ের বকের ভেতর থেকে তিনকুড়ি বছরের ইতিহাস সাক্ষার রূপ ধরে বেরিয়ে পড়ে যদি ছেলে বোঁদের চোখের সামনে ! সর্বনাশ, সর্বনাশ হয়ে যাবে একেবারে ।

দূর, দূর, দূর হয়ে যা সব । দে দে ব দূর করে খেদিরে, তাড়াতাড়ি আমার সামনে

থেকে। বাঁটা ঘেরে, জুড়িয়ে বিদেয় কর সবাইকে।

বিড়বিড় করতে লাগলেন হালদার মশায়। তারকারি হালদার হুঁকে পড়লেন বাপের মুখের ওপর।

“বাবা, বাবাগো, কি বলছ বাবা ?”

চটকা ভেঙে গেল হালদার মশায়ের। চোখ মেললেন তিনি, কিন্তু মেলেও কিছু দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন খুব ঠাণ্ডা গলায়, “রাত কত ?”

রাত তখন অর্ধেকও পার হয়নি। শুনে হালদার মশায় আবার চোখ বুজলেন। ভয়টা কিন্তু কিছুতেই ছাড়ল না তাঁকে। ওরা কেউ দেখে ফেলেনি ত তাঁর ভাবনাগুলোকে। ব্যতিবাস্ত হয়ে উঠলেন হালদার মশায়। আঃ, পোড়া রাতটা কি আর পোহাবে না কিছুতে! রাত পোহালে তাঁর চোখের আলো ফিরে পাবেন তিনি। তখন ভাল করে একবার ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবেন যে, ওরা কতটুকু কি জানতে পেরেছে। ভয়ানক সাবধান হবে গেলেন হালদার মশায়। না, আর কিছুতেই ঘুমে না পেয়ে বসে তাঁকে। স্বপ্নে যদি কিছু প্রকাশ হয়ে যায় তাঁর মুখ থেকে। খুব সজাগ থাকতে হবে রাতটা, কারণ অত জোড়া সজাগ দৃষ্টির সামনে তিনি অন্ধ হয়ে পড়ে আছেন। এরা একটু বেরোয় না কেন তাঁর ঘর ছেড়ে। একলা থাকতে পারলে এখন স্বস্তি পান তিনি। কিন্তু ওরা নড়বে না, কোনও মতেই আর তাঁকে একলা ফেলে রেখে যাবে না কোথাও। আঃ, কি যন্ত্রণা। রাতের যে এখনও অর্ধেকটা বাকী।

আর একটা রাত, অনেক বছর আগের এই রকমের এক রাতের অর্ধেকটা তখনও পাব হয়নি। হালদার মশায় সে রাতে বাড়ী ফিরতেও পারেননি। রাত একে-বারে শেষ হয়ে গিয়েছিল বাড়ীতে ফিরতে তাঁর। তপু আর তারু সে বছরই বোধ হয় ম্যাট্রিক দেয়! ওদের মা সেই বছরই দ্বোগে পড়ল। আব হালদার মশায় সেই যে গৌফ কামিয়ে ফেললেন তারপর আর তিনি গৌফ রাখেননি।

ঈ, সেই রাতটির অর্ধেকও তখন পার হয়নি। হালদার মশায়ের দুহাত ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করে উঠেছিল সে। প্রাণপণে চেষ্টা করেও তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়নি তেমন। বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল যে, আওয়াজ বেরবে কেমন করে। কি বিপরীত লাশ! এক কুড়ি মাসের লাগল কেওড়াভায়া নিয়ে যেতে। এককুড়ি মাসের জুটিয়েছিলেন হালদার মশায় সেই রাজ্জৈ। কিছুই অসম্ভব ছিল না তখন কংকারি হালদারের। একটি করে মদের বোতল, পাঁচটি করে টাকা আর

এক জোড়া করে খুঁটি চান্দ্র প্রত্যেককে। এক হুড়ি মানুষ দিয়ে লাশ নিইয়েছিলেন তিনি কেওড়ালায়। তিন টিন ঘি চেলে ষট। তিনেকের ভেতর কাবার করে দিয়েছিলেন সেই লাশ। বাস, নেয়ে খুয়ে যখন বাড়ীতে ফিরেছিলেন হালদার মশায় তখন আর একটুও বাকী ছিল না রাত কাবার হতে। মনে পড়ে গেল, ষট মনে পড়ে গেল হালদার মশায়ের যে তখন মায়ের বাড়ীর পায়বাগুলো বুম বুম বক বকম বুম, জুড়ে দিয়েছিল। বাড়ীতে ঢোকার আগে বেশ কিছুক্ষণ তিনি ওদের বক বকম বুম শুনেছিলেন কান পেতে। সেই ভয়ঙ্কর নিশ্চুতি ভোরে পায়বার ডাক শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন হালদার মশায়। বিশ্রী বকম চমকে উঠেছিলেন তিনি, মনে হয়েছিল পায়রার বক বকম বুমের মধ্যে একটা কথা লুকিয়ে রয়েছে যেন। মনে হয়েছিল, পায়রাগুলো বক বকম বুম কবে যা বলতে চাইছিল তাঁকে ত, তিনি ধরতে পাবছেন, মানে বুঝতে পাবছেন ওদের ভাষার। তখন থেকে তিনি পায়রা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। আরও একটা মুশকিল হয়েছে, তখন থেকে তিনি মায়ের বাড়ীর পায়রার চোখের দিকে চাইতে পারেন না। অনেকবার তিনি এ প্রস্তাবও করেছিলেন যে, ঐ পায়রার গুটিকে মায়ের বাড়ী থেকে বিদেয় করা হোক। অনর্থক ঐ আপদে নোংরা কবছে মায়ের মন্দির, নাটমন্দির, বারান্দা। কিন্তু পায়রা মায়ের বাড়ী থেকে ত্যাগানো যায়নি। নেপালী ব্যাটারদের জালায় সম্ভবও নয় পায়রা নিকেশ করা মায়ের বাড়ী থেকে। প্রত্যেকটি নেপালী এক জোড়া পায়রা এনে কপালে সিঁহুর লাগিয়ে ছেড়ে দেবে ছালাধরা চাব আনা দক্ষিণা পায়, পায়বার কপালে সিঁহুর লেপে নিবেদন কবে দেবাব জন্তে। কাজেই মায়ের বাড়ী থেকে পায়রা দূর করা সম্ভব হয়নি কিছুতেই।

হালদার মশায় দেখতে লাগলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। অনেকগুলো পায়রা তাঁর চারদিক ঘিরে ঘাড় ফুলিয়ে নাচছে। নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে আসছে তাঁর খুব কাছে, এসে মাথা বঁকিয়ে তাঁর দিকে এক চোখে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকছে কিছুক্ষণ। পায়রার চোখ কত রকমের হয়! সব পায়বার চোখই কি ঐরকম লাগচে গোছের হয়। যেন ছোট্ট গোল এক টুকরো গোমেদ, পায়রার চোখে কি গোমেদ জলে। কি রকম যেন একটা আতঙ্ক হয় পায়রার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে, যেন খুব ছোট্ট একটু আঙুলের ফিনকি লুকিয়ে রয়েছে সেই চোখে। সেই চাউনি বলতে চায়, জানি, সব জানি আমরা হালদার, কিছুই লুকোতে পারনি তুমি, কিছুই লুকোনো যায় না আমাদের দৃষ্টি থেকে। আমাদের বলিদান হয়েই গেছে কি না মায়ের স্থানে। বলিদানের পর আমরা বেঁচে আছি, তাই আমরা সব দেখতে পাই। দুনিয়ার যেকোনো যা কিছু ঘটছে তাঁর কোনও

কিছুই আমাদের দৃষ্টি থেকে লুকোনো যায় না। যেখানে যে বলিই হোক, মায়ের বাড়ীও ভেতর থেকে আমরা দেখি সেই বলি। দিনরাত অষ্টপ্রহর বলি দেখতে দেখতে আমাদের চোখ থেকে এই রকম লালচে ছটা ঠিকরোয়।

হালদার মশায় হিসেব করে দেখেছেন, মানে অনেকবার মনে মনে মিলিয়ে দেখেছেন ভূধর ভৌমিকের সেই চাউনিও সঙ্গে পায়রাব চোখের চাউনিও যেন কেমন একটা মিল আছে। শেষ পর্যন্ত ভূধর ভৌমিক ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, ছটফট-খড়ফড় আছাড়-পাছাড় বন্ধ হয়ে গেল তার, গলা দিয়ে আব আওয়াজও বেরল না। শুধু লোকটা ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একতরফী দুই চক্ষু, পায়রাব চোখে চেয়ে অনেকগুণ বড় সেই চোখ, কিন্তু দৃষ্টিটা যেন ঐ পায়রাব দৃষ্টির মত। কিছুতেই ভুলতে পারেন না সেই চাউনি হালদার মশায়, জেগে বা ঘুমিয়ে বা স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ সেই রক্তবর্ণ চোখ দুটো তাঁর চোখে সামনে ভেসে ওঠে, আব তিনি সজোবে নিজের দুই চোখ চেপে ধরেন। দুই হাতে দুই চোখ কচলাতে থাকেন প্রাণপণে। এই ভাবে চোখ কচলাতে কচলাতেই তিনি রাতের দৃষ্টিটুকু খুঁজেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, দিনেও তিনি খুব স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পান না। তবু হালদার মশায় চশমা নেননি, কাবণ চশমা নিলে তিনি চোখ কচলাতে পারবেন না। চোখ কচলাতে না পাবলে চোখেও করকরানিতে প্রাণটাই বেবিষে যাবে তাঁর। এই ভয়েই তিনি চশমা নেননি।

চোখ দুটো আবাব করকর করে উঠল হালদার মশায়ে। দুহাতে তিনি দুচোখ কচলাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারকারি বলে উঠলেন, “বাবা, দু’ফোটা গোলাপ জল দিয়ে দি তোমার চোখে। হাতটা একটু সরো।”

গোলাপ জল দেওয়া হয়ে গেল চোখে। একবার একটু জ্বালা করে উঠল চোখ দুটো, তারপর বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হালদার মশায় আবাব নিশ্চর হয়ে পড়লেন।

ভূধর ভৌমিকও নিশ্চর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু চোখ দুটো সে বোজেনি। কেওডাতলায় যখন তাকে তোলা হল চিতায় তখনও সে একভাবে চেয়েছিল। একটাবাব মাত্র হালদার মশায় তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সে সময়। দেখেছিলেন, ভৌমিক তখনও সমানে চেয়ে রয়েছে। মনে হয়েছিল হালদার মশায়ের যে ভৌমিক তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। সে চাউনিতে কি ছিল। ওই ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে কি বলতে চাইছিল ভৌমিক। কি সে বোঝাতে চাচ্ছিল তাঁকে।

কিছুই নয়, ভৌমিক তাঁকে কি বলতে পারে? তখন তাঁর কাছ থেকে কি

আশা করতে পারে ভৌমিক ? কি-ই বা তিনি করতে পারতেন সে সময় ? সব শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে ডাকা হয়েছিল, বিষ তখন পেটেই ঢুকে পড়েছিল ভৌমিকের । বিষের চরম ফল ফলেই গিয়েছিল তখন । ডাক্তার বণ্ডি জড় করে সেই অস্তিম মূহুর্তে কতটুকু লাভ হত ? বাঁচাতে কি পারতেন তখন ভৌমিককে হালদার মশায় ? কিছুতেই নয়, কিছুতেই ভৌমিক বাঁচত না তখন । শুধু হত খানিক কেলেকাবি, খানা পুলিশ কোর্ট কাছারি পর্যন্ত গড়াত ব্যাপারটা । শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণও হত যে, কে কি উদ্দেশ্যে বিষ খাইয়েছিল, তখন ভৌমিককে, তাহলেই বা হত কি ? কিছুই হত না, আশামীর গলাব দিকে তাকিয়ে হাকিম নিশ্চয়ই ওই গলায় দাঁড়ি বেঁধে ঝোলাবার হুকুম দিতে পারত না নবম তুলতুলে মোমের মত গলাটা, পর পর তিনটি রেখা সাজানো রয়েছে গলায় । আর কি তার রঙ, পিচটুকু গিললেও দেখা যায় গলার ভেতর দিয়ে নামতে । ওই গলায় দাঁড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখার হুকুম দিতে পারত কোনও হাকিম ! অসম্ভব, অসম্ভব, একি পাঠা ছাগলের গলা নাকি যে ঝপ করে কোপ বসালেই হল ।

আচ্ছা, প্রথমেই কি হালদার মশায়ের নজর পড়েছিল তার গলাও ওপর । উঁহ, গলার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি অনেক পরে । প্রথমে নজর পড়ল শুধু দুখানি হাতের ওপর, হাত দুখানি চেপে বসে রয়েছে তাঁর পায়ের পাতায় । নজর পড়তেই তাঁর পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কেমন যেন কেঁপে উঠল, শিশির করে উঠল তাঁর শরীরের ভেতরটা । অত নবম অত ফর্সা আর অমন গড়নব তুলতুলে হাতের স্পষ্ট তাঁর কাদকার পায়ের ওপর, এ যেন তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না । পা ছাড়িয়ে নেবারও শক্তি ছিল না তখন তাঁর । কাঠ হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে ।

তারপর, তার অনেকক্ষণ পরে, আশ্বে আশ্বে ওপর দিকে উঠল একখানি যুথ । তখন দেখতে পেলেন হালদার মশায় চোখ দুটি । হাঁ, ত কক্ষণ লেগেছিল তাঁর সেই চোখ দুটি দেখতে, অনেকক্ষণ পরে তিনি সরাসরে পেরেছিলেন তাঁর নজর, সেই চোখ দুটির ওপর থেকে । সামান্য একটু জলে ডুবে ছিল সেই চোখ দুটি তখন, জল কিন্তু একটু গড়িয়ে নামেনি চোখ উপছে । জলে ডোবা সেই চোখে কি যে পড়েছিলেন হালদার মশায়, তা এতদিন পরে আর ঠিক মনে করতে পারেন না । মানে, মনটা এখন তাঁর ভয়ানক বুডো হয়ে দরকচা মেয়ে গেছে কিনা ।

চোখের ওপর থেকে নজর সরিয়ে আনতে গিয়ে নজর পড়ল সেই গলায় । গলাটাও তখন ওপর দিকে চিত হয়ে রয়েছে । তিনটি সৰু রেখা পরপর সাজানো ছিল সেই গলায় । গলায় নজর পড়তেই, তিনি চমকে উঠেছিলেন । 'না, ওরকম

গলায় দড়ি বেঁধে ঝোলাবার ব্যবস্থায় কিছুতেই কংসারি হালদার সাহায্য করতে পারেন না।

ব্যস, ও-পক্ষের যা কিছু বলার ছিল তা বলা হয়ে গেল। এ-পক্ষের বোঝবার যতটুকু তাও বোঝা হয়ে গেল। ঠোঁট নাড়তে হল না, গলা দিয়ে স্বর বার করতে হল না, কোনও কিছু ইঙ্গিতও করতে হল না। চোখ দুটি, গলাটি আর হাতের পাতা দুখানি সব বলে শেষ করে ফেললে। বললে অতি সাদা কথা। বললে, “এই গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে, এই কি তুমি চাও?”

তখন পা টেনে নিয়েছিলেন হালদার মশায়। তারপর ভূধর ভৌমিকের ম্যানেজার জয়গোপাল সামন্ত তাঁর সামনে দাঁড়াতে সাহস করেছিল। কিছুই নেননি হালদার মশায়, কিছুই দাবি করেননি তাদের কাছে। শুধু একটি কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, বছরে যে কটা পালা পড়বে তাঁর, সে কটা পালা চালিয়ে দিতে হবে। অতবড় স্টেট হাতে পেয়ে, বছবে আড়াই হাজার তিন হাজার খবচ করা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। নগদ এক আধলাও নিতে পারবেন না হালদার মশায়, একটি কানা কড়িও তিনি নেবেন না তাঁর নিজের জঙ্গে। তবে মাঘের পূজো দিতে হবে, বছরের পব বছর যতদিন কংসারি হালদার বেঁচে থাকবেন ততদিন তার পালা কটার খরচা দিতে হবে। ভূধর ভৌমিক যখন হালদার মশায়ের যজমান, আর সেই যজমান যখন তাঁর কাছে এসেই অপঘাতে মল তখন যজমানের স্টেট থেকে মাঘের পালাব খরচাটুকু যদি পান তিনি চিরকাল, তাহলে যজমানের সংকরটুকু যাতে নিবিয়ে নিব্ব ঝাটে সমাধা হয় তার ব্যবস্থা করতে রাজী আছেন তিনি।

ও-পক্ষও রাজী হয়ে গেল। যে কোনও শর্তে তখন বাজী হত ওরা। ভূধর ভৌমিকের লাশ পোড়ানো হয়ে গেল। মুখে আগুন দিতে গেল জ্বী, ম্যানেজার গেল সঙ্গে। হালদার মশায় উপস্থিত বইলেন আগাগোড়া শ্রাশানে। এবং উল্লেখযোগ্য একটি কর্ম সমাধা হয়ে গেল সেই সময়টুকুর মধ্যে। বডলোক ভূধর ভৌমিক সঙ্গীক তীর্থ করতে এসেছিলেন গোটাচারেক তোরঙ্গ স্ট্রাকেস নিয়ে। ম্যানেজারেরও ছিল স্ট্রাকেশ বিছানা। পাছে সব চুরি যায় এই ভয়ে, হালদার মশায় সমস্ত সরিয়ে ফেললেন নিজের হেপাজতে। যাজীতোলা বাড়ীতে ত আর সে সব জিনিস বিশ্বাস করে রাখা যায় না। শ্রাশান থেকে ফিরে আসবার ঘন্টা দুয়েক পরে ফিরিয়েও দিয়েছিলেন তাদের যথাসর্বস্ব। শুধু থানকয়েক চিঠি খুঁজে পেতে বার করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। চিঠিগুলো পাওয়া গেল ভূধর ভৌমিকের বিধবা জয়জয়ন্তী দেবীর হাত বাস্তের ভেতর। ঐ চিঠি কখানি মাজ

সরিয়ে রেখেছিলেন হালদার মশায়। চাবিওয়ালাকে ডাকিয়ে বাস্তু খুলিয়ে মাত্র চিঠি-কথানি বার করে নিয়ে সোনাদানা সমস্ত ঠিকঠাক মাজিয়ে রেখে বাস্তুটি ফেরত দিয়েছিলেন। হালদার মশায় তাঁদের তীর্থগুরু, তীর্থগুরু কখনো অবিশ্বাসী হতে পারে না। ওঁরা সব জিনিসপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে নিয়ে সম্বল হয়েছিলেন। একটি কানাকড়িও এখার ওখার হয়নি।

সেই চিঠিগুলো এখনও রয়েছে ঐ দেয়াল-আলমারির ভেতর। এমনভাবে লুকানো আছে যে সহজে কেউ টের পাবে না। আর চাবিটা রয়েছে হালদার মশায়ের গদির তলায়। আছে ত ঠিক! হঠাৎ চাবির কথা মনে পড়তেই অস্থির হয়ে উঠলেন হালদার মশায়।

ডাক দিয়ে ফেললেন, “তারু, তারু আছিস নাকি রে এখানে?”

পর মুহূর্তে সাড়া পেলেন তিনি তাঁর মাথার কাছ থেকে, “হ্যাঁ বাবা এই যে আমি। কষ্ট হচ্ছে নাকি আবার? দু ফোঁটা শুষ্ক থাকে?”

একটু চূপ করে থেকে চাপা শ্বাসটুকু ফেলে হালদার মশায় বললেন, “না, কষ্ট হচ্ছে না। বলছিলুম, এবার একটু ঘুমিয়ে নে না তোরা। রাত আর কত বাকী রে?”

তারকারি হালদার ঘড়ি দেখে বললেন, “পৌনে দুটো হল এখন। আমার ত ঘুম পাচ্ছে না বাবা, তুমি একটু ঘুমোও না। রাত ত আর বেশী নেই।”

হালদার মশায় আর বললেন না কিছুই। রাত বেশী নেই, এবার শুনতে পাওয়া যাবে তার গান, তারপর জানানার কাঁচ কথানা শুনতে পারা যাবে।

তার মানে আর খানিক পরেই আবার তিনি উদ্ধার পাবেন অন্ধকারের অতল গহবর থেকে। মাড়িতে মাড়িতে চেপে চোখ মেলে কান পেতে শুয়ে রইলেন হালদার মশায়। রাতের আর বেশী বাকী নেই।

ধনারও সেইরকম ধারণা হল। আকাশের যেটুকু ফালি তার নজরে পড়ল ছোট্ট জানালাটার গর্ত দিয়ে তা থেকে এই আন্দাজই করতে পারলে ধনা যে, রাত কাবার হতে আর বড় বেশী দেরী নেই। একটা নিশ্বাস ফেলল ধনা, কোথায় কি অবস্থায় যে ফিনকির কাটছে এই রাতটা! কোথায় রইল ফিনকি আর কোথায় রইল সে। অনর্থক খাল পার হয়ে এ বাড়ীতে মরতে এসে ধনা বন্দী হয়ে রইল সারাটা রাত। খামকা এ হেন ফ্যাসাদে পড়ে যেতে হবে জানলে কি ধনা পার হত না কি খাল। হারামজাদা খুনের পাল্লায় পা দিচ্ছে এ ধারণা করুতে পারলে টপকাতো যেত নাকি সে এ বাড়ীর পাঁচিল। কি প্যাচেই না পড়ে গেছে ধনা

মিছিমিছি। রাত ত পোহাল বলে, এখন এই জাল কেটে বেয়বে কি করে সে, সেই হল কথা। সকাল হলে কেউ না কেউ এ ঘরের শিকল খুলবে আর তখন দেখতে পাবে তাকে। তারপর যে কি ব্যবস্থা করবে এরা! পরিণতিটা ভাবতে গিয়ে ধনার মাথা খারাপ হবার যোগাড় হল। দুহাতে সে নিজের মাথার দু-মুঠো চুল ধরে টানাটানি করতে লাগল।

অথচ ভেবে দেখতে গেলে কোনও অপরাধই নেই তাব। হালদার মশায়ের নির্দেশমত বাড়ী খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয়নি তাকে। বাড়ীর পাশে পৌঁছে রাস্তার ধারের ছোট জানালাটাও সে দেখতে পেয়েছিল। জানালাটায় ঢোকা দিলে হয়ত কেউ খুলেও দিত বাড়ীর দরজা। কিন্তু তারপর তাকে বলত কি ধনা? হালদার মশায় বলে দিয়েছিলেন, পাথরখানা হাতে দিলেই এরা সব বুঝতে পারবে। কিন্তু পাথর দিতে ত আসেনি সে। এসেছে ফিনকিবে খুঁজতে। ফিনকি যদি বন্ধ থাকত এই বাড়ীতে তাহলে এরা তা মানত নাকি। না তাকে আদর করে ঢুকতে দিত বাড়ীতে। ঢুকতে হয়ত দিত, কিন্তু ফিনকিকে নিয়ে বেরতে দিত না। কাজেই সব দিক বিবেচনা করে পাঁচিল টপকানই উচিত বলে বিবেচনা করলে ধনা। পাঁচিল টপকাতো একটু কষ্ট হল না। যে সব পথটিব ওপর এ বাড়ীর সদর দরজা, সে পথের দুধারের দেওয়ালে দু-পা দিয়ে অনায়াসে সে উঠে পড়ল পাঁচিলের মাথায়। তারপর আর কিছু বিবেচনা না করেই আরও অনায়াসে নেমে পড়ল বাড়ীর ভেতর। নেমেই এমন এক কাণ্ড ঘটছে দেখল ঘরের মধ্যে যে, বুদ্ধিভ্রান্তি সব লোপ পেয়ে গেল তার। আর একটু হলই চোঁচিয়ে উঠত ধনা! ভাগ্যে ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েমানুষটার গলা ছেড়ে দিয়ে লোকটা এক পা শিছিয়ে দাঁড়াল, নয়ত তখনই হয়ত চোঁচিয়ে উঠে ধরা পড়ে যেত সে। তখনই হয়ত সে পালাত, কিন্তু তারপর লোকটা এমন সব কথা বলতে লাগল যার একটু-খানি কানে যেতেই সে নিঃশব্দে উঠে পড়ল বারান্দায়। একেবারে ঘরের দরজাব পাশে এসে দাঁড়াল। কারণ ভয়ানক চাপা স্বরে আর সাপের মত হিসহিস শব্দ করে শাসাচ্ছিল লোকটা মেয়েমানুষটাকে। খুব কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল বলেই খানিকটা তবু বুঝতে পেরেছিল ধনা। উঃ, কি সাংঘাতিক কথা, হালদার মশায়কে খুন করতে চায় ও! এরা কিন্তু জানেও না যে হালদার মশায় মরতে গিয়েছেন। হয়ত এতক্ষণে মরেও গেছেন তিনি। দিনের বেলা ত একটা টাল গেছে। ঐ রকমের আর একটা টাল যদি এসে থাকে রাতে, তাহলে তা আর সামলাতে হয়নি হালদার মশায়কে। এতক্ষণে তাঁকে কে ওড়াভালায় নিয়ে তোলা হয়েছে।

ধনা ভয়ানক অশ্রুমনস্ক হয়ে পড়ল হালদার মশায়ের কথা মনে পড়তেই। কি ভয়ানক অবস্থায় নিজে পড়েছে তা ভুলে সে হালদার মশায়ের কথাই ভাবতে লাগল। আহা রে, বুড়ো মানুষটার ও দশা হবার জন্তে ধনাই দায়ী। মায়ের মন্দিরের ভেতর পেছন থেকে ধাক্কা না দিলে হুমডি খেয়ে পড়তেন না হালদার মশায়। অবশ্য ধাক্কা না দিয়ে উপায়ও ছিল না ধনার। হালদার মশায় হুমডি খেয়ে পড়লেন আব সেই ফাঁকে সে একটানে খুলে নিতে পেবেছিল হারছড়াটা বৌটিব গলা থেকে। হালদার মশায়ের ফেলতে না পাবলে সাধ্য ছিল না কি ধনার তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে তাঁবই যজ্ঞমানব গলা থেকে হাব ছিনিয়ে নেওয়া। যে বাঘা হালদাব, বুড়ো হলে চাপ কি এখনও তাঁর নজর থেকে হাজাবটা ধনাব মন ওস্তাদের ওস্তাদি পার পায় না।

যে বনা প্রবল সর্বনাশটা করলে তার, পাঠের শিরদাড়াটা জখম করে জন্মেব শোধ বিছানায় শোষালে, পাবেই তিনি বিশ্বাস করে গুরুত্ব কাজেব তার দিলেন। আব পাউকে বিশ্বাস হল না হালদার মশায়ের, ধনাকেই বিশ্বাস হল। পাউকে না জানিয়ে চাকরকে দিয়ে ডাকিয়ে পাঠালেন ওকে। সে যেহেতু তাকে চুপিচুপি তেতলায় উঠে চাকরব খেতে সর্বনেশ পাথরখানায় নাগিয়ে আনবে বললেন। তাবপর তাব দু হাত ধরে তাব দলেন পায়না নাকে হই বাড়ী। পৌছে দেবার। কিন্তু সে বিশ্বাসধা। তা করেই মরণাপন্ন হালদার মশায়ের মঙ্গল। তার শিরদাড়া ভাঙবার জন্তে যে ধনা দায়ী, সেই ধনাকেই তিনি উদ্ধার করলেন পুলিশের হাতে ধরে। সেই বনাই করে বসল, তাব সঙ্গে প্রবল মিত্রতাবামিটা। এব ফল হাতে হাতে মিলল, নিকি গোলায় গেল, বাতটা কাবাব হলোই সে নিজেও গোলায় যাবে।

যাক, তাহলে আব দুঃখ নেই ধনাব, কিন্তু হালদার মশায়ের শেষ সময় যদি সে পৌছতে পাবত তাঁর কাছে। তাহলে সকলের সামনে নিজেব সব দোষ কবুল কবে তাঁব পায়ে ধবে ক্ষমাটা চেয়ে নিবে পাবত। কিন্তু সে উপায়ও আব নেই।

আর একটা টাল যদি এসে থাকে আবার, তাহলে হালদার মশায়কে আর সামলাতে হয় না। প্রত্যক্ষণে তাঁকে কেওডাতলায় নিয়ে তোলা হয়েছে।

আর এ ব্যাটা খুনে এখানে মতলব ভাঁজছে তাঁকে খুন কববার। আর একটু হলোই মেয়েমানুষটাকে শেষ করে দিয়েছিল আব কি। যে ভাবে দেওয়ালের সঙ্গে গলাটা চেপে ধরেছিল মেয়েমানুষটার, যেরকম ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল মেয়েমানুষটার চোখ

ছুটো তাতে আর মিনিটখানেক বডজোর টিকত ওর দম। উঃ গলা টিপেই খতম করে দিত ব্যাটাচ্ছেলে একটা মেয়েমানুষকে !

কিন্তু ঐ খুনেটার সঙ্গে ও একলা এ বাড়ীতে থাকেই বা কেন। আর খুনেটা ওকেই বা দায়ী করছে কেন। হালদার মশায়ের কাছে কি সব চিঠিপত্র আছে তার জন্তে। গলা ছেড়ে দিয়ে লোকটা হিমহিম করে যে-সব কথা বলে শাসালে ওকে তা স্পষ্ট শুনেছে ধনা। হাঁপাতে হাঁপাতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল লোকটা, “কেন আর আসে না সে? কেন আসে না? তুই তাকে মানা করেছিস আসতে। তুই তার হাতে তুলে দিবেছিলি আমার চিঠিগুলো। সেইগুলো হাতে পেয়েই ত তাক্ত এত তডপানি। এতগুলো বছর ধবে হাজার হাজার টাকা ব্যাটা আদায় করলে। রাজ ভোরে এসে সে তোকে চরণামৃত খাইয়ে যায়। চরণামৃত, আহা রে, চবণামৃত। একটি দিন বাদ পড়ে না গুরুদেবের ভোরবেলা এসে চবণামৃত দিতে। শিষ্টার ওপর কি দরদ গুরু। মনে করেছিলি, আমি কিছু বুঝি না, না। আমার চোখে ধুলো দিবে বেশ কাটছিল এতকাল, মুখ বুজে সব সহ্য কবেছি আমি। যতবার জিজ্ঞাসা কবেছি চিঠিগুলোর কথা ততবাব মিথ্যা কথা বলেছিস, সব ঠিক আছে। সব ঠিক আছে তোর সেই গুরুবাবা হালদার হারামজাদার কাছে। চিঠিগুলো কিছুতেই আদায় হল না এতদিনে, এখন সে নিজে ডুব মারলে। শুনে রাখ, হারামজাদা মেয়েমানুষ, শেষবারেও মত শুনে রাখ আজও তোকে ছেড়ে দিলুম। কিন্তু সেই হালদারটাব কাছ থেকে চিঠিগুলো যদি আদায় করতে না পারিস তাহলে পার পাবি না আমার হাত থেকে। নিজের হাতে বিষ খাইয়ে মেরেছিলি স্বামীকে, সব কবতে পারিস তুই। তা-বলে মনে করিসনি, আমার হাত থেকে রেহাই পাবি।

শেষ কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ লোকটা পেছন ফিরে ছুটে বেবিষে পড়ল ঘর থেকে। ভাগ্যে ধনা সট করে ঢুকে পড়তে পেরেছিল এই ঘরে, নয়ত তখনই তার দফারকা হয়েছিল আর কি।

কিন্তু এ ঘরে ঢোকাই কাল হল তার। আর কি ঘটে তা শোনবার আশায় ঘাপটি মেরে বসে রইল সে অন্ধকার ঘরের ভেতর। ঘটল আর কচু, কিছুক্ষণ পরে কোথা থেকে কার বিকট নাকের ভাক শোনা যেতে লাগল। ধনা তখন ভাবছে ঘর থেকে বেরিয়ে সরে পড়বার কথা। সরে আর তাকে পড়তে হল না, পাশের ঘর থেকে মেয়েমানুষটা বেরিয়ে এসে এ ঘরের দরজা টেনে শিকল তুলে দিয়ে চলে গেল। অন্ধকারের ভেতর থেকে আড্ডট হয়ে চেয়ে রইল ধনা, একটি আঙুল তুলেও বাধা দিতে পারলে না।

তখন একটু চেষ্টা করলেই হত, সারাটা রাত এভাবে বন্ধ থাকতে হত না এ বাড়ীতে। মেয়েমানুষটাকে এক ধাক্কা এক পাশে সরিয়ে দিয়ে যদি সে তখন লাফিয়ে পড়ত ঘরের বাইরে, তাহলে এ বাড়ী থেকে উদ্ধার পাওয়া হয়ত খুব একটা কঠিন কাজ হত না। টাই হৈ করে লোক জমা করত এরা, ততক্ষণে ধনা গলি কটা পার হয়ে হয়ত নেমে পড়তে পারতে খালে। কিন্তু মেয়েমানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে গেল সে। দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিয়ে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধনা সেই মুখখানার কথাই ভাবতে লাগল। অমন মুখ অমন চোখ যার, সে কি কখনও স্বামীকে বিব খাইয়ে মারতে পারে? সেই হারামজাদা খুন মাতালটা ত বলেই গেল, নিজের হাতে বিব খাইয়ে মেরেছিল স্বামীকে। হাত দু'খানাও ধনা দেখতে পেয়েছিল দরজা বন্ধ করার সময়। ঐরকম হাত দিয়ে কেউ বিব দিতে পারে। অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব কাণ্ড। ও মানুষ কখনও ও সব কাজ করতে পারে না। চোর ডাকাত খুনে অনেক দেখেছে ধনা, ধনাকে আর শেখাতে হবে না কিছু। মানুষ দেখে সে ঠিক বলে দিতে পারে যে তার দ্বারা কি সম্ভব, কি অসম্ভব। ও মানুষ, যাব ঐ একম ঠাণ্ডা মুখ ঐরকম গোবেচারা গোছের চোখ, আর হাত গুলদণ ছোট ছোট যার হাত, সে কববে মানুষ খুন করে হাত পা মাংস কি মাংস অমন মানুষের নামে। নিশ্চয়ই ঐ শালা খুনেটার একটা কিছু এদ মনলব আছে পেটে। এ বেচাষাকে এখানে আটকে রাখিনি? এমন... ও... পারে যে, কোনও কারণে এ পালাতে সংকল্প করছে না ওই খুনেটার হাত থেকে। গলা টিপে মেবে ফেলতে যাচ্ছিল, সব টুট শব্দটি করলে না। আর কি আশ্চর্য্য ভব। অমন মেয়েছেলের গায়ে ও হাত তোলে?

থেকে গেল এভাবে বনা। পেছন থেকে এখনই সেই খুনেটার ঘাড়ের গুলম বোঁপিয়ে পড়ে মেয়েছেলের গলা টিপে ধরার উপযুক্ত ফল দিতে পারেনি এই আপমোমে সে নিজের হাত কামড়ানো লাগল। একদা যদি ছাদ দায় ঐ ঘর থেকে তাহলে আগে সেই খুনেটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে বসে সে বেরবে ঐ বাড়ী থেকে, নয়... নোকে যেন তাকে ধনা বলে না ডেকে জুয়ার, পাঁচ ছাগল বলেই ডাকে। খাব কিছু না পাকক, কামড়ে এক খাবল মাংসও ত ছিঁড়ে নিতে পারবে সেই হারামজাদার শরীর থেকে। মেয়েমানুষ খুন করার মতলব, আচ্ছা দাঁড়া বোটা, বেরই একবার এই ঘর থেকে। রাগে ঘোঁতে জ্ঞানহারী হয়ে ধনা টেঁচিয়ে বলে ফেললে, “মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা বার করব শালা তোমার, দাঁড়াও একবার বেরিয়েনি এই ঘর থেকে।”

ভয়ানক চমকে উঠল ধনা।

নিজের বলা কথাটা যে মুহূর্তে ঢুকল কানে, সেই মুহূর্তে সে হাঁশ ফিরে পেল। সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে রইল আর কোনও সাড়াশব্দ শোনার আশায়। কেউ শুনতে পারনি ত। এ হে হে হে, করলে কি সে অন্তমনস্ক হয়ে। যদি কেউ শুনতে পেয়ে থাকে তাহলে হয়েছে কাজের শেষ। আগে ভেকে ডুকে লোক জড় কববে, তারপর ঘরের দরজা খুলবে। কোনও সন্দেহ না কবে যদি কেউ খুলত ঘরের দরজা তাহলেও একটা উপায় হয়ত হত। আচমকা লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দৌড়ে পালাতে পারা হয়ত সম্ভব হত। কিংবা অন্ধকারে এক কোণে লুকিয়ে বসে থেকে এক ফাঁকে সকলেব নজব এড়িয়ে সরে পড়া, তাও হয়ত অসম্ভব হত না। কিন্তু এ কি করলে সে? নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে বসল।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। ধনার মনে হল, অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল নিবিয়্রে। অন্ত কোনও সাড়াশব্দ উঠল না কোথাও থেকে। তখন সে দম ফেললে আন্তে আন্তে। যেন তার নিশ্বাস ফেলাব আওয়াজটুকুও কেউ না শুনতে ফেলে। নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসেছে আব অমনি শুনতে পেল। ঠিকই শুনতে পেল ধনা, দরজার বাইরে থেকে কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। নিশ্বাসে সে সরে এসে দাঁড়াল দরজার গায়ে। কান চেপে ধবল দরজার ওপর। তাবপব স্পষ্ট শুনতে পেলো দু-বার।

“কে তুমি? ঘরের ভেতর তুমি কে?”

খুব চুপিচুপি দু-বার করা হল সেই প্রশ্ন। চুপ করে ধনা ভাবতে লাগল জবাব দেবে কি না। আবার তার কানে গেল, “বল তুমি কে, নয়ত লোক ডাকবে।”

ধনা বুঝতে পারলে মেয়েমানুষেব গলা। তখন তার সাহস হল। সেই বকম চুপি চুপি সে বললে, “দরজাটা খুলে দাও মা সব বলছি।”

“না, আগে বল তুমি কে। কেন এসেছ এ বাড়ীতে? এ ঘবে ঢুকেছ কখন?”

ধনা কঁাদ কঁাদ গলায় বলল, “আমি হালদাব মশায়ের কাছ থেকে এসেছি মা, তিনি মরতে বসেছেন। আমায় একখানা পাথর দিয়েছেন আপনাকে দেবার জন্তে।”

বাস, আর একটুও সাড়াশব্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ কাটল নিশ্বাসে। তারপর আন্তে আন্তে দরজাটা একটু ফাঁক হল। তখন শুনতে পেল ধনা, “সাবধান, একটুও শব্দ যেন না হয়। বেরিয়ে এস বাইবে।”

একটুও শব্দ না করে দরজাটা আর একটু ফাঁক করে বেরিয়ে এল ধনা। সঙ্গে

সঙ্গে ধরা পড়ল তার একথানা হাত। কানের কাছে স্তনতে পেল ধনা “চল আমরা পালাই এখান থেকে। সাবধান, খুব সাবধানে এস।”

হাতখানা ছাড়া পেল না ধনার। তার হাত ধরেই তাকে নামিয়ে আনা হল বারান্দা থেকে। সদর দরজার খিল খোলা হল নিঃশব্দে। সদর দরজা পেরিয়ে এসে নিঃশব্দে আবার সেটা টেনে দেওয়া হল।

তারপর গলি। গলির পর গলি পার হয়ে চলল ছুজনে নিঃশব্দে। শেষে খাল দেখা গেল। তখন ধনার হাতখানা ছাড়া পেল।

আর তখন স্তনতে পেল ধনা একটি অগ্নিগোধ। অগ্নিগোধ নয়, যেন ভিখিরী ভিক্ষে চাইছে তার কাছে। “আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে যাবে বাবা?”

একটা চৌকি গিলে ধনা বললে, “চলুন মা, সাবধানে আসুন আমার হাত ধরে। এখানটা ভয়ানক পেছল। জল সরে গিয়ে পলি পড়েছে কিনা। খালে এক হাঁটু জলও নেই। আসুন আমরা এখান দিয়ে পেরিয়ে যাই।”

সাবধানে তাঁকে নামালে খালে ধনা, সাবধানে তুলে নিয়ে এল এপারে। এপারে ওঠার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, একটা তারা খুব জ্বলজ্বল করে জ্বলছে মাথার ওপর। মনে হল যেন রাতটা সত্যিই শেষ হয়ে এসেছে।

ফিনকিরও তাই মনে হল।

আগ্নে আস্তে সে উঠে বসল বিছানায়। নরম সবুজ আলোর ঘরটা অন্ধুত দেখাচ্ছিল, মেঝের মাজুর পেতে শুয়ে বুড়ী কি-টা নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিল, ওপাশের জানালার পর্দার ওপব দিয়ে দেখা যাচ্ছিল খানিকটা আকাশ। সেই আকাশটুকুতে জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল একটা তারা। তারটির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর ফিনকিরও মনে হল রাত শেষ হতে যাচ্ছে।

ঠিক এই রকম ভোর রাতেই তার মা উঠে পড়েন রাজ, উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দার খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তখন তাঁর চোঁট নডতে থাকে। অনেকদিন ভোরে ফিনকিরও উঠে গিয়ে বসেছে মায়ের পাশে, মায়ের মত তাকিয়ে থেকেছে ঐ তারাটির দিকে। কিন্তু চোঁট নাডতে পারেনি। নাডবে কি করে, ফিনকির ত আর মায়ের মত জপ করতে জানে না। তাই সে চুপ করে বসে থেকেছে মায়ের মুখখানির দিকে চেয়ে, অনেকবার ফিনকির মনে হয়েছে যে, ঐ জ্বলজ্বলে তারাটির মত তার মায়ের মুখখানিও জ্বলজ্বল করছে! রোগা শুকনো গানে, হাড় ঠেলে-ওঠা মায়ের মুখখানি অনেকটা

ঐ তারাটির মতই। আর একটু ভাল করে দেখবার জন্যে খাটের ওপর থেকে নেমে পড়ল ফিনকি। নেমে আগে কাপড়খানা খুঁজে বার করলে বিছানা থেকে। একটা খুব পাতলা কাপড়ের সাদা শেমিজ আর একখানি চকচকে কালো পাড কাপড় ফিনকিকে পরানো হয়েছিল। ফিনকির মনে পড়ে গেল, পাড দেখে সে বলে ফেলেছিল, ‘ওমা, এ যে ধুতি!’ শুনে সেই বোঁটির কি হাসি, হাসতে হাসতে বলেছিলেন তিনি, “তা ত বটেই, তুমি হলে গিন্নীবান্নী মান্নম, তুমি কি ধুতি পরতে পার।” বলে সেই ধুতিখানিই ফিনকিকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য অনেকক্ষণ তার হুঁশ ছিল না।

বিছানা থেকে কাপড়খানা টেনে নিয়ে কোমরে জড়াতে জড়াতে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল ফিনকি যে, তারপর আর কি কি হয়েছিল। কে কে যেন এসেছিল তাব কাছে! আবছা আবছা যেন সে দেখেছিল অনেক ব্যাপার, একজন সাহেব গোছের লোক এসে বসেছিল তার বিছানার ওপর, তখন খুব লেগেছিল তার হাতে। হঠাৎ ফিনকি কাপড় পরা বন্ধ হবে বা হাত দিয়ে ডান হাতের ওপর দিকটায় হাত বুলোতে লাগল। একটু যেন ফুলে আছে জায়গাটা! আরও ভাল করে সব মনে করবাব জন্যে সে মুখ নীচু করে ছোট কপালখানি কুঁচকে থেমে রইল কিছুক্ষণ। কপাল কৌচকাত গিয়েই বোধ হয় টান পড়ল কপালে। তখন তার হাত গিয়ে ঠেকল কপালের ওপর।

এ কি!

কপালের বাঁ ধারে কি একটা স্ফেটে বসে রয়েছে যেন।

হঠাৎ আবার মাথাটা যেন গুলিয়ে গেল ফিনকির। পড়েই যেত আর একটু হলে, কোনও রকমে বিছানায় ঠেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলালে। দাঁড়িয়ে রইল সেই ভাবে নিজের পায়ের পাতাব দিকে তাকিয়ে। একটু-একটু বরে অনেক কথা তার মনে পড়ে গেল। সকাল থেকে যা যা ঘটেছে, সব ঠিকঠাক পরপর শুছিয়ে মিলিয়ে নিলে ফিনকি মনে মনে। এ বাড়িতে আসার পূর্ব থেকে কিস্তি কেমন যেন সব গুলট পালট গোলমাল হতেলাগল। যেন ঘুমের ঘোরে সে দেখেছে অনেক কিছু, কিস্তি কিছুই ঠিক মনে করতে পারছে না। সেই ভক্তলোকটিকে মনে পড়ল, যিনি তাঁর বোঁয়ের হাতে ফিনকিকে দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখে গেলেন। বোঁটি তাকে এই কাপড় জামা পরালে, পরিয়ে এই বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে। বোধহয় তখন খানিকটা দুধও খেয়েছিল ফিনকি! তারপর কি হল!

বেশ চেষ্টা করে দেখলে ফিনকি যদি মনে করতে পারে কি কি হয়েছিল তারপর। কিন্তু না, আর যেন কিছু হয়নি।

ওঃ, এবার মনে পড়েছে।

তারপর যেন আর একবার দেখেছিল, সে সেই ভয়লোকটিকে আর তাঁর বোকে! ই্যা, ঠিক দেখেছিল, ওরা বসেছিলেন এঁটখানেক, এই বিছানার ধারেই। এই সবুজ আলোটা থাকার দরুনই ফিনকি ভাল করে চিনতে পাবনি তাঁদের।

তবে শুনতে পেয়েছিল ফিনকি ওঁদের কথা। চুপি চুপি নয়, তবে চাপা গলায় ওঁরা কথাবার্তা বলছিলেন।

কি বলছিলেন যেন।

ই, ই! এঁটবার মনে পড়েছে সব। হাসপাতাল, কাল সকালে হাসপাতালে দিতে হবে।

ভয়ানক বকম সম্মুখে উঠল ফিনকি, যেন ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে সে কোন কারণে। ব্যাকুল চোখে শোকাতে লাগল ঘরের চারদিকে। আবার তার নজর গিয়ে পড়ল জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশে। আকাশের গায়ে জলজ্বল করে জলছে শাবাটি। আবার একটু দূর দেখা করলে না ফিনকি, কালো পাড পাতলা কাপড়খানির আঁচলটা টোনে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ফেললে। হাসপাতাল পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। খুমখুম বুড়োকে উড়িয়ে যেতে হল ফিনকিকে, বুড়োটা আবার এখন বিদ্রবিত হয়ে দাঁড়িয়ে বড়ো বকুনী শুনে এক মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল ফিনকি। না, বড়োটার ঘুম নাহয়, খুমিয়ে ঘুমিয়েই সে ঝগড়া করছে যেন কার সঙ্গে। কতক শাসন বিভ্রম, ফিনকি দরজার দাঁড়ানি দিয়ে উঠে মেঝে দেখে নিলে বাইরের চারদিক। হাসপাতাল দাঁড়ানি দিয়ে পা দিলে।

ঘর থেকে বেশিগেট বাইরে, তা পাশে বাসান্দল শেষ দিকে একটা দরজা। ফিনকির সব মনে পড়ে গেল। এই দরজা দিয়ে বাইরের ঘরে নোকা যাবে। এই ঘরেই সেই মুশকিল মিনমেটা ফিনকির এনে নামিয়ে দিয়েছিল সেই ভয়লোকের টেবিলের সামনে। এই ঘরটার এখন চুপে পাবলে হয় হাসপাতাল দরজা যদি খুলতে পারা যায় কতলেই বাস্তব।

পাতলা অক্ষকাপে দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলল ফিনকি পর্দা সবিয়ে তৈলা দিতে খুলে গেল দরজাটা। ঘরের মধ্যে ভয়ানক অক্ষকাপ। গাভের সব পেলে চলবে না ফিনকির, থামলেও চলবে না। অক্ষকাপেই সে পা ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চলল। দু হাত সামনে মেলে দিয়ে এগতে লাগল। হাতে তৈকল প্রথমবার একটা চেয়ারের পিঠ, চেয়ারখানা ঘুরে যেতেই টেবিলের কোণায় হাত তৈকল। তারপর আর একটু এগতেই দেওয়াল পাওয়া গেল। এইবার দেওয়াল ধরে ধরে ডান দিকে খানিকটা যেতেই পাওয়া গেল দরজাটা। সম্ভরণে দরজার খিল খুলে

দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখলে ফিনকি। কিন্তু টেনে দরজা খোলে না। ওপরে বোধহয় ছিটকিনি আছে। ওপর দিকে হাত বুলোতে ছিটকিনি হাতে ঠেকল। খুঁট করে একটু শব্দ হল ছিটকিনি খুলতে। কুঁচ করে একটু শব্দ হল জরজাটা ফাঁক করতে। দরকার নেই বেশী ফাঁক করে, যদি আবার শব্দ হয়। ঠিক যতটুকু ফাঁক করলে ফিনকি গলে বেরিয়ে যেতে পারে ততটুকুই ফাঁক হল দরজার কপাট। আর হয়ে বেরিয়ে এল ফিনকি !

আবার রাস্তা। ওপরে খোলা আকাশ। দেখানে মায়ের মুখের মত তারাটা জলজল করে জলছে, লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বুকটা ভরে ফেললে ফিনকি। মুখ তুলে আর একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল।

তারাটা হাসছে। ফিনকির কাণ্ড দেখে মুখ টিপে হাসছে তারাটা। যেমন তার মা হাসেন ফিনকি যখন বাগাবাগি করে হাত পা ছুঁড়তে থাকে, তেমনি ভাবে মুখ টিপে হাসছে যেন আকাশের তারাটাও !

কি জানি কেন, হঠাৎ হু হু করে কঁদে উঠল ফিনকি। পরমুহুর্তেই সে জোর করে থামিয়ে ফেলল তার কান্না। থামিয়ে মাথা নীচু করে ছুটতে লাগল। কোন্ দিকে যাচ্ছে, কোথায় পৌঁছবে, এ সমস্ত ভাবনা চিন্তা তার মাথাতেই এল না। ছুটল ফিনকি জনমানবশূন্য পথে। ছুটতেই হবে যে তাকে, পালাতেই হবে, নয়ত আর রক্ষে নেই ! ধরা পড়লেই ওরা তাকে দিয়ে আসবে হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে যাবে না ফিনকি, কিছুতেই সে ধরা দেবে না। ছুটে গিয়ে এখনই তাকে পৌঁছতে হবে তার মায়ের কাছে।

ধরা দেওয়া চলবে না কিছুতেই।

এক ঘর মাহুঘের সামনে আত্মপরিচয় দেওয়াটা মহাভুল হয়ে গেছে। কংসারি হালদার মরছে শুনে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পাথরখানা আদায় করতে যাওয়াটা মোটেই ভাল কাজ হয়নি। এতক্ষণে সবাই জানতে পেরে গেছে যে পাগলটা কে। সর্বাক্ষে ইট পাটকেল ঝুলিয়ে কে পড়ে থাকে শ্মশানে, কে রোজ নিশিরাতে মায়ের দরজায় মাথা ঠুঁকে নকুলেশ্বরের ঘুম ভাঙিয়ে কালীঘাটের পথে গান গেয়ে বেড়ায়, এখন পাগলার পরিচয় জানতে আর বাকী নেই কারও। শয্যাশায়ী হালদারকে যখন চেপে ধরেছে সকলে পাগলার পরিচয় জানার জন্তে, তখন সে বেচারী নিশ্চয়ই বলে ফেলেছে সব কথা, এতদিন পরে ছাড়তেই হল কলিতীর্থ কালীঘাট। আর মাকে গান শোনানো চলবে না, ভৈরবের ঘুম ভাঙাতে আর

কেউ নিশিয়াতে আসবে না। আর কেউ কখনও পাগলাকে কালীঘাটে দেখতে পাবে না।

রইল ওরা।

- ওরা রইল, সবাই মায়ের আশ্রয়ে। বারটা বছর পূর্ণ হতে আর মাত্র তিনটি বছর বাকী। বার বছরের ব্রত পূর্ণ হলে বাকসিদ্ধ হওয়া যেত, শ্রুতিধর হওয়া যেত, জাতিস্মর হওয়া যেত। এই কালীঘাট আবার জেগে উঠত তাহলে, দেশে দেশান্ত্রের মানুষ মায়ের মহিমা জানতে পেরে ছুটে এসে আছড়ে পড়ত এই তীর্থে। কলিতীর্থের সমস্ত কলুষ যেত বুয়ে। ঐ মরা আদি গঙ্গায় আবার জোয়ার ডাক, সেই জোয়ারের জল কালীঘাটের কুল ছাপিয়ে উঠে সব ধূয়ে মুছে মাফ করে নিয়ে যেত—দীনতা, শীনতা, জাল জুয়াচুরি, পাটোয়ারী বৃদ্ধি সমস্ত। তখন লোকে এই তীর্থে এসে মোকদ্দমা জেতবার জগে ঘুপ দিত না মাকে, নিজের ছেলের ব্যামো ভাল হবার কামনায় ছাগলের ছেলের গলা কাটতে চাইত না। মানুষ তখন কালীঘাটকে ছাগল বেচার মস্ত এড হাট বলে মনে করত না। ছাগলেরা তখন কালীঘাটে মানুষ কিনতে আসত না। কারণ কলিতীর্থ কালীঘাট থেকে তখন মানুষ বেচা কেনার পাটই উঠে যেত।

• এই ঘাটে মৃত্যুই মানুষ কেনা হত।

গঙ্গাটা তখন এত বড় ছিল যে, পালতোলা জাহাজ সারা জগৎ ঘুরে এসে এই ঘাটে লাগত। নামত জাহাজ থেকে বোম্বেরা, পুজো দিত নরবলি দিয়ে ঐ কালীদেবী। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঐ কালী তখন এমন জাগ্রত ছিল যে, দুনিয়ার অন্ধ প্রান্তের দস্যুরা পশুস্ত্র একে মানত। তখন এই ঘাটে বসত হাট, মানুষ বেচা-কেনার হাট। নানা দেশ লুট করে চেনে বেঁধে জাহাজের খোলে ভরে আনত তারা মানুষ, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ সব জাতের সব রকমের মানুষ। কচি, বুড়ো, পুষ্ট, যাকে কালীঘাটের ভাষায় বলা হয় পুকুট্ট, সব রকমের মানুষ তারা সস্তায় নিলেম হত তখন এই ঘাটে। এখনও হয়, কিন্তু রংমটা একটু বদলেছে। জাহাজের খোলে ভরে আসে না তারা কালীঘাটে, আসে ভাগ্যের পরিহাসে, সমাজের তাড়নায় কোথাও চাই না পেয়ে, পেটের জ্বালায় অন্ধ হয়ে। তারা কেউ চেনে বা দাঁড়িতে বাঁধা থাকে না। তবু তারা থাকে, পালায় না, কালীঘাটের অদৃশ্য কালো দাঁড়িতে বাঁধা তারা ডালা হাতে শুকনো মুখে মুরতে থাকে কালীঘাটে। মেয়েমানুষগুলো মুখে চূণ কালি মেখে নিজেদের ফেরি করে বেড়ায়। আর যারা এটাও পাবে না, ওটাও পারে না, তারা কালীঘাটের পথের কাদায় গড়াগড়ি খায়।

এখনও আসে পণ্য কালীঘাটের দ্বারা। শুকনো পথে আসে। আদি গঙ্গাটা

তকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যে ।

ঐ আদিগঙ্গা ।

জলে টাইটুদুয়, দিনে ছবার জোয়ার ভাঁটা খেলত । ঐ মা, সাক্ষাৎ মা, জাগ্রত জননী । ঐ গঙ্গাগর্ভে আবক্ষ নিমজ্জিত সেই মহামানব, দুটি হাত জোড় করে মাথার ওপর সোজা করে তুলে আঁচলা ভরতি জল অর্ঘ্য দিচ্ছেন—

হ্রীং হং সঃ মান্ত ণ্ডৈভরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায়
ইদমর্ঘ্যং শ্রীমদ্ সূর্য্যায় স্বাহা—

আজলাব জল যে মুহূর্তে পড়ছে গঙ্গার জলে, সেই মুহূর্তে দাঁউ দাঁউ করে আগুন জলে উঠেছে । যেন আজলা ভবতি ঘি ঢালা হচ্ছে যজ্ঞকুণ্ডে ।

ঠিক এই সময়, এই নিশা-মহানিশার অস্তিম লগ্নে এ দৃশ্য দেখেছিল মাত্র দুটি মানুষ । ঐ কংসারি হালদার একজন, আর একজন হাবিয়ে গেছে । দ্বাদশ বর্ষ লুকিয়ে থাকতে হবে, শ্রমশানসাধনা করতে হবে, কায়মনোবাক্যে সন্ত্যক্ত ধারণ করে থাকতে হবে, তবে মা জাগ্রত হবেন । একটি মাত্র সন্তানের তপস্কার ফলে আবার জগজ্জননী এখ তুলে চাইবেন । সমস্ত জাতটা জেগে উঠবে সেই লগ্নে, মনোমোহন আর কেউ করতে না, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ফাঁদা চলবে না তখন আর এ দেশে, আত্ম-প্রবঞ্চনা করার প্ররতিই তখন ঘুচে যাবে মানুষের । কলিতীর্থ কালীঘাটেব মনোজয়ী সন্তানেরা তখন বিশ্বজগৎকে মুক্তাঙ্ক মস্ত্রে দীক্ষা দেবে ।

এই ছিল সেই মহামানবের আশা, এই তাঁব আদেশ, এই তাব সঙ্কেত । সে আশা, সে আদেশ, সে সঙ্কেত সার্থক হবে তোলাবার জন্তে একজন হাবিয়ে গেল । কংসারি রইল, তাব যন্ত্র কাজ অস্ত্র ব্রত । সে মায়েব পালাদার । শাকে মুখ টিপে মায়েব পালা চালাতে হবে, মায়েব বাড়ীর ওপর নজর রাখতে হবে, আর ঐ যন্ত্র রক্ষা করতে হবে । দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে শুকভাই যখন সিদ্ধিলাভ করে ফিরে আসবে, তখন মায়েব বাড়ী থেকে কাজ আবস্ত করতে হবে । সেই জন্তে হালদার বসে গেল । যন্ত্রটিকে হালদারের হাতে তুলে দিতে হল । পুরুষাত্মকমে এ বংশের সকলেই পূর্ণাভিষিক্ত কোল, একমাত্র কোলেঘট অধিকার ঐ যন্ত্র ছোবার, ওর নিত্য তর্পণ করাবাব । হালদারকে পূর্ণাভিষিক্ত করে সেই অধিকার দিয়ে তার হাতে যন্ত্রটি সঁপে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল । কুলদেবতা কুললক্ষ্মী অস্ত্র কুলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন । বারটা বছর পরেই আবার ফিরে আসবেন মা এই বংশে । কিন্তু মা আর ফিরবেন না কখনও । হালদার সেই মহাযন্ত্র খুঁয়েছে ।

অতএব, সবই যখন গেছে তখন আর ভাবনা কি ।

কাজেই ধরা দেওয়া কিছুতে চলবে না । পালাতে হবে কালীঘাট ছেড়ে ।
কোন মুখে আজ তাদের সামনে গিয়ে শুধু হাতে দাঁড়ানো যায় ! ধরা পড়লেই
তাদের সামনে মাথাযে টেনে নিয়ে যাবে যে ।

সহধর্মিণী, সহধর্মিণীর মত কাজ করলে । হাসি মুখে বিদায় দিলে । শেষ কথা
কটি আজও মনে পড়ে ।

“যাও তুমি, কোনও ভাবনা নেই তোমায় । গুরুর আদেশে যদি বার বছর
বউ, ছেলে-মেয়ের মুখ দেখা বারণ হয়ে থাকে তোমার, তাহলে আমি তোমায় বাধা
দেব কেন । যাও, একটুও মন খারাপ কর না, ছেলে মেয়ে ঠিক আমি বড় করে
তুলব । দেখ তুমি ফিরে এসে দেখ, আমি কিছুতেই কালীঘাট ছাড়ব না । ছেলে
মেয়ে তোমার বড় হবে, ভাল হবে । ডালাধরার ছেলে মেয়ে হয়ে ওরা বেঁচে
আছে । তোমার গুরুর দয়ায় যদি তুমি সিদ্ধিলাভ করতে পার, তখন ওদেব কেউ
ডালাধরার ছেলে মেয়ে বলতে পারবে না । কিন্তু কথা দিয়ে যাও, যেখানেই থাক,
যাই কর, বার বছর পরে খবর দেবে আমাদের । আমি তোমার ছেলে মেয়ে
তোমার হাতে তুলে দিয়ে তখন ছুটি নেব ।”

আবশ্য কত কথা বলেছিল সে । ছেলেটা তখন বছর আটেকের, মেয়েটা সবে
পাঁচে পড়েছে । ফ্রক পরে মায়ের বাড়ীতে ছুটোছুটি করে বেড়াতে । ধরে নিয়ে
বসিয়ে কুমারী করাতে হত । ঐ কুমারী করার দরুনও রাগ নবত তার মা ।
মেয়ে তাব খারাপ হয়ে যাবে এই ভয়ে ।

সেই মেয়ে, সেই ছেলে আর তাদের মা এখন কোথায় ! বছর ছয়েক পরে
কালীঘাটে ফিরে আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি । তেমন ভাল কবে খোঁজবার
চেষ্টাও করা হয়নি । কারণ বার বছর পূর্ণ হতে অনেক বাকী যে । যদি তারা
টের পেয়ে যায়, এই ভয়ে তাদের খোঁজা হয়নি ভাল ক ।

সেই ভয়েই পালাতে হবে এখনই কালীঘাট ছেড়ে ।

নয়ত লোকে ধরে ফেলবে, টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের সামনে খাড়া করে দেবে ।
তারা জানবে যে সমস্ত বিফল হয়ে গেছে । সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়নি । যে ডালা-
ধরা সেই ডালাধরাই আবার ফিরে এল ।

এই ন’ বছর কি অবস্থায় কাটিয়েছে তারা তাই বা কে জানে ! যদি বেঁচেও
থাকে কোনও রকমে তবু মরে বেঁচে আছে । শুধু এই আশায় বেঁচে আছে যে,
একদিন এমন এক সাধক মহাপুরুষ ফিরে আসবে তাদের কাছে, যার সাধনায়
মহিমায় সমস্ত দুঃখ কষ্ট গ্লানি ধুয়ে মুছে সাক্ষ্য হয়ে যাবে । মাঝী তুলে দাঁড়াতে

পারবে আবার তারা। সে আশায় ছাই দিয়ে কোন মুখে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারা যায় আজ। এমন কি কুলদেবতা পর্যন্ত খুইয়ে আবার তাদের মুখ দেখান—কখনও নয় কিছুতেই নয়, প্রাণ পেলেও নয়।

ইট-পাটকেল দড়ি-দড়া সমস্ত বিসর্জন দিয়েছে পাগলা। কেওড়াতলার ঋশানে খুলে ফেলে দিয়েছে সব একটা চিতার মধ্যে। ভোমেদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করেছে একখানা চাদর। মড়া চাপা দিয়ে এনেছিল কেউ, ভোমেরা তুলে নিয়েছিল। পাগলা পাগলামি করে ভোমেদের মন ভিজিয়ে আদর করে নিয়েছে চাদরখানা। তারপর চুপি চুপি তার সাজসজ্জা সব খুলে ফেলে দিয়ে চাদরখানা জড়িয়ে পালিয়ে এসেছে ঋশান ছেড়ে।

সেই চেনা পথ, সেই ঠিক লগ্ন, গলায় গান নেই, গায়ে ঝুলছে না ইটপাটকেল। চলেছে পাগল, শেষবারের মত চলেছে মায়ের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের ফটকে। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত মাকে প্রণাম করে চলে যাবে।

কত দিন কত রকমের ঠাট্টা করেছে মাল্লুবে।

“হ্যাঁ ঠাকুর, কি দেখে তুমি রোজ ও সময় মায়ের বাড়ীর ফটকের ফাঁক দিয়ে?”

অগ্নান বদনে জবাব দিয়েছে পাগলা, “মাকে দেখি।”

হা হা, হি হি হেসে উঠেছে সকলে। হাসবারই কথা, রাতের তৃতীয় প্রহরে মায়ের মন্দির বন্ধ। বন্ধ না থাকলেই বা কি। অতদূর থেকে নাটমন্দির, উঠোন, গেট, সেই গেটের ওদার থেকে মন্দির খোলা থাকলেও কি মাকে দেখা যায় নাকি!

“হ্যাঁ, দেখা যায়। নিশ্চয়ই দেখা যায়। তিনটি চোখ আর মুখখানি স্পষ্ট দেখা যায়। আর কিছু দেখা যায় না।”

শুনে আবার হেসে উঠেছে সকলে।

চুপি চুপি এসে দাঁড়াল পাগল গেটের বাইরে। চোখ বুজে লোহার পাটির ফাঁকে মুখখানা চেপে ধরলে। তারপর বিড়বিড় করে কি বললে। বলে চুপি চুপি আবার পালিয়ে গেল।

এইবার নকুলেশ্বরের মন্দির।

ভৈরবের মন্দির বে-আবরু। চতুর্দিকে দেওয়াল নেই। আছে লোহার গরাদে। দরজাও লোহার গরাদে দিয়ে ভৈরী। তিনটি সিঁড়ি উঠে দরজার গরাদের ফাঁকে মুখ চেপে দাঁড়াল পাগল। রাস্তার আলোয় বেশ দেখা যাচ্ছে ভৈরবকে। ঈশট দর্শন হল।

মনে মনে বলতে লাগল পাগলা, “হে গুরু, হে মহাগুরু, আবার চললাম ঘুরে। এবার যেন সিদ্ধিলাভ হয়। এই কালীঘাট, এই মহাতীর্থ, মহামায়াব এই মহাপীঠে স্থান পাবাব উপযুক্ত হয়ে যেন ফিবতে পারি।”

বহুকাল আগে শোনা একটা গানের কলি মনে পড়ে গেল পাগলের—

“পুনঃ যদি তপস্রাত্তে একটি ব্রাহ্মণ হতে পার

শ্রমক্ষেত্রে মাযেব নামে এ জগৎ মা ত্রাত্তে পার।”

গুন গুন কবে গেয়ে উঠল গানের কলিটি ভৈরবের দরজায় মুখ চেপে—

“বেট যাবে এ দুর্গতি

নইলে বে ভাই অধোগতি।”

হঠাৎ যানব্র ক্রম চমকে উঠল পাগলা।

ছুটে আসলে সে। কে যেন ছুটে আসছে শুদিক থেকে।

“মা—মাগো!”—করণ ক্রম নি গুনতে পেল পাগলা। সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পাড়াব শব্দ হল ঠিক পেছনে।

ভৈরবের দরজা ছেড়ে মিনিটি মিনিট এক সঙ্গে লক্ষ্য রাখা বড়ল পাগলা।

ঐ ত। ঐ না কে পড়েছে রাস্তার মাঝখানে।

ছুটে গিয়ে। টু গেড়ে বসে পড় বাল পাশে, বসে মুখখানা উলটে ধল গুপব দিকে। রাস্তার আশেয় মুখখানা অনেকক্ষণ বসে দেয়া। লক্ষণ নানমেব চোখে। বালপা দ্বারা। শাকে বসে তুলে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল মাযের বাড়ীর দিকে

ঘুমিয়ে বসেছে তখনও মাযের বাড়ী।

ঘুম ভাঙান গান শোনা গেল না মাযের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের গেটের সামনে। বহুকাল কান পেতে থাকবার পর হালদায় মশায় মনে মা বসে পাগলে, “থাক, ঘুমিয়েই থাক মা। অনন্তকাল ঘুমও। তোমাব এই কাল-নিদ্রা কোন দিন আর কেউ ভাঙাবাব চেষ্টা কববে না।”

এল না সে, মনিই সে এল না। এই ধাবণা মনে নিয়ে চলে গেল সে, যে গুরুভাই কংসারি হালদারও তাকে ঠকালে। ফেব্রু দিলে না যন্ত্রটা, মিশ্র্য কথা বললে যে যন্ত্রটা খোয়া গেছে।

একটি কথাও যে বুঝিয়ে বলার স্রযোগ মিলল না তাকে। কংসারি হালদার তাকে ঠকাযনি, ঠকাতে পাবে না তাকে কংসারি হালদার। নিশ্চয়ই ফেরত পাওয়া যাবে সেই যন্ত্র, মরবার আগে ায় হাতে তাব কুললক্ষ্য সঞ্চে দেবেই কংসারি

হালদার। কিছুতেই এর অন্তথা হবে না।

শুধু আর একটিবার একটু আলো ফুটে উঠুক হালদারের চোখে। একটু ঘোলাটে গোছের হক অন্তত অঙ্ককারটা, ফিকে গোছের একটু আলো ধরা দিক তাঁর চোখে। খুব স্পষ্ট না হোক, অন্তত একটু আবছা দেখা যেন তিনি দেখতে পান আর একটিবার। তাহলে কংসারি হালদার একবার দেখে নেবেন সেই ঠগ, জোচ্চর খুনেদের। সেই চিঠি কথানি, তাদের মৃত্যুবাণ, এখনও হাতে আছে হালদার মশায়ের। যাবে কোথায় তারা।

ঐ যজ্ঞটি কি জিনিস, কি করতে হয় ওটাকে নিয়ে, এ সমস্ত তত্ত্ব বিশ্বাস করে একমাত্র তাদেরই জানিয়েছিলেন হালদার মশায়। যদি তিনি নিজে কখনও অশক্ত হয়ে পড়েন, তখন ঐ যজ্ঞের নিত্য তর্পণ করবে কে। এই ভয়েই তিনি ওদের দীক্ষা দিয়ে পূর্ণাভিষেক পর্যন্ত করেছেন। বার বছর পরে কাকে ওই জিনিস ক্ষেত্র দিতে হবে তাও জানিয়েছেন। কিছুই জানাতে বাকী বাথেননি। ভয়ানক বিশ্বাস তিনি করেছিলেন তাদের, তাই শয্যাশায়ী হয়ে যজ্ঞটি ওদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে অগ্নায়টা কোথায়?

হালদার মশায় বারবার নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা কবতে লাগলেন, অগ্নায়টা কোথায় তিনি করলেন?

হঠাৎ একখানি মুখ ফুটে উঠল অঙ্ককাবের মধ্যে। জল টলটল করছে দুটি চক্ষু, স্পষ্ট দেখতে পেলেন হালদার মশায়। মনে হল যেন, কানেও তিনি শুনতে পেলেন ছোট্ট একটি কথা, 'এস'। যেন তিনি চিনতে পারলেন একটু গোট-টেপা হাসি। হাসিটুকু যেন তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলে, হালদার, তোমার মনের মধ্যে কি লুকিয়ে আছে, তা আমি জানি। কি কথা তুমি বলতে চাও অথচ বলতে পার না। তাও আমি জানি। দীক্ষা দেওয়া, গুরু হওয়া এ সমস্ত শুধু অছিল। তোমার হালদার, নিজেকে তুমি ঠকাতে চেয়েছিলে, সেই ঠকাবার জন্তে একটা অছিল। চাই ত। ঐ ছুতোটুকু না পেলে রোজ তুমি ভোর রাতে আসতে কি করে আমার কাছে।

না না না না, কিছুকেই তা হতে পারে না। কংসারি হালদার মায়ের সেবায়ত, কংসারি হালদার মহাসাধকের শিষ্য, কংসারি হালদারের সামনে কেউ মুখ তুলে কথা বলতে পারে না। কংসারি হালদারের গুরুভাই বনমালী চক্রবর্তী, দ্বাদশ বছর পরে সিদ্ধি লাভ হবে তার। দ্বাদশ বছরের ন'বছর কেটে গেছে। এই কালীঘাট্ট সে আত্মগোপন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তিনটি বছর কাটলেই এমন মহাশক্তি লাভ করবে কংসারি হালদারের গুরুভাই বনমালী চক্রবর্তী, যে

সেই শক্তির প্রভাবে আবার এই মহাতীর্থ জেগে উঠবে। লোভ, পাপ আর ধর্ম-ব্যবসা লোপ পাবে কালীঘাট থেকে।

হালদার মশায় লোভে পড়ে ধর্ম ব্যবসা করতে চেয়েছেন, এবড় কথা কার সাধ্য বলবে বলুক ত দেখি হালদার মশায়ের মুখের সামনে। জানে না ওরা, এখনও ভাল করে টের পায়নি যে, কি করতে পারেন কংসারি হালদার। সকালটা একবার হোক, আর একটিবার এই সর্বনেশে আধারটা ঘুচুক তাঁর চোখ থেকে। তখন তিনি দেখাবেন মজা। যেখানেই সে থাকুক, যত বড় ভুল বুঝেই সে চলে যাক, গুরুর নাম নিয়ে ডাকলে সে ফিরবেই। বিনা অপরাধে কিছুতেই সে গুরু-ভাইকে ত্যাগ করে জন্মের শোধ চলে যেতে পারে না।

কিন্তু যদি সে একেবারে কালীঘাট ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে! যদি তাকে কোথাও খুঁজে না পাওয়া যায়!

হালদার মশায় তলিয়ে যেতে লাগলেন আবার নিবিড় অন্ধকারের অতল গহ্বরে। হয়ত সে গুরুর কৃপায় সবই জানতে পেরেছে, আর মনে মনে হেসে কংসারি হালদারকে ত্যাগ করে চলে গেছে চিরকালের মত। কিছুই অসম্ভব নয়।

কোন মানে, আপনার বলতে আর একটি প্রাণীও রইল না হালদার মশায়ের কাছে। ছেলে, ছেলের বউ, পাড়াপড়শী, এরা কে? কেউ নয়, কোনও সম্বন্ধ নেই এদের সঙ্গে। একটি প্রাণীও জানে না কিভাবে তাঁর আর বনমালী চক্রবর্তীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ ঘটেছিল সেই মহাপুরুষের। এরা কি কেউ বিশ্বাস করবে যে, এই কালীঘাটের রাস্তায় ঘাটে গা-ময় কুষ্ঠ ব্যাধির ঘা বানিয়ে যারা পড়ে থাকে, ওদের মধ্যে শিবভূল্য মহাসাধকও আত্মগোপন করে থাকেন। কালীঘাটে মহা-নিশার অস্ত্রে কত কি ঘটে, তার কতটুকু সংবাদ রাখে এরা। কংসারি হালদার আর, বনমালী চক্রবর্তী, মাত্র এই দুটি প্রাণী সেই দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। নারা রাত গুলির আড্ডায় কাটিয়ে বনমালী ফিরছিল ঘরে, হা... আর মশাই অস্ত্র এক নেশার টানে চলেছিলেন খালের ওপারে। মায়ের বাড়ীর নহবতখানার সামনে থেকে একটা কুঠরোগীকে গড়াতে গড়াতে রাস্তাটা পার হতে দেখলেন হালদার মশায়। ঘাটে যাবার রাস্তায় ঢুকে সটান সে উঠে দাঁড়াল, দিবিয় হুস্থ সবল মাহুঘের মত সোজা চলতে লাগল গঙ্গার দিকে। পেছন পেছন গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে অন্ধ-কারের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুজনে দেখেছিলেন, মাহুঘটা গঙ্গাগর্ভে গলা পর্যন্ত জলে নেমে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আজলা করে গঙ্গাজল তুলে কার উদ্দেশে অর্ঘ্য দিতে লাগল। তিনবার তিন আজলা জল অর্ঘ্য দেওয়া হল। আর প্রত্যেকবার সেই

জল গভীর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাউদাউ করে আঙুন জলে উঠল।

এই অবিস্মৃত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছিলেন হালদার মশায়, আর ঐ বনমালী ঠাকুর। গুলিখোর ডালাধরা একটা কালীঘাটের, এর বেশী কোনও পরিচয় নেই ঐ ঠাকুরের। কিন্তু সীমাহীন সাহস ওর, অসীম ভাগ্যের জোরও বটে। মহামানব গঙ্গা থেকে উঠতেই বনমালী তাঁর পাদপদ্মে আছড়ে পড়ল। দেখাদেখি সাহস হল হালদার মশায়েরও। তিনিও জড়িয়ে ধরলেন তাঁর ছু পা। কৃপা করতেই হবে।

কৃপা তিনি করলেনও, করলেন ঐ বনমালীকেই। পুরুষানুক্রমে ওরা শক্তিসাধক, তাই ও কৃপা লাভ করলে তাঁর। কে জানত যে ঐ হাড়-হাবাতে ডালাধরার ঘরে অমন অমূল্য নিধি লুকনো আছে। অন্তর্ধামী গুরু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন ওকে, “তোমার কাছে মহামায়ার যে যন্ত্রটি আছে, সেটি তুমি কার কাছে রেখে যাবে বাবা? তোমাদের ঐ জাগ্রত কুলদেবতার ভার কে নেবে? তোমার ছেলে যে একেবারে শিশু।”

বনমালী কি জবাব দেবে, ভেবে না পেয়ে চূপ করে বইল।

তখন তিনিই দয়া করে উপায় করে দিলেন। কংসারি হালদার ভার নেবে ঐ যন্ত্রের, কংসারি হালদারকে পূর্ণাভিষেক করে যেতে হবে। যতদিন না বনমালী ফেরে ততদিন কংসারি রক্ষা করবে ঐ যন্ত্র। সেই কাজই হবে হালদারের বাধনা। বার বছর বনমালীকে সংসার ত্যাগ করে থাকতে হবে। বার বছর পবে সাধনায^৬ সিদ্ধি লাভ করে ফিরবে বনমালী, কংসারির কাছেই ফিরে আসবে। তখন কালীঘাট আবার জাগবে। মহাতীর্থের মহামহিমা তখন বিশ্বজগৎকে শাস্তিব পথ দেখাবে। কালীঘাটের সমস্ত কলুষ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। একটি মাত্র শক্তি-সাধকের সাধনার ফলে মা আবার জেগে উঠবেন।

মস্তর্ভদ আশা। হালদার মশায় যন্ত্রটির ভার নিলেন। বনমালীও সংসারের ভারও তিনি নিতে চেয়েছিলেন। বনমালী রাজী হল না। প্রতিজ্ঞা করিয়ে গেল হালদার মশায়কে, তিনি কিছুতেই তার ছেলে মেয়ে স্ত্রীর খোঁজ খবর নিতে পারবেন না। গুরুর কৃপায় যদি তারা বাঁচে ত বাঁচবে। নয়ত তাদের বেঁচে দরকার নেই।

ছ’ বছর পরে বনমালী ফিরে এসে আশানে আশ্রয় নিলে। শেষ ছ’ বছর আশান বাস করতে হবে তাকে গুরুর আদেশে। এই কালীঘাটেই থাকতে হবে আশ্র-গোপন করে। শেষ ছ’ বছরের আর তিনটি বছর বাকী।

৬ সেই বনমালী এই ধারণা নিয়ে গেছে যে, গুরুভাই কংসারি হালদার তাকে ঠকিয়েছে। যন্ত্রটা ফেরত দিলে না। উঃ—

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন হালদার মশায়। আলো, আলো কই, একটু ফিকে গোছের আলো, আবছা গোছের অন্ধকার, অস্বস্ত সামান্য একটু ফুটো নিরেট নিরস্ত্র নিকষ কালো পর্দাখানার গায়ে। কিছুই কি নেই, কোনওখানে কোথাও একটু ফাঁক নেই, যার ভেতর দিয়ে হালদার মশায় একটিবার একটু উকি দিতে পারেন।

হালদার মশায়ের প্রাণটা আনচান করতে লাগল। বালিশের ওপর অনবরত তিনি মাথা চালতে লাগলেন, অবুঝ শিশুর মত অস্থির হয়ে উঠলেন একেবারে।

ধনা পৌছল মাঘের বাড়ীর পূবে কুণ্ডেব কিনারায়। এবার সে ফিরবে, আর সে এগতে পারে না। পাথরখানা না নিয়ে কোন্‌ মখে গিয়ে সে দাঁড়াবে হালদার মশায়ের সামনে। কি জবাবই বা দেবে তাঁকে।

ফিরে দাঁড়াল ধনা। বললে, “এবার আপনি যান। সিধে চলে যান, গিয়ে বা হাতি গলিতে ঢুকুন। ঐ গলি দিয়ে গেলেহ—”

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, “তুমি যাবে না বাবা?”

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল ধনা। কি উত্তর দেবে সে। ফিনকিকে খুঁজে না পেলে কি কবে সে ফিবিয়ে দেবে সেই পাথরখানা!

হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, “কে, কে ওখানে?”

চমকে উঠে ধনা জিজ্ঞাসা করলে, “কই? কাকে দেখলেন?”

“ঐ যে কুণ্ডের জল থেকে উঠে আসছে।”

এইবার ধনা দেখতে পেল। দেখল একজন উঠে আসছে কুণ্ডের ভেতর থেকে, স্পষ্ট দেখতে পেল, লোকটার ছহাতের ওপর আর একটা মানুষ। বৃকের কাছে ধরে বয়ে আনছে, কাকে ও!

এ কি! কাউকে ডুবিয়ে মারতে এসেছে নাকি কেউ মায়ের কুণ্ডে?

চোঁচিয়ে উঠল ধনা, “কে-কে তুম? তুম কোন হায?”

জবাব নেই। লোকটা পালাবার জন্তে জোরে পা চালালে। এক লাফে তার সামনে পড়ে প্রাণপণে চোঁচাতে লাগল ধনা, “চোর চোর।”

তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে ঘুমন্ত কালীঘাট রৈ রৈ করে উঠল। দোকান-পাট ঘর-বাড়ীর ভেতর থেকেই মানুষে চোঁচাতে লাগল, “চোর চোর, ধর ধর, মার মার।” ধড়াস্‌ধড় আওয়াজ উঠল জানালা দরজা খোলার। চতুর্দিক থেকে ছপছপ শব্দে ছুটে আ- ত লাগল সকলে। ভিখিগীগুলো তাদের

ফুটপাথ শয্যার ওপর উঠে বলে হাউ মাউ খাউ জুড়ে দিল। মায়ের মন্দিরের চুড়োর ওপর কালীঘাটের শাস্ত্র সিন্ধু উষা ভেতে আগুন হয়ে উঠল।

যে পালাছিল সে ধপ করে বসে পড়ল ধনার পায়ের কাছে। যাকে সে বয়ে নিয়ে পালাছিল তাকে কিন্তু ছাড়লে না। দুহাতে তাকে আঁকড়ে ধরে রইল নিজের বুকের সঙ্গে। কিছুতেই যেন কেউ কেড়ে নিতে না পারে তার বুকের ধন, এ জগৎ মাথা নিচু করে আড়াল দিয়ে রইল। ধনা যাকে নিয়ে যাচ্ছিল হালদার বাড়ীতে তিনিও এক অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। ছুটে এসে দুহাত মেলে আগলে দাঁড়ালেন তাদের। পাছে লোকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ভয়েই বোধ হয় আড়াল করে দাঁড়ালেন।

রাস্তার আলো নিভে গেছে তখন, আকাশের আলোয় ভাল করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবু ধনা দেখতে পেলে মুখের পাশটা, লোকটাব কাঁধের ওপরে পড়ে আছে মুখখানি। দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ধনা, দুহাতে ধরে ফেললে হাত দুখানি। প্রাণপণে আবার টেঁচিয়ে উঠল, “ফিনকি, ফিনকি।”

ততক্ষণে বহু মানুষ জমে গেছে চারিদিকে। ভাল করে ঘূমের ঘোরও বোধ হয় কাটেনি কারও। কি যে ঘটেছে চোখের সামনে, তার মাথামুণ্ড বুঝতেই পারলে না কেউ। একটা মানুষ একটা মেয়েকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বসে আছে পথের মাঝখানে, আর একটা ছোঁড়া মেয়েটাব হাত দুখানি ধরে মবীয়া হয়ে টানটানি করছে। মেয়েটা মরেছে কি বেঁচে আছে তাও বোঝার উপায় নেই।

চীৎকারের চোটে আকাশ বাতাস ফেটে যাবাব যোগাড। যার যা মুখে আসছে তাই বলে চৈঁচাচ্ছে। আরও মানুষ ছুটে আসছে চারিদিক থেকে। যে যা হাতের কাছে পেয়েছে নিয়ে এসেছে। কিন্তু হাতের স্থখ করার উপায় নেই কারও। সামনে ধনা, পেছনে তিনি, লোকে চোরটার কাছে পৌঁছতেই পারছে না। কাজেই শুধু ঠেলাঠেলি আর গুঁতোগুঁতি। কেউ কারও কথা শুনতেও পাচ্ছে না, শোনার দরকারও নেই। চোর যখন ধরা পড়েছে তখন আর কি। যে যত পার মনের স্থখে গলা ফাটিয়ে চৈঁচাও।

ইতিমধ্যে কোন্‌ ডেঁপো দমকল ভেকে ফেলেছে। দূরে কালীটম্পল রোডের মোড়ে শোনা যাচ্ছে ঢং ঢং ঢং ঢং আওয়াজ। প্রাণ কাঁপান আওয়াজ তুলে ছুটে আসছে দমকল। দমকল পৌঁছবার আগেই পৌঁছে গেল পুলিশের দুখানা লরি। লাঠি হাতে লাফিয়ে পড়ল লরি দুটো থেকে দু'তিন কুড়ি লাল পাগড়ি। সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেল দুখানা দমকল। ঢং ঢং ঢং ঢং প্রচণ্ড শব্দে সব রকমের চিংকার গোলমাল ডুবে গেল।

কে কাকে খামাতে পারে। হকচকিয়ে গেছে সকলে। আগুন লাগল আবার কোথায়।

দমকলওয়ালারা বাজিয়েই চলেছে ঘণ্টা পথ সাফ করার জন্তে। পুলিশ ভাবলে, নিশ্চয়ই লেগেছে আগুন ওধারে, ঐ খালের পারে কোথাও, নয়ত দমকল এল কেন। সুতরাং সর্বাগ্রে পথ করে দাও, দমকলের জন্তে, হটাৎ মানুষ, ভিড় হটাৎ।

আরম্ভ হয়ে গেল পুলিশের আদি ও অন্ধিম হাতেব খেলা। লাঠি আর লাল পাগড়ি চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষের ওপর। চক্ষের নিম্নে সাফ হয়ে গেল ভিড়। বাড়ী-ঘর, মানুষের বুক সব কাঁপাতে কাঁপাতে দমকল দুখানা ছুটে চলে গেল পশ্চিম দিকে।

সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডর মধ্যে হুঁশ ফিরে পেল ফিনকি। মাথাটা তুললে সে, তারপর লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে চোখ মেললে। চোখ মেলেই সে বুঝতে পাবলে যে তার হাত দুখানায় ভয়ানক টান পড়ছে। পর মুহূর্তেই তার মনে হল যে কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। এতটুকু নড়বারও তার শক্তি নেই।

শান যাবে কোথা চিল-চৈচানি জুড়ে দিলে ফিনকি চোখ বুজে। হঠাৎ সব নিস্তর হয়ে গেল। মেয়েটা বঁচে আছে তাহলে। চৈচানির চোটেই বোধ হয় যে তাকে আঁকড়ে ধরে ছিল তার হাতের বাঁধন গেল আলগা হয়ে, কিন্তু কব্জির বাঁধন আলগা হল না। ফলে এক হেঁচকায ফিনকি পৌঁছে গেল ধনার বকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কব্জি ছেড়ে দিয়ে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলে ধনা। সেই মুহূর্তে একটিবার মুখ তুলে চেখে চেখে দেখতে পেল ফিনকি ধনাব মুখখানা। দেখেই ফিনকিও তাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরলে। চৈচানি কিন্তু সে খামালে না। ধনার বকে মুখ গুঁজে পরিত্রাহি চৈচিয়েই যেতে লাগল।

চারিদিকে তখন পুলিশ। অত জোড়া চোখের সামনে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে। ধনার দুচোখ দিয়ে আগুন ছুটছে। গাশ ফাটিয়ে সে বলেই চলেছে এক কথা, “চোর, চোর। একে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল ঐ লোকটা।”

ওদের দুজনের পায়ের কাছে এক মাথা চুল, এক মুখ বিলী গোঁফ দাড়ি, সর্বাঙ্গে ময়লা মাথা সেই লোকটা মাথা নিচু করে বসেই রইল। কিছুতেই সে আর মাথা তুলতে পারে না।

একজন অফিসার পুলিশের ব্যাহ ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পিছনে এলেন পাঞ্জামা আর পাঞ্জাবি পরা চতুরানন চৌধুরী। মুকিম সাহেব ফিনকির দিকে তাকিয়েই চৈচিয়ে উঠলেন, “এই যে, এই যে সেই মেয়ে।” টপ

করে একবার মুখ তুলে হাকিমের মুখের দিকে তাকিয়েই ফিনকি আবার মুখটা ও জে ফেললে ধনার বুকে। যেন সে কোনও রকমে ধনার বুকের ভেতর লুকতে পারলে বাঁচে।

অল্প কেউ কিছু বলবার আগেই যিনি আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন এতক্ষণ চোরটাকে, তিনি এক পা এগিয়ে এসে ধরে ফেললেন ফিনকির কাঁধটা। মিনতি করে বললেন ধনাকে, “ছেড়ে দাও বাবা এবার। এস ত মা আমার কাছে।”

ধনা ছেড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ, ফিনকিকে তিনি টেনে নিলেন নিজের বুকে। নিয়ে তাঁর গায়ের চাদর দিয়ে ঢেকে ফেললেন তাকে।

ব্যাপার দেখে চতুরানন চৌধুরী ঘাড় চুলকতে লাগলেন। অফিসার চড়া স্বরে ভকুম্ব দিলেন, “এই, উঠাও ইস্‌কো।”

তৎক্ষণাৎ আরও কঠিন স্বরে আদেশ হল, “খবরদার কেউ গুর গায়ে হাত দেবেন না।” যিনি ফিনকিকে চাদর ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁর দিকে সকলের নজর গিয়ে পড়ল। তিনি তখন অম্মনয় করে বলছেন, “উঠুন এবার আপনি, দয়া করে উঠে দাঁড়ান।” কারও মুখে একটি কথা নেই। লোকটা মাটিতে হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। ধনার মাথার একখানা হাত রেখে অতি আশ্চর্য রকম শাস্ত গলায় সে জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কে বাবা? তোমায় ত চিনতে পারছি না। এ মেয়ে তোমার কে?”

কি উত্তর দেবে ধনা। ভয়ানক ভাবাচাকা খেয়ে সে তাকাতে লাগল চারিদিকে। বোধ হয় আবার সটকাবার মতলবই এসে গেল তার মাথায়।

কিন্তু অত মানুষের মাঝখান থেকে সটকাবে কি করে সে। তাছাড়া ফিনকিকে ফেলে সটকান, তাই বা কি করে সম্ভব। যা ভয়ানক মেয়ে, আবার হয়ত গা ঢাকা দিয়ে বসবে।

ধনা তোতলাতে শুরু করলে।

“মানে ও হল এই মানে।”

হাকিম চতুরানন চৌধুরী চড়া স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “ও তোমার কে হয়?”

আরও ঘাবড়ে গেল ধনা, তোতলানোও বৃদ্ধ হয়ে গেল তার। কক্ষণ চোখে সে তাকাল একবার ফিনকির দিকে। সেই মুহূর্তে ফিনকিও একবার মুখ তুলে তাকাল ধনার চোখের দিকে। সে চাউনিতে কি ছিল ধনাই জানে। মরীয়া হয়ে সে বলে বসল, “ও হল, এই যাকে বলে, পরিবার, আমার পরিবার।”

হো হো শব্দে হেসে উঠল সকলে। দাঁড়ি-গোঁফ হুচ্চ সেই বিশ্রী লোকটাও হাসতে লাগল প্রাণখোলা হাসি। পুলিশ অফিসারের ত আর বেশীক্ষণ হাসা চলে

না। তিনি লাগালেন এক প্রচণ্ড ধমক পাগলটাকে।

“এই, হাসছ যে? হাসছ কেন তাঁত বার করে? তুমি কে? পেলে কোথায় এই মেয়েটাকে?”

“আমি কে?” পাগলা আবার জুড়ে দিল হাসি। হাসতে হাসতে বলতে লাগল, “আমি কে? তা তো জানি না বাবা। তা জানে কংসারি হালদার। হালদার বলে দেবে, কে আমি। চল, নিয়ে চল আমাদের হালদারের কাছে। ঐ মেয়েটাকে আর বাবাজীকেও নিয়ে চল হালদারের কাছে, সে বলে দেবে, ওরা আমার কে হয়।”

চতুরানন তখন যেন আন্দাজ করতে পেরেছেন খানিকটা। হালদার মশায়ের নাম শুনে বেশ একটু নরমও হয়ে পড়লেন তিনি। বললেন, “হালদার মশায় চেনেন আপনাকে? বেশ, তাহলে চলুন, তাঁর কাছেই যাওয়া যাক।”

হালদার মশায় শাস্ত হয়েছেন, বদ্ধ হয়েছেন তাঁর ছটফটানি। চোখ বুজে স্থির হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। চোখ মেলবার প্রয়োজনই তাঁর ফুরিয়ে গেছে। মেলাই, থাকুক, বা বোজাই থাকুক, সবই এখন এক কথা! দিনই হোক বা রাতই হোক, কিছুতেই কিছু আর যায় আসে না হালদার মশায়ের। অঙ্কের কিবা রাত, কিবা দিন, দুইই সমান।

বহুকণ ঝড় ঝাপটা খাওয়ার পর একটা আশ্রয় পেলে কাক যেমন ভাবে ঠোঁট ফাঁক করে মুখ ওপর দিকে তুলে চূপ করে বসে থাকে, তেমনি দশা হয়েছে হালদার মশায়ের। বহুকণ তিনি যুঝেছেন ঝড় ঝাপটার সঙ্গে, আশা নিরাশার প্রচণ্ড ছলুনিতে দম বদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল তাঁর। আলো-আঁধার নির্মম নিষ্পেষণে তাঁর প্রত্যেকটি বৃকের পাজরা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে বেঁচে হয়। এতক্ষণে মিলেছে পরিজ্ঞান, এতটুকু আর সন্দেহের অবকাশ নেই। চরম জানাটা জেনে ফেলেছেন হালদার মশায়। জেনেছেন, অঙ্ককার শুধু অঙ্ককার। বিরামহীন অনন্ত অঙ্ককার মাত্র সম্বল এখন। কোথাও কোনওখানে এক বিন্দু আলোর চিহ্নমাত্র নেই।

কাঁদছে সকলে। তপু, তাক, বোঁমারেরা সবাই নিঃশব্দে কাঁদছে তাঁর চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে। ওদের নিঃশব্দ কান্নার শব্দও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন হালদার মশায়। স্থির হয়ে শুয়ে তিনি শুনছেন ওদের নীরব ক'থা। কান্নাই শুধু শুনছেন, শুধু কান্না। ছাড়া আর কোনও কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না তিনি।

থেকে পাঠানো হয়েছে পঞ্চানন ভট্টাচার্যকে, বড় মিশ্র মশায়কেও ডাকতে পাঠানো হয়েছে। তারা আসছে, কংসারি হালদার ডাকছেন সুনলে তারা আসবেই। এলে পর হালদার মশায় সব কথা খুলে বলবেন সকলের সামনে। এতটুকু কিছু রেখে-ঢেকে বলবেন না। তখন সকলে জানতে পারবে কংসারি হালদারের আসল রূপটা। সারা কালীঘাটের মানুষ কখনও মুখ তুলে কথা কইতে পারেনি তাঁর সামনে। যমের মর্ত ভয় করেছে সকলে তাঁকে। এককাল সকলে জেনেছে যে, এতটুকু অন্ত্যায় অন্ত্যায়, তিলমাত্র ছ্যাচডামি ভণ্ডামি, বিশেষত ধর্মের নামে ব্যবসাদারি কংসারি হালদার মশায়ের সামনে চলবে না। সবাই জানে, মায়ের বাড়ী থেকে বহু পাপ দূর হয়েছে কংসারি হালদারের জন্তে। এই একটি মাস্তবের সদা-সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না বলে মায়ের বাড়ীর মধ্যে টানা-হেঁচডান, জোর-জুলুম করা, বা মেয়েমাস্তবের গা ছোঁয়ার কোন উপায় ছিল না কারও। নেশা করে মায়ের বাড়ীতে কেউ ঢুকেছে, টেব পলে হালদার মশায় তাকে পুকুরে চোবাবার ব্যবস্থা করতেন। অত্যাচার, নির্দয় হয়ে শুধু অত্যাচারই চালিয়ে গেছেন জীবনভোর কংসারি হালদার, কালীঘাটের মায়ের বাড়ী চেটে যারা কোনও রকমে বেঁচে আছে তাদের ওপর। মুখ বুজে সকলে সহ্যও করছে তাঁর অত্যাচার। এবার তারা প্রতিশোধ নেবে। এককাল পবে সকলে জানবে যে, কংসারি হালদারের চেয়ে পাপী আর একটিও নেই কালীঘাটে। টাকার জন্তে লোকটা যা করেছে তা করার সাহস আর একটি প্রাণীরও নেই কালীঘাটের জিন্দামানার মধ্যে।

তখন আর এরা কাঁদবে না। তপু, তারু, বোমায়েরা আর চোখের জল ফেলবে না তখন। তখন ওরা ওদেব মুখ লুকবে কোথায় তাই ভেবে পাবে না।

তারপর কান্না, শুধু কান্না, নিরবচ্ছিন্ন কান্নাই শুধু সুনবেন হালদার মশায়। কান্নাটা সুনতে পাবেন তাঁর বৃকের ভিতর থেকে। কান্নার সমুদ্র ফুঁসিয়ে উঠবে তাঁর বৃকের মধ্যে। কিছুতেই সেই কান্নার ঢেউ থামানো যাবে না।

প্রাণপণে নিজেকে নিজে সামলে রাখলেন হালদার মশায়। আঃ এই সঙ্গে যদি শোনার ক্ষমতাইকুণ্ড লোপ পেত। যদি কেউ দয়া করে তাঁর কান দুটো কোনও রকমে বুজিয়ে বন্ধ করে দিত !

তাহলে অন্তত তিনি কান্না শোনার দায় থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচতেন।

হালদার মশায় ডুব দেবার চেষ্টা করলেন নিজের মধ্যে। ডুবে তিনি এড়িয়ে যেতে চান, কান্না, কান্নাকে তিনি ফাঁকি দিতে চান নিজের মধ্যে নিজে তলিয়ে গিয়ে।

অসম্ভব, আরও অসম্ভব। কান্না তখন নিবিড় কালোরূপ ধরে, তাঁর অন্ধ চোখের অন্ধদৃষ্টি জুড়ে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হাসতে লাগল।

সতয়ে বোঝা চোখ আরও জোরে বুজে রইলেন হালদার মশায়। জোরে, আরও জোরে, অন্তিম চেষ্টায় তিনি তাঁর অন্ধ চোখের দৃষ্টিশক্তিটুকুকে পিশে মারতে চাইলেন।

উপায় নেই, কোনও উপায় নেই। যতই তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন কিছু না দেখবার সত্ত্বে, ততই সেই কালোরূপ স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট, একেবারে জাজ্জল্যমান স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তাঁর বৃকের মধ্যে। চেয়ে রইলেন হালদার মশায় সেই নিবিড় কালো কান্নার দিকে। অসহায় ভাবে চেয়েই রইলেন।

চেয়ে থাকতে থাকতে শেষ পৰ্যন্ত যা চাইছিলেন তিনি, তাই পেলেন! শোনার দায় থেকেও অব্যাহতি পেলেন। দেখারও কিছু নেই, শোনারও কিছু নেই, একদম কোথাও কিছু নেই। শুধু আছে একটা অন্তর্ভূতি, যেমন নীত বা গ্রীষ্ম। দেখাও যায় না, শোনাও যায় না; কিন্তু বোঝা যায় যে নীত করছে বা গরম হচ্ছে। তেমনি হালদার মশায় বুঝতে পারলেন যে কান্না রয়েছে। কালো কান্না, নীরব কান্না, রূপহীন বর্ণহীন বোঝা কান্না। যা শোনাও যায় না, বোঝাও যায় না, শুধু মর্মে মর্মে অন্তর্ভব করা যায়।

সে কান্নায় শোক নেই, দুঃখ নেই, হা-হতাশ নেই, জ্বালায়ন্ত্রণাও নেই। সে কান্নায় প্রাণ নেই, মন নেই, হৃদয় নেই, রাগহিংসাও নেই। সে কান্নায় কারও করুণা উদ্ভেক করবে না, কাবও মন টলবে না, কারও হৃদয় গলবে না। হালদার মশায় পরম পরিভূক্তির সঙ্গে সেই নিঃসঙ্গ কান্নার মাঝে হাবডুব খেতে লাগলেন। তাঁর বৃকের জ্বালা জুড়িয়ে গেল সেই কালো কান্নার সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে। বহুকাল পরে তিনি নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে কারও হাতে মঁপে দিতে পেরে শান্তি পেলেন। একেবারে ভাবনা চিন্তা শূন্য হয়ে গেল তাঁর মন, বর্ণহীন বোঝা নিঃশেষ হয়ে নেমে গেল। একদম নিঃসঙ্গ হওয়ায় যে এত শোয়া, তা তিনি কখনও জানতে পারেননি জীবনে। নিঃসঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতখানি যে নিঃশব্দ হওয়া যায় তা টের পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

কতক্ষণ যে এ অবস্থায় কাটল তাঁর তাও তিনি টের পেলেন না, সময়টাও যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হালদার মশায়ের মনে হল যে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও কোথায় মিলিয়ে গেছে, এমন কি তিনি নিজেও নেই। আছে শুধু নিবিড় নিঃসঙ্গ অন্ধকার। অন্ধকারও তাকে বলা ভুল, বলা উচিত শুধু কালোই আছে, কালোর অন্তরের মধ্যে যে কালো থাকে সেই অনাবিল কালো ছাড়া কোথাও আর কিছু নেই।

তারপর এক সময় সেই কালো কান্নার বুকে ধনি ফুটে উঠল—

“আমি তাই কালোরূপ ভালবাসি”

খুব ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে আবার চেতনার রাজ্যে ফিরে আসতে লাগলেন হালদার মশায়। একটু একটু করে বুঝতে লাগলেন শব্দগুলো—

“আমি তাই কালোরূপ ভালবাসি।

জগ-মনমোহিনী এলোকেশী।

ভালবাসি ॥”

ভুল শুনছেন না ত !

হালদার মশায়ের মনে হল, শোনাটা তাঁর মনের ভুল। গাইছে না কেউ ও গান। কে গাইবে এই নিবিড় কালো অন্ধকারের মাঝে। তবু তিনি শুনতে লাগলেন প্রাণ-মন দিয়ে—

“আমি তাই কালোরূপ ভালবাসি।

যিনি দেবের দেব মহাদেব—

কালোরূপ তার হৃদয়বাসী,

কালোবরণ—”

এ কি। কালো কান্নার বুকে ভাষা ফুটল নাকি।

হালদার মশায়ের মনে হল, কান্নাব ভাষাটা যেন এবার একটু একটু তিনি বুঝতে পারছেন।

“যিনি দেবের দেব মহাদেব

কালোরূপ তার হৃদয়বাসী

কালোবরণ

ব্রজের জীবন

ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।

ভালবাসি।

আমি তাই কালোরূপ ভালবাসি ॥”

গলাটাও চিনতে পারছেন যেন হালদার মশায়। না না, তা হতেই পারে না। কিছুতেই তা হতে পারে না। কোথা থেকে আসবে সে এখানে? কেন সে আসবে? সবই ত সে বুঝতে পেরেছে, কিছুই ত লুকনো যায়নি তার কাছে। সে জেনে গেছে যে, কংসারি হালদারের ভেতরে কালো ছাড়া অস্ত্র কিছু নেই। কংসারি তাকে ঠকিয়েছে। তাই সে চলে গেছে চিরকালের মত কংসারিকে ছেড়ে। সে আসবে কোথা থেকে এখানে, এই অন্ধকার কান্নার মধ্যে মরতে?

তবু তখনতে লাগলেন হালদার মশায়—

“হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী

বাণী ত্যাগে করে অসি,

প্রসাদ ভনে

অভেদ জ্ঞানে

কালোক্রপের মেশামেশি।

ভালবাসি।

আমি তাই কালোক্রপ ভালবাসি।

জামা মনমোহিনী এলোকেশী।

ভালবাসি।”

গান শেষ হবার আগেই চোখ মেললেন হালদার মশায়।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠলেন।

এ কি। আলো যে। আলো, আলো, আলো আবার আলো যে রে।
আলো যে।

আলোর মাঝে ফুটে বয়েছে দাঁড়ি গোঁফ স্তম্ভ মুখ একটা, বনমালীর মুখ।
বনমালী তাঁর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে গাইছে—

“হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী”

হালদার মশায় মাথা ঘুরিয়ে একে একে সকলের মুখের দিকে তাকালেন।
সকলেই এসেছে আবার, আসতে বাকী নেই আর কেউ। ভটচাষ এসে দাঁড়িয়েছে
শিয়রে, এক মনে জপ করে চলেছে ইষ্টমন্ত্র, বড় মিশ্র মশাই দেওয়াল ঠেস দিয়ে
দাঁড়িয়ে গুনগুন করে তাবকব্রহ্ম নাম আওড়াচ্ছেন। ছেলেরা, বোঁমায়েরা রয়েছে
পায়ের দিকে, ওরা কাঁদছে। ওদের চোখে সত্যিই জল। আরে, নাতি নাতনী-
গুলোও এসেছে যে। ওরা যে সাহস করে ঢুকল তাঁর ঘরে কাঁদছে না কেউ,
মহা-অপবোধীর মত মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আর ওটা কে। সেই ফিনকিটা নথ। আর ওর ওধারে ও কে।

হালদার মশায় একদষ্টে তাকিয়ে বইলেন ফিনকির দিকে। ফিনকিকে সামনে নিয়ে
ঘিনি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে বইলেন হালদার মশায়।
চোখ আর ফেরাতে পারলেন না।

বনমালী ঠাকুর ফিসফিস করে বলতে লাগল, “কি দেখে এলেন হালদার?”

এতক্ষণ ধরে চোখ বুজে কি দেখলে তুমি ? কালো ছাড়া আর কিছু দেখতে পেরেছ কোথাও ? বল, হালদার, বল, কি দেখে এলে তুমি ।”

অতি কষ্টে একথানি হাত উঠিয়ে বনমালীর গায়ের ওপর রাখলেন হালদার মশায় । অতি কষ্টে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, “না বনমালী, কালো ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই ।”

নিস্তব্ধ ঘরে আর কারও মুখে বোনও কথা নেই, শুধু অশ্রু শোনা যেতে লাগল বড় মিশ্র মশায়ের মুখে তারকব্রজ নাম ।

শেষে চতুরানন চৌধুরী এগিয়ে গেলেন । দু-পা সামনে এসে হালদার মশায়ের নজরে পড়লেন তিনি । তাঁর চোখের সঙ্গে হালদার মশায়ের চোখ মিলতেই জিজ্ঞাসা করলেন, “কেমন আছেন কাকা ? একটু ভাল বোধ করছেন ত ?”

“কে ! চতুর, তুমি এত সকালে—” হালদার মশায় বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন ।

“আপনাকে দেখতে এলাম কাকা । আমি জানতাম না যে আপনার এত বড় অসুখ । এই এঁরা সকলে আসছিলেন আপনার কাছে , আমিও সঙ্গে এলাম ।” চতুরানন চৌধুরী আর কি বলবেন ভেবে পেলেন না ।

বনমালী ঠাকুর তৎক্ষণাৎ শুধবে দিলে কথাটা ।

“না না হালদার, শুধু তোমায় দেখতেই আসেননি ইনি । এসেছেন আমার পরিচয়টা জানার জন্তে । আমি পালাচ্ছিলাম মেয়ে চুরি করে, হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছি ।”

হালদার মশায় আরও আশ্চর্য হয়ে গেলেন ।

“মেয়ে চুরি ! কার মেয়ে ?”

“ঐ ত দাঁড়িয়ে রয়েছে ওধারে । ঐ যে ।”

বনমালী ঠাকুর ফিনিকিকে দেখিয়ে দিলেন ।

“ও মেয়ে ত তোমার । ওকে চুরি করলে কোথা থেকে । ধরলেই বা তোমায় কে ?”

“ধরলেন ঐ উনি, ঐ যে এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবাজী । উনি ধরলেন, সকলের মুখের ওপর বলে ফেললেন যে তাঁর পরিবারকে চুরি করে নিয়ে আমি পালাচ্ছিলাম । তাই এঁরা জানতে এসেছেন আমার পরিচয় ।”

কিছুই না বুঝতে পেরে হালদার মশায় ধনাকেই ডাকলেন কাছে, “এধারে আয় ত বাঁবা, বল ত কি হয়েছে ? ওই মেয়েটার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছে নাকি ?”

ধনা সামনে এসে দাঁড়িয়ে ঘাড় চুলকতে লাগল । মুখ সে ভুলতেই পারলে না, কাজেই জবাব দেনি কি করে ।

তখন ফিনকিকে ধরে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, “ওই ছেলে আমাকে নিয়ে আসছিল এখানে। মায়ের কুণ্ডের ধারে আমরা দেখতে পেলাম, এই মেয়েটাকে কাঁধে করে উনি উঠে আসছেন কুণ্ড থেকে। মেয়েটার তখন হুঁশ নেই।”

চতুরানন বলে উঠলেন, “সেই ত হচ্ছে কথা। মেয়েটাকে আনলে কে আমার বাড়ী থেকে। রাত বারটা একটা পর্যন্ত জ্বরে বেহুশ ছিল ও, রাত একটার পর আমি শুতে গেছি। জ্বরটা তখন কমে আসছিল। একটা ঝি ছিল ওর কাছে। ঝি-টা ভোরবেলা চোঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। উঠে দেখি, মেয়ে নেই। তখনই থানায় জানালাম, তারপর কুণ্ডের ধারে গোলমাল হচ্ছে শুনে এসে দেখি, ইনি ধরা পড়েছেন ঐ মেয়ে নিয়ে।”

ধনা এতক্ষণে কথা বলার ফাঁক পেলে। তৌতলাতে তৌতলাতে বললে, “মানে আমি এই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম কি না ওকে। ও যে পালিয়েছিল ওদের বাড়ী থেকে। আর আপনার সেই পাথরখানা আমি রাখতে দিয়েছিলাম কিনা ওর কাছে, তাই—”

হালদার মশায় থপ করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন ধনাকে। ব্যাকুল হয়ে বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় সেই পাথরখানা? দে ত বাবা, দে ত আমায় সেটা। সে পাথর যার জিনিস তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই আমি।”

ধনা তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে দিলে ফিনকিকে।

“ঐ ওর কাছে জমা দিয়েছি হালদার মশায়। মানে, মনে করেছিলুম, এক ফাঁকে সেটা নিয়ে গিয়ে খালের ওপারে দিয়ে আসব। তা ও যে সটকাবে বাড়ী থেকে তা তো—”

ফিনকি বাঁ কবে মুখ তুলে বলে ফেললে, “হাড মিথ্যুক কোথাকার। কিছু বলেনি ও আমাকে হালদার মশায়। টপ করে পাণ গানা আমাব হাতে গুঁজে দিয়ে সব পড়ল।”

হাসির ধুম পড়ে গেল ঘরের ভেতর। একটু আগ যেখানে শোকের গুমটে সকলের দম বন্ধ হওয়ার যোগাড় হয়েছিল, সেখানে শান্তির নীতল হাওয়ায় সবাই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। স্বয়ং হালদার মশায়ও হেসে ফেললেন।

ঘরের বাইরে আবার গোলমাল শোনা গেল। কে যেন বলছে, “হ্যাঁ, এই ঘরেই আছে সে মেয়ে। যে চুরি করেছিল মেয়েটাকে সেও ধরা পড়েছে।”

আর একজন হেঁড়ে গলায় বলতে লাগল, “আরে বাব্বা, মেয়ে নিয়ে পালাবে কোথায় বাছাধন। আমার নাম পরাণকেষ্ট গুঁই, আমার লোকের গায়ে হাত

“দেওয়া, আমার লোককে বেইজ্ঞত করা, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজাটা।”

“হুড়মুড় করে অনেক লোক ঢুকে পড়ল ঘরে। ফিনকির মা ছুটে এসে দুহাতে জাপটে ধরলেন মেয়েকে। বুক ফাটা একটা আত্মনাদ শোনা গেল, “ফিনকি রে, কি করে তুই তোর মাকে ছেড়ে পালিয়ে এলি।”

ফণাও দৌড়ে এসে ধরে ফেললে বোনের হাত একথানা। একটি কথাও কইতে পারলে না সে। সবাই দেখলে বোনের হাত-ধরা হাতথানা তার ঠকঠক করে কাঁপছে।

আড্ডতদার পরাণকেষ্ট কাজের মানুষ। তিনি কাজের কথাই বলতে লাগলেন বার বার, “দারোগা সাহেব কই? গেলেন কোথা জমাদার সাহেব? সাবধান, চোরটা যেন না পালায়। হাতেনাতে ধরা পড়েছে বাছাধন, কিছুতেই ছাড়া হবে না। এ শালা হাডনচ্ছারের স্থান কালীঘাট। মান-ইজ্ঞত নিয়ে ঘর করতে পারে না কেউ এখানে। এবারে দেখাচ্ছি মজা, আমার নাম পরাণকেষ্ট গুঁই, আমার সঙ্গে—”

হঠাৎ ধনা খেপে গেল একেবারে। এক লাফে ফিনকির কাছে গিয়ে সে তার আর একথানা হাত ধরে ফেললে। নিছক অপরাধীর আকুল আকৃতি ফুটে উঠল তার গলায়।

“এই তোমার গা ছুঁয়ে দিবি গালছি, মাইরি আর ছোট কাজ করব না কখনও। পাখরথানা ফেরত দিয়ে যাও, নয়ত হালদার মশায় আমাকে মেরে ফেলবে।”

ফিনকিও গেল খেপে। এক ধমক লাগিয়ে দিলে সে, “চূপ চোর কোথাকাব। কিসের জন্তে মরতে দিতে গেলে আমার হাতে পাখরথানা?”

আবার হেসে উঠল অনেকে। তাতে ফিনকি আরও রেগে গেল। সে ভাবলে, তাকেও সকলে ধনার মত চোর মনে কবছে। চিংকার কবে উঠল সে, “কেন আমার সকলে চোর মনে করবে তোমার জন্তে? কেন—?”

রাগের চোটে ফিনকির বাক-রোধ হয়ে গেল। আর কিছুই বলতে পারলে না সে, তার দুই চোখ থেকে আগুন ছুটছে তখন। হাতথানা কিন্তু তখনও ধরাই রয়েছে ধনার হাতে, ধনা তার হাতথানি দুহাতে আঁকড়ে ধরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

হালদার মশায় হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে ধনাকে বললেন, “ঠিক কাজই তুই করেছিল বাবা। যাকে দেবার তার হাতেই দিয়েছিল সে ভিনিস। আমারই মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। যাক, এখন বনমালী, তোমার মেয়ের কাছ থেকে

তুমি নাও তোমাদের কুলদেবতা।”

কণা কিনিকি, কিনিকির মা এক সঙ্গে মুখ কিয়িয়ে তাকাল বনমালী ঠাকুরের দিকে। কিনিকির মা একবার হাঁ করলেন কিছু বলবার জন্তেই বোধহয়। বলতে কিছুই পারলেন না, চোখ বুজে মুখ গুঁজড়ে বসে পড়লেন ছেলেমেয়ের পায়ের কাছে।

বনমালী ঠাকুর ফিরেও তাকাল না সেদিকে। হালদার মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, “পাথর হালদার, স্রেফ একটুকরো পাথর। ওতে প্রাণ নেই, হৃদয় নেই, কিছু নেই। ওই পাথরের টুকরোয় আব আমার কোনও দরকার নেই। তুমি মরতে বসেছ ৩০ কাল যখন ওই জিনিসটার জন্তে তোমার কাছে এসেছিলাম, তখন আমাবও মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। এক বোঝা নোড়াহুড়ি, স্ট-পাটকেল সর্বাঙ্গে ঝুলিয়ে বসে মরছিলাম, তাই ওই-পাথরের টুকরোটোর মায়া ছাড়তেও প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল। আজ দেখ, সব বিসর্জন দিয়ে এসেছি। শেষ রাতে ঝাড়া হাত পা নিয়ে সব পড়ছি কালীঘাট থেকে, পেছনে এসে আছড়ে পড়ল ঐ মেয়ে। বাস, সব মল্লব ভেসে গেল। ওর মুখখানা বাস্তব আলোয় ভাল করে দেখে কোনও কিছু মনে রইল না আব তখন। তুলে নিয়ে কুণ্ডের ধারে এলাম, ওর মুখে চোখে জল দেবার জন্তে। ধবা পড়ে গেলাম, আর আশ্চর্য শ্যাপার কি জান হালদার, জ্ঞান হতে মেয়েটা জোঁব করে আমাব বুক থেকে ছিটকে গিয়ে দুহাতে আকড়ে ধরলে ঐ ও-কে। তখন ঠেলে ঐ মেয়েকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে টেচাতে লাগল, ‘চোর, এই লোকটা একে চুঁব কবে নিয়ে পালাচ্ছে।’ অত লোকের মুখের ওপব জোর গলায় বলে ফেললে, ‘ও আমার পরিবার।’ তখন যদি ওর মুখ চোখের অবস্থা দেখতে হালদার। নিজের পরিবারের মান-ইজ্জত বাঁচাবার জন্তে ও হন্তে হয়ে উঠেছে তখন। আসল ব্যাপারটা আমার চোখে ধবা পড়েছে হালদার। পাথরে আব আমার কোনও দরকার নেই। আমি দেখতে পেয়েছি ওদের, ওরা জন্মেছে, ওরা বঁচে আছে, ওরা ওদের নিজেদের মান-ইজ্জত বাঁচাতে জানে। কোনও ঢাক ঢাক গুড়গুড়ের পরোয়া করে না ওরা। যদি কোনও দিন এই শীথের উদ্ধার হয় ত ওদের হাত দিয়েই তা হবে। গুপ্ত সাধন-ভজন সিদ্ধিলাভ এই সব গোঁজামিলের পথে কোনও কালে কালীঘাটের কালীকে জাগানো যাবে না, যদি ইচ্ছে হয়, বিশ্বাস করতে পার, চৈতন্যস্বরূপা আত্মশক্তি জেগে উঠেছেন ওদের বৃকে। কারণ লুকিয়ে কোনও কিছু করার ওদের গরজ নেই কিনা।”

চতুরানন চৌধুরী আর থাকতে পারলেন না। নিচু হয়ে বনমালী ঠাকুরের দু পা জড়িয়ে ধরলেন। বাব বাব বলতে লাগলেন, “এই কুণ্ডাই আপনি শোনান

ঠাকুর, এই কথাই মাহুয শুনতে চায় আজ। কালীঘাটের এই হতচ্ছাড়া মাহুয-
গুলোকে আপনি ঐ কথাই শোনান ঠাকুর যে, মা কালী সকলের বুকের মধ্যে
রয়েছেন। বুকের মধ্যে তিনি জাগলেই সকলের সব দুঃখ ঘুচবে। তখন আর
কাউকে ভাল হাতে নিয়ে পোড়া পেটের দায়ে হস্তে কুবুরের মত ছুটে মরতে
হবে না।”

আড্ডতদার পরাণকেষ্ট অতশত কিছুই বুঝলে না। মাঝখান থেকে সে বলে
বসল, “মা কালীর দায় পড়েছে আমাদের দুঃখ কষ্ট ঘোচাবার জগ্গে। মার যেন
চোখ নেই, মা যেন দেখতে পায় না যে, আমরা তাঁর চোখ তিনটেকে ফাঁকি দিয়ে
লুকিয়ে ছাঁপিয়ে একশ রকম মজা লোটবার ফন্দি আঁটছি মনে মনে। আর মুখে
বলছি, ‘মা একবার চোখ তুলে চাও গো। একবার চাও চোখ খুলে আর একবার
অন্ধ হয়ে থাক চোখ বুজে, যখন যেমন দরকার হবে আমাদের।’ আ-হা-হা,
আধিক্যোতা দেখ না। চল গো মা ঠাকরুন, নাও ওঠ। নে রে ফণা,
বোনাইটাকেও পাকড়ে নিয়ে চল। সামনের একটা ভাল দিন দেখে সাতটা পাক
ঘুরিয়ে দিলে হবেখন।”

এক ঝটকাষ ধনা আর ফণার হাত থেকে নিজের দুখানা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে
ফিনকি ছুটে এসে জাপটে ধরল তার বাপকে।

বনমালী ঠাকুর চোখ বুজে নিঃশব্দে মেয়ের রুক্ষ মাথায় হাত বুলতে লাগল।

একে একে প্রায় সকলেই বেরিয়ে গেল ঘব ছেড়ে। হাকিম সাহেব পুলিশ
অফিসারকে নিয়ে চলে গেলেন। তাঁদের যা জানাব ছিল, জানা হয়ে গেছে।
যাদের মেয়ে, তারাই ফিরে পেয়েছে মেষেকে। সুতরাং বে-আইনী কিছু হয়নি।
মেয়ে ফিরে পেয়ে মেয়ের মাও চলে গেলেন ছেলে মেয়ে নিয়ে। আড্ডতদার
পরাণকেষ্ট হবু জামাইটিকেও রেখে গেল না। ধনাকেও তিনি কাজকর্ম শেখাবেন
তাঁর আড্ডতে। সাইকেলের দোকান আর তাকে খুঁজে বার করতে হবে না।
বনমালী ঠাকুরও চলে গেল, কারণ মেয়ে ফিনকি বাপকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই
রাঙ্গী হল না। তপু তারু, বোঁমায়েরা ছেলেমেয়ে নিয়ে নিচে চলে গেল, তাদের
সংসার আছে। তাছাড়া বাপের কাছে ঠায় পাহারা দেবার দরকারও আর নেই।
পঞ্চানন ভটচাষ শুষ্ট করে বলেই ফেললেন সেই কথা। বললেন, “আর ভাবনা কি
গো তোমাদের। এবার তোমরা নিশ্চিন্তি হয়ে ঘর সংসার সামলাওগে যাও।
ধার দায় তিনিই যখন এসে পড়েছেন তখন আর ভাবনা কি।”

‘ হুতরাং যার দায় তাঁকেই এবার কথা বলতে হল । এতক্ষণ তিনি মুখ টিপে একধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এক পা এগিয়ে এসে বৌমায়েরে বললেন, “হ্যাঁ মা, তোমরা যাও এখন । ছেলপুলেদের নাওয়ানো খাওয়ানোর ব্যবস্থা কর গে ।”

ত্রিপুরারি হালদার একান্ত কৃতার্থ হয়ে বললে, “কাল যদি আপনি আসতেন মাসীমা, কি অবস্থাতেই কাটছে আমাদের কাল থেকে ।”

ভারকারি বললে, “কালই ত আমি বললাম, ঠুকে নিয়ে আসিগে । তা তোমরা বাবার ভয়ে রাজী হলে না যে ।”

ওরা সব বেরিয়ে গেল ঘর থেকে । বাপের ভার যার হাতে দেওয়া উচিত, তার হাতে ভুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল । যাবার আগে বৌমায়েরা নিচু গলায় বলে গেল, একটু পরে আপনিও নিচে আসুন মাসীমা । স্নান আঙ্গিক সেয়ে জল মুখে দিয়ে আবার আসবেন ।”

সবই স্তনলেন কংসারি হালদার মশাই, চোখ পিটিপিটি করে চেয়েও দেখলেন সব কিছু । তারপর তিনি চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন, কোথায় লুকাবেন তাঁর মুখখানা ।

এ কি হল ! ওকে এরা চিনলেই বা কেমন করে ! ওই বা কেন এল এখানে ! লজ্জা শরম ভয় ভর সব বিসর্জন দিয়েছে নাকি একেবারে ?

চোখ বুজেই একান্ত কুণ্ঠিত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “এবার কি হবে তাহলে ?”

যাঁর দায় তিনিই জবাব দিলেন । অল্পট সহজ স্বরে বললেন, “হবে আবার কি ? এবার আমরা কোনও তীর্থস্থানে চলে যাব । যেখানে গেলে শরীর মন ভাল থাকবে, এমন কোনও ভাল জায়গায় চলে যাব আমরা । কিছুদিন শান্তিতে থাকলেই আবার উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবে তুমি । আজই আমি বলছি ছেলেদের, যাবার ব্যবস্থা করতে । এখন যত তাড়াগড়ি হয়, এখা থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই ভাল ।”

হালদার মশায়ের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, “কিন্তু সেই লোকটা—”

একান্ত তাক্কিল্যের সঙ্গে তিনি বললেন, “সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না । আমার তপু তাক্কর মত দুই ছেলে আছে, আমাকে আর কেউ জ্বালাতে সাহস করবে না ।”

বড় মিশ্র মশাই এক কোণায় বসে নাম করছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি কথা বললেন । কথা বলতে গেলেই তাঁর মাথাটা ছপাশে ছলতে থাকে আর গলাটা ভয়ানক কাঁপে । বেশীক্ষণ চালাতেও পারেন না তিনি কথা, কাশি শুরু হয়ে যায় ।

গলা কাশিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, “ভাই যাও মা, কাঁসারীকে নিয়ে তুমি চলে যাও কোথাও। যেখানে গেলে ও স্বস্থ হয়, সেখানে নিয়ে যাও ওকে। কাঁসারী আমাদের ভাল আছে, উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে, এটুকু জানতে পারলেই আমাদের শান্তি। আমার চেয়ে ও অনেক ছোট মা, ঢের ছোট। তবু ও আগে পড়ল আর আমি এখনও চলে কিরে বেড়াচ্ছি।”

মিশ্র মশায়ের কাশি আরম্ভ হয়ে গেল।

হালদার মশায় আবার বলে ফেললেন, “আপনারা সকলেই চেনেন না কি ওকে!” পক্ষান ভট্টাচার্য হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে তিনি বলেন, “চিরকালটাই তোমার একভাবে কাটল কাঁসারী। কোনও কালে কিছু তুমি চোখেও দেখতে পেলে না, কানেও শুনতে পেলে না। কখনও কারও এতটুকু খবর রাখার গরজ ছিল না তোমার, যে তুমি কিছু দেখতে শুনতে পাবে। ওঁকে চেনে না কে এখানে? ঠেকে ঠুঁর দরজায় গিয়ে হাত পাতেনি এমন কেউ আছে না কি কালীঘাটে? পালপার্বণে কালীঘাট স্কন্ধ বামুনকে নেমস্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে উনি বিদেয় দিয়েছেন। ওই যে হতভাগা ডালাধরাগুলো, কবে ওরা লোপ পেত কালীঘাটের মাটি থেকে যদি উনি বুক দিয়ে আড়াল করে ওদের না বাঁচাতেন। কবে একবার নাকি তুমি ওঁর সামনে বলেছিলে যে, কালীঘাটের মাহুঘের হাড়ির হাল ঘোচানই তোমার স্বপ্ন। সে স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে তোমার ঐ শিষ্টাঙ্গী প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তুমি ত কিছুতেই কিছু দেখবে না চোখ চেয়ে। কংসারি হালদারের মুখের সামনে চোখ তুলে কেউ কথা কইতে পারে না, এই গর্বে অন্ধ হয়ে থেকেছ তুমি চিরকাল। আর স্বপ্ন দেখেছ, একদিন তোমার ঐ মা কালী চার হাতে সুরায়ের দুখুঁ ঘুচিয়ে দেবেন। কন্মিন কালেও তা হবে না হালদার, মার চারটে হাতই যে জোড়া। ভাই তিনি যা করার তা মাহুঘের হাত দিয়েই করান।”

বড় মিশ্র মশায় সামলেছেন তখন কাশি। বললেন, “অত কষ্ট করতেই বা যাবেন কেন মা কালী? সব কাজই কি আমরা মা কালীর সঙ্গে পরামর্শ করে করি, যে মা আমাদের সব কিছু সামলে দেবেন? মা স্পষ্ট জানতে, দেখতে পাচ্ছেন, যে কত কিছু আমরা তাঁকে লুকিয়ে করি। কাজেই তিনি চোখ বুজে আছেন আমাদের দিকে আর কখনও চোখ তুলে চাইবেন না। কি বল গো মা ঠাকরন?”

মা ঠাকরনকে আবার মুখ খুলতে হল। বললেন, “না না, তা হবে কেন মিশ্র মশায়। আমরা হলাম সন্তান, আমরা হাজারবার অন্তর করতে পারি তুল করতে

পারি। ওই ত আমাদের স্বভাব। তার জন্তে মা কি কখনও মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারেন। তাহলে মায়ের দয়াময়ী নামই যে মিথ্যে হয়ে যায়। মা যা করবার ঠিকই করছেন। ঐ তপু, তারু, ফণা ফিনকি ধনা ওদের বুকে মা জেগে উঠেছেন যা করবার, ওরাই করবে এবার। লুকিয়ে করার মত কোনও কাজ ওরা করতে পারবে না, কাজেই ওদের দিকে নজর রাখতে মায়ের কষ্ট হবে না।

কলি, ১ কালীঘাট।

আত্মশক্তি মহামায়ার মহাপীঠ।

ভাগীরথীর কূলে একদা ছিল সেই মহাতীর্থ। তখন কালীঘাটের ঘাটে জোয়ার-ভাটা খেলত, আমাবস্তা পূর্ণিমায় পাহাড়-প্রমাণ উচু হয়ে বান ডাকত, দেশ বিদেশ থেকে পালতোলা জাহাজ এসে ভিড়ত।

অদ্ভুত সাজপোশাক পরা বোম্বেটেরা নামত সেই সব জাহাজ থেকে কালীঘাটের তটে। দেশ বিদেশ থেকে মানুষ ধরে এনে তারা কেনা বেচা করত কালীঘাটের হাটে। ফিরে যাবার সময় মহাপীঠের মহাশক্তিকে তুষ্ট করাব জন্তে বিস্তর মানুষ বালশদিত তারা। বাল দিয়ে প্রার্থনা জানাত একান্ত সোজা ভাষায়—

“মাগো, এবাব যেখানে চলেছি লুটতরাজ করতে, সেখান থেকে যেন ফিরতে পারি কাজ হাসিল করে।”

সে-সব দিন বড় শান্তির দিন ছিল মা গালীর, ভক্ত সম্ভানদের প্রার্থনা বুঝতে একটুও কষ্ট হত না তাঁর। তাই তিনি খপ করে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে ফেলতেন।

তারপর একদা ভাগীরথী মরে যেতে লাগল।

জাহাজ আশা বন্ধ হয়ে গেল। লম্বা লম্বা ডোঙা ভরতি পাঠার আমদানি হল তখন কালীঘাটে। কালীঘাটেব হাট আর মানুষের হাট রইল না, পাঠার হাটে পরিণত হল।

মহামায়ার মহাপীঠে বিস্তর পাঠাবলি শুরু হয়ে গেল তখন। পাঠার ব্যাপারীরা পাঠাবলি দিয়ে ফেরবার সময় পাঠাব ভাষায় প্রার্থনা জানাতে লাগল মায়ের কাছে। সে প্রার্থনায় যত প্যাচ তত পচা গন্ধ। সেই পৈচাল প্রার্থনা শুনতে শুনতে আর পাঠাবলি দেখতে দেখতে মায়ের কালো মুখ আরও আঁধার হয়ে উঠল।

তারপর একদা ভাগীরথী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

১ পচা পাক আর মরা কুকুর বেড়ালে ভয়ে উঠল ভাগীরথীর বুক। দুকোনও দেশ

থেকে কোনও তরীই আর আসতে পেল না কালীঘাটের কূলে। মানুষ, পাঠা, কোনও কিছুই উঠল না আর কালীঘাটের হাটে। সেই শুকনো ডাঙায় বসে ম, কালী শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন কেওড়াভলার পানে।

তারপর একদা একটা আইনের হাট বসল মরা গন্ধার ওপারে। আবার জাঁকিয়ে উঠল কালীঘাট। কালীঘাটের হাটে আইনের বেচা কেনা জমে উঠল। মাকে শিখতে হল আইনের মারপ্যাচ। এ-পক্ষ ও-পক্ষ দু-পক্ষই মায়ের সামনে প্রার্থনা জানাতে লাগল, “মা, কাজ হাসিল কবে দাও। আইনেব খাঁড়ায় শত্রু যেন কচুকাটা হয়ে নিপাত যাব।”

কোনও পক্ষের প্রার্থনাই কানে তুললেন না মা। কে যায় ঐ বিষম ফ্যাসাদে মাথা গলাতে। এ-পক্ষ ও-পক্ষ দু-পক্ষই ফতুব হয়ে ফিরতে লাগল কালীঘাটের হাট থেকে।

তবু দু-একটা মানুষ তখনও রয়ে গেল কালীঘাটে, যাবা স্বপ্ন দেখতে লাগল। স্বপ্ন দেখতে লাগল ভাগীরথীতে আবার বান ডাকবে। কুলকুল করে দুকুল ছুঁয়ে বয়ে যাবে মা গঙ্গা কালীঘাটের ঘাটের সামনে দিয়ে। সেই গঙ্গায় মহানিশার অস্ত্রে আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে মহাশক্তির সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ অঞ্জলি ভরে গঙ্গাজল নিয়ে অর্ঘ্য দেবেন—

১. ঐতাদিত্য মণ্ডলমধ্যবর্তিত্তে নিত্যচৈতন্ত্যোদিতারৈ ইদমর্ঘ্যং
শ্রীমদক্ষিণাকালিকার্তৈ স্বাহা।

যে মুহূর্তে সেই অর্ঘ্য পড়বে গঙ্গার জলে, সেই মুহূর্তে দাঁড় দাঁড় কবে আগুন জলে উঠবে। জলবেই আগুন, যে সন্তান মহাসাধনার বলে চৈতন্ত্যস্বরূপা আত্মা-শক্তিকে জাগাবে, তার অর্ঘ্যে আগুন জলবেই। সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে কালীঘাটের সমস্ত কলুষ, ভাগীরথী সেই ছাই বয়ে নিয়ে গিয়ে সাগরের জলে বিলর্জন দেবে।

কংসারি হালদার মশায় স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর কলিতীর্থ মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে অষ্টবার। হয়েছে একটি মাত্র সন্তানের মরণজয়ী সাধনার ফলে। সেই স্বপ্ন যুকে নিয়েই তাঁকে কালীঘাট ছেড়ে চলে যেতে হল।

এখন কালীঘাটে গিয়ে মাথা খুঁড়ে মলেও কেউ কংসারি হালদারের দেখা পাবে